আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

NOT TO BE REMOVED.

ভূমিকা

"আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা" পুস্তকটি প্রণয়ন করিতে আমার অনেক দিন সময় লাগিয়াছে। এই পুস্তকটির পরিকল্পনায় বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীভগবান দাস গাঙ্গুলী, অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, বাণীপুর নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকটি রচনায় অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী ও স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের সহকারী শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক বক্সী তাঁহার শিক্ষার ইতিহাস পুস্তক হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। সোদরপ্রতিম শ্রীপ্রণয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়া আমাকে বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন। আমি সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পুস্তকটিতে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস এবং ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যাসমূহ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিক্ষার্থীরা এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। ইতি

বাণীপুর, স্বাধীনতা দিবস
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

উৎসর্গ

পরম আরাধ্যা স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচী

বর্তমান যুগ

পরবর্তী যুগ

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে, আমাদের শুধু বর্তমানকে জানিলেই চলিবে না, যে অতীত যুগের শিক্ষার ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শিক্ষাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের সর্বাগ্রে জানিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অতিশয় প্রাচীন এবং সেই দিক হইতে প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন দেশের সঙ্গে ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। অতএব প্রাচীন ভিত্তির উপর স্থাপিত ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে পূর্বে আমাদের অতীতকে স্মরণ করিতে হয়। প্রাচীন যুগের সঙ্গে গ্রন্থি রহিয়াছে বর্তমানের। আমরা যতই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে চাই না কেন, আমাদের অস্থিমজ্জাগত পুরাতনের প্রভাব আমরা এড়াইয়া উঠিতে পারি না। শিক্ষা-ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে আমাদের দেশের অতীতের শিক্ষাধারার অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করা একান্তই প্রয়োজন।

বর্তমানে শিক্ষকতা একটি বৃত্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে এবং ইহার জন্য বিভিন্ন প্রকার কলা-কৌশল শিক্ষকগণকে আয়ত্ত করিতে হইতেছে। এই বৃত্তির যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য অতীত যুগের শিক্ষা-ব্রতীদের বিভিন্ন কর্মপন্থাসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই শিক্ষাব্রতীরা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইবেন।

আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। আমরা উত্তরাধিকার বলে যাহা পাইয়াছি, তাহাকে উন্নত করিয়া লইয়া যাওয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য। সেই হিসাবে আমরা কোন্ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা আমাদের সর্বাগ্রে জানিতে হইবে, তবেই আমরা আমাদের দেশকে শিক্ষার দিক হইতে অগ্রসর করাইয়া লইয়া যাইতে পারিব।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে শিক্ষার ইতিহাস জানিব কেন তাহা আলোচনা করিব।

শিক্ষার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না—কারণ শিক্ষাই হইতেছে সেই সোপান যাহা মানুষকে পশুত্বের স্তর হইতে বর্তমান মনুষ্যত্বের সুউচ্চ স্তরে উন্নীত করিয়াছে, এবং মহামানব বা Supermanএর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত রাখিয়াছে।

কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও 'শিক্ষার ইতিহাসের' গুরুত্ব আমাদের মনে তেমন সহজ স্বীকৃতি পায় না। তাহার কারণ কি?

প্রথম কারণ শিক্ষাদান-কৌশল যে শুধু কলা-কৌশল অর্থাৎ আর্ট নয়—ইহা যে একটা বিজ্ঞান তাহা অনেক শিক্ষকই মনে করেন না। তাঁহারা অনেকেই ব্যক্তিগত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রচুর সার্থকতা দেখান এবং তাই ইহাকে একটি আত্মক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত Art মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাঁহার সকল শিক্ষাদান কৌশলের ক্ষেত্রেও ততখানি স্বয়ম্ভু নন। তাঁহার শৈশব কৈশোরের যে সমস্ত ভাল শিক্ষক তাঁহার মনে রেখাপাত করিয়াছেন, নির্জ্জন মনে তিনি তাঁহাদের স্মৃতি বহন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াই তাঁহার ঐ Artএ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এই ভাবে অজ্ঞাতসারেই শিক্ষাদানের একটি পরমাশ্চর্য ধারাবাহিকতা থাকিয়াই যাইতেছে। যদি ঐ ধারাবাহিকতাকে সজ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জন করা যাইত তাহা হইলে তাঁহার ঐ Art আরও সুফলপ্রসূ হইত, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শিক্ষার ইতিহাস—শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রভৃতির সহিত মিলিত ভাবে কার্যে সহায়তা করে।

তাহা ছাড়া শিক্ষা কথাটার অর্থও দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। শিক্ষার একটা দিক মাটির দিকে—দৈনন্দিন জীবন-যাপনে অধিকতর সার্থকতা অর্জনই তাহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু তাহার আর একটা দিক আকাশের দিকে—যে দিকটা মানুষের জীবনের—সংকীর্ণ গণ্ডীকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও জীবনাতীত বৃহতের দিকে

হাতছানি দেয়। এই মাটি ও আকাশের সম্মিলিত অবদানেই মনুষ্যত্ব রূপ বিষয়ের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটির প্রতি অধিক গুরুত্ব অপরটিকে অনেক ক্ষেত্রেই পঙ্গু করিয়াছে এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ-ছন্দে বেতাল আনিয়াছে। এই দুই দিকের সমতা রক্ষা সহজ নয়—তাহা লাভ করিতে হইলে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ও সার্থকতা হইতে জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে। শিক্ষার ইতিহাস আমাদিগকে সেই জ্ঞান দেয়।

মানুষের শিক্ষার অভিজ্ঞতা যুগে যুগে দেশে দেশে খণ্ডিত ভাবে ছড়াইয়া আছে। ইহাদের সম্মিলিত ইতিহাসই সত্যকার শিক্ষার ইতিহাস। এক দেশ যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা যেমন শিখিতে পারি, আবার আর এক দেশের ভুল পাদক্ষেপও তেমনি আমাদিগকে শিক্ষার সুযোগ দেয়। আবার প্রতি দেশের শিক্ষার অভিজ্ঞতার সঙ্গে রহিয়াছে যুগের স্বাক্ষর—সমাজ ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যময় পটভূমি। শুধু তাহাই নয়, মানুষের চিন্তাধারা ভূগোলের সীমা মানে না—সুদূর অতীতে যখন মানুষ নিজ দেশ হইতে খুব দূর পর্যন্ত যাওয়াতে সক্ষম ছিল না, তখনও ভাবধারা ভূগোলের সীমা মানে নাই। আজ মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সারা পৃথিবীর মানুষকে বাস্তব অর্থেই এক গোষ্ঠীভুক্ত করিয়াছে। তাই আজিকার যুগে বিশ্বমানবের কালাতীত সত্বার অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করিয়া তাহার জয়যাত্রার নূতন দিশা আবিষ্কারের প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে।

সেই কারণে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে শিক্ষার ইতিহাস আজিকার শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ইতিহাস চর্চায় স্বদেশকে গৌণ করা যে কত বড় ভুল তাহা আজ আমরা জানিয়াছি। যে মূঢ় নিজেকে চিনিতে পারে নাই, সে আর কাহারও সত্যকার পরিচয় কি বলিয়া লাভ করিতে সক্ষম হইবে? শিক্ষার ইতিহাস জানার উদ্দেশ্য যদি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লাভ করাই হয়, তবে নিজের দেশের শিক্ষার ইতিহাস জানার প্রয়োজন সর্বাগ্রে—অবশ্য অন্য দেশের শিক্ষার ইতিহাসও সমভাবেই জ্ঞাতব্য।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সমৃদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সাধারণ ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস জানিতে যতটা আগ্রহী, নিজেদের ইতিহাস জানিতে ততটা আগ্রহী নই।

অসুবিধা আছে। আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি। আমাদের জাতের এইটা ঐতিহাসিক ত্রুটি। তাই আমাদের ইতিহাস জানা সহজ নয়। সেই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে ইহাই আনন্দের। তবু নানা ভুল-ভ্রান্তি ও অন্ধ ধারণা কাটাইয়া আমাদের দেশের সাধারণ ইতিহাসের সত্যকে আবিষ্কার এখনও সাধনার বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

শিক্ষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই সত্য আরও কঠোর ও নির্মম ভাবে দেখা দিয়াছে। তবুও তাহার মধ্যে শিক্ষাব্রতীকে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য সমাজ ও জাতি গঠন। আর এই লক্ষ্যের সাফল্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃজনের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে।

ইতিহাস শিক্ষার ফলে মানুষের মন বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া উদার হয়, সীমাহীন কল্পনারাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হয়, বুদ্ধি ক্ষুরধার হয় এবং অন্যের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়া থাকে। বিশ্ব-ইতিহাসের মধ্য দিয়া মন সংবেদনশীল হয় এবং আন্তর্জাতিকতার দিকে মন ঝুঁকিয়া পড়ে। শিক্ষার ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়াও মানুষের মন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের শিক্ষাধারা এবং দেশের প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিক্ষাধারার সংস্পর্শে আসিয়া থাকে। ফলে মানুষের মন বিভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যে পরিপাক লাভ করে। মানুষের নির্জ্ঞান মনের জারক রসে সকল শিক্ষাধারা মজিয়া, থিতিয়া যায়, মন নূতনকে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। গ্রহণ, বর্জন আপনা আপনিই সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমানকে বুঝিবার জন্য, বর্তমানের সাথে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য অতীতকে জানা অপরিহার্য।

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা

আমাদের ভারতবর্ষ আজ খণ্ডিত হইয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে ভারত ও পাকিস্তানের। কিন্তু বহু প্রাচীন যুগ হইতে তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতবর্ষ ছিল অখণ্ড। আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা কালে আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের কথাই উল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষে বহু বিদেশী জাতি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড়, আর্য, সিথিয়ান ও মোঙ্গেলিয়ান প্রধান। তাহা ছাড়াও পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পার্শী, আরবীয়, তুর্কী, আফগান, মোগল ইত্যাদি জাতি ভারতবর্ষে আসে। পরিশেষে আসে ইংরেজ ও আরও কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি।

অনেকের ধারণা ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য জাতি বাস করিত এবং আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পর অসভ্য অনার্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অনার্যগণকে পরাজিত করিয়া আর্য-সভ্যতার বিস্তার করে। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের দেশের সভ্যতার সুরু আর্যগণ হইতে নয়, আরম্ভ তাহার বহু পূর্ব হইতে। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের সময় সিন্ধুর মোহেন-জো-দড়ো ও পঞ্জাবের হরপ্পায় (বর্তমানে উভয় স্থানই পাকিস্তানের অন্তর্গত) সুসভ্য জাতি বাস করিত বলিয়া ভূপ্রোথিত ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ঐ সকল স্থানে এক বিশিষ্ট নগর-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং শিল্প, কলা ও স্থাপত্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। এই প্রাচীন সভ্যতাকে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সভ্যতা কাহারও কাহারও মতে মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক, আবার কেহ কেহ মিশরীয় সভ্যতার পরবর্তী যুগের সভ্যতা বলিয়া ইহাকে বর্ণনা করেন। এই সময় বিভিন্ন সভ্য দেশের সঙ্গে মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ভারতবাসী যে 'অসভ্য' ছিল একথা বলা চলে না। যাহারাই আর্য নয়, তাহারাই 'অনার্য' বা অসভ্য একথা স্বীকার করা

যায় না। তাহা ছাড়া আর্যদের পূর্বে দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে বসবাস করিতে থাকেন। দ্রাবিড়গণ সুসভ্য জাতি ছিল এবং সমসাময়িক সুসভ্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল। তাহা ছাড়া কাহারও কাহারও মতে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড়-সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। এই সমস্ত তথ্য হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বেও ভারতবর্ষ একটি সুসভ্য দেশ ছিল।

আর্যগণের আগমন

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে রূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহার ভিত্তি আর্যদের ভারতে আগমনের পর হইতেই স্থাপিত হইয়াছিল। আর্যগণ খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দের কিছু পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। আর্যগণের আগমন হয়ত একই সময়ে সংঘটিত হয় নাই। কয়েক বারে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ছড়াইয়া পড়েন। আর্যগণ যখন ভারতে আগমন করেন তখন ভারতের অধিবাসী ছিল আদিম অধিবাসী বা অনার্য অর্থাৎ যাহারা আর্য নয়। 'অনার্য' এবং 'অসভ্য' একার্থবোধক হিসাবে আর্যগণ মনে করেন। আর ছিল ভারতের দক্ষিণ দিকে দ্রাবিড় জাতি। আর্যগণের সঙ্গে আদিম অধিবাসী বা অনার্য ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। পরাজিত অনার্য আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করে এবং দাস হইয়া থাকে। আর্যগণ শুধু ভারতবর্ষের ভূমি অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা যেমন রাজবংশ স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহারা ধর্ম, দর্শন, কলা, বিজ্ঞানও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিয়াছেন।

সভ্যতার সম্মেলন

আর্য-সভ্যতার পরিচয় আমরা পাই বেদে। চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রধান। ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেও আর্যগণের মধ্যে বেদ প্রচলিত ছিল। বেদ লিখিত গ্রন্থ ছিল না, উহা মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। শ্রবণ করিয়া শিখিতে হইত বলিয়া বেদের আর এক নাম শ্রুতি। ঋগ্বেদের কয়েকটি শ্লোক হইতে অনুমান করা যায় যে আর্যগণ কর্তৃক সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্র এই ধ্বংসকার্যে সহায়তা করেন। এই কারণেই ইন্দ্র দেবতা রূপে পূজিত হইতে থাকেন। যুদ্ধে ইন্দ্র অগ্নি ও প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন অগ্নি ও বরুণের সাহায্যে। অতএব অগ্নি ও বরুণও দেবতার সম্মান লাভ করেন। ঋগ্বেদের নানা অনুষ্ঠান ও ভাষা-বিষয়ক,

গবেষণা হইতে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে আর্যগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল শিকার ও পশুপালন। তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং তাঁহারা যোদ্ধা জাতি হিসাবে বিশেষ কুশলী ছিলেন বলিয়া সিন্ধু-সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিন্ধু-সভ্যতা নগর-সভ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু আর্যগণ নগর-সভ্যতার বিরোধী ছিলেন বলিয়া সিন্ধু-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র নগর-সভ্যতাকে হজম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে আর্যগণ নগর-সভ্যতায় অভ্যস্ত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নগর গড়িয়া উঠে। আর্যগণ নগর-সভ্যতায় প্রথমে অভ্যস্ত না হইলেও তাহারা যে সুসভ্য জাতি ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সাহিত্যে তথা ধর্মগ্রন্থে। ঋগ্বেদ উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি দেবতার পূজা করিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতিক শক্তি। অতএব আর্যগণ ধর্মের দিক হইতে জড় চৈতন্যবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, একথা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

আর্যগণ ভারতে আসিয়া ভারতের নানা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পাই ঋগ্বেদে পরবর্তী দেবতা সৃষ্টি হইতে। আর্যগণ ধ্যান-ধারণায় প্রথমে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন ক্রিয়া-কর্মে। কিন্তু ধ্যান-ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় দ্রাবিড়-সভ্যতায়। আর্যগণ দ্রাবিড়-সভ্যতা হইতেই ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। 'মহাদেবকে' আমরা দেখিতে পাই আর্যগণের রুদ্র দেবতা হিসাবে, কিন্তু তিনি দ্রাবিড়-সভ্যতার ধ্যানের দেবতা এবং অনার্যদের আত্মভোলা শ্মশানে বিচরণকারী দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া মনে করা যায়। এই ভাবে নানা সভ্যতার মিলনের ফলেই ভারতীয় আর্য-সভ্যতা এক বিরাট সভ্যতায় পরিণত হয়।

আর্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। শিলমোহর ও পোড়ামাটির আসবাবের উপর চিত্রাবলী আমরা ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া পাইয়াছি বটে, কিন্তু ঐসব লিপিমালার পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু অন্যদিকে তৎকালে ব্যবহৃত নানা রকম জিনিষ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে সেই যুগে শিক্ষা-পদ্ধতি সুসংগঠিত ছিল। তাহা না হইলে তৎকালীন জীবন-যাত্রার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অত সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে

পারিত না। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পা ধ্বংসাবশেষ ও বিভিন্ন প্রকারের বাসগৃহ এবং পোড়ামাটির চিত্র হইতে অনুমান করা যায় ঐ নগরীগুলি বাণিজ্য-নগরী ছিল। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং দাসপ্রথাও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল না বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের মধ্যে দাসপ্রথাও ছিল না। আর্যদের মধ্যে পরে যে শ্রেণীভেদ দেখা যায় তাহা বিজিত সভ্যতার ফল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

মার্শাল, এঞ্জেলস প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে মানুষ প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত হিসাবে বাস করিত, প্রথমেই পরিবার সৃষ্টি হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবন তখন স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে নাই। গোষ্ঠী হিসাবে অর্জন এবং গোষ্ঠী হিসাবে ভোগ—এই ছিল চিরাচরিত-রীতি। আর্যগণ ভারতে আগমনের পূর্বে গোষ্ঠীভুক্ত জীবন যাপন করিতেন এবং ভারতে তাহারা যখন আগমন করেন, তখনও নানা ক্রিয়াকর্মে গোষ্ঠী-জীবনের ছাপ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। তবে একথাও ঠিক যে এই সময়ে পরিবার-জীবনের দিকে তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ভারতে আগমনের পূর্বে আর্য-সভ্যতা

ঋগ্বেদের দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক ছিলেন এবং তাঁহারা সকলের দ্বারা পূজিত হইতেন। এই সময়ে মানুষ আংশিক কল্পনা ও আংশিক সত্য দ্বারা জগতের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন, বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা এইটুকু বুঝিতেন যে কোনও কিছু সম্পাদন করিতে হইলে ইচ্ছা-শক্তি ও বাস্তব-শক্তির প্রয়োজন। তাই তাঁহারা যেসমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা বা বিপর্যয় দেখিতেন, তাহাদের পিছনেও তাঁহারা ঐরূপ ইচ্ছা-শক্তি ও বাস্তব-শক্তির প্রয়োগ করিতে উদ্যোগী হইতেন। বন্যা, দাবানল, অশনিপাত, বৃষ্টি ইত্যাদির পশ্চাতে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগকারী কোন শক্তি আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। মানুষ যদি খুশী হয়, তাহা হইলে সে অপরের ভাল করে। আর মানুষের যদি ক্রোধ হয় তাহা হইলে সে অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। ঠিক একই নিয়মের অনুবর্তী সেই ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগকারী কোন শক্তি। তাই এই ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগকারী শক্তিকে যে ভাবেই হউক সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। ফলে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নানা রকম স্তব-স্তুতির ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের প্রচলন হইল। এই সব স্তব-স্তুতি ও

বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান বংশগত ভাবে শিখাইয়া রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন হইতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। শিক্ষার ইতিহাস হইতে আমরা এই কথাটুকু জনিতে পারি। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, যথা শত্রুকে নিধন করিবার কৌশল শিক্ষা, শিকার করার কৌশল শিক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ করার শিক্ষা ইত্যাদি। ধর্মীয় শিক্ষা হইতে জীবনের প্রয়োজনে এই সব শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও জীবন ছিল একার্থবোধক এবং সকল প্রকার শিক্ষাই জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা ছিল।

নানা রকম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিলে দূরে অবস্থিত শত্রুকে নিহত করা যায়। ইহা হইতে অস্ত্র নির্মাণ ও শর নিক্ষেপের কৌশলকে প্রাধান্য দেওয়া হইল না। মনে করা হইল যে ঐ প্রকারে শর নিক্ষেপ করিলে শিকারের দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাহার ফলে প্রার্থিত ফল লাভ করা যায়। এই কারণে শর নিক্ষেপ কৌশল শিকার দেবতার সন্তুষ্টি হিসাবে পরিগণিত হইল। অগ্নি প্রজ্জলনের ক্ষেত্রেও দেখা গেল নানা প্রকার ইন্ধন-দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকারের অগ্নি প্রজ্জলিত হয়। মনে করা হইল ইন্ধন-দ্রব্যের মধ্যে অগ্নি দেবতার ভালবাসার পাত্রী 'স্বাহা' দেবী রহিয়াছেন। ফলে অগ্নি প্রজ্জলন জীবন-যাত্রায় মূল স্থান পাইল না, মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা অগ্নিদেবতার আরাধনার অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইল। এইরূপে অনেক ক্ষেত্রেই উপাসনা ও আরাধনার মূল উৎস দেখা যাইতে লাগিল। আরাধনা ও উপাসনার জন্য স্তোত্র রচিত হইল, প্রক্রিয়াও স্থির হইল। কিন্তু শুধু নিজেদের জানিলেই চলিবে না, বংশপরম্পরায় স্তোত্র, রীতি, নীতি, আচার ইত্যাদির ধারা যাহাতে প্রবাহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা হইল। সহজে শিক্ষাদানের উপায় মন্ত্র ও স্তোত্রগুলিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া সংক্ষিপ্ত আকার দান করা। ইহার কারণ ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়। এইরূপ ভাবে জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, আচরণ ইত্যাদি 'বেদ' সৃষ্টি করে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে জন্মলাভ করিয়াছে নূতন অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস এবং বেদের মধ্যে শ্লোকের আকারে উহারা স্থান পাইয়াছে। বহু যুগের অভিজ্ঞতা বেদে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কালের গতিতে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

বেদের জন্ম

প্রয়োজন হয়ত ততটা প্রকট নাই, তবুও অভিজ্ঞতাগুলি বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে স্থান লইয়া রহিয়াছে। যদিও অনুষ্ঠানগুলি হয়ত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন উদ্দেশ্য বহন করিতেছে। এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি, ঋগ্বেদ শুধু আর্যদের ভারতের আগমনের সময় তাঁহাদের জীবনধারণ-বিষয়ক পরিচয় দান করে না। আর্যদের ক্রম-বিকাশের ধারাও উহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই কারণেই বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষের দ্বারা রচিত নয় বলিয়া বলা হয়, কারণ বাস্তবিক পক্ষে বেদ কোন বিশেষ মনুষ্য দ্বারা রচিত হয় নাই। উহা মানুষের বহু কালের অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনা ও বিশ্বাসের ফল। বেদের অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষ মানুষের দ্বারা রচিত বলিয়া মনে করা হইলে উহার সংরক্ষণ ও উহার বিকৃতি রোধ করিবার প্রতি মানুষ খুব বেশী যত্নবান হইত না। উহা অপৌরুষেয় বলিয়াই মানুষ উহাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে। বেদের আর এক নাম শ্রুতি, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদ গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শিখিতে হইত। লিখিত ভাষার প্রচলন ছিল না বলিয়াই যে ঐভাবে বেদ শিক্ষা করা হইত এমন নহে, কারণ দেখা যায় যে যে সময় লিখিত ভাষার প্রচলন হইয়াছে, সে সময়েও বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শিষ্য শিক্ষা করিত। তাহার কারণ, বেদের অনুষ্ঠানসমূহের আচরণকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা হইত এবং ফলে উহাতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইত। বেদের স্তোত্রগুলি শুধু কর্মের বর্ণনা নয়, উহা দেবতার তুষ্টির জন্য লিপিবদ্ধ। অনুষ্ঠানগুলি যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং স্তোত্রগুলি যদি উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেই দেবতাগণ একমাত্র সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহাতে উপযুক্ত ফল লাভও হইবে। যে জাতীয় জ্ঞানের কথা বলা হইল, উহা শুধু গুরুমুখ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে, লিখিত পুঁথি হইতে তাহা পাওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া, যে বেদমন্ত্র সঠিক শুদ্ধ উচ্চারণে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং পক্ষান্তরে উহা ভুল উচ্চারিত হইলে দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন, সেই বেদমন্ত্র একান্তই পবিত্র মন্ত্র এবং উহা উচ্চারণ করিবার পূর্বে শিষ্যকে পবিত্র হইতে হইবে। বেদের মন্ত্রোচ্চারণ সম্পর্কে এই বিশ্বাস শিষ্যকে খুবই নিয়মনিষ্ঠ করিয়া তোলে।

'শ্রুতি' হিসাবে বেদ শিক্ষাদান করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাতে নূতন নূতন শ্লোক সংযোগ করা সম্ভব হইয়াছিল। জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের

নূতন নূতন অভিজ্ঞতা বৈদিক মন্ত্ররূপে এইভাবেই স্থান পায়। মুখে মুখে প্রচারিত হইত বলিয়া কোন ঋষির অভিজ্ঞতালব্ধ নূতন শ্লোককে মানুষের রচিত বলিয়া কেহ অগ্রাহ্য করিত না। আর্যগণের ভারতবর্ষে আসিবার পর যখন বেদের শ্লোকাদি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, তখন ইহাকে একটি সুসংবদ্ধ আকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সম্ভবতঃ বেদব্যাস নামে কোন কোন ঋষিকল্প পণ্ডিত বেদকে সুসংবদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে মানুষের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। তাহার ফলেই উপনিষদাদি গ্রন্থে উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বেদ অপৌরুষেয় এবং সকল শিক্ষার মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অতএব প্রাচীনযুগের কোন কিছু অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা বেদের সাহায্য লইতে বাধ্য। শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধেও একই কথা। প্রাচীন যুগের শিক্ষার কথা জানিতে হইলে আমরা বেদের একান্ত সাহায্য-প্রার্থী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক শিক্ষা

ঋগ্বেদের দুইটি অংশ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে প্রধানতঃ স্তোত্র। উহা দেবতাগণের প্রতি স্তুতি এবং যজ্ঞ, উপাসনা ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানকাণ্ডে আছে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সত্য কিভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে তাহার বিবরণ। ঋগ্বেদের কর্মকাণ্ড আর্যগণের ভারতে আগমনের পুর্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সত্য যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বা সত্যদ্রষ্টা বলা হয়। আমরা বেদে সাত জন ঋষির পরিচয় পাইয়া থাকি। তাঁহারা হইতেছেন, (১) বশিষ্ট (২) বিশ্বামিত্র, (৩) ব্যাসদেব, (৪) অত্রি, (৫) কন্ব, (৬) ভরদ্বাজ ও (৭) গৃৎসমদ। দুর্বাসা, পরাশর, জামদগ্নি প্রভৃতি ঋষিরও উল্লেখ দেখা যায়।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি

বিভিন্ন ঋষির অবদান সংহিতার আকারে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহাদিগকে মণ্ডল বলা হয়। ঋগ্বেদে ১০১৭টি স্তোত্র আছে এবং উহা দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ১০১৭টি স্তোত্রের মধ্যে ১০৫৮০টি শ্লোক এবং ৭০,০০০ সারিতে ১৫৩৮২৬টি বাক্য আছে। এই ৭০০০০ সারির ৫০ হাজার সারির উল্লেখ বারে বারে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। ঐ যুগের সমাজে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংকলন করিয়াছেন।

উপরে উক্ত দশটি মণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত অংশটি ঋগ্বেদের মূল কেন্দ্র বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই ছয়টি মণ্ডলের প্রত্যেকটি মণ্ডলই একটি ঋষির নামের সঙ্গে জড়িত এবং হয়ত উহা নির্দিষ্ট-ঋষির নিজের ও তাঁহার বংশধরদের অবদান। ইহাতে মনে করা যায় যে মণ্ডলগুলি পারিবারিক সাহিত্য এবং বংশ পরম্পরায় উহা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীনকালে রাজা ও ভূম্যধিকারীরা নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য যজ্ঞের আয়োজন করিতেন। যজ্ঞের জন্য পুরোহিতের সাহায্য লইতে হইত।

ঋষিগণের বংশধরেরা পুরোহিতের কাজ করিতেন এবং নিজ নিজ পারিবারিক স্তোত্র ও শ্লোকগুলিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া সুসাহিত্যের আকার দিতে চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞাদি ব্যাপারে বিভিন্ন পুরোহিতের প্রতিযোগিতার ফলে স্তোত্রগুলি ধীরে ধীরে খুবই সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। যতই পুরোহিতদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই যজ্ঞাদির নিয়মকানুনও জটিল হইতে থাকে। ফলে পুরোহিতেরা বংশধরদিগকে নিজ নিজ ঘরোয়ানা সম্বলিত স্তোত্র ও রীতি-নীতি উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়া যাইতে থাকেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ইহাই মূল ও আদি ব্যবস্থা ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সর্বপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা

ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার প্রথম অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। বর্ষাকালে ব্যাঙ্‌রা যেভাবে একত্র মিলিত হয়, সেই ভাবে ব্রাহ্মণগণও একত্র মিলিত হইয়া থাকেন এইরূপ একটি বর্ণনামূলক কবিতায় প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যাঙ্‌রা যেমন এক স্বরে ডাকিতে থাকে সেইরূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নির্দেশক্রমে তাঁহার পুত্রগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পারিবারিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তোত্রগুলি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে থাকেন, যতক্ষণ না সেই স্তোত্রগুলি কণ্ঠস্থ হয়। প্রত্যেক পণ্ডিত তাঁহার পারিবারিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোপনতা অবলম্বন করিতেন। পরে কোন এক সময়ে এই পারিবারিক অবদানগুলি একত্রিত হইয়া যায় এবং একসাথে উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা কিরূপ ভাবে সংগঠিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না, তবে মনে হয় কোন এক পরাক্রমশালী রাজা বা দেশনায়ক হয়ত নিজের কল্যাণের জন্য যজ্ঞাদি সংক্রান্ত সমস্ত সাহিত্যকে একত্র করিয়াছিলেন। এইভাবে খুব সম্ভবতঃ সমস্ত মণ্ডলগুলি একত্র করা হয়। পরে প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল রচিত হয়। ইহারও পরে নবম মণ্ডল যাহা সোম যজ্ঞাদি সংক্রান্ত বিষয়, তাহা যুক্ত হয়। সর্বশেষে দশম মণ্ডল লিখিত হয়। যদিও ইহাতে পুরাতন বিষয়ের পুনরুল্লেখ রহিয়াছে, তবুও তাহাতে পরে কিছু নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত করা হয়। ইহার ভিতর একটি স্তোত্রে বর্ণবিভেদের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে ঐ সময়ে সামাজিক জীবনে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজ হইয়াছে জটিল। শেষ মণ্ডলের একটি স্তোত্রে ব্রাহ্মণদের বিতর্ক-সভায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিতর্ক-সভায় সাফল্যের উপর একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানের যজ্ঞাদি ব্যাপারে অংশগ্রহণ নির্ভর করিত বলিয়া মনে হয়।

ঋগ্বেদের সমস্ত স্তোত্রের একত্রীকরণ খৃষ্টপূর্ব ১০০০এর পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। একত্রীকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর পারিবারিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে গুরুর পুত্রও পিতার কাছেই শিক্ষালাভ করিত। অবশ্য গুরু অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেন। পিতা শিক্ষক হইলে পুত্র তাহার পিতার কাছে শিক্ষালাভ করিবে, ইহা সকল যুগেই সম্ভব। তাই পুত্র শিক্ষার্থী থাকিলেও উহাকে ঠিক পারিবারিক শিক্ষাকেন্দ্র বলা চলে না।

বেদের ক্রমবিকাশ

'বেদ' শব্দের অর্থ হইতেছে 'জ্ঞান' এবং ইহা 'বিদ' অর্থাৎ 'জানা' শব্দ হইতে উদ্ভূত। বেদের স্তোত্র সংগ্রহ সাহিত্য হিসাবে উহার সংরক্ষণের জন্য নয়, উহারা যজ্ঞাদি-কর্ম ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত বলিয়া স্তোত্রগুলিকে সংগ্রহ ও একত্র করা যায়। যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠানে পুরোহিতকে তিন রকম কর্ম করিতে হইত। তিন রকম কর্মের জন্য তিন রকম নামকরণ করা যায়। যিনি প্রধান পুরোহিত তাঁহাকে বলা হইত হোতা। যজ্ঞকালে তিনি যে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হইতেছে, সেই দেবতার যথা,—ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদির প্রীত্যর্থে স্তোত্র ও শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। অনুষ্ঠানের আর একটি অংশ ছিল সোম যজ্ঞ। সোম হইতেছে প্রকৃতপক্ষে একটি বৃক্ষ হইতে নিষ্পেশিত এক প্রকার রস। ইহা অত্যন্ত বলকারক এবং আনন্দবর্ধক পানীয় বলিয়া উহাকে দেবতাদের পানীয় বলিয়া মনে করা হইত এবং উহা পান করিলে মৃত্যুকে জয় করা যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। ফলে সোমরস দেবতার স্থান লাভ করে এবং বিশেষ অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উহার সম্বন্ধে গড়িয়া উঠে। যে পুরোহিত সোম দেবতার প্রীত্যর্থে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাকে বলা হইত উদ্গাতা। যজ্ঞাদি-ব্যাপারে যিনি নানা রকম কায়িক পরিশ্রম-জনিত কাজ করিতেন তাঁহাকে বলা হইত অধ্বর্যু। প্রথম অবস্থায় যে কোন পুরোহিত এই তিন জাতীয় কর্মের মধ্যে যে কোন কর্ম করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেক ছাত্র-পুরোহিত তিনটি বিষয়েই শিক্ষণ লাভ করিতেন এবং কার্যকালে যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কালক্রমে ইহার পরিবর্তন করিতে হয়। যজ্ঞাদি ধীরে ধীরে এত জটিল অনুষ্ঠান-সম্বলিত হয় যে পুরোহিতের কর্মের মধ্যেও শ্রমবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কোন ছাত্র-পুরোহিতই তিনটি বিষয়ে পূর্ণ পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে না, ফলে

প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ছাত্র-পুরোহিতকে প্রথমে যজ্ঞাদি-সম্পর্কিত সর্বপ্রকার কাজের জন্য সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত, পরে তাঁহাকে যে বিভাগের জন্য তিনি উপযুক্ত সেই বিভাগের জন্য বিশেষ শিক্ষাদান করা হইত। ইহার পরে শিক্ষার্থী পুরোহিতদের মধ্যে আরও নূতন রকম শিক্ষণের ধারা দেখা যায়। বিভিন্ন বেদের ক্রিয়াকর্মের জন্য বিভিন্ন পুরোহিত সৃষ্ট হইতে থাকে। তাঁহারা বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে থাকেন।

সোমযজ্ঞের জন্য উদ্গাতাকে সোম-যজ্ঞবিষয়ক সকল প্রকার শ্লোক মুখস্থ করিতে হইত। ফলে সোমযজ্ঞ-বিষয়ক সকল স্তোত্র একত্র করিয়া 'সামবেদ' রচিত হইল। সামবেদের ৭৫টি শ্লোক ছাড়া, সমস্ত শ্লোকই ঋগ্বেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। সোম অনুষ্ঠানের জন্য ইহা একটি বিশেষ সঙ্গীত-সংগ্রহ বলা যাইতে পারে। উদ্গাতাকে সোম-বিষয়ক সকল সঙ্গীতকে আয়ত্ত করিতে হইত। উদ্গাতার এই বিশেষ জটিল কর্ম হইতে উদ্ভূত হয় এক বিশেষ শ্রেণীর পুরোহিতের, যাঁহারা সামবেদ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত আয়ত্ত করেন।

সাধারণ যজ্ঞাদি ব্যাপারে হোতাই দেবতার প্রতি স্তব-স্তুতি জানাইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন, কিন্তু অধ্বর্যু যিনি যজ্ঞাদি-সম্পর্কিত কায়িক পরিশ্রমের কাজ করিতেন, তিনিও মাঝে মাঝে কোন কোন বিশেষ সময়ে দেবতাকে স্তুতি জানাইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন। অধ্বর্যু পুরোহিতদের শিক্ষণের জন্যও ব্যবস্থা করা হয় এবং ধীরে ধীরে আর একটি বেদ অর্থাৎ যজুর্বেদের সৃষ্টি হয়। যজুর্বেদের সংগ্রহ প্রায় সমস্তই গদ্য মন্ত্র, যদিও মাঝে মাঝে ঋগ্বেদের শ্লোক তাহার মধ্যে দেখা যায়। উদ্গাতা এবং অধ্বর্যু পুরোহিতদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা হইলে ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণের জন্য রহিলেন শুধু হোতা পুরোহিতেরা। হোতারা ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্য শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, যে-কোন বিভাগের পুরোহিত প্রকৃত শিক্ষণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা যে কোন পুরোহিতের কাজ করিতে পারিতেন।

যে তিনটি বেদের কথা উক্ত হইল, সেই তিনটি বেদ ছাড়াও আর একটি বেদের সৃষ্টি পরে হয়। এই চতুর্থ বেদটির নাম অথর্ববেদ। অথর্ববেদের স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। এমন কি এখনও দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অথর্ববেদ এখনও অজানিত

অবস্থায় রহিয়াছে। অথর্ববেদ যাদু, ইন্দ্রজাল ও প্রেতবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ। মন্ত্রবলে বশীভূত করা বা মন্ত্রবলে রোগ, দৈত্য, শত্রু বিতাড়ন বা প্রেতমোচন করার জন্য পুরোহিতেরা ঐ বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। ইহা ছাড়া ভাল ভাল মন্ত্রও এই বেদে আছে, যাহা মানুষের সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা যায়। এই বেদ হইতে আর এক প্রকার পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন প্রকার পুরোহিতের কর্মপন্থা এবং চারিটি বেদ সৃষ্টি হইবার সময় আর্যগণ তাঁহাদের বসতি আরও পূর্বদিকে সরাইয়া আনিয়াছেন। অর্থাৎ এই সময়ে তাঁহারা শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

বিভিন্ন প্রকার পুরোহিতের দল এই সময়ে একটি বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং নিজ নিজ দলের অনুবর্তী হিসাবে গর্ববোধ করেন।

বেদ শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষার্থী পুরোহিতের প্রধান কর্তব্য ছিল তাঁহার নিজস্ব বেদ সম্পূর্ণভাবে কণ্ঠস্থ করা। তিনি শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে বেদের স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ভুলভাবে বেদ পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। যে পদ্ধতিতে তাঁহারা শিখিতেন, সেই পদ্ধতি হইতেছে সম্পূর্ণ মৌখিক। প্রতিটি স্তোত্র ও শ্লোকের অর্থও তিনি তাঁহার শিক্ষক হইতে জানিয়া লইতেন। তাহা ছাড়া ক্রিয়া-কর্মাদির নিয়ম-কানুনাদিও তিনি শিক্ষা করিতেন। বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কালক্রমে এই নীতিগর্ভ উপদেশাবলী বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশে একই ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। 'ব্রাহ্মণ' অংশে যজ্ঞাদি-সম্পর্কিত নানা রকম উপদেশাদি ছাড়াও নানা রকম পৌরাণিক গল্প, গাথার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, দর্শন, আইন ইত্যাদিরও সংস্পর্শে আমরা আসি।

এই সময়ে আর্যগণ ভারতবর্ষের আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এই সময়েই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' বর্ণিত উপাখ্যানের মালমশলা হয়ত

চারি বর্ণ

পাওয়া যায়। এই সময়ে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পুরোহিতদের ক্ষমতা সকলের ঊর্ধ্বে বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজার উপরে ছিল পুরোহিতের স্থান। এই সময়ে চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর লোক, ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, বৈশ্যেরা ছিলেন কৃষি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত আর শূদ্রেরা ছিল অনার্য ও দাস।

ঋগ্বেদ হইতে সেই যুগের আর্য-সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। আর্যগণ সভ্যতার দিক হইতে যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন। তাঁহারা সমাজ-ব্যবস্থার অধীন ছিলেন এবং গো-পালন, খাদ্যশস্য উৎপাদন, বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কাজে পারদর্শী ছিলেন। প্রথম অবস্থায় বর্ণবিভেদ তেমন কঠোর ছিল না। পৌরোহিত্য, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যাওয়ায় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণ সৃষ্টি হয়; পরাভূত অনার্যগণ শূদ্র বা দাস নামে অভিহিত হইত। কিন্তু বর্ণ সৃষ্টি হইলেও প্রথম তিন বর্ণ যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য বংশগত ছিল না, গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণ স্থির হইত। তিন বর্ণের লোকেরাই বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে ক্রমশঃ বিভেদ বৃদ্ধি পায় এবং গুণকর্ম অনুসারে বর্ণ স্থির না হইয়া উহা বংশগত হয়। ইহার বিশেষ কারণ এই যে পরিবার-প্রথার বিকাশ ঘটায়, সন্তানগণ পিতামাতার সান্নিধ্য লাভ করিয়া পিতামাতার গুণাবলী অনুকরণ করে, ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। এই কারণেই বর্ণের বংশগত রূপ দেখা যায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বর্ণের এই বংশগত রূপ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু পরে বর্ণবিভেদ কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। পূর্বে প্রথম তিন বর্ণের মধ্যে বেদ অধ্যয়নে সকলেরই সমান অধিকার ছিল, কিন্তু বর্ণ বিভেদের কঠোরতা দেখা দিলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকেরা বেদ অধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়।

ঋগ্বেদের যুগে আর্য-সভ্যতা

বৈদিক মন্ত্রসমূহ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ইহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। তাই বৈদিক ভাষা ও তাহার উচ্চারণ কোন ক্রমেই যাহাতে বিকৃত না হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য ছিল। কথ্য ভাষাকে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন করিতে হয়। তাই কথ্য ভাষা ও বৈদিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা গিয়াছিল। আর্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অনার্য বিজিতদের সঙ্গে নানা ভাবে মিলিত হন এবং তাহার ফলে অনার্য ও আর্যগণের ভাষার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু বৈদিক ভাষা যাহাতে বিকৃত ও দুষ্ট না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি থাকায় বৈদিক ভাষা সংমিশ্রণ-দুষ্ট হয় নাই। তবুও ভারতে আগমনের পূর্বের বৈদিক ভাষা ও পরবর্তী কালের বৈদিক ভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য

বৈদিক ভাষার ক্রমবিকাশ

দেখা গিয়াছিল। এদিকে কথ্যভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার বিভেদ যতই প্রকট হইল, ততই বৈদিক ভাষার অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য উহাকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা দেখা গেল। ফলে ষড়বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়। উহারা হইতেছে—শিক্ষা (স্বর), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ ও কল্প (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পাদন-প্রণালী)। এইগুলি হইতে অন্যান্য বিষয়েরও সৃষ্টি হয়। যেমন কল্প হইতে আইন। সে যাহা হউক, পরবর্তী যুগে হয়ত বৈদিক ভাষা কিছুটা সংমিশ্রণ দ্বারা দুষ্ট হইয়াছিল, তাই উহার সংস্কার-সাধনও প্রয়োজন হয়। বৈদিক ভাষা সংস্কার করিবার কালে ঐ ভাষা যাহাতে আরও বেশী বোধগম্য হয় সেদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছিল। এইভাবে বৈদিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা জন্ম লাভ করে। বৈদিক ভাষা বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষা সৃষ্টি করে। প্রাকৃত ভাষা হইতে ভারতবর্ষের বহু আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়।

ব্যাকরণের ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। পাণিনি হইতেছেন ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ লোক। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধারের অধিবাসী তিনি ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রগুলি আটটি অধ্যায়ে লিখিত। ইহাদিগকে অষ্টাধ্যায়ীও বলা হয়। ম্যাক্সমূলার বলেন যে পাণিনি-সূত্রে যে প্রকার ব্যাকরণের সূত্রের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কাত্যায়ন পাণিনি সূত্রের কিছুটা ব্যাখ্যা করেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমরা পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখিতে পাই। এই লেখকেরা সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহাদের নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইত।

ব্যাকরণ

সংস্কৃত ব্যাকরণ পরবর্তী কালে বহু লেখা হইয়াছে, কিন্তু সকল গ্রন্থই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনুকরণে লেখা হইয়াছে এবং বর্তমান কালেও পাণিনির সূত্র সকল সংস্কৃত ভাষার ছাত্রকে পাঠ করিতে হয়। সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ' খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পরে সংকলন করা হয়। ইহা এখনও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার ছাত্রেরা পরম আগ্রহে পাঠ করে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চ শতাব্দীর স্বরবিন্যাস (phonetics) ভাষার এমনই বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ যে বর্তমান যুগে আমাদের

অভিধান

পক্ষে উহা হইতে বহু জিনিস শিখিবার আছে বলিয়া দেখা যায়। প্রাচীন যুগে অনেক জ্যোতির্বিদ ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীতে আর্যভট্ট নামে পাটলিপুত্রের এক পণ্ডিত নক্ষত্রমণ্ডলের বহু তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর থাকিয়া ঘূর্ণনের কথা বলেন এবং সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ব্যাখ্যা করেন। অঙ্ক শাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতবাসী অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। বীজগণিতের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভারতবর্ষের কাছে ঋণী, সংখ্যার ধারণাও ভারতবর্ষেরই দান, যদিও উহার ইঙ্গিত আরব দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা

চিকিৎসা-শাস্ত্রও ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিকাশ লাভ করে। চরক ছিলেন প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং তিনি রাজা কনিষ্কের সভাসদ্ ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শুশ্রুতও একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া এই দুইটি ছিল বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য, অতএব মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিতে বৌদ্ধধর্মের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি।

চিকিৎসা-শাস্ত্র

দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই উপনিষদ, ব্রাহ্মণ ও সংহিতায়। ভারতে ষড়দর্শনের উৎপত্তি খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা ব্রহ্মচিন্তা-বিষয়ক দর্শন। প্রথমোক্ত দর্শন বেদের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় এবং কর্মের পথ বা যজ্ঞাদি কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয় দর্শন জ্ঞানের পথ ব্যাখ্যা করে এবং বলে যে একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে এবং আত্মাই ব্রহ্ম। সাংখ্যদর্শন ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং বলে যে একমাত্র আত্মা ও পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিলেই মুক্তি অনিবার্য। যোগদর্শনের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু যোগদর্শনে ব্যক্তিগত ভগবানের স্থান আছে এবং এই মত অনুসারে কঠোর যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ সত্যে পৌছাইতে পারে। ন্যায়দর্শন তর্ক-শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করে এবং মিথ্যা জ্ঞান অপসারিত হইলেই মুক্তি হইবে বলিয়া মত পোষণ করে। বৈশেষিক দর্শন পরমাণু সম্বন্ধে আলোচনায় পর্যবসিত এবং উহার বিষয়-বস্তু এই যে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণু অনন্ত, অমর ও অপরিবর্তনীয়।

দর্শনশাস্ত্র

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

আর্যগণ সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার পর তাঁহারা চারি বর্ণে বিভক্ত হন এই কথা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। (১) ব্রাহ্মণের কাজ ছিল পৌরোহিত্য এবং ধর্ম-সংক্রান্ত কার্য, (২) ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল যুদ্ধ এবং তাঁহারা দেশকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতেন, (৩) বৈশ্যরা ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেন এবং সমাজের লোকদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন, (৪) শূদ্র সমাজের জন্য নানা ভাবে শ্রমদান করিত। এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা পৌরোহিত্য করিতেন, মানুষের মনে ধর্মের প্রেরণা যোগাইতেন এবং জ্ঞান দান করিতেন। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেন। শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে করিতে পারেন তাহার জন্য তাঁহারা উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দিতেন না; যে সমাজের লোকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন, সেই সমাজের কাছে ভিক্ষা করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের জীবন কাটাইতেন।

এদিকে জীবনটাকেও আর্যগণ চারিটি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিলেন,—(১) **ব্রহ্মচর্যাশ্রম**—এই সময়ে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিত এবং ৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত তাহারা এই আশ্রমের অধীন থাকিত। (২) **গৃহস্থাশ্রম**,—এই সময় আর্যগণ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ জীবন যাপন করিতেন। (৩) **বানপ্রস্থাশ্রম**,—এই সময় আর্যগণ জীবনের বিভিন্ন কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, (৪) **সন্ন্যাস**—এই সময় আর্যগণ বনে গমন করিতেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন।

আমরা আর্যগণের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা এইখানে আলোচনা করিব, অতএব অন্যান্য আশ্রমের সম্বন্ধে আলোচনা না করিরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্বন্ধেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব। ছাত্রেরা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে পাঠে আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং জাগতিক বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে জড়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্য ছাত্রদিগকে এই সময়ে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত। শিক্ষালাভ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

তাহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। তবে শিশুদের শিক্ষালাভ যে শুধু শিক্ষক বা গুরুর কাছেই প্রথম আরম্ভ হইত, তাহা সকলে মানিয়া লন নাই। অনেকেই মনে করেন যে, শিশুর শিক্ষা শিক্ষকের কাছে প্রথম আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় মাতার কাছে। মনে করা হইত যে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রাতভা শিশুর মাতার বিবাহিত জীবনের উপর নির্ভর করিত। তাহা ছাড়া শিশুর শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য শিশুর জন্মের পূর্বেই মাতাকে কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করিতে হইত। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে জানা গেলে, নানা রকম অনুষ্ঠানে মাতাকে কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইত। মাতা নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবেন, সর্বদা পবিত্র চিন্তা করিবেন এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করিবেন, যাহাতে তিনি শিশুর মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে পারেন, শিশুর চরিত্র সংগঠন করিতে পারেন, এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আরোপ করিতে পারেন।

মাতার প্রতি উপদেশ

শিশুর জন্মগ্রহণের পর জাতকর্ম ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর মাতাকে শিশুর পালন ও শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দেওয়া হইত।

পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুর বিদ্যারম্ভ হইত। একটি ভাল দিনে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া শিবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া শিশুকে ৫০টি অক্ষরের উপর হাত ঘুরাইতে দেওয়া হইত। একটি সাদা কাপড়ের উপর চাউল বিছান হইত। উহার উপর কলমের সাহায্যে শিশু হাত ঘুরাইত। বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠানের পর কিছুকাল গৃহশিক্ষা চলিত। গৃহ-শিক্ষার সময় তিন বর্ণের শিশুদের জন্য তিন প্রকারের ছিল। গৃহ-শিক্ষার পর ছাত্রকে গুরুর কাছে যাইয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত। গৌতম বলেন, ব্রাহ্মণদের গুরুগৃহে শিক্ষারম্ভ হইত আট বৎসর বয়ক্রমকালে,—গর্ভসঞ্চার হইতে বয়স গণনা করা হইত। এই শিক্ষারম্ভকে বলা হইত উপনয়ন। 'উপনয়ন' অর্থ শিক্ষকের নিকট লইয়া যাওয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করা বা দ্বিজ হওয়া।

বিদ্যারম্ভ

ক্ষত্রিয়-সন্তান গুরুগৃহে আসিত এগার বৎসর বয়ক্রমকালে। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে বয়স গণনা করা হইত গর্ভসঞ্চারের পরের বৎসর হইতে। বৈশ্য সন্তানেরা গুরুগৃহে আসিত বার বৎসর বয়সে। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বয়সে গুরুগৃহে বিদ্যারম্ভ করিবার কি সার্থকতা ছিল, তাহা ভালভাবে

বুঝিতে পারা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা যে বয়সে গুরুগৃহে শিক্ষারম্ভ করিত, তাহা শিক্ষারম্ভের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ই মনে করেন। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে বয়স ধরিয়া আট বৎসর, অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ-সন্তান গুরুগৃহে আসিত। বিদ্যারম্ভের পক্ষে উহা উপযুক্ত বয়স বলিয়া মনে হয়। বেদের এক শ্লোকে উল্লেখ আছে যে গুরুগৃহে বিদ্যারম্ভ অর্থাৎ উপনয়নের পূর্বে শিশু বেদের স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বেশী বয়সে উপনয়নের দুইটি ব্যাখ্যা চলিতে পারে। প্রথম কথা ব্রাহ্মণ-সন্তানদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ অন্যান্য বর্ণের সন্তানদের চেয়ে বেশী এবং দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ গুরুগৃহে আগমনের পূর্বে গৃহে পিতার নিকট কিছু শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাতে সে গুরুগৃহে তাড়াতাড়ি শিক্ষারম্ভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ-সন্তানদের শিক্ষারম্ভ অপেক্ষাকৃত পূর্বে হওয়ার কারণ এই দুইটি বলিয়া মনে হয়।

গুরু-শিক্ষার্থী সম্পর্ক
উপনয়ন

উপনয়ন অর্থাৎ গুরুগৃহে ছাত্রকে গুরুর কাছে আনীত হইবার পর ছাত্র বা শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে গুরুর অধীন হইয়া পড়ে। এই সময় হইতে শিক্ষার্থী গুরুগৃহে এক পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়ে এবং গুরুকে সে নানা ভাবে সেবা করিতে চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী বা শিষ্য বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করে, জল তোলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখে এবং যে কোন কাজ তাহার নিকট প্রত্যাশা করা হয়, তাহাই সে করে। সে ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করে এবং ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের সাহায্যে জীবন ধারণ করে। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের সাহায্যে জীবনধারণ করায় শিক্ষার্থীর জীবনে মঙ্গলজনক পরিণতি দেখা যায়। ইহা তাহাকে বিনয়ী করে, ইহাতে তাহার সৌজন্য-বোধ্ জন্মে এবং তাহার শিক্ষার জন্য যে সে সমাজের কাছে ঋণী ইহা সে শিক্ষা করে। তাহা ছাড়া পরবর্তী কালে শিক্ষাদান কার্যে যে তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে, ইহাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উপরন্তু ভিক্ষাগ্রহণ কার্য গরীব-বড়লোক—এই শ্রেণী-বৈষম্য ঘুচাইয়া দেয়। উপনয়নের সময় গুরু বলিয়া থাকেন—"তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি পরিশ্রমী হও, অধ্যবসায় তোমার জীবনে ব্রত হউক। দিবানিদ্রা যাইও না। গুরুর কাছে বেদ শিক্ষা কর। গুরু যে ক্ষেত্রে ভুল করেন, সে ক্ষেত্রে ছাড়া গুরুকে সর্বদা অনুসরণ কর। রাগ ও অসত্য পরিহার কর। স্নান, আহার, নিদ্রা ও জাগরণে আধিক্য দেখাইও না। পরনিন্দা, ঈর্ষা, লোভ, ভয়, দুঃখ পরিহার কর। প্রাতঃকালে

শয্যাত্যাগ কর এবং গাঢ় চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত রাখ। মদ্য, মাংস বা উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করিও না।"

শিক্ষার্থীর জীবন শুধু পড়াশুনায় ব্যয়িত হইত না। এই সময়ে তাহাকে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিতে হইত। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু বৎসরাধিক সময় শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান না করিয়া তাহাকে দিয়া অন্য কাজ করাইয়াছেন। ইহা অবশ্য ব্যতিক্রম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও গুরুগৃহে নানা রকম কাজ করিতে হইত। গুরুগৃহে পবিত্র অগ্নির ব্যবস্থা করা, গুরুর গোমহিষাদি পালন, ইত্যাদি কাজ শিক্ষার্থীকে করিতে হইত। শিক্ষার্থী সকল সময়ে গুরুর সাথে সাথে যাইত এবং গুরুর সমস্ত আদেশ হাসিমুখে পালন করিত। গুরুর সমস্ত কাজ করার পর অবসর সময়ে শিক্ষার্থী বেদ অধ্যয়ন করিত।

গুরুগৃহে বাস ও নানা রকম কর্ম-সম্পাদন

ধর্মসূত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। শিক্ষার্থী যেমন গুরুর সমস্ত আদেশ পালন করিবে, সেইরূপ গুরুও শিক্ষার্থীকে পুত্রবৎ পালন করিবেন এবং শিক্ষাদান করিবেন। শিক্ষার্থী যতদিন শিক্ষা গ্রহণ করিবে ততদিন সে গুরুকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। উপনিষদে এক গুরু হইতে অপর গুরুর নিকট যাইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। শিক্ষার্থী সকল সময়ে গুরুর আদেশ মান্য করিয়া চলিবে তাহাই ছিল নিয়ম। গুরু কোথায়ও গেলে, শিক্ষার্থী তাঁহার অনুসরণ করিত। গুরু উচ্চাসনে বসিয়া আছেন এই অবস্থায় শিক্ষার্থী নীচু আসনে বসিবে। গুরু কোন কারণে নিজের আসন পরিবর্তন করিলে শিক্ষার্থীও তৎক্ষণাৎ তাহার বসিবার স্থান পরিবর্তন করিবে।

গুরু শিক্ষার্থীকে স্বীয় পুত্রের মতই শুধু ভালবাসিবেন না, তিনি শিক্ষার্থীকে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষাদান করিবেন। 'মনু'তে শিক্ষার্থীর প্রতি গুরুর ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। গুরু প্রিয়ভাষী হইবেন, শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করিবেন না, যাহাতে শিক্ষার্থী মনে ব্যথা পায়। চিন্তায় ও কর্মে গুরু কখনও শিক্ষার্থীর অনিষ্ট কামনা করিবেন না।

গুরুর স্নেহ

গুরু এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক এমনই উচ্চ পর্যায়ে নীত হইয়াছে যেখানে শিক্ষার্থী গুরুকে পূজা করিয়া থাকে। বেদান্তে উল্লেখ আছে যে

গুরু হইতেছেন এমন ব্যক্তি যিনি মুক্তির স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি হইয়াছেন ব্রহ্ম। শিক্ষার্থীকে ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে গুরুকে পূজা করিতে হইবে। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে "গুরু হইতেছেন ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু এবং গুরু শিব। অতএব গুরুকে প্রণাম কর।"

গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম

"গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরু ও শিক্ষার্থী একসাথে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের জীবন-যাত্রা অভিন্ন ছিল। তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা করিতেন।

আমাদের উভয়কে ভগবান বিপদ হইতে সতর্ক করুন। আমাদের উভয়কে ভগবান রক্ষা করুন। আমরা যেন একত্র কাজ করিতে পারি। আমাদের উভয়ের অধ্যয়ন সাফল্যলাভ করুক। আমরা যেন উভয়ে উভয়ের প্রতিপক্ষ না হই। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

"সহনাববতু, সহ নৌভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে গুরু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজমান ছিল তাহার আলোচনা করা গেল। শিক্ষার্থীকে একটু কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিতে হইত সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে নৃশংসতা কিছু ছিল না। নৈতিক জীবনের ও চরিত্রের উঁচু আদর্শ গুরু ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে প্রতিভাত হইত। গুরুর দিক হইতে শিক্ষাদান-কার্যে টাকা পয়সা লোভের কোন প্রেরণা ছিল না। তিনি সমাজের প্রতি তথা শিক্ষার্থীর প্রতি কর্তব্য হিসাবেই শিক্ষাদান করিতেন। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীও সরল জীবনে অভ্যস্ত হইয়া শিক্ষালাভ করিত এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করিত।

গুরু শিক্ষার্থীর নিকট হইতে কোন বেতন লইতেন না। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য ছিল শিক্ষাদান করা এবং এই কারণে যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার্থী গুরুর কাছে শিক্ষা-লাভ করিত ততদিন গুরু শিক্ষার্থীর নিকট বেতন হিসাবে অর্থ বা অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু শিক্ষা-সমাপনান্তে শিষ্য গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিতে চেষ্টা করিত। বেতন না থাকার দরুণ ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী নির্বিশেষে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। শিক্ষাশেষে এক ধনী শিষ্য ছাড়া গুরু কাহারও নিকট হইতে এমন কিছু দক্ষিণা

অবৈতনিক শিক্ষা

পাইতেন না, যাহা প্রচুর বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে 'মনু'তে যাহা উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা এই—সমাবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ শিক্ষা শেষের পূর্বে গুরু কোন শিষ্য হইতে দক্ষিণা হিসাবে কিছু লইতে পারিবেন না, কিন্তু শিষ্য যখন সমাবর্তন শেষে গৃহে ফিরিবে, তখন সে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী গুরুর জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে পারে। গরু, ঘোড়া, ভূমি, আসন, শস্য, শাকসব্‌জি, ছাতা বা জুতা—যে কোন জিনিস শিষ্য গুরুকে দিতে পারে।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নারদ সনৎকুমারের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আগমন করিলে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করেন যে নারদ কি কি শিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্বে জানা প্রয়োজন। নারদ বলিলেন যে তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্রিয় অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের প্রীত্যর্থে যাগযজ্ঞ, অঙ্ক, সংখ্যা, দৈব, অর্থাৎ অশুভ ও অলক্ষণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, নিধি অর্থাৎ সময়-বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, রাজ্যশাসন-প্রণালী, শব্দ-বিজ্ঞান, স্বরবিজ্ঞান, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ভূতবিদ্যা অর্থাৎ ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, পাত্রবিদ্যা অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নৃত্য-গীতবিদ্যাদি, চারুকলা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন যে, নারদ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, স্বীয় আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় দুই প্রকার জ্ঞানের জন্য ছাত্র বিদ্যা অর্জন করিত। প্রথম হইতেছে অপরা-জ্ঞান অর্থাৎ আধিভৌতিক বা জাগতিক বিদ্যা। এই বিদ্যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। অপরটি হইতেছে পরাজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা। এই জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানকে উপলব্ধি বা আত্মার মুক্তি কামনা করা হইত।

পাঠক্রম

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, ইহার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি। জীবনের শৃঙ্খল হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভই ছিল সেই যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেই বিদ্যাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যে বিদ্যা আহরণ করিলে আত্মার মুক্তি হয়। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।" অবশ্য শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বর্ণের লোকদের নিজস্ব জীবন-ধারণের প্রয়োজনে শিক্ষালাভ করা।

সাধারণতঃ গুরুগৃহে শিক্ষার কাল ছিল বার বৎসর। এক একটি বেদ অধ্যয়ন করিতেই বার বৎসর কাটিয়া যাইত। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা বেদগুলি সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া একটি বেদ বিশেষ ভাবে পড়িত। ইহাতেই বার বৎসর সময় লাগিত। ধর্মসূত্র অনুসারে বৎসরে গুরুগৃহে সাড়ে চার মাস হইতে সাড়ে পাঁচ মাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। প্রতি শ্রাবণ পূর্ণিমায় বৎসরের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হইত। ঐ দিনে এক উৎসবের ব্যবস্থা হয়। এই উৎসবে বিগত বৎসরের কাজের হিসাব-নিকাশ হইত এবং পরবর্তী বৎসরে কি ভাবে পঠন-পাঠন চলিবে তাহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইত। সাধারণতঃ শীতকালে এবং বর্ষাকালে যখন গরম অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তখনই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিত। ছুটির ব্যবস্থা ছিল; কোন কোন মাসের পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। তাহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবেও পঠন-পাঠনের কাজ চলিত না। পক্ষান্তরে পঠন-পাঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলার ব্যবস্থা ছিল। দিবাভাগে ধূলার ঝড় উঠিলে, রাত্রিতে ঝড়ের শব্দ শোনা গেলে, কিংবা ঢাকের ধ্বনি বা রথের ধ্বনি শোনা গেলে, কিংবা অসুস্থ লোকের কাতর-ধ্বনি শোনা গেলে, কিংবা বাঁদর বা কুকুর প্রভৃতি পশুর চীৎকার শোনা গেলে, কিংবা আকাশ লাল হইলে বা আকাশে রামধনু দেখা দিলে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকিত। এইরূপ বিধি-নিষেধের মূলে কুসংস্কার বা অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যথা,—গর্জন, ডাক, শব্দ ইত্যাদি শোনা গেলে সাধারণতঃ পাঠে গভীর মনোযোগ আসে না, সেই কারণে পাঠ বন্ধ করার দিক হইতে যৌক্তিকতাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এই সকল বাধা-নিষেধ যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময় কিঞ্চিৎ খর্ব করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

শিক্ষার কাল

শিষ্য বা শিক্ষার্থী গুরুগৃহে কিভাবে জীবন যাপন করিবে তাহা উপনয়ন উৎসবে গুরুর মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী হইতে আমরা দেখিয়াছি। গুরুগৃহে অত্যন্ত কঠিন নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া শিক্ষার্থীকে চলিতে হইত। শারীরিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং উপযুক্ত আচরণ পালন ছিল প্রতি ব্রহ্মচারী শিষ্যের দৈনন্দিন কর্ম। শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন স্নান করিতে হইত এবং মধু মাংস সেবন, সুগন্ধি ও মালা ব্যবহার ও দিবাভাগে নিদ্রা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ

ছিল। প্রলেপ, অঞ্জন, যানবাহন, পাদুকা, ছাতা, প্রেম, ক্রোধ, লোভ, উদ্বেগ, গল্পপ্রিয়তা, যন্ত্রবাদন, আনন্দ, নৃত্য, সঙ্গীত, পরনিন্দা ও ভয়—এগুলিও ছাত্রজীবনে বর্জনীয় ছিল। গুরুর সম্মুখে শিষ্য গলদেশ আবৃত করিতে পারিত না। পা দুইটি একটির উপর আর একটি রাখিতে পারিত না, পা ছড়াইয়া বা কোন কিছুতে হেলান দিয়া বসিতে পারিত না। গুরুর সম্মুখে থুতু ফেলা, হাস্য করা, হাই তোলা এবং আঙ্গুলের গ্রন্থি ফোটানও নিষিদ্ধ ছিল। শিষ্য সদা সত্যকথা বলিত এবং সে গুরুজনের কাছে সর্বদাই শ্রদ্ধানম্র কণ্ঠে কথা বলিত। শিক্ষার্থীকে নির্মল চরিত্রের অধিকারী হইতে হইত, সে স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বা স্পর্শ করিতে পারিত না।

নৈতিক শৃঙ্খলা

শিক্ষার্থীদের পরিধেয়-সম্পর্কিত কতকগুলি আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হইত। উপনয়নের পর প্রতি শিক্ষার্থীকে একটি বেষ্টনী পরিধান করিতে হইত। কিন্তু বর্ণ-অনুসারে ঐ বেষ্টনীর পার্থক্য দেখা যায়। ব্রাহ্মণ মঞ্জু-ঘাসের তৈয়ারী বন্ধনী পরিত; ক্ষত্রিয় পরিত ধনুকের ছিলের বন্ধনী; এবং বৈশ্য পরিত পশম বা রেশমের সূতার বন্ধনী। দেহের উপরিভাগের জন্য আবরণী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণ অনুসারে উহা স্থির করা হইত। সাধারণতঃ দেহের উপরিভাগের আবরণী জন্তুর চামড়া হইতে তৈয়ারী হইত। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী পরিত কালো হরিণের চামড়ার পোষাক; ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থী পরিধান করিত বিচিত্র দাগযুক্ত হরিণের চামড়ার পোষাক এবং বৈশ্য শিক্ষার্থী পরিধান করিত ছাগলের চামড়ার পোষাক। শরীরের নীচের অংশের পরিধেয়ের জন্য শনের সূত্র দ্বারা তৈয়ারী কাপড়, পশমী কাপড় বা গাছের ভিতরকার বাকল প্রভৃতি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। গৌতম বলেন যে, শরীরের নীচের অংশের পরিধেয়ের জন্য সূতী বস্ত্র পরিধানেরও নিয়ম ছিল। শিক্ষার্থীরা দণ্ড ধারণ করিত এবং দণ্ডসহ চলাফেরা করিত। দণ্ডের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও বর্ণানুযায়ী বিভেদ ছিল। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের দণ্ড ছিল, তাহার মাথার তালু পর্যন্ত লম্বা, ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর দণ্ড ছিল তাহার কপাল পর্যন্ত লম্বা এবং বৈশ্য শিক্ষার্থীর দণ্ড ছিল, তাহার নাকের অগ্রভাগ পর্যন্ত লম্বা।

পরিধেয়

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগে দৈহিক শাস্তিবিধান একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। গুরুগণও দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন। গৌতম বলেন যে, সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত, কিন্তু

যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সরু রজ্জু বা সরু বেতের সাহায্যে শারীরিক শাস্তি দিতে পারা যাইত। যদি গুরু অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে শাস্তি দিতেন তাহা হইলে তিনি রাজরোষে পড়িতেন। মনুর বিধান এই সম্পর্কে এই যে, শিষ্য যদি বিশেষ অন্যায় কার্য করে, তাহা হইলে একটি সরু রজ্জু বা চেড়া বাঁশ দ্বারা তাহার পশ্চাৎ ভাগে আঘাত করা যাইতে পারে। যে গুরু ইহার ব্যতিক্রম করেন, তাঁহাকে চুরির অপরাধে অপরাধী করা হয়।

শাস্তিদান

গুরুগৃহে অবস্থান কালে শিষ্য কোন গুরুতর অপরাধ করিলে শাস্তির পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিত। অপরাধী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে তাহার অপরাধের কথা খুলিয়া বলিত। গুরু উহা শ্রবণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন। প্রায়শ্চিত্ত ছিল বিশেষভাবে কঠোর আত্মনিগ্রহ। আত্মনিগ্রহ স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় উহা শিক্ষার্থীর মঙ্গল বিধান করিত এবং উহা দ্বারা গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কোনরূপ বিরূপ মনোভাব জন্মাইত না।

প্রায়শ্চিত্ত

শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে গৌতম নিম্নলিখিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষার্থী নিজের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা গুরুর বাম হস্ত ধারণ করিয়া গুরুকে বলিবে, "গুরুদেব, আপনি আবৃত্তি করুন।" শিক্ষার্থী তাহার দৃষ্টি ও মন গুরুতে কেন্দ্রীভূত করিবে এবং আর এক হস্ত দ্বারা যে কুশের উপর সে বসিয়া আছে তাহা ধরিবে। সে পঞ্চদশ মুহূর্তের জন্য তিন বার তাহার শ্বাস বন্ধ করিবে এবং তাহার পর 'ওঁ তৎ সৎ' এই কথা উচ্চারণ করিবে। এই ভাবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিক্ষার্থী গুরুর নিকট বেদপাঠ আরম্ভ করিবে। বেদ পাঠের প্রারম্ভে ও অন্তে শিক্ষার্থী গুরুর পদধারণ করিবে। আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ প্রক্রিয়া অর্থহীন মনে হইলেও সেই প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীদের কাছে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইত। শিক্ষার্থী ও গুরু যে বেদপাঠে একটি গুরুগম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেন, তাহার পরিচয় ছিল ঐসব প্রক্রিয়ার মধ্যে। গুরুর প্রধান কর্তব্য ছিল, নিজে যেরূপ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে বেদ গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে তাঁহার শিষ্যদের কাছে বেদের প্রত্যেকটি চুলচেরা অংশ উপস্থিত করিবেন।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

মৌখিক শিক্ষার একটি চিত্র আমরা ঋগ্বেদের 'প্রতিসাক্ষ্য' অধ্যায়ে পাইয়া থাকি। এই অধ্যায়ে খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চ কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত

হইয়াছিল। 'প্রতিসাক্য' অধ্যায়ের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই যে গুরু বসিয়া আছেন, যদি একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী থাকেন, তাহা হইলে তাহারা গুরুর দক্ষিণ দিকে বসিয়া আছে, যদি বেশী সংখ্যায় শিক্ষার্থী থাকে, তবে তাহারা গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া বসিয়াছে। শিক্ষাদানের প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীগণ গুরুর পদ-বন্দনা করে এবং বলে "পাঠ আরম্ভ করুন।" শিক্ষক উত্তর করেন ওঁ অর্থাৎ আচ্ছা শব্দ উচ্চারণ করেন। প্রথম ছাত্র প্রথম শব্দ পুনরাবৃত্তি করে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে, গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুরু ব্যাখ্যা করেন। এই ভাবে একটি প্রশ্ন তাঁহারা শেষ করেন। একটি প্রশ্নে সাধারণতঃ তিনটি শ্লোক থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি থাকে। একটি প্রশ্ন শেষ হইলে শিক্ষার্থীরা শ্লোকগুলিকে উচ্চারণের নিয়ম পালন করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। এই ভাবে যতক্ষণ না একটি অধ্যায় শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিতে থাকে। একবারের অধ্যাপনায় প্রায় ষাটটি প্রশ্ন শিক্ষা দান করা হয়। ঐ অধ্যাপন পর পর শিক্ষার্থীরা গুরুর পদ বন্দনা করিয়া চলিয়া যায়।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে গুরু প্রথমে আবৃত্তি করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার পুনরাবৃত্তি করিত; তাহার পর গুরু ব্যাখ্যা করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার উপর প্রশ্ন করিত এবং সর্বশেষে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পঠনের বিষয় লইয়া আলোচনা চলিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সন্ধি, অন্বয়, সমাস, শব্দার্থ এবং সারাংশ ইত্যাদি সহযোগে পাঠ দান করা হইত। লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা হইত।

"সমানি সমশীর্ষাণি বর্তুলানি ঘনানি চ।
মাত্রাস্থ প্রতিবদ্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ॥"

যিনি বর্ণগুলি একই আকৃতিযুক্ত, একই রূপ ঘন, স্বরবর্ণের চিহ্ন উত্তমরূপে দিয়া মাত্রা দিয়া লিখিতে পারেন তিনিই হইতেছেন লেখক।

তর্কবিজ্ঞান শিক্ষাদানে প্রথমে প্রতিজ্ঞা, পরে হেতু, উদাহরণ, প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত।

আমরা দেখিয়াছি গুরু শুধু শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের দিয়া মুখস্থ করান নাই, তিনি প্রতিক্ষেত্রে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ সম্পর্কিত সূত্রগুলি এমনই গূঢ় অর্থবোধক যে উহার ব্যাখ্যাকরণ

যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সরু রজ্জু বা সরু বেতের সাহায্যে শারীরিক শাস্তি দিতে পারা যাইত। যদি গুরু অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে শাস্তি দিতেন তাহা হইলে তিনি রাজরোষে পড়িতেন। মনুর বিধান এই সম্পর্কে এই যে, শিষ্য যদি বিশেষ অন্যায় কার্য করে, তাহা হইলে একটি সরু রজ্জু বা চেড়া বাঁশ দ্বারা তাহার পশ্চাৎ ভাগে আঘাত করা যাইতে পারে। যে গুরু ইহার ব্যতিক্রম করেন, তাঁহাকে চুরির অপরাধে অপরাধী করা হয়।

শাস্তিদান

গুরুগৃহে অবস্থান কালে শিষ্য কোন গুরুতর অপরাধ করিলে শাস্তির পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিত। অপরাধী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে তাহার অপরাধের কথা খুলিয়া বলিত। গুরু উহা শ্রবণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন। প্রায়শ্চিত্ত ছিল বিশেষভাবে কঠোর আত্মনিগ্রহ। আত্মনিগ্রহ স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় উহা শিক্ষার্থীর মঙ্গল বিধান করিত এবং উহা দ্বারা গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কোনরূপ বিরূপ মনোভাব জন্মাইত না।

প্রায়শ্চিত্ত

শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে গৌতম নিম্নলিখিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষার্থী নিজের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা গুরুর বাম হস্ত ধারণ করিয়া গুরুকে বলিবে, "গুরুদেব, আপনি আবৃত্তি করুন।" শিক্ষার্থী তাহার দৃষ্টি ও মন গুরুতে কেন্দ্রীভূত করিবে এবং আর এক হস্ত দ্বারা যে কুশের উপর সে বসিয়া আছে তাহা ধরিবে। সে পঞ্চদশ মুহূর্তের জন্য তিন বার তাহার শ্বাস বন্ধ করিবে এবং তাহার পর 'ওঁ তৎ সৎ' এই কথা উচ্চারণ করিবে। এই ভাবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিক্ষার্থী গুরুর নিকট বেদপাঠ আরম্ভ করিবে। বেদ পাঠের প্রারম্ভে ও অন্তে শিক্ষার্থী গুরুর পদধারণ করিবে। আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ প্রক্রিয়া অর্থহীন মনে হইলেও সেই প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীদের কাছে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইত। শিক্ষার্থী ও গুরু যে বেদপাঠে একটি গুরুগম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেন, তাহার পরিচয় ছিল ঐসব প্রক্রিয়ার মধ্যে। গুরুর প্রধান কর্তব্য ছিল, নিজে যেরূপ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে বেদ গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে তাঁহার শিষ্যদের কাছে বেদের প্রত্যেকটি চুলচেরা অংশ উপস্থিত করিবেন।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

মৌখিক শিক্ষার একটি চিত্র আমরা ঋগ্বেদের 'প্রতিসাক্ষ্য' অধ্যায়ে পাইয়া থাকি। এই অধ্যায়ে খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চ কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত

হইয়াছিল। 'প্রতিসাক্ষ্য' অধ্যায়ের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই যে গুরু বসিয়া আছেন, যদি একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী থাকেন, তাহা হইলে তাহারা গুরুর দক্ষিণ দিকে বসিয়া আছে, যদি বেশী সংখ্যায় শিক্ষার্থী থাকে, তবে তাহারা গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া বসিয়াছে। শিক্ষাদানের প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীগণ গুরুর পদ-বন্দনা করে এবং বলে "পাঠ আরম্ভ করুন।" শিক্ষক উত্তর করেন ওঁ অর্থাৎ আচ্ছা শব্দ উচ্চারণ করেন। প্রথম ছাত্র প্রথম শব্দ পুনরাবৃত্তি করে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে, গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুরু ব্যাখ্যা করেন। এই ভাবে একটি প্রশ্ন তাঁহারা শেষ করেন। একটি প্রশ্নে সাধারণতঃ তিনটি শ্লোক থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি থাকে। একটি প্রশ্ন শেষ হইলে শিক্ষার্থীরা শ্লোকগুলিকে উচ্চারণের নিয়ম পালন করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। এই ভাবে যতক্ষণ না একটি অধ্যায় শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিতে থাকে। একবারের অধ্যাপনায় প্রায় ষাটটি প্রশ্ন শিক্ষা দান করা হয়। ঐ অধ্যাপন পর পর শিক্ষার্থীরা গুরুর পদ বন্দনা করিয়া চলিয়া যায়।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে গুরু প্রথমে আবৃত্তি করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার পুনরাবৃত্তি করিত; তাহার পর গুরু ব্যাখ্যা করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার উপর প্রশ্ন করিত এবং সর্বশেষে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পঠনের বিষয় লইয়া আলোচনা চলিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সন্ধি, অন্বয়, সমাস, শব্দার্থ এবং সারাংশ ইত্যাদি সহযোগে পাঠ দান করা হইত। লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা হইত।

"সমানি সমশীর্ষাণি বর্তুলানি ঘনানি চ।
মাত্রাস্তু প্রতিবন্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ॥"

যিনি বর্ণগুলি একই আকৃতিযুক্ত, একই রূপ ঘন, স্বরবর্ণের চিহ্ন উত্তমরূপে দিয়া মাত্রা দিয়া লিখিতে পারেন তিনিই হইতেছেন লেখক।

তর্কবিজ্ঞান শিক্ষাদানে প্রথমে প্রতিজ্ঞা, পরে হেতু, উদাহরণ, প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত।

আমরা দেখিয়াছি গুরু শুধু শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের দিয়া মুখস্থ করান নাই, তিনি প্রতিক্ষেত্রে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ সম্পর্কিত সূত্রগুলি এমনই গূঢ় অর্থবোধক যে উহার ব্যাখ্যাকরণ

একান্তই প্রয়োজন ছিল। উপনিষদ বা দর্শনের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গুরু নানা রকম গল্প ও গাথা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতেন। দর্শন শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষার্থী শুধু এক-চতুর্থাংশ গুরুর নিকট হইতে জানিতেন, এক-চতুর্থাংশ নিজেই বুঝিয়া লইত, এক-চতুর্থাংশ সহপাঠীদের নিকট হইতে বুঝিত এবং শেষ চতুর্থাংশ পরবর্তীকালে জীবন যাপনের মধ্য দিয়া বুঝিত।

যদিও মুখস্থ করার প্রচলন ছিল, তবুও একেবারে না বুঝিয়া মুখস্থ করার কেহ সমর্থন করিতেন না। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীকে গুরু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতেন, শ্রেণী-শিক্ষা ছিল না বলিলেও চলে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু সকল ছাত্রকে সম্মিলিত ভাবেও শিক্ষা দিতেন। মনুতে উল্লেখ আছে যে গুরুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতাকে শিক্ষাদান-কার্যে সাহায্য করিতেন। পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পুত্র কোন কোন সময় পাঠদান করিতেন। ইহা হইতেই সর্দার পোড়ো (Monitorial System) বা অগ্রসর ও মেধাবী শিষ্যগণের সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রথার উদ্ভব হয়। ছাত্র-সংখ্যা একজন গুরুর অধীনে বেশী থাকিলে গুরু অগ্রসর ও মেধাবী শিষ্যগণের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। পরবর্তী কালে পাঠশালায় সর্দার-পোড়ো দ্বারা পড়ানোর ভিত্তি এইখানেই স্থাপিত হইয়াছিল।

তৈত্তরীয় উপনিষদে গুরু, শিষ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথার উল্লেখ রহিয়াছে।

"জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে গুরু হইতেছেন সম্মুখভাগ, শিষ্য হইতেছে পশ্চাৎভাগ। জ্ঞানদান হইতেছে দুইয়ের সংযোজক এবং ব্যাখ্যা হইতেছে সংযোজনী শক্তি।"

প্রতিবৎসরের কাজের শেষে একটি উৎসব পালন করা হইত, তাহাকে বলা হইত উৎসর্জন উৎসব। এই সময়ে সকল শিক্ষার্থী তাহাদের বৎসরের কাজ সমাপ্ত করিত। কিন্তু শিক্ষা সমাপনান্তে যে উৎসবের ব্যবস্থা হইত তাহাকে বলা হইত সমাবর্তন উৎসব। স্নান বা সমাবর্তন উৎসবের পর শিক্ষার্থী শিক্ষা-সমাপনান্তে গৃহে গমন করিত। এইখানেই তাহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শেষ।

সমাবর্তন

এই উৎসবে ছাত্র তাহার ছাত্র-জীবনের পোষাক, যথা, বেষ্টনী, মৃগচর্ম, দন্ত ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সুগন্ধি জলে স্নান করিয়া গুরুকে সামর্থ্য-অনুযায়ী দক্ষিণা দান করিয়া গৃহে গমন করিত। গৃহে গমনকালে গুরু ছাত্রকে পর পৃষ্ঠায় লিখিত উপদেশ দিতেন :—

'সত্যকথা বলিও। ধর্ম আচরণ করিও। পাঠে অবহেলা করিও না। গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দাও। বিবাহ কর এবং নির্বংশ হইও না।'

'সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইও না। পাঠ এবং শিক্ষা অবহেলা করিও না।'

'ভগবান ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করিও না। মাতাকে দেবীর মত পূজা কর। পিতাকে দেবতার মত পূজা কর। গুরুকে দেবতার মত পূজা কর। অতিথিকে দেবতার মত পূজা কর। ইত্যাদি

"সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমমাহৃত্য প্রজাতন্তমাব্যবচ্ছেতসীঃ ॥

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্নপ্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন-প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

"দেব পিতৃ কার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। ইত্যাদি

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ

উপরে যে সকল উপদেশ উল্লেখ করা গেল তাহা অতিশয় উচ্চ ধরণের এবং আজও উহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আজও যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতকগণকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া চলে।

পণ্ডিতগণ ও মুনি-ঋষি সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দেশের রাজা তাঁহাদিগকে মান্য করিতেন এবং করযোড়ে তাঁহাদের আদেশ শুনিতেন। রাজা পণ্ডিতের আগমনে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সম্মান জানাইতেন।

শিক্ষা ও সমাজ

নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পণ্ডিত ঋষিগণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছেন।

দেশের রাজার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষা ছিল বেসরকারী প্রচেষ্টা এবং ব্রাহ্মণগণই দেশের শিক্ষাপ্রসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের রাজা ইচ্ছা করিলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থ বা জমি দান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার জন্য কোন সর্ত আরোপ করিতে পারিতেন না, কিংবা শিক্ষকগণের উপর কোন আদেশ জারীও করিতে পারিতেন না।

ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য পরিচালনা করিলেও রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অপরিসীম প্রভাব ছিল। রাজার ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে রাজ্য-শাসন-

সংক্রান্ত নানা রকম উপদেশ দিতেন এবং রাজাও সেই সকল উপদেশ মানিয়া লইতেন।

বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষা

বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে এবং উপনিষদের সময়, স্ত্রীলোকগণ উপনয়নের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য বরণ করিতেন, গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন এবং শিক্ষার্থী ভ্রাতাগণের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গ এবং অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ভবভূতির উত্তররাম-চরিতে দেখা যায় আত্রেয়ী রামের পুত্রগণ লব ও কুশের সঙ্গে বাল্মীকির আশ্রমে বেদান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে, কোন নারী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ সমাপ্ত না করিলে বিবাহের অধিকারী হইত না। অনেক রমণী এমনই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা বহু পণ্ডিতের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক আলোচনায় তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঐ উপনিষদেই আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উপক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কিছু ভূমি দান করিবার মনস্থ করেন। মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী হইলেও কি তিনি অমর হইতে পারিবেন? অতএব যাহাতে তিনি অমর হইতে পারিবেন না, এমন জিনিস তিনি চান না। এই সমস্ত ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রকার রমণীদের জ্ঞান-পিপাসা কিরূপ ছিল।

এই জাতীয় রমণীদের বলা হইত ব্রহ্মবাদিনী, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপলব্ধি ছিল। মন্ত্রবিদ্, পণ্ডিতা ইত্যাদি উপাধিধারী রমণীও ছিলেন। মন্ত্রবিদ্, অর্থ বেদের মন্ত্রে যাঁহারা পারদর্শী, পণ্ডিতা অর্থে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য আছে। রামের মাতা কৌশল্যা ও বালীর স্ত্রী তারা মন্ত্রবিদ্ ছিলেন এবং দ্রৌপদী ছিলেন পণ্ডিতা। গার্গী মৈত্রেয়ীরাই যে শুধু শিক্ষিতা ছিলেন এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। ঐ যুগে স্ত্রীলোকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু স্মৃতি ও মনুসংহিতার যুগে স্ত্রী-শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের শিক্ষার অধিকার হইতে পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়। যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহের নিয়ম হওয়ায় স্ত্রীলোকের শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়।

তাহারা পিতামাতা, ভাই, স্বামী ইত্যাদির নিকট হইতে যতটুকু শিক্ষা পাইতে পারিত, ততটুকু শিক্ষাই তাহারা পাইত। মনুর মতে স্ত্রীলোকের বিবাহ বেদ-অধ্যয়ন হইতে বড়, স্বামীর সেবা আশ্রমে পাঠগ্রহণ হইতে উত্তম এবং সাংসারিক কাজ গুরুগৃহের কাজ হইতে মহত্তর। মনুর যুগে স্ত্রীলোকের অধিকারকে বিশেষ ভাবে খর্ব্ব করা হয়। স্ত্রীলোকের নিজস্ব সত্ত্বা বলিয়া কিছুই থাকে না। স্ত্রীলোককে অল্প বয়সে রক্ষা করেন পিতা, যৌবনে রক্ষা করেন স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রগণ স্ত্রীলোককে রক্ষা করেন, তাহার কারণ স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে বাস করিবার জন্য উপযুক্ত নয়।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি বার্ধক্যে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

আমরা পূর্বেই পরা ও অপরা বিদ্যার কথা জানিয়াছি। অপরা বিদ্যার দ্বারা জাগতিক কর্মাদির পক্ষে শিক্ষার্থী উপযুক্ত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরাবিদ্যা শিক্ষার সাহায্যে আত্মার মুক্তি কামনা করা। জীবন মায়া, এবং শিক্ষা আত্মাকে এই মায়াময় জগৎ হইতে মুক্ত করিবে, এই ধারণা তৎকালীন মানুষকে এই জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং আত্মার মুক্তি চিন্তা ছাড়া আর তাহারা কিছু ভাবিতেই পারিত না। অতএব তাহারা বর্তমান জীবনকে উন্নত করিবার দিকে কোন প্রেরণাই অনুভব করিত না। বলা বাহুল্য, জীবন যাপন ও জীবনকে উন্নত করার দিক হইতে প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

প্রাচীন শিক্ষার অসুবিধা

দ্বিতীয়তঃ বর্ণবিভেদ বর্ণগত ভাবে মানুষের কর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল। মানুষ নির্দিষ্ট কাজের প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। মানুষকে স্বাধীনতা দিলে সে যে কোন কর্মের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বর্ণভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মবিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেশের সামগ্রিক উন্নতির দিক হইতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে জ্ঞান ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণগণও নিজেদের পদে আসীন হইয়া ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিয়া দেয় এবং নিজেরাও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করিয়া ভালভাবে অগ্রসর হয় না। ফলে সমাজের মধ্যে অসহযোগিতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের

নিশ্চল অবস্থা সমাজের অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখে। কিন্তু জ্ঞান যদি সকল শ্রেণীর মধ্যে সমানভাবে বিকীরণ করার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে দেশ ও সমাজ সহযোগিতার ভিত্তিতে উন্নতির পথে যাইত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তৃতীয়তঃ আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি তৎকালীন জীবনকে আরও নিশ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষ ভাবিত যে তাহারা বহু জন্মের ভিতর দিয়া মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছে, এবং মনুষ্যদেহ ছাড়িয়া পুনরায় নানা জীবন লাভ করিবে, যতদিন পর্যন্ত আত্মার মুক্তি লাভ না হয়। মনুষ্য-জীবন আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির বৃত্তের মধ্যে ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র। অতএব মনুষ্য-জীবনের উন্নতির জন্য অত বেশী চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই বলিয়া তাহারা ভাবিত।

চতুর্থতঃ বেদের উপর সর্ববিষয়ে আস্থা মনুষ্য-জীবন অচল করিয়া তুলিয়াছিল। বৈদিক প্রথাগুলি অনমনীয় বলিয়া ব্রাহ্মণগণ মত পোষণ করিতেন এবং সামাজিক পরিবর্তন সময়োচিত হইলেও বেদের প্রভাবে কোন রকম পরিবর্তন দানা বাঁধিয়া উঠিত না। ফলে উন্নতির পথ রুদ্ধ ছিল।

প্রশ্নাবলী

1. Sketch briefly the system of Hindu Education as outlined by Manu. Which of its features could be conveniently adopted under present condition ? (C. U. B. T. 1950)

উত্তর-ইঙ্গিত—মনুসংহিতায় আমাদের দেশের সেই যুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন রূপ ধারাবাহিক বিবরণী নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে নির্দেশ স্থানে স্থানে রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাধারা মনুর শিক্ষাধারা হইতে খুব বেশী স্বতন্ত্র নয়। প্রথম দিকে আর্যদের মধ্যে চতুবর্ণ-প্রথা ছিল না। সামাজিক প্রয়োজনে বর্ণপ্রথার সৃষ্টি হইলেও গুণ ও কর্ম অনুযায়ী মানুষ বর্ণগত হইত। কিন্তু মনুর যুগে বর্ণপ্রথা কঠোর হয় এবং তখন এক বর্ণের লোক অন্য নীচু বর্ণের কাজ করিলে সে পতিত হইত। বর্ণ জন্মগত হয়। ফলে বিভিন্ন বর্ণের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া উঠে। বর্ণের গণ্ডী লঙ্ঘন করিলে লঙ্ঘনকারী

ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। মনু এইখানে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের বর্ণের গণ্ডী লঙ্ঘন করিবার অপরাধে বিভিন্ন শাস্তি বিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের অপরাধ একই রূপ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি শাস্তি ছিল লঘু এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি শাস্তি ছিল কঠিন। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন সমাজের পক্ষে বেশী বলিয়াই হয়ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে লঘু শাস্তি দিবার কথা মনু উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন শিক্ষাধারাকে অনুসরণ করিয়াই মনু শিক্ষার নির্দেশ দিয়াছেন। চারি বর্ণের বিভেদের উপরই মনুর শিক্ষা নির্দেশ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ শিক্ষার অধিকারী ছিল। শূদ্রের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম তিন বর্ণের উপনয়ন হইত, কিন্তু উপনয়নের বয়স ছিল বিভিন্ন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে বেদের কিছু অংশ কণ্ঠস্থ করিতে হইত। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ-বিদ্যা, রাজ্যশাসন, দণ্ডদান নীতি ইত্যাদি শিখিত। বৈশ্যগণ শিখিত কৃষিবিদ্যা, ব্যবসাবিদ্যা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ বেদ অনুশীলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণকে কঠোর শ্রম করিতে হইত। তাহারা বিলাসহীন জীবন যাপন করিতেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন রাজ-পুরোহিত ও মন্ত্রী।

ব্রাহ্মণ গুরু হিসাবে তিন বর্ণের শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। গুরু ছিলেন শিক্ষাদাতা পিতা। গুরুর পরিবার ছিল শিক্ষার্থীর পরিবার। গুরু সেবার মধ্য দিয়াই শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার্থীকে ভিক্ষার জন্যও বাহিরে যাইতে হইত।

শিক্ষা ছিল দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, গণিত, ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যাদি শিখিতে হইত।

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল নগরের বাহিরে প্রকৃতির কোলে আশ্রমের পরিবেশে।

মনুর সময়ের যতটুকু আমরা বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিতে পারি তাহা হইতেছে এই।

বর্তমান যুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায়। প্রাচীন যুগের গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা আমাদের মুগ্ধ করে। বর্তমান যুগে সেই ব্যবস্থা যাহাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষার জন্য প্রকৃতির কোলে আশ্রমিক পরিবেশও প্রয়োজন। তাহারও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করা যাইতে পারে।

মনুর যুগে শিক্ষার আদর্শ ছিল ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ, ধর্মীয় কর্তব্য সাধন, উন্নত চরিত্র গঠন। আমরা এই যুগেও শিক্ষার আদর্শ তাহাই রাখিতে চাই। [তৃতীয় অধ্যায় দেখুন]

2. "The Educational system in Ancient India suited a simple type of society but could hardly fit our times." Discuss. How far do you think we could go in adopting the old world ideas.

(C. U. B. T. 1951)

উত্তর-ইঙ্গিত—আর্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের পরই তাহারা দৃঢ় সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠা হইলে চতুর্বর্ণ প্রথার সৃষ্টি হয়। চতুর্বর্ণের জন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্যগন যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা ছিল যাযাবর। প্রাচীন বেদগুলির মধ্যে তাহাদের শিক্ষা নিহিত ছিল। ঋগ্বেদ সবচেয়ে পুরাতন বেদ। ইহার কিছু অংশ আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার পর আর্যেরা ভারতবর্ষে আগমন করিলে ধীরে ধীরে যজু, সাম ও অথর্ববেদ সৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় পুরোহিত পরিবারের মধ্যেই বেদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। পিতা হইতে পুত্রে বেদের জ্ঞান লাভ করিতেন।

চতুর্বর্ণ-প্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

ঐ যুগে সমাজ খুবই সরল ছিল। এখনকার মত জটিল ছিল না। তখনকার দিনে চতুর্বর্ণ-প্রথা এবং তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক যুগে ঐরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন অসুবিধাজনক।

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে রাজ্য শাসনে পরামর্শ দিতেন। গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের মানুষ নিজের প্রয়োজনে জিনিস তৈয়ারী করিয়া লইত। কৃষি কাজও জটিল ছিল না, শিক্ষা-ব্যবস্থাও প্রয়োজনের দিক হইতে সরল ছিল। কিন্তু বর্তমান জটিল যুগে প্রাচীন যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা অচল, কারণ যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজ সরল সমাজের জন্য উপযুক্ত ছিল, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমান জটিল সমাজের সমস্যাগুলি সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না।

[এর পর তৃতীয় অধ্যায় হইতে উপযুক্ত অনুচ্ছেদগুলি পড়িয়া উত্তর লিখুন।]

Q 3. What features of the ancient Brahmanic System of Education could we introduce into our system? Discuss in some details (C.U. B.T. 1952)

উত্তর—১৯৫০ সনের প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Q 4. How does the life of a modern Indian student compare with that of "Brahmachari" of ancient India? What feature in the life of the Brahmachari would you like to see introduced in the life of the modern student? (C.U. B.T. 1953)

উত্তর—১৯৫০ সনের প্রশ্নের উত্তর দেখুন এবং এই অধ্যায়ের 'গুরু-শিষ্য সম্পর্ক', 'নৈতিক শৃঙ্খলা', 'শাস্তিদান', 'সমাবর্তন', 'শিক্ষা ও সমাজ' শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন।

চতুর্থ অধ্যায়

যুক্তিবাদের অভ্যুত্থান—বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ছিল বেদ, কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে অন্য বিশ্বাস ও নূতন জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ফলে উপনিষদাদি দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বেদকে কেহই অস্বীকার করে নাই। বেদকে অস্বীকার করিলে নাস্তিক হইতে হইত। বেদকে স্বীকার করিয়া কেহ যদি ঈশ্বর-বিশ্বাস নাও করিত, তাহা হইলেও তাহাকে নাস্তিক বলা হইত না। কিন্তু বেদকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা আর বহু দিন ধরিয়া চলিল না।

নূতন জিজ্ঞাসা

ক্রিয়াকর্মবহুল বেদকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। আর্যসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় ও অন্যান্য সভ্যতার মিলন হওয়ায় নূতন নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি হয়। এই সব নূতন দেবদেবীদের মর্যাদা দান করিবার জন্য পুরাণের সৃষ্টি হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে, বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি কোন রূপ বাস্তব সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া সমর্থন পাইয়াছে, কিন্তু নূতন দেবদেবী সৃষ্টি যখন সমস্যা হইতে উদ্ভূত নয়, তখন তাহার সমর্থন সকলের কাছে পাওয়া যায় না। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ জাগতিক সুখ বিসর্জন দিয়া জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদান করাই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় তাহারা হইয়াছেন বৃত্তিভোগী এবং নূতন নূতন দেবদেবীর সমর্থক। ফলে যাঁহারা যুক্তিদ্বারা নূতন প্রশ্নের অবতারণা করিতেছিলেন, তাঁহাদের বিরোধিতা করিলেন ব্রাহ্মণ-সমাজ। এই বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের পূর্বেও অনেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিদ্রোহ বুদ্ধদেবের মত দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। বুদ্ধদেবই ভারতীয় চিন্তাধারায় এক নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও এক বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়।

বেদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ

নূতন দেবদেবী

বুদ্ধদেব

আমরা বৈদিক শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিয়াছি যে পূর্বে সকলেরই বেদে অধিকার ছিল। এমন কি নারীরাও বেদ অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বর্ণভেদ কঠোর হওয়ায় ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরা শুধু বেদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া নিজ নিজ বৃত্তি শিক্ষা করিত। পরে তাহারা বেদের অধিকার হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। বৈদিক যুগে প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু মনুসংহিতার আমলে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয়। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ব্যভিচারেরই প্রশ্রয় দেয় বলিয়া মনু মনে করিতেন। এই ভাবে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার অর্থ হইতেছে অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে বজায় রাখার প্রচেষ্টা। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, উহা পুরোপুরি সফল হয় নাই। উপনিষদের অনেক ঋষি ছিলেন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের। তাঁহারা স্বার্থদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম না হইয়া নির্জনে উচ্চচিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ চিন্তা হইতেই 'বেদান্ত' দর্শনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চার্বাক প্রভৃতি ঋষিগণ বেদকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেন, কিন্তু সমাজে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া তাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এই সব দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় বৌদ্ধ-ধর্মই ক্রিয়াপ্রধান বেদকে নির্মম আঘাত হানিতে সক্ষম হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সাহায্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণ নিজেদের অধিকার স্থাপনে সক্ষম হয় এবং তাহাদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া শিল্প, ভাস্কর্য, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি যাহা মনুষ্য-জীবনে একান্ত কল্যাণকর, তাহা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রী, সম্মিলিতভাবে ভাবের আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য হইতেছে সমষ্টিগত জীবন যাপন। ফলে অনেক সংঘারাম গড়িয়া উঠে এবং পরবর্তী কালে সংঘারামই বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

বেদে অধিকার দান

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার অধিকার হ্রাস

বুদ্ধপূর্ব প্রগতিবাদী-দের পরিণতি

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতের শিক্ষার নবযুগ সূচনা করে। বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে ইহা দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবন দুঃখময়, এবং ইহা হইতে মুক্তিলাভই মানুষের একান্ত কামনা। এই

ধারণা হইতে মানুষের জন্ম যে দুঃখ আনয়ন করে ইহা মনে করা হইত। ফলে যে কোন আকাঙ্খাকে একেবারে নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। নারী-জাতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন এবং নারীসঙ্গ বর্জন করা বৌদ্ধধর্মের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যে ধর্ম সকলের প্রতি অপার করুণা প্রদর্শন করে, সেই ধর্ম নারী-জাতির প্রতি করুণাহীন ছিল। নারীকে শিক্ষায় পূর্ণ অধিকার বৌদ্ধধর্ম দেয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু নারীকে শিক্ষার অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হইয়াছে, একথাও স্বীকার করা চলে না। কারণ কোন কোন ভিক্ষুণী জ্ঞানময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে নামিয়া আসে এবং ফলে যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের বিকাশ লাভ হয়। ব্রাহ্মনেতর বর্ণগণ এদিকে প্রাধাণ্য লাভের জন্য বৌদ্ধধর্মের সমর্থন করেন এবং জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য সংঘারাম, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করিতে থাকেন। সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীরাও মন্দির, মঠ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হন। রাজন্যবর্গও যুদ্ধ না করিয়া মানুষের মন জয়ের দিকে দৃষ্টি দান করেন। তাঁহারা জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হইয়া আসেন। ইহার ফলে শিল্প, ভাস্কর্য; চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শিক্ষার বিকাশ ঘটিতে থাকে। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে প্রাকৃত ও পালিভাষায় রচনা করেন। আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রচলন হওয়ায় জনশিক্ষা উন্নতির পথে যায়। এতদিন পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চ চিন্তা মুষ্টিমেয় লোক করিত, জনসাধারণ তাহার সমর্থন জানাইত মাত্র। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসারের ফলে জনসাধারণও ধর্মচিন্তার সুযোগ ও অবকাশ পায়। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের মত যুক্তিবাদী ধর্মমতও জনসাধারণের সংযোগের ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অবহেলা

বৌদ্ধ-বিরোধিতা ও হিন্দুদের সংস্কার-প্রচেষ্টা

বৌদ্ধধর্মে গণসংযোগ

বৌদ্ধধর্মের 'জাতক' সৃষ্টি একটি অনবদ্য দান। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কর্মফলই বৌদ্ধ ধর্মে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু কর্মফল একই জন্মে পাওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মত

জাতক

পরজন্মে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মের গল্পসমূহ লইয়া 'জাতক' গ্রন্থ রচিত। জাতক গ্রন্থের সুন্দর সুন্দর গল্পের মধ্য দিয়া লোকশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের ত্রুটি

অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধধর্মের অহিংসাবাদ ও জাগতিক সুখের প্রতি বিমুখতা ভারতীয়দের মনে এক উদাসীন মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, ফলে ভারতীয়েরা যোদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করে এবং সেই সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এই দেশ আসিয়া অধিকার করে। এই অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে, একথা স্বীকার্য। কিন্তু মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে বুদ্ধদেবের অহিংসাবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনীয়। বর্তমান সময়ের জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের সমস্যা সমাধানে বুদ্ধদেবের অহিংসাবাদকে না মানিয়া উপায় নাই। বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদকে সমর্থন করা যায় না, কারণ উহা মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে উহাতে সংসার বিমুখতা জন্মিতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের মত এমন প্রগতিশীল যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের সঙ্গে দুঃখবাদ যুক্ত থাকায়, সত্যিই দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাধারা

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার অনেক সাদৃশ্য আছে এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। একই পরিবেশ ও ঐতিহ্যে দুই শিক্ষাধারাই রূপায়িত হইয়াছে, তাই তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়, আর পার্থক্য দেখা যায় ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইতে। নিম্নে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হইল।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ—তুলনা

(১) হিন্দুগণ বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ ছিলেন বেদ-বিরোধী।

(২) হিন্দুগণ জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা মানিয়া লইয়াছিলেন এবং মনুর যুগে তাহারা উহা কঠোরভাবে মানিতেন। বর্ণগত বিভেদের জন্য বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বৌদ্ধগণ জাতিভেদ-প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। জাতিভেদ-প্রথা না থাকার দরুণ

বৌদ্ধগণ যে-কোন শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন এবং জন্মগত কারণে কেহই শিক্ষাদানের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেন না।

(৩) হিন্দুগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু শিক্ষার্থীদের পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল। জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা ও আত্মার মুক্তির জন্য শিক্ষা এই দুই শিক্ষাই তাহারা লাভ করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহলোক-বিমুখতা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া নির্জনে ধ্যান-ধারণা করাকেই জীবনের ব্রতরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা সেবাব্রতকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছিলেন।

(৪) হিন্দুগণ গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিতেন, এবং শিক্ষা ছিল বিশেষ-ভাবে ব্যক্তিগত। হিন্দু শিক্ষার্থী গুরুগৃহকে আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া সংঘবদ্ধ জীবন যাপন অন্যতম প্রধান শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হয় এবং ফলে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। যক্ষ্মা, বসন্ত, কুষ্ঠ বা মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, দস্যু, ধনী, ক্রীতদাস, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি ও রাজকর্মচারী ছাড়া সকলেই সংঘারামে সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের অধিকারী ছিল।

(৫) হিন্দুদিগের গুরুকেন্দ্রীয় শিক্ষায় গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটিত। কিন্তু সংঘারামে বহু শিক্ষক থাকায় গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ততটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইত না। সংঘারামে বহু শিক্ষক থাকিলেও প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য একজন দীক্ষাদাতা গুরু থাকিতেন এবং তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতেন। অতএব সম্বন্ধ যে গুরু-শিষ্যের মধ্যে একেবারেই ঘনিষ্ঠ হইত না, এমন নয়। এই দিক হইতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থায় কিছুটা সাদৃশ্য ছিল।

(৬) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষার্থী গুরুর নিকট হইতে একদেশদর্শী বিচার পাইতেন, কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষায় সংঘারামে বহু শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিবার সুযোগ ছিল।

(৭) ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় গুরুর দোষগুণ আলোচনা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থায় গুরু যেমন শিষ্যের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন এবং সংশোধন করিতেন, তেমনি শিষ্যেরও গুরুর দোষ-ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব ছিল।

(৮) হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় প্রচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধদের ধর্ম প্রচারধর্মী হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রচারের ব্যবস্থা ছিল।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার পার্থক্য দেখান গেল, কিন্তু সাদৃশ্য ও ছিল অনেক। নির্জনে প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ উভয় ধর্মেরই নীতি ছিল। গুরুসেবা, গুরুর ছোটবড় আদেশ পালন করা উভয় ধর্মের শিক্ষার্থীই করিত। ভিক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাই বাহির হইত ইত্যাদি।

আজীবন কৌমার্য, সংসার বিমুখতা ও সন্ন্যাস জীবনই ছিল বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য বিহার ও সংঘারামে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিহার বা সংঘারামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুশ্রেণী-ভুক্ত হওয়াও খুব কঠিন কাজ ছিল না। শুধু কুষ্ঠ, বসন্ত, যক্ষ্মারোগী, মৃগীরোগী, ক্রীতদাস, দস্যু, নপুংসক, বিকলাঙ্গ ও রাজকর্মচারী ছাড়া সকলে বিহারে ও সংঘারামে প্রবেশ করিতে পারিত। নাবালকের ক্ষেত্রে পিতামাতার অনুমতি লইতে হইত। বিহার ও সংঘারামে প্রবেশের আইন-কানুন 'বিনয়পিটকে' লিখিত আছে।

বিহার ও সংঘারামে প্রবেশ

সংঘারামে বা বিহারে প্রবেশার্থীকে প্রথমে কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। তাহাকে হলুদ রংএর বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিতে হইবে এবং উত্তরীয় দ্বারা একটি স্কন্ধ আবৃত রাখিয়া অপর স্কন্ধ অনাবৃত রাখিতে হইবে। পরে সংঘারামের ভিক্ষুদের পায়ে প্রণাম করিয়া মাটিতে পদ্মাসনে বসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে হইবে।—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।"

সংঘারামে এই প্রথম প্রবেশকে বলা হয় **প্রব্রজ্যাগ্রহণ**। আট বৎসরের পূর্বে কোন বালক প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে পিতামাতার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণে অনুমতি পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম সংঘারামে প্রবেশের পর হইতে নূতন বৌদ্ধ তরুণকে বলা হইত **শ্রমণ** বা শিক্ষার্থী। পূর্ণ ভিক্ষুত্ব লাভের জন্যও অনুরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন হইত। শ্রমণ জীবন অতিবাহিত হইলে পূর্ণ ভিক্ষুত্ব লাভ করা যাইত। তখন শ্রমণকে বলা হইত **উপসম্পদা**। কুড়ি বৎসর বয়স্ক না হইলে কেহ উপসম্পদা হইতে

পারিত না। উপসম্পদা লাভ করিতে গেলে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে শ্রমণকে উপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইত। উপাধ্যায় শ্রমণের উত্তরে সন্তুষ্ট হইলে পর তিনি শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিতেন।

মঠে বা সংঘারামে যে সমস্ত শ্রমণ থাকিতেন তাহাদের বলা হইত সদ্ধি-বিহারিক। প্রত্যেকটি শ্রমণকে গুরু হিসাবে একজন ভিক্ষুকে গ্রহণ করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই ভিক্ষু সর্বগুণসমন্বিত, এবং বহু দিন ভিক্ষু থাকিয়া তিনি উপাধ্যায় বা আচার্যের পদে উন্নীত হইয়াছেন। উপাধ্যায় সদ্ধিবিহারিককে পুত্রের মত জ্ঞান করিতেন, এবং সদ্ধিবিহারিকও উপাধ্যায়কে পিতার স্থলাভিষিক্ত করিত। এইরূপে এই দুই জন পরস্পরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস লইয়া জীবনে অগ্রসর হইতেন, এবং জীবনের উচ্চস্তরে যাইয়া পৌঁছাইতেন।

উপাধ্যায় ও সদ্ধি-বিহারিক

উপাধ্যায় বরণও একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইত। সদ্ধি-বিহারিক উত্তরীয় দ্বারা এক স্কন্ধ আবৃত করিয়া এবং অপর স্কন্ধ মুক্ত রাখিয়া উপাধ্যায়ের পায়ে প্রণিপাত জানাইয়া বলিতেন, "প্রভু, আপনি আমার উপাধ্যায় হউন।" এইরূপ বাক্য তিন বার বলা হইলে উপাধ্যায় শিষ্য গ্রহণে সম্মতি দিতেন। এই ভাবে গুরু বরণ সমাপ্ত হইত।

ব্রহ্মচর্য পালন এবং অত্যন্ত দরিদ্রভাবে জীবন যাপন ছিল সংঘজীবনের আদর্শ। মঠের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত, কিন্তু শ্রমণ বা সদ্ধিবিহারিক সেইগুলি মানিয়া চলিবার জন্য কোন শপথ গ্রহণ করিত না। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন সকলের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কাজ ছিল। শ্রমণেরা সংঘারামে থাকাকালীন কোন কোন সময় অপরাধ করিয়া ফেলিত। অন্যূন দশ জন ভিক্ষু লইয়া গঠিত একটি সমিতি এই সকল অপরাধের বিচার করিতেন। গভীর অপরাধের জন্য শ্রমণ বা সদ্ধিবিহারিককে সংঘ হইতে বিতাড়নের ব্যবস্থাও ছিল। কি কি অন্যায় কাজ হইতে শিক্ষার্থী শ্রমণ বিরত থাকিবে তাহার একটি তালিকা 'প্রতিমোক্ষ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। প্রতি সংঘারাম বা বিহারে মাসে দুই বার সকলের সম্মুখে প্রতিমোক্ষ গ্রন্থ হইতে কুকর্মের তালিকা পাঠ করা হইত। যে শ্রমণ কোন রূপ ব্রতভঙ্গ করিয়াছে তাহাকে ঐ সভায় তাহার অপরাধের কথা বর্ণনা করিতে হইত, এবং ঐ

মঠে শৃঙ্খলা রক্ষা

সভার প্রবীণ ভিক্ষু-সংসদ অপরাধীর উপর যে দণ্ড বিধান করিতেন, অপরাধী শ্রমণকে তাহা মানিয়া লইতে হইত।

সদ্ধিবিহারিকদের সংঘারামে কঠোর জীবন যাপন করিতে হইত, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা দশটি শীল মানিয়া চলিত। এই দশটি শীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি শীল প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য, অপর পাঁচটি শীল মঠাশ্রয়ী সদ্ধিবিহারিকেরা মানিয়া চলিত। শীলগুলি নিম্নলিখিত প্রকার:—

দশটি শীল

(ক) প্রাণাতিপাত করিবে না, (খ) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, (গ) ব্রহ্মচর্য-ভঙ্গ করিবে না, (ঘ) মিথ্যা বাক্য বলিবে না, (ঙ) কোনরূপ মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

দ্বিতীয় পাঁচটি শীল হইতেছে:—(ক) মালাচন্দন ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে না, (খ) বিকালে আহার করিবে না, (গ) নৃত্যগীতাদি করিবে না। (ঘ) স্বর্ণ-রৌপ্যাদি দান গ্রহণ করিবে না, (ঙ) কোমল বিলাসপূর্ণ শয্যা বা উচ্চ শয্যায় শয়ন করিবে না।

এই দশটি শীল ব্যতীত সদ্ধিবিহারিকগণকে আরও দ্বাদশটি শীল পালন করিতে হইত। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের জীবন ধারণের উপায় ছিল ভিক্ষা। তাঁহারা সকলেই ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ধনীলোকেরা ভিক্ষুদের নিজ গৃহে আনাইয়া ভোজন করাইতে পারিতেন কিংবা মধ্যে মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণও করিতে পারিতেন। ভিক্ষা এবং মঠের কায়িক পরিশ্রমের কাজসমূহে সাধারণতঃ নূতন কমবয়স্ক শ্রমণেরা অংশ গ্রহণ করিত। প্রবীণ ভিক্ষুগণ সাধারণতঃ ধর্মশাস্ত্রের গবেষণা, উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ রচনা ও ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিতেন। বৎসরের কোন কোন সময়ে প্রবীণ ভিক্ষুগণ ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণে বাহির হইতেন, কিন্তু বর্ষাকালে তাঁহারা ভ্রমণের অসুবিধার জন্য কোন না কোন মঠে আশ্রয় লইতেন। ইহা তাঁহাদের বর্ষাবাস বলা হইত।

ভিক্ষাগ্রহণ

প্রবীণ ভিক্ষুগণের কাজ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মত উপাধ্যায় ও সদ্ধিবিহারিকের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্ক। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থী গুরুর পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষায় উপাধ্যায়ের পরিবারের কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ উপাধ্যায় হইতেন

সদ্ধিবিহারিকের দৈনন্দিন কাজ

মঠাশ্রয়ী ও কৌমার্যব্রতধারী। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মত শিক্ষার্থীকে গুরুর সেবা করিতে হইত, এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইত।

সদ্ধিবিহারিককে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সদ্ধিবিহারিক শুচি বসন পরিধান করিয়া এবং উত্তরীয় দ্বারা এক স্কন্ধ আবৃত করিয়া উপাধ্যায়ের মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিত। দাঁতন ও জল উপাধ্যায়ের জন্য তাহাকে আনিতে হইত। উপাধ্যায় মুখ প্রক্ষালন করিলে সদ্ধিবিহারিক আসনের ব্যবস্থা করিত এবং উপাধ্যায় উহাতে বসিলে সদ্ধিবিহারিক ভাতের ফেনপূর্ণ পাত্র পানের জন্য উপাধ্যায়ের সম্মুখে ধরিত। উপাধ্যায় পান করিলে সদ্ধিবিহারিক তাঁহাকে জল দিত এবং ফেনভাণ্ড ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিয়া দিত। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিলে সদ্ধিবিহারিক আসন তুলিয়া রাখিত এবং ঐ স্থান কোন রকমে নোংরা হইলে সে উহা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত। ইহার পর গুরু ভিক্ষার জন্য বাহির হইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সদ্ধি-বিহারিক উপাধ্যায়কে পরিধেয় দিত এবং ভিক্ষাপাত্র সম্মুখে রাখিত। যদি উপাধ্যায় ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে সদ্ধিবিহারিককে তাঁহার সাথে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত, কিন্তু অনুসরণকালে শিষ্য গুরু হইতে খুব বেশী দূরে বা নিকটে না থাকে সে দিকে তাহাকে লক্ষ্য করিতে হইত। উপাধ্যায় যখন কথা বলিতেন তখন সদ্ধিবিহারিক চুপ করিয়া থাকিতেন। ভিক্ষাগ্রহণ শেষ হইলে উপাধ্যায় যখন ফিরিতেন, তখন শিষ্য দ্রুত মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য জলের ব্যবস্থা ও বসিবার জন্য আসনের ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া পথে উপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হইত এবং তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষাপাত্র ও বেশবাস লইয়া গুরুর সাথে মঠে ফিরিত এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিত। গুরু যদি ভিক্ষাপাত্রে আহার করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে শিষ্য তাড়া-তাড়ি জল ও খাদ্য আনিয়া গুরুকে পরিবেশন করিত। গুরুর আহার শেষ হইলে শিষ্য ভিক্ষাপাত্রটিকে ধুইয়া মুছিয়া রাখিত এবং গুরুর বেশবাসও গুছাইয়া রাখিত। গুরু আসন হইতে উত্থান করিলে শিষ্য আসন তুলিয়া রাখিত এবং গুরুর হস্তমুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিয়া দিত। খাওয়ার জায়গা অপরিষ্কার হইলে শিষ্য ঐস্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিত। ইহার পর গুরু স্নান করিতেন। শিষ্য উহার সকল ব্যবস্থা করিত।

স্নানের স্থানে লইয়া যাইত এবং গরম ও ঠাণ্ডা জল যাহা প্রয়োজন তাহাই ব্যবস্থা করিয়া দিত। গুরুর স্নানের সময়ই শিষ্য কোন রকমে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া গুরুকে স্নানে সাহায্য করিত। স্নান শেষে শিষ্য গুরুকে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ জানাইত।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক জায়গায় সাদৃশ্য থাকিলেও এক ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু গুরুর দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় উপাধ্যায়ের চরিত্র, স্বভাব ও আচরণের প্রতি সদ্ধিবিহারিকের প্রখর দৃষ্টি থাকিত এবং উপাধ্যায়ের কোন রূপ স্খলন ও পতন হইলে সদ্ধিবিহারিককে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত। উপাধ্যায় যেন তাঁহার ধর্মবিশ্বাসে অচল ও অটল থাকেন সেদিকে শিষ্যের লক্ষ্য রাখিতে হইত। যদি উপাধ্যায় কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য তাঁহার অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা করিত বা অন্য কাহাকেও দিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। যদি উপাধ্যায়ের মনে ধর্ম সম্পর্কিত কোন রূপ ভুল ধারণার উদয় হইত, বা অন্য কোন ভ্রান্ত নীতির দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইতেন, তখন শিষ্যের কর্তব্য তাঁহাকে তাঁহার স্বীয় বিশ্বাসে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। যদি উপাধ্যায় কোন রূপ ঘোরতর অন্যায় কাজ করিতেন, তাহা হইলে শিষ্য প্রবীণ ভিক্ষু সঙ্ঘের সাহায্যে গুরুর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিত এবং প্রায়শ্চিত্তের পর গুরুকে তাঁহার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিত। পক্ষান্তরে সঙ্ঘ যদি গুরুর উপর শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কোন কঠিন আদেশ দিত তাহা হইলে সঙ্ঘকে বলিয়া কঠোরতা লাঘবের জন্য শিষ্যকে চেষ্টা করিতে হইত।

সদ্ধিবিহারিকের বিশেষ দায়িত্ব

গুরুর বস্ত্রাদি যাহাতে প্রতিদিন ধৌত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে উহাদিগকে রঙ করা হয় এদিকে শিষ্যের লক্ষ্য রাখিতে হইত। শিষ্য গুরুর আদেশ ব্যতিরেকে কাহারও নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং শিষ্য নিজেও কাহাকে উপহার প্রদান করিতে পারিত না। গুরুর অনুমতি ছাড়া শিষ্য কাহারও সেবা করিতে পারিত না। যদি গুরু কোন সময়ে অসুস্থ হইতেন, তখন শিষ্যকে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে গুরুর সেবা করিতে হইত।

সদ্ধিবিহারিকের প্রতিও উপাধ্যায়ের বহু কর্তব্য ছিল। সদ্ধিবিহারিকের আচরণের উপর উপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইত। সদ্ধিবিহারিককে আধ্যাত্মিক সাহায্য দান উপাধ্যায়ের বিশেষ কর্তব্য কাজ ছিল। সদ্ধিবিহারিককে প্রশ্ন করার দ্বারা, প্রেরণা দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা উপাধ্যায় সদ্ধিবিহারিকের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতেন। উপাধ্যায় লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন সদ্ধিবিহারিকের ভিক্ষাপাত্র, বস্ত্র এবং অন্যান্য সাধারণ জিনিস যাহা ভিক্ষুর থাকা প্রয়োজন, তাহা আছে কি না। যদি শিষ্য অসুস্থ হইয়া পড়িত, তাহা হইলে উপাধ্যায় শিষ্যের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। শিষ্য তাহার বস্ত্রাদি ধৌত করে কিনা তাহা গুরু লক্ষ্য করিতেন এবং শিষ্যকে বস্ত্র রঙ করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিতেন।

উপাধ্যায়ের কর্তব্য

গুরু-শিষ্যের মধ্যে উপরে উক্ত সম্পর্ক ছিল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের পূর্বে এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। আই সিং নামে এক চৈনিক পরিব্রাজক ৬৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষা সেই সময়ে কিরূপ ভাবে চলিতেছিল তাহার এক বিবরণী দেন। তিনি বলেন যে শিষ্য গুরুর কাছে রাত্রির প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে উপস্থিত থাকিত। গুরু শিষ্যকে ভালভাবে বসিতে বলিতেন, তাহার পর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক হইতে কোন অধ্যায় পাঠ করিতেন এবং শিষ্যকে উহা ভালভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কোন বিষয়ই শিষ্যের কাছে অস্পষ্ট বোধ না হয় এমন ভাবে গুরু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। আই সিং বলেন যে উপাধ্যায় শিষ্যের চরিত্রের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং কোনরূপ স্খলন হইলে তিনি শিষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করিতেন। শিষ্য গুরুর দেহ মর্দন করিত, বস্ত্র ভাঁজ করিয়া রাখিত এবং ঘর ঝাঁট দিত। গুরুর পানের জন্য শিষ্য বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিত। পক্ষান্তরে শিষ্য অসুস্থ হইলে গুরু শিষ্যের সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং শিষ্যকে পুত্রবৎ পালনও করিতেন।

আই সিং-এর বৌদ্ধশিক্ষা বিষয়ক বিবরণী

আই সিং বলেন যে শিষ্য 'বিনয়' পাঠে পারদর্শী হইবার পর পাঁচ বৎসর পরে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে পৃথক হইয়া বাস করিতে পারিত, কিন্তু যেখানেই সে যাক না কেন, 'বিনয়' সম্বন্ধে পারদর্শিতা

লাভের পরও, তাহাকে দশ বৎসর কোন গুরুর কাছে শিষ্যত্ব করিতে হইত।

শ্রমণদের ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। প্রথম অবস্থায় শ্রমণদের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া এবং সংঘারামে থাকিবার মত আচার আচরণ আয়ত্ত করা শিক্ষাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে অজ্ঞতার নিরসন এবং ইহার উদ্দেশ্য বৌদ্ধিক বা শিক্ষাগত উন্নতির জন্য নয়। অজ্ঞতা অর্থ ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। জীবনের সঙ্গে দুঃখের সম্পর্ক, সকল কামনা বাসনার উচ্ছেদের মধ্যেই যে দুঃখের অবসান, এবং জন্মমৃত্যুর দুষ্ট চক্র হইতে মুক্তিই যে নির্বাণ এই সব বিষয়ে অজ্ঞতার নিরসনই হইতেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান শিক্ষার বিষয়। অতএব জাগতিক শিক্ষার বিষয় বৌদ্ধ শিক্ষার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তবুও দেখা যায় বৌদ্ধ মঠগুলিতে ধীরে ধীরে লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান ও মহাযান শাখায় সাধারণ বৌদ্ধিক শিক্ষা ও লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রভাবেই বৌদ্ধগণ নানা বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা

চৈনিক পরিব্রাজক যাঁহারা পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণী হইতে বৌদ্ধ শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা মূল্যবান তথ্য পাই। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্ম পুস্তকগুলির প্রতিলিপি নিজ দেশে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। চীনা পরিব্রাজকগণ বিপদসঙ্কুল কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের সংঘারামগুলিতে আসিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধ শিক্ষার খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকদের ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য

ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া বলিয়াছেন যে তিনি পাঞ্জাবে মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বদিকে লিপির ব্যবহার ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পাটলিপুত্রের অশোকস্তম্ভের নিকট হীনযান ও মহাযান শাখার দুইটি সংঘারাম ছিল এবং সেই সংঘারামগুলিতে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। ঐ সংঘারামগুলিতে বহু দূর দেশ হইতে শিক্ষার্থীর সমাগম হইত।

হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখেন যে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হইলেও বৌদ্ধ শিক্ষা মর্যাদার সঙ্গেই চলিতেছে। তিনি আরও দেখেন যে মহাযান শাখার প্রসার লাভ হইতেছিল এবং হীনযান শাখা অবনতির দিকে যাইতেছিল। তিনি অনেক বড় বড় সংঘারাম সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে সেইখানে উচ্চস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

জনশিক্ষা প্রচার

ক্রমে সংঘারামের বাহিরেও ভিক্ষুগণ জনশিক্ষা প্রচারের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাহারা গ্রামে বিদ্যালয়ও পরিচালনা করিতেন।

স্ত্রীলোকদের শিক্ষা

জন্মগ্রহণ করাকে বৌদ্ধধর্মে দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করা হয়। নারীই জন্ম দান করে, এই কারণে বৌদ্ধধর্ম নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা দান করে নাই। তাহা হইলেও প্রিয় শিষ্য আনন্দের এবং পালিকা মাতা মহাপ্রজাপতির প্রভাবে বুদ্ধদেব নারীকে সংঘারামে প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রেও সমস্ত শীল অবশ্য পালনীয় ছিল এবং সদ্ধিবিহারিকারা আরও দ্বাদশটি বিশেষ নিয়ম পালন করিতেন। তাহা ছাড়া ভিক্ষুণীদের পক্ষে একা ভ্রমণ করা, পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে বাস করা, বিবাহে ঘটকালি করা, নদী পার হওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। তরুণী ভিক্ষুণীদের 'শিক্ষমানা' বলা হইত। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে বিশাখা, সুপ্রিয়া প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীদের উল্লেখ দেখা যায়। উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্না ভিক্ষুণীদের বলা হইত 'তিরি' বা 'থেরি'। বুদ্ধের পালক মাতা মহাপ্রজাপতি ও তাঁহার সঙ্গে আরও পাঁচ শত শাক্য রমণী এই পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন, কিষা গৌতমী জেতাবন সংঘারামের পরিচালিকা ছিলেন। অতএব দেখা যায়, বৌদ্ধধর্ম নারীদের উপর সুবিচার না করিলেও বৌদ্ধ নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে অনগ্রসর ছিলেন না।

অর্থসংস্থান

বৌদ্ধ সংঘারামগুলিতে বৌদ্ধ রাজগণ, বৌদ্ধ ব্যবসায়িগণ এবং শ্রেষ্ঠীরা মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন, ফলে সংঘারামগুলি গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘারামগুলিতে বাহিরের শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার সুযোগ পাইত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও অনেক সময় গ্রামের বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় ইহার প্রভাব আজও বিদ্যমান। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রভাব কতটুকু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। বৌদ্ধ শিক্ষার অনেকখানি অংশই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা হইতে গৃহীত। শুধু বেদের স্থান অধিকার করিয়াছিল বৌদ্ধধর্ম পুস্তকগুলি; চিকিৎসাশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে বৌদ্ধগণ আগ্রহী ছিল। বৌদ্ধগণ ন্যায়শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একাধিপত্য নষ্ট করে এবং সর্ব বর্ণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বৌদ্ধশিক্ষা সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার বর্তিকা তুলিয়া ধরে, এবং জনসাধারণও শিক্ষার জন্য আগ্রহ বোধ করে।

উপসংহার

প্রশ্ন

Q 1. Examine the state of Education in Buddhist India and make your comments.

উঃ। চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ পড়িয়া সারাংশ লিখুন।

Q 2. Buddhism democratised and internationalised Indian Education.

উঃ। উপরের প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Q 3. Compare the Brahmanic System of Education with the Buddhistic System in regard to the aims and organisation.

উঃ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ বিশেষ করিয়া দেখুন, তারপর পরের অংশ পড়ুন।

Q 4. Examine critically the Brahmanic System of Education and give reasons for its decline at the advent of Buddhism in ancient India.

উঃ। তৃতীয় অধ্যায় হইতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে লিখুন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অবনতির জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ দেখুন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয়

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রী শিক্ষা। গুরুর কাছে একদল শিষ্য শিক্ষা গ্রহণ করিত ; গুরুই পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি ছিল ভিন্ন রকম সংস্থা। সংঘারামে প্রবীণ ভিক্ষুরা থাকিতেন। প্রবীণ ভিক্ষুদের এক সংসদ সংঘারাম পরিচালনা করিত, অর্থাৎ সঙ্ঘারামের গঠন ছিল গণতান্ত্রিক। উহা গুরুকেন্দ্রী ছিল না বলিয়া পাঠ্যসূচীও সকলের মতগ্রাহ্য হইয়া গড়িয়া উঠে। ফলে একই স্থানে বিভিন্ন মতের শিক্ষা ও বিষয়ের শিক্ষা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে থাকে। বৈদিক শিক্ষাও ইহাদ্বারা পরে প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাদৃশ্য খুব বেশী ছিল না। প্রথমতঃ প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সংগঠিত বা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি শিক্ষাসংস্থা ছিল যেখানে শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ একত্রিত হইতেন। ছাত্রেরা সেখানে বাস করিত এবং শিক্ষকদের কাছে যতটুকু শিখিবার শিখিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারপণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ করিত হইত। কিন্তু প্রবেশান্তে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন ছিল না, সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের কোন রকম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও ছিল না, এবং পরীক্ষান্তে কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা দিবার নিয়মও ছিল না। বর্তমান কালে একই দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা যেমন তাহাদের ব্যবসায়ে সুবিধার জন্য শহরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবসা স্থাপন করে, ঠিক সেই রকম সেই যুগের জ্ঞান আহরণ ও বিকীরণের জন্য এক একটি বিখ্যাত স্থানে বিভিন্ন মতের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একত্র হইয়া এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতেন। ইহারা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করিত। আবার ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি ধনী ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ

শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে তক্ষশিলা, বারাণসী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বলভি, নবদ্বীপ (বাংলাদেশের নদীয়া) এবং কাঞ্চীপুরম্ (মাদ্রাজ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে বারাণসী, নবদ্বীপ ও কাঞ্চীপুরমের শিক্ষা-কেন্দ্র মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ধারা এই সকল কেন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠে—নালন্দা, বিক্রমশীলা, বলভি ইত্যাদি বিহার ও সংঘারামে। এই বিহার ও সংঘারামগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সব উদ্যানে যেখানে বুদ্ধদেব শিষ্যগণ সহ আসিয়া পরিভ্রমণের সময় অবস্থান করিতেন।

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা প্রাচীন গান্ধারের (বর্ত্তমানে কান্দাহার) অন্তর্গত এবং পেশোয়ারের নিকটস্থ এক স্থানে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল এবং শত শত ছাত্র ও শিক্ষক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতবর্ষের বাহির হইতে এখানে শিক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতেন। খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেও সুদূর বারাণসী হইতে ছাত্রগণ তক্ষশীলাতে যাইত। খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, যখন সেকেন্দার শাহ ভারত আক্রমণ করেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় দার্শনিক শিক্ষায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ২৫২ নং জাতকের কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই যে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁহার ষোড়শবৎসর বয়স্ক পুত্রকে তক্ষশীলায় শিক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা পুত্রের সাথে দিয়াছিলেন এক জোড়া স্যাণ্ডেল জুতা, একটি পাতার ছত্র এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। রাজপুত্র শিক্ষকের সম্মুখে নীত হইলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" "বারাণসী হইতে," উত্তর দিল বালক। "তুমি কাহার পুত্র?" "বারাণসীর রাজার পুত্র।" "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?" "শিক্ষা গ্রহণ করিতে।" "শিক্ষকের জন্য দক্ষিণা আনিয়াছ, না তুমি শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে আমাকে সেবা করিবে?" "আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি।" এই বলিয়া বালক গুরুর পায়ের কাছে স্বর্ণমুদ্রার থলে রাখিল।

এই গল্পটি হইতে আমরা কতকগুলি তথ্য জানিতে পারি। ১৬ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল। নগদ দক্ষিণা বা গুরুসেবা করিয়া শিক্ষা লাভ করিবার প্রথা ছিল। শিষ্যেরা সামর্থ্য অনুযায়ী গুরু-দক্ষিণা দিত। যাহারা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা লাভ করিত, তাহারাও

গুরুকে অন্যদের মত একই ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাইত এবং সেবা করিত। তাহা ছাড়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ছাত্রগণ বিদেশ হইতে এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসিত। গুরুও পুত্রস্নেহে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন।

তক্ষশীলার শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই খ্যাতি ছিল। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহাদের খ্যাতি প্রসারিত ছিল। তাঁহারা ছাত্রদিগকে বেদ শিক্ষা দিতেন, চিকিৎসা বিদ্যা ও অশ্বচিকিৎসা শিক্ষা দিতেন এবং ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ও কৃষিকাজ শিক্ষা দিতেন। ৫৩৭ নং জাতক হইতে জানিতে পারি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের ১০৩ জন রাজপুত্র যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষার্থ তক্ষশীলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল স্থায়ী ছিল এবং ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্বেতহুনদের দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বারাণসী—শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বারাণসীর শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে স্থাপিত হয়। আর্যগণের সিন্ধু উপত্যকা হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আসিয়া বসতির পর এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রাচীনকালে বারাণসীর এতই প্রসিদ্ধি ছিল যে, যে কোন ধর্মনেতা যিনি তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রথমে এখানে আসিয়া পণ্ডিতদের কাছে উহা ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। বুদ্ধদেব খৃষ্টপূর্ব ৫২৮ অব্দে ধর্মপ্রচার করিতে বারাণসীর নিকট সারনাথে আসিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য পরবর্তী কালে তাঁহার অদ্বৈতদর্শন প্রচারের জন্য বারাণসীতে আগমন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব এবং শিখনেতা গুরু নানকও বারাণসীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ স্বীয়মতবাদ প্রচারের জন্য বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে যদিও রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও পতন দুই হাজার বছরের মধ্যে বহুবার হইয়াছে, তবুও বারাণসী হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বিরাট কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। বারাণসী হিন্দুশিক্ষার কেন্দ্র ছিল, কিন্তু সাথে সাথে সারনাথ গড়িয়া উঠিয়াছিল বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে। সম্রাট অশোক সারনাথে প্রচুর দান করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতেও সারনাথ শিক্ষাপ্রসারে খ্যাতি অর্জন করে।

একদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত আরবীয় ঐতিহাসিক আলবেরুনী বারাণসীকে একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্ররূপে দেখিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বারনিয়ার

এই দেশে আগমন করেন এবং বারাণসীকে এথেন্সের সাথে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে বারাণসীতে বিশেষ শিক্ষালয় ও শ্রেণী ব্যবস্থার পরিবর্তে সমগ্র নগরে শিক্ষাদানের কাজ বিস্তৃত ছিল। গুরুগৃহে এবং নগর সীমায় অবস্থিত উদ্যানাদিতেও শিক্ষার কাজ চলিত। গুরুদের মধ্যে কাঁহারও ছিল চার জন ছাত্র এবং কাঁহারও ছিল ছয় সাত জন আর কাঁহারও ছিল চৌদ্দ পনের জন ছাত্র। এই ছাত্রেরা দ্বাদশ বর্ষব্যাপী শিক্ষা গুরুর নিকট লাভ করিত। স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যে তাহাদের সহজ জীবন অতিবাহিত হইত।

নালন্দা—ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল নালন্দা। ইহার সংগঠন, ও পরিচালনা খুবই সুষ্ঠু ছিল এবং শিক্ষার মান ছিল যথেষ্ট উচ্চ। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ও বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থীরা আসিয়া নালান্দায় সমবেত হইত। সুদূর চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও তুর্কীস্থান হইতে শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিত।

নালন্দার অবস্থান

মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ হইতে ৭ মাইল দূরে নালন্দা অবস্থিত। বর্তমান পাটনা বা প্রাচীন পাটলিপুত্র হইতে ইহা ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। বড়গাঁও নামক স্থানে খননের ফলে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। অতিশয় উন্নত ধরণের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন এই ধ্বংসাবশেষে দৃষ্ট হয়। বক্তৃতাগৃহ, ছাত্রদের আবাসগৃহ, বৃহৎ পুষ্করিণী আজও অতীতের সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নালন্দার উৎপত্তি

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তখন অবশ্য পরবর্তী কালের রূপ পরিগ্রহ করে নাই। আর্যদেবী পরে চতুর্থ শতাব্দীতে নাগার্জুনের শিষ্য এইখানে এক বিহার স্থাপন করেন। ইহাই ক্রমে একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। গুপ্তরাজগণের প্রচুর অর্থসাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাকেন্দ্ররূপে উহার খ্যাতি খুবই বৃদ্ধি পায়। যদিও গুপ্তরাজগণ হিন্দু ছিলেন তবুও তাঁহারা এই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতির জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে এই উদার মনোভাব ইতিহাসে দুর্লভ। জনশ্রুতি আছে যে বুদ্ধদেব এই স্থানে

কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি লেপ নামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে অতিথি হন। লেপ এবং স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ সকলে মিলিয়া ১০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া এক বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড ক্রয় করিয়া মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধদেবকে দান করেন। এইরূপে এইখানে একটি সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়। নালন্দার নাম সম্পর্কে দুই রকম কিংবদন্তী আছে। প্রথমতঃ সঙ্ঘারামের নিকটে নাগানন্দ সরোবর নামে এক সরোবর আছে। নালন্দা নামের উৎপত্তি এই নাম হইতেও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধদেব এইখানে অফুরন্ত দান করেন। ন-অলম-দা অর্থাৎ অফুরন্ত দাতা—ইহা হইতে এই স্থানের নাম নালন্দা হয়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই নালন্দায় মহাযান শাখার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বলা বাহুল্য, মহাযান শাখার পঠনীয় বিষয়গুলির শিক্ষাদান এইখানে হইত। হীনযান শাখার বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে জানিতে হইত, কিন্তু শিক্ষার্থী উহা জানিত মহাযান শাখার শিক্ষার্থী হিসাবে, হীনযান শাখার মতামতগুলি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে। পরবর্তী কালে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাখার শিক্ষাই এইখানে দেওয়া হইত। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষারও কেন্দ্র ছিল। এই কারণেই যখন চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন ভারতবর্ষে ৪১০ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন, তখন তাঁহার বিবরণীতে নালন্দার বিষয় বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার পরে নালন্দা বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভারতে ৬২৯—৬৪৫ খৃষ্টাব্দে থাকাকালীন তিনি যে বিবরণী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা নালন্দার গৌরবের কথা জানিতে পারি।

তিব্বতীয় সূত্র হইতে জানা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। ধর্মগঞ্জ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা শক্রাদিত্য। শক্রাদিত্য এবং তাঁহার অধস্তন চারি জন বংশধর এই বিদ্যালয়ের পাঁচটি মঠ নির্মাণ করেন এবং ষষ্ঠ মঠটি অপর এক রাজা নির্মাণ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা শক্রাদিত্যের প্রপৌত্র বলাদিত্যের সময় নালন্দার চরম উন্নতি হয়। হিউয়েন সাঙ ছাড়া আই সিং নামক আরও এক জন চীনা-পরিব্রাজক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং তিনি নালন্দায় আসিয়া দশ বৎসর কাল

শিক্ষা গ্রহণ করেন। হিউয়েন সাঙ পাঁচ বৎসর কাল নালন্দায় শিক্ষা-গ্রহণের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই নালন্দা সম্বন্ধে যে বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি।

নালন্দার প্রাচীর অতিক্রম করিতে হইলে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইত। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ অঙ্গন চোখে পড়িত। এই বৃহৎ অঙ্গনের চারি দিকে আটটি বৃহৎ কক্ষ ছিল। ছোট বড় অনেকগুলি স্তম্ভ ছিল। তাহা ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য একটি মানমন্দিরও সেইখানে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ

নাগার্জুনের সময় এইখানে এক শত আটটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এইখানে তিনটি প্রাসাদ ছিল—তাহাদের নাম ছিল রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্নদধি। শেষোক্ত প্রাসাদটি নয়তলাবিশিষ্ট ছিল এবং এইখানে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি রাখা হইত। ইহা ছিল গ্রন্থাগার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ অঙ্গনের চারি দিকে শিক্ষার্থী ভিক্ষুগণের এবং উপাধ্যায়গণের বাসস্থান ছিল। আই সিং যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, পাঁচ হাজারের বেশী ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। আটটি বড় ঘরে এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ঘরে উপাধ্যায় ও শিক্ষার্থী ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। এই সকল গৃহের ধ্বংসাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে একজন ছাত্র কিংবা দুই জন ছাত্র বাস করিবার মত ঐসকল কক্ষগুলি নির্মিত ছিল। পাথরের বেদীতে শয়ন কার্য চলিত, আর এক কুলুঙ্গিতে থাকিত পুস্তক ও আর এক কুলুঙ্গিতে থাকিত প্রদীপ। ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ছিল এবং বিভিন্ন স্তরের ভিক্ষুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবাস-কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। উপাধ্যায়গণ ও ভিক্ষুগণ এই পুষ্করিণীগুলিতে স্নান করিতেন। স্নানের সময় হইলে ঘণ্টা বাজান হইত। তখন সকলে স্নান করিতে নামিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। প্রাসাদগুলি ছিল তিনতলা। সময় স্থির করিবার জন্য একটি জলঘড়ি ছিল। দিবাভাগ আটটি অংশে বিভক্ত ছিল এবং ঢাক, ঢোল, শঙ্খ ইত্যাদি বাজাইয়া সময় ঘোষণা করা হইত। রাত্রি ছিল তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ও শেষ

অংশে ধর্মসাধন করা হইত এবং মধ্য অংশে বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণী অনুসারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫১০ জন উপাধ্যায় ছিলেন এবং ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮৫০০। ইউয়ান সাঙ নামে একজন চীনা শিক্ষার্থী ছিল। তিনি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক সহস্র ভিক্ষু ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ছিলেন খুবই শিক্ষিত। তাহা ছাড়া কতিপয় উপাধ্যায় অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন এবং শিক্ষকতা ক্ষেত্রে তাঁহারা খুবই বিখ্যাত ছিলেন। ভিক্ষুগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ লইয়া আলোচনা করিতেন। বিদেশী ছাত্রগণের মনে ধর্ম বা অন্য কোন বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সন্দেহ নিরসনের জন্য নালন্দায় আগমন করিতেন এবং তাঁহারা ঐস্থানে অবস্থান করিয়া প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হইতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ছিল তিন জন প্রধান কর্মকর্তার উপর। নালন্দার শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র-সম্মত ছিল। মাসে দুইবার করিয়া সাধারণ সভায় প্রতিমোক্ষ পাঠ হইত। পরে ঐখানে বিশ্ববিদ্যালয় শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয় নির্ধারণের জন্য আলোচনা হইত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীকে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অর্থাৎ দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইত। পরীক্ষাগুলি এতই কঠিন ছিল যে প্রতি দশ জন প্রার্থীর মধ্যে দুই তিন জনের বেশী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত না। বহু প্রার্থীকেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হইত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধেই শুধু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, বিভিন্ন জাগতিক বিষয় যথা ব্যাকরণ ও তর্কবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং যোগ ও সাংখ্য দর্শনও পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত ছিল। এই বিষয়গুলি ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের ভিতর ছিল। তন্ত্রও এইখানে পরবর্তী কালে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাধ্যায় তন্ত্র ব্যাখ্যা বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

পাঠ্যক্রম

শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বাদশ বৎসর শিক্ষা লাভ করিত। দীর্ঘকাল ব্যাপী তাহারা ব্যাকরণ পাঠ করিত। উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হইতেছে ব্যাকরণ। অতএব অধিক দিন ধরিয়া শিক্ষার্থীকে ব্যাকরণ পড়িতে হইত। ইহার পরে তাহারা গদ্য ও পদ্য সম্বলিত ভাষা পাঠ করিত, তাহার পরে তাহারা পাঠ করিত ন্যায়শাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিদ্যা।

পঠন-পাঠন

সাধারণতঃ তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিত। তর্ক ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তি, অতএব ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। শিক্ষার্থীরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিত এবং স্নান করিয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত হইত। গুরুর সেবা শেষ করিয়া তাহারা ধর্মশাস্ত্রের কোন এক অংশ পাঠ করিত এবং পরে ঐ বিষয়ে চিন্তা করিত। এই ভাবে তাহারা প্রতিদিন নূতন জ্ঞান আহরণ করিত। উপাধ্যায়গণ ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দিতেন, তবে কোন কোন জটিল বিষয় শিক্ষার্থীরা সাধারণ আলোচনা হইতেও শিক্ষা লাভ করিত। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থিগণ আলোচনা শ্রবণ করিত, পরে তাহাদিগকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে হইত।

নালন্দার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক দিক অবহেলিত ছিল। শিক্ষার্থিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা ও দর্শনচর্চা নিয়া ব্যাপৃত থাকিত, অতএব শিক্ষা শেষে তাহারা কোনরূপ ব্যবহারিক কাজের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্যবহারিক কাজের জন্য তাঁহারা উপযুক্ত না হইলেও তাঁহারা রাজকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া অনেক শিক্ষার্থী ভিক্ষুজীবন অতিবাহিত করিত, ব্যবহারিক কর্মের প্রশ্ন তাহাদের ক্ষেত্রে উত্থিত হইত না।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়দের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহাদের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। নাগার্জুন, আর্যদেব প্রভৃতি উপাধ্যায়গণ বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। উপাধ্যায় দিঙনাগ তর্কশাস্ত্রের বিরাট্ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন।

নালন্দার অধ্যাপকগণ

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শীলভদ্র, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনচন্দ্র ও জিনমিত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায় ছিলেন। বাঙ্গালী

শীলভদ্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁহারা সকলেই প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।

'হর্ষচরিত'-লেখক বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বর্ণনা দিয়াছেন। নালন্দা পরিক্রমাকালে তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি—নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয় পড়িতে ও আলোচনা করিতে দেখিয়াছেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের একত্র সমাবেশ থাকিলেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শান্তি বিরাজমান ছিল।

অর্থ সংস্থান

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত গুপ্তরাজগণের দেওয়া তিন-শতখানি গ্রামের আয় হইতে। এই গ্রামগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস দিত, যথা—চাউল, দুধ ইত্যাদি। তাহা ছাড়া অনেক ধনী ব্যক্তি শিক্ষা-প্রসারের জন্য প্রচুর টাকা দান করিতেন। ফলে ছাত্রদের অন্ন, বস্ত্র ও আবাসের জন্য কোন চিন্তাই করিতে হইত না। ছাত্রগণ নিরুদ্বেগে পড়াশুনা করিতে পারিত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই নালন্দার গৌরব অস্তমিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু তবুও একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব ছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণের ফলে নালন্দা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বলভি—বর্তমান কাথিয়াবাড় জেলার বলা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, শিক্ষাকেন্দ্রহিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইহা নালন্দার সমসাময়িক। বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত শিক্ষক এবং নালন্দার উপাধ্যায় স্থিরমতি ও গুণমতি বলভিতে বৌদ্ধ শিক্ষা সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। বলভি শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু দূর দেশ হইতেও ছাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রে আসিত। বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'কথাসারৎসাগরে' উল্লেখ আছে যে গাঙ্গেয় উপত্যকার এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রকে শিক্ষার জন্য বলভিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলভির শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি এই গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায়।

বিক্রমশীলা—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালের পুত্র ধর্মপাল বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উন্নতির পথে

যায়। বিক্রমশীলা নালন্দার অনুকরণেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু এই সময়েই নালন্দা পতনের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল নালন্দা এবং তাহার পরেই স্থান লাভ করে বিক্রমশীলা। নালন্দার যে প্রাচুর্য ছিল, তাহা বিক্রমশীলায় ছিল না। কিন্তু ছাত্রসংখ্যার দিক হইতে বিবেচনা করিলে বিক্রমশীলাতেও প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল এবং তাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশ হইতে শিক্ষা-লাভের জন্য বিক্রমশীলায় আসিয়া উপনীত হইত। ঐখানকার উপাধ্যায়দের মধ্যেও অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন এবং অনেকে বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান বিতরণ করেন। বিক্রমশীলার শিক্ষা পরিচালনা নালন্দার মতই ছিল। কোনক্রমেই উহাকে নীচু স্তরের বলিয়া মনে করা যাইত না। তবে একথাও সত্যি যে নালন্দার খ্যাতি ছিল অনেক বেশী। তাহার কারণ নালান্দা ছিল বহুকাল স্থায়ী। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উহার সূত্রপাত এবং ধ্বংস হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় পনের শত বৎসর ছিল নালন্দার আয়ু। কিন্তু বিক্রমশীলার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র চারিশত বৎসর। অতএব নালন্দার প্রতিষ্ঠা বিক্রমশীলা হইতে বেশী হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

বিক্রমশীলা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা জানা যায় নাই। বিহারের কোন পাহাড়ের নিকট গঙ্গাতীরে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহা ভাগলপুরের কাছে অবস্থিত ছিল বলিয়াও অনেকে মনে করেন। অনেকে মত পোষণ করেন যে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার কাছেই কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল, তাই দেখিয়া মনে হয় শেষোক্ত মতটিই হয়ত ঠিক। বিক্রমশীলার ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায় নাই।

অবস্থান

রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। ঐ অর্থ হইতে যাহারা ঐখানে থাকিতেন তাঁহাদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ বহন করা হইত। ধর্মপাল একশত আটটি মন্দির এবং কতকগুলি বিরাট কক্ষ বা হলঘর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে, উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি উচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করান। এই

অর্থসংস্থান

বেষ্টনী প্রাচীরে ছয়টি দ্বার ছিল। প্রত্যেকটি দ্বার দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে যাওয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বার-পণ্ডিতের নিকট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার অনুমতি মিলিত।

বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ

রাত্রিতে বেষ্টনী-প্রাচীরের দ্বারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার পর যদি কোন অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বেষ্টনী-প্রাচীরের বাহিরে এক ধর্মশালায় থাকিতে দেওয়া হইত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছয়টি মহাবিদ্যালয় ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় মহাকক্ষ ছিল। এই কেন্দ্রীয় মহাকক্ষটি বিজ্ঞান পাঠের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করিতেন ছয় জন সভ্য সম্মিলিত একটি সংসদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন এই সংসদের প্রধান ব্যক্তি। এই সংসদের সভ্যদের মনোনীত করিতেন পাল রাজগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনা করিতেন দ্বারপণ্ডিতগণ এবং ঐ সংসদের প্রধান ছিলেন সংঘের প্রধান ভিক্ষু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং তিব্বত হইতে বহু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য বিক্রমশীলায় আসিত। তিব্বতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পৃথক গৃহ নির্দিষ্ট ছিল। ইহা হইতেই তিব্বতের সঙ্গে বিক্রমশীলার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিচালনা

বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিবার পর শিক্ষার্থীরা পণ্ডিত উপাধি পাইতেন। মগধের রাজন্যবর্গ এই উপাধি দান করিতেন। শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই পণ্ডিত উপাধি পাইতেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিলেই শিক্ষার্থী পণ্ডিত উপাধির অধিকারী হইতেন।

বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নালন্দার পাঠ্যক্রমের মতই ছিল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়া, ব্যাকরণ, অধ্যাত্মবিদ্যা, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্মের চারিটি শাখায়, প্রত্যেক শাখাতে ২৭জন করিয়া উপাধ্যায় ছিলেন। মোট উপাধ্যায়ের সংখ্যা ছিল ১০৮। সকল উপাধ্যায়ের উপরে ছিলেন একজন মহাধাধিক ও মহাপণ্ডিত অধ্যক্ষ। পরবর্তী কালে এইখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চা হয়।

পাঠ্যক্রম

বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য জ্ঞানপাদ। তিনি রাজা ধর্মপালের পুরোহিত ছিলেন। এইখানকার মহাপণ্ডিত উপাধ্যায় বৈরোচন রক্ষিত বহুগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বত গমন করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত অধ্যাপকগণ

মহাপণ্ডিত জ্ঞানশ্রী মিত্র বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যাপনায় খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিব্বতে গিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র-সমূহ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি আচার্য অতীশ নামেও পরিচিত। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি গৌড়ের এক রাজপরিবারে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে ভিক্ষু হন এবং বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া পেগু, সিংহল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া বিক্রমশীলায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিক্রমশীলার প্রথমে তিনি দ্বারপণ্ডিত হন, পরে তিনি রাজা ন্যায়পালের সময় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য গমন করেন। তিনি তিব্বত-রাজের নিমন্ত্রণক্রমেই সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর কাল তিব্বতে ছিলেন। ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন।

গ্রন্থাগার

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি ছিল খুব মূল্যবান। এইখানে বহু মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মহাখ্যাতির সঙ্গে বিরাজমান ছিল। কিন্তু বখ্তিয়ার খিলজী যখন নালন্দা ধ্বংস করেন, সেই সময় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহারই হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল এবং ইহার চারিদিকে ছিল উচ্চ বেষ্টনী-প্রাচীর। ইহাকে দুর্গ বলিয়া ভুল করা হইত। বখ্তিয়ার খিল্‌জী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। কয়েকজন ভিক্ষু পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ছাড়া আর সকলকে হত্যা করা হয়। গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটি গ্রন্থ যে সব ভিক্ষু পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা

লইয়া গিয়াছিলেন, বাকী সমস্ত গ্রন্থই আক্রমণকারীরা পোড়াইয়া ফেলে।

নবদ্বীপ—নবদ্বীপ কলিকাতা হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সেন রাজার দ্বারা স্থাপিত হয়। নবদ্বীপ অতি অল্প সময়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এইখানে বেদ, বেদাঙ্গ এবং ষড়দর্শন বিশেষ করিয়া ন্যায় দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিংবদন্তী আছে যে এইখানকার বিখ্যাত ছাত্র বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য মিথিলায় (বিহার) গমন করেন। তিনি মিথিলায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, নবদ্বীপে তখন পর্যন্ত ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ এইচ এইচ উইলসন নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রায় ২৫টি টোল নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন। টোলগুলি ছিল বাঁশের বেড়ার তৈয়ারী। ঐখানে গুরু থাকিতেন এবং উহা শ্রেণী করার জন্যও ব্যবহার করা হইত। পাশেই মাটির দেওয়াল-দেয়া কয়েকখানি ঘর। সেই ঘরে বাস করিত শিক্ষার্থিগণ। নদীয়ার রাজা পণ্ডিতদের যে সাহায্য দিতেন, তাহা হইতেই পণ্ডিতগণ টোলগৃহ নির্মাণ করিতেন বা সংস্কার করিতেন। সাধারণতঃ প্রতি টোলে কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র পড়িত, কিন্তু গুরু যদি খুব খ্যাতিমান হইতেন, তাহা হইলে ছাত্রসংখ্যা টোলে পঞ্চাশ জনের মত হইত। সমগ্র নবদ্বীপে টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ কিংবা ছয় শত। শিক্ষার্থীরা বেশীর ভাগ ছিল বাঙ্গালী, তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশীয় ছাত্রও এইখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। নেপাল, আসাম ও ত্রিহুত হইতেও বহু ছাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের জন্য আগমন করিত। শিক্ষার্থী বাস করিবার স্থান পাইত গুরুর কাছে আর আহার্য ও পরিধেয় পাইত জমিদার এবং বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে। কোন বিশেষ উৎসবের সময় ছাত্রেরা কিছু দিনের জন্য বাহিরে যাইত এবং কিছুদিনের চলিবার মত ভিক্ষা তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া আনিত।

এই জাতীয় শিক্ষা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসার কারণ হইতেছে এই যে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই শাস্ত্র শিক্ষা দান করা বা শিক্ষা করাকে একটি

ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। তাহা ছাড়া অনেকে যাঁহারা শিক্ষা
প্রসারে অর্থদ্বারা সাহায্য করিতেন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদিগকে অন্ন ও বস্ত্র
যোগাইতেন, তাঁহারাও ইহাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ
মনোভাব থাকার জন্যই ঐ জাতীয় শিক্ষা একটি দরিদ্র পরিবেশের মধ্যেও
অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল। প্রফেসার কাউওয়েল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের
টোলগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শিক্ষক ও
শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা
করেন।

কাঞ্চী—কাঞ্চী অথবা বর্তমান কাঞ্চীভরম প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা
কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুরা এখনও ইহাকে দক্ষিণ কাশী বলিয়া
অভিহিত করে। কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতের পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল এবং
সর্বোপরি ইহা অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা কৌটিল্য বা চাণক্যের জন্মস্থান ছিল।
চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৪২ খৃষ্টাব্দে নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে
কাঞ্চীতে গমন করিয়া সেইখানে কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কাঞ্চীর
লোকদের তিনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।
তিনি হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈব, দিগম্বর, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধদের
শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেখিতে পান। বৌদ্ধদের ঐখানে ১০০টি সঙ্ঘারাম ছিল
এবং সেই সমস্ত সঙ্ঘারামে ১০ হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। কাঞ্চী মন্দিরের
জন্য বিখ্যাত এবং এইখানকার বিখ্যাত মন্দির হইতেছে কৈলাসনাথের।

মাদুরা—দক্ষিণ ভারতের আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র হইতেছে মাদুরা।
এইখানকার শিক্ষকদের তৎকালীন শিক্ষাজগতে বিশেষ খ্যাতি ছিল।
এই শিক্ষাকেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার
করে।

অন্যান্য—এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও অনেক
শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ আর্কট জেলায় এন্নারিয়মে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার জন্য একটি
মহাবিদ্যালয় ছিল। মহাবিদ্যালয়ের খরচ বাবদ তিন শত একর জমি বরাদ্দ
ছিল এবং ৩৪০ জন ছাত্র বিনা খরচে এইখানে অধ্যয়ন করিতে পারিত।
চিঙ্গলপেট জেলার তিরুমুকুদলে ভেঙ্কটেশ পেরুমল মন্দিরের সংলগ্ন
একটি মহাবিদ্যালয় ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ও আবাসিক ছিল। এইখানে
৬০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিত। ইহাও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটি কেন্দ্র।

গুণ্টুর জেলায় মালকাপুরমে একটি মহাবিদ্যালয় ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছিল একটি হাসপাতাল ও একটি ছাত্রাবাস। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫০ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৮। ইহাও একটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

এই সবগুলি ছাড়াও ধারওয়ার জেলায় হেবালে, চিতলদুর্গ জেলায় জাটিগা-রামেশ্বরে, কর্ণাটকে বিজাপুর ও তভারগেরেতে মন্দির-সংলগ্ন মহাবিদ্যালয় ছিল। বস্তুতঃপক্ষে প্রাচীনকালে যে-কোন মন্দিরই তাহার আয়ের কিয়দংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিত এবং মন্দিরের সঙ্গেই একটি করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিত।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা

ডক্টর গ্রেভ্স আমেরিকার শিক্ষার ইতিহাসের একজন লেখক। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় শিক্ষা নৈরাশ্যজনক ধর্মবিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। বর্ণভেদও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিকৃত করিয়াছে। একটি হিন্দু বালক জন্মের কিছু দিন পর হইতেই জগৎ মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে এবং জগৎ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানচর্চা এবং আবিষ্কার সম্বন্ধে হিন্দুদের মনে কোন রূপ আগ্রহ জন্মাইত না, কারণ তাহারা পারলৌকিক জীবনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিত, ইহজীবনের উপর নয়। জীবন যাপনের প্রয়োজনে অগ্রগতিকে তাহারা কোন মূল্যই দিত না। দেখা যায় এখনও হিন্দুরা সেই প্রাচীন প্রথামতেই চাষবাস করিতেছে, ধাতুর ব্যবহার করিতেছে, ইত্যাদি। তাহা ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় ঐক্যের অভাব দেখা যাইতেছে। তাহারা ধৈর্য, নম্রতা, শান্তিভাব, বশবর্তিতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ জীবনে অর্জন করিয়াছে; তাহারা নম্র, পিতামাতা ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবান, কর্তৃত্বের নিকট অবনত, কিন্তু তাহারা নিজেদের জন্য, নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতির জন্য সামান্য কর্তব্য সম্পাদনও করে নাই এবং ফলে ভারতবর্ষ একের পর এক বিদেশীর কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে। মাসিডোনিয়ার গ্রীক, মুসলমান তুর্কী ও মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি পর পর ভারতবর্ষকে পদানত করিয়াছে; ভারতবাসীদের কাছে অগ্রগতি, উন্নতি এবং দেশপ্রেমের

কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুরা ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং আদর্শপূর্ণ ধর্মের অধিকারী হইলেও ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে বর্বরজাতি।

ডাক্তার গ্রেভ্‌সের এই সমালোচনায় বিস্মিত হইবার কিছু নাই। পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে প্রাচ্য দেশকে বুঝিতে পারা কঠিন, যেমন প্রাচ্যের পক্ষে পাশ্চাত্যকে বুঝিতে পারা অসুবিধাজনক। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ভারতবাসী যদি বর্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে প্রাচ্যের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য, তাহার অগ্রগতি সত্ত্বেও নাস্তিক ও জড়বাদী।

ডাক্তার গ্রেভ্‌সের সমালোচনার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি বৈষম্যমূলক বর্ণভেদ-প্রথার উপর স্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারাকে ব্যাহত করিয়া থাকে, তবে আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও কি একই রকম বর্ণপ্রথা দেখা যায় না? আমেরিকায় সাদা ও কালার প্রভেদের যে সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব, হিন্দুদের বর্ণভেদ-প্রথায় তত গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই।

তাহা ছাড়া হিন্দু বালক যদি জগৎ মিথ্যা বলিয়া জানিয়া থাকে, খৃষ্টান বালকও কি খ্রীষ্টধর্মদ্বারা একই ভাবে প্রভাবান্বিত হয় না? বাইবেলে লিখিত আছে, "পৃথিবীকে ভালবাসিও না, এবং পৃথিবীতে যাহা আছে তাহাও ভালবাসিও না। যদি কোন মানুষ পৃথিবীকে ভালবাসে, তাহা হইলে পরম পিতার ভালবাসা তাহার উপর বর্ষিত হইবে না।"

(জন, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদ)

ডাঃ গ্রেভ্‌স বিজ্ঞানচর্চা এবং আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যে দেশ বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও চন্দ্রশেখর রমনকে জন্ম দিয়াছে, যে দেশ মধ্যযুগে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মদত্ত যিনি Quadratic Equation (কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, বর্গীয় সমীকরণ) আবিষ্কার করিয়াছেন ও ভাস্করাচার্য যিনি Square Root (স্কোয়ার রুট, বর্গমূল) সম্পর্কে গ্রীকদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং জেরো বা ০ শূন্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এমন লোক জন্মদান করিয়াছে, এবং যে দেশ প্রাচীন যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ ও অস্ত্রোপচারে বিখ্যাত শুশ্রুত ও চরক, যিনি প্রাচীন যুগে কুড়ি রকম ফরসেপ ব্যবহার করিতেন এমন প্রতিভাশালীদের জন্ম দিয়াছে, সেই দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় ও আবিষ্কারে অনগ্রসর কিছুতেই বলা চলে না।

পুরাতন পদ্ধতিতে চাষবাসের কথা ডাঃ গ্রেভ্‌স উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী হিন্দুধর্ম বা বর্ণভেদ নয়, তাহার কারণ অন্যত্র।

ভারতবাসীদের আত্মবিশ্বাসহীনতা ও দায়িত্বহীনতার কথা ডাঃ গ্রেভ্‌স উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী গত দুইটি মহাযুদ্ধে যে সাহস ও বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে কি ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?

হিন্দুরা তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কতটা উন্নত করিয়াছে, তাহা আমরা বিভিন্ন লেখকের মতামত হইতে জানিতে পারি। অঙ্কশাস্ত্র ও বীজগণিত সম্বন্ধে ক্যাজরি (Cajori) লিখিয়াছেন যে অঙ্কশাস্ত্রে ও বীজ-গণিতে ভারতবাসীর দান নিঃসন্দেহে সকল দেশ হইতে বেশী।

ইউরোপে সভ্যতা বিকাশের বহু পূর্বে এশিয়া তথা ভারত সভ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া সমস্ত ধর্মের পীঠস্থান হইতেছে এশিয়া মহাদেশ।

উপসংহারে এইটুকু বলা যায় যে, ভারতবর্ষ বিভিন্ন অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা এখনও অনেক স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রশ্ন

Q. 1. Describe the organisation and activities of either the University of Nalanda or Vikramshila. (C.U.B.T. 1951)

উঃ। নালন্দা ও বিক্রমশীলা শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন।

Q. 2. Write notes on :

(1) Admission Examination to Nalanda.

(C.U.B.T. 1954)

উঃ। নালন্দা শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি দেখুন।

Q. 3. Give an account of the ancient University of Nalanda with special reference to the courses of studies followed there.

উঃ। নালন্দা শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি দেখুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক নূতন যুগ দেখা যায়। এই সময় হইতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়, অতএব এই সময় হইতেই এক নূতন শিক্ষাধারা দেখা যায়। মুসলমান রাজত্বকালে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে।

মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন

মুসলমানগণ প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ধন-রত্ন সম্পদ সংগ্রহের লোভে এবং পরে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য বিস্তার ও ধর্মপ্রচার। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতেই মুসলমানগণ ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেও, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহ্‌মুদ ভারতবর্ষে সপ্তদশ অভিযান করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান এবং তিনি ভারতবর্ষের বহু মন্দির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেন। তিনি ভারতবর্ষের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বদেশে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গজনী বিখ্যাত ছিল এবং তাঁহার সভা কবি ফিরদৌসী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কবি ফিরদৌসী ছিলেন বিখ্যাত শাহ্‌নামা-রচয়িতা। মাহ্‌মুদ নিজে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। ভারতবর্ষের এক দুর্গের রাজা মাহ্‌মুদ কর্তৃক তাঁহার দুর্গ অবরোধকালে মাহ্‌মুদের শৌর্য-বীর্য উল্লেখ করিয়া একটি স্বরচিত কবিতা মাহ্‌মুদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ স্তুতিপূর্ণ কবিতাটি পড়িয়া খুব সন্তুষ্ট হন এবং রাজাকে পনেরটি দুর্গ পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। মাহ্‌মুদের পুত্র মাসুদও অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু অংশ আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মাহ্‌মুদ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন নাই। তাঁহাকে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে করিয়াছিলেন মহম্মদ ঘোরী (১১৭৪—১২০৬ খৃঃ)। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের কিয়দংশ অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি বহু মন্দির ও মঠ ধ্বংস করেন, কিন্তু তিনিই আবার মুসলমানী শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত করেন। তিনি আজমীরের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন এবং সেইখানে মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সেইখানে মুসলমান ধর্ম ও আইন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মহম্মদ ঘোরীর বহু ক্রীতদাস ছিল। তিনি তাঁহার ক্রীতদাসদিগকে সাহিত্য ও রাজকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম শিক্ষিত ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি দাস রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষের বহু মন্দির ধ্বংস করেন এবং মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুতুবউদ্দীনের সমর-নায়ক বক্তিয়ার বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন। দাস-বংশেরই সুলতান ইলতুতমিসের কন্যা সুলতানা রিজিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার স্বল্প রাজত্বকাল যুদ্ধ বিগ্রহে কাটে, তাই তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অল্প কয়েকটি মসজিদ ও মক্তব স্থাপন করেন মাত্র। সুলতান নাসিরউদ্দীন জলন্ধরে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সুলতান বলবনও মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া মুসলমানী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেন। বস্তুতঃপক্ষে দাসবংশের রাজত্বকালে মুসলমানী শিক্ষার কিছুটা বিস্তার ঘটিয়াছিল। সুলতানগণ ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য আর্থিক সংস্থানও করিয়া দিয়াছিলেন। ওয়াকফ সম্পত্তির মারফত ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইত। সুলতান বলবনের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। চেঙ্গিস খাঁর অত্যাচারে বহু পণ্ডিত পলাইয়া আসিয়া দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি আমীর খস্রু অন্যতম। ঐ সময়ে দিল্লী মুসলমানদের একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

দাস রাজ-বংশের আমলে শিক্ষা

খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দীন খিলজীর রাজসভায় বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। জালালউদ্দীন খিলজী দিল্লীতে একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। ঐ গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কবি আমীর খস্রু। জালালউদ্দীনের পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী পিতার মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি আত্মসাৎ করেন এবং ফলে শিক্ষাবিস্তারে বাধা দেখা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লী মুসলমানী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি এতই দৃঢ় হইয়াছিল যে আলাউদ্দীন খিলজীর প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও শিক্ষাকেন্দ্রের অনিষ্ট সাধন তিনি করিতে পারেন নাই। পরবর্তী সময়ে আলাউদ্দীন খিলজীর শিক্ষা সম্পর্কে মতের কিছুটা পরিবর্তন হয়। তিনি শিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে দিল্লীতে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন কবি আমীর খস্রু ও দার্শনিক নিজামউদ্দীন আউলিয়া। আলাউদ্দীন খিলজীর পুত্র শিক্ষাবিষয়ে পিতার চেয়ে উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যর্পণ করেন।

খিলজী আমলে শিক্ষা-ব্যবস্থা

তুঘলক বংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। তিনি বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক উচ্চশিক্ষিত, বাগ্মী ও তার্কিক ছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত নরপতি, তিনি গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রচুর দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার খামখেয়ালীতে দিল্লীর সমস্ত দিকেই অবনতি ঘটে এবং ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবনতি ঘটিয়াছিল। দিল্লী হইতে রাজধানী স্থানান্তরীকরণের ফলে মক্তব ও মাদ্রাসাগুলির বহু ক্ষতি হয় এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

তুঘলক বংশের রাজত্বকালে শিক্ষা-ব্যবস্থা

তুঘলক বংশের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য বিখ্যাত। তিনি শুধু তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান

ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন না, সমগ্র পাঠান রাজত্বকালে তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী নরপতি আর দেখা যায় নাই। তিনি নিজে ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেন ছত্রিশ লক্ষ টাকা। ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজ্যের নূতন রাজধানী ফিরোজাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে শিক্ষা

ঐ নগরী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তিনি আঠার হাজার ক্রীতদাস-সন্তানের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এই ক্রীতদাস সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ কোরানের অনুলিপি করিত, কেহ করিত ধর্মালোচনা। সুলতান অবশিষ্ট প্রায় বার হাজার ক্রীতদাস-সন্তানকে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সুদক্ষ কারিগর ও শিল্পী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ৩৩টি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহার রাজধানীতে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক। এই আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে উহা একটি সুদৃশ্য এবং সুপ্রশস্ত প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাসাদের বা মাদ্রাসার সুদৃশ্য গম্বুজ ছিল। মাদ্রাসাটি সুন্দর উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পার্শ্বে ছিল স্বচ্ছ সরোবর। ঐ সরোবরে মাদ্রাসার প্রতিচ্ছবি পড়িত। তাহা ছাড়া ঐ সরোবরটি শিক্ষার্থীদের সুমধুর পাঠাভ্যাসের ধ্বনি দ্বারা মুখরিত ছিল। অধ্যাপকগণের মধ্যে মৌলনা জালালউদ্দীন রুমি ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, কোরান ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরও বহু বিষয় ও শাস্ত্রের অধিকারী ছিলেন। সমরখন্দ হইতে আগত আর একজন অধ্যাপকও অধ্যাপনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই মাদ্রাসাটি ছিল আবাসিক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই মাদ্রাসার নিকটবর্তী আবাসগৃহে একত্রে বাস করিতেন। ফলে উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষাকার্যও সুষ্ঠু এবং পূর্ণাঙ্গ হয়। মাদ্রাসার সংলগ্ন একটি মসজিদ ছিল। ঐ মসজিদে সুফিগণ সর্বদা জপমালা লইয়া প্রার্থনা করিতেন। মাদ্রাসার সন্নিকটে ছিল অতিথিশালা। বহু দূর দেশ হইতে বহু লোক এই মাদ্রাসা দেখিবার জন্য অতিথিশালায় আসিয়া সমবেত হইতেন। অতিথিশালায় অতিথিগণ ভালভাবেই আপ্যায়িত হইতেন। মসজিদ হইতে দরিদ্র প্রার্থীরা সাহায্য পাইত। এদিকে মেধাবী ছাত্রগণ মাদ্রাসা হইতে বৃত্তি ও ভাতা পাইত। মাদ্রাসার সকলেই বিনা

খরচায় থাকিবার ও পড়িবার সুযোগ পাইত। এই মাদ্রাসার খরচ সঙ্কুলানের জন্য পৃথক সম্পত্তির ব্যবস্থা ছিল।' তুঘলক বংশের রাজত্ব-কালেই তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি খুব বেশী-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইতিমধ্যে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের লক্ষণ দেখা যায়। মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে হিন্দুদের শিক্ষালাভে কোন নিষেধ ছিল না, কিন্তু ঐসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য, হিন্দুরা সেই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতে পারিত না। কিন্তু হিন্দুরা যখন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইতে লাগিল তখন তাহাদের আরবী ও ফার্সী শিখিতে হইত এবং পক্ষান্তরে মুসলমানেরাও হিন্দু ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। হিন্দুরা ক্রমে সরকারী উচ্চ পদ লাভের জন্য আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখিতে লাগিল এবং মুসলমানগণ ও ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। লোদী বংশের রাজত্বকালে ফার্সী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণের ফলে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। উর্দু ভাষা ফার্সী লিপিতে লিখিত হইতে থাকে। উর্দু শব্দের অর্থ 'শিবির'। সুলতানের শিবির হইতে এই ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, এই জন্য এই ভাষাটির নাম হয় উর্দু।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির আদান-প্রদান

লোদী বংশের রাজত্বকালেও মুসলমানী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল। দিল্লী ছাড়া অন্যান্য ছোট মুসলমান রাজ্যগুলিতেও মুসলমানী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছিল।

বাহমনী রাজ্যের প্রায় সকল সুলতানই বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। বাহমনী রাজবংশের এক সুলতান রাজ্যের নানাস্থানে অনেক মক্তব এবং রাজধানীতে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী সুলতান বিভিন্ন দেশ হইতে বহু পণ্ডিত নিজ দেশে আনাইয়া তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার সুবিধার জন্য একটি মানমন্দিরও তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী সুলতান নিজ রাজ্যে

বাহমনী রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা

অবস্থিত ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়া সেইখানে একটি বড় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ মহম্মদ গাওয়ান। তিনি বাহমনী রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাকে সাহায্য প্রদান করেন। তিনি বিদারে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থাগারে তিন হাজারের বেশী গ্রন্থ ছিল।

বিজাপুরে মুসলমানদের অধিকারে বহু পূর্ব হইতে একটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। মুসলমানগণের আগমনের পর এই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্রটি মুসলমানী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে রূপান্তরিত হয়। বিজাপুরের নরপতিগণ সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

বিজাপুরের শিক্ষা-ব্যবস্থা

গোলকুণ্ডার নবাবগণের মধ্যে মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ হায়দরাবাদে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নাম চারমিনার মসজিদ। এই মসজিদের সঙ্গে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ থাকিতেন মন্দিরের চারিটি মিনারে।

গোলওকুণ্ডার শিক্ষা-ব্যবস্থা

মালোয়া রাজ্যে সুলতানগণ অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক বিষয়ে এইখানকার সুলতানগণ বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। অন্তঃপুরের মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই কোন সুলতান এ পর্যন্ত বিশেষভাবে করেন নাই, কিন্তু মালোয়া রাজ্যের সুলতান অন্তঃপুরের মেয়েদের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মালোয়া ও জৌনপুরে শিক্ষা-ব্যবস্থা

জৌনপুরেও শিক্ষা-ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল। শেরশাহ শিক্ষা লাভের জন্য বালক বয়সেই জৌনপুরে আসিয়াছিলেন। শিক্ষা গ্রহণ কালে তিনি তাঁহার পিতাকে জানান যে জৌনপুরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সাসারামের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ভাল। জৌনপুরের নবাবের প্রেরণায় জৌনপুরে একটি বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশেও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। বখতিয়ার খিলিজি বাংলাদেশের নানা স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন লক্ষ্মণাবতীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার মুসলমান নবাবগণ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে খুবই চেষ্টিত ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার

নবাব হুসেন শাহ প্রথম জীবনে বাংলাদেশের অনেক মন্দিরের ধ্বংস সাধন করেন এবং তিনি অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে

...ল। তিনি দিল্লীর

হুসেন শাহ রূপ ও সনাতনের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন ...ন। আকবর হয়। হুসেন শাহ ঐ সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের খুবই পৃষ্টপোষক ই...হ অর্থ বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনেও তাঁহার অবদান খুব বেশী। হুসেন শাহে... ঐ

বাংলা ভাষার উন্নতি

ছুটিখাঁও এই বিষয়ে খুব অগ্রণী ছিলেন। পরবর্তী মুসলমান নরপতিগণও বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হন। মুসলমান নরপতিগণ বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সহজতর হয়।

পরবর্তী সময়েও দেখা যায় বাংলার নবাবগণ কবি ও চারণদের অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আদান-প্রদানের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

মুঘল যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর (১৫২৬-১৫৩০)। বাবর সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি 'বাবরী' নামে এক লিপি-শিল্পের প্রবর্তন

বাবরের আমলে শিক্ষা

করেন। বাবর নিজ জীবনী লিখিয়াছিলেন। বাবর আরবী, ফার্সী এবং তুর্কী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে অত্যন্ত অল্প কালের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার বিশেষভাবে করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মাদ্রাসার অভাব রহিয়াছে তিনি মাদ্রাসা ও মক্তবের প্রতিষ্ঠা রাজ্যের পূর্তবিভাগের হাতে দিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে, যথা ধার, উজ্জয়িনী ও মাণ্ডুতে মানমন্দির ছিল বটে, কিন্তু ভারতবাসীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পশ্চাদপদ ছিল।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন ও শেরশাহের আমলে শিক্ষা-বিস্তার

হুমায়ুন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভৌগোলিক গ্লোবের প্রচলন হয়। হুমায়ুন সপ্তাহে দুই বার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ও শনিবারে ধার্মিক, সাধক ও পণ্ডিতশ্রেণীর লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। হুমায়ুনের একটি বড় গ্রন্থাগারও ছিল। হুমায়ুন পাঁচ-বৎসর কাল পলাতক জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

অবস্থিত ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পাঠানরাজ শেরশাহ ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র অর্থাৎ ১৫৪০ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে জয়পুরের নিকটবর্তী স্থান নারনৌলে তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন।

আকবরের সময়ে শিক্ষাবিস্তার

হুমায়ুনের পুত্র আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) ছিলেন মুঘল রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার এত উৎসাহ ছিল যে তিনি নিরক্ষর ছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার রাজসভায় পণ্ডিতগণের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনায় যোগদান করিতেন। কবি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, নীতিজ্ঞ, ধার্মিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সাথে প্রতি শুক্রবার ও রবিবার দিন আলোচনা করিতেন। একজন নিরক্ষর সম্রাটের পক্ষে তাহা কি সম্ভব? তাঁহার রাজত্বকালে গোয়া হইতে খৃষ্টান মিশনারীরা তাঁহার সভায় আগমন করিতেন। তিনি আবুল ফজলকে খৃষ্টান 'গসপেল' (Gospels) গুলি অনুবাদ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি 'দীন ইলাহি' নামে এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম সর্ব ধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। সকল ধর্মের সার তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি ঐ নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিতে পারেন। এই সবই কি নিরক্ষতার চিহ্ন? তাহা ছাড়া সম্রাট আকবর প্রথম শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার নিরক্ষরতার প্রমাণ নয়। আকবর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। শিক্ষা-ব্যাপারেও তাঁহার ধর্মীয় উদারতা দেখা যায়। যে কোনও ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার রাজসভায় সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সুযোগ দিতেন। আকবর রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ, নল-দময়ন্তীর কথা, বত্রিশ সিংহাসন, হরিবংশ, লীলাবতী নামে অঙ্ক শাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সীভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। অনুবাদকদিগকে এই সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য আকবর হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আকবর ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক নূতনভাবে লিখাইয়াছিলেন।

আকবরেরও অন্যান্য সম্রাটের মত গ্রন্থাগার-প্রীতি ছিল। তিনি দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য অনেক নূতন পুস্তক সংগ্রহ করেন। আকবর একটি চিত্রশালাও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চিত্র-শিল্পীদের বহু অর্থ পারিশ্রমিক ও পুরস্কার হিসাবে দান করিতেন। আকবরের উৎসাহে ঐ যুগের সংগীত-কলার খুবই উন্নতি সাধন হয়। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী তানসেন সম্রাট আকবরের সভার শোভা বর্ধন করেন।

আকবরের রাজত্বকালে শিক্ষার নব-যুগের সূচনা হয়। আকবর হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষার জন্য একই ভাবে চেষ্টা করেন। অনেক জায়গায় হিন্দু ও মুসলমান একই বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করে। ইহাও আকবরের সযত্ন চেষ্টার ফল। এইরূপ প্রচেষ্টা পূর্বে আর দেখা যায় নাই।

আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, আকবর একটি আদেশ-পত্র দ্বারা তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে উদ্যোগী হন। ঐ আদেশ পত্রে লিপিবদ্ধ ছিল যে পূর্বে প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে অক্ষর পরিচয়ের জন্য বহু দিন কাটাইতে হইত এবং অক্ষর জ্ঞানের লাভের পর শিক্ষার্থীকে অর্থ না বুঝিয়া অনেক 'বয়েৎ' মুখস্থ করিতে হইত। ইহাতে শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় হইত। ইহার প্রতিকারের জন্য সম্রাট আকবর এই আদেশ দেন যে শিক্ষার্থীদিগকে প্রথমেই অক্ষর লিখিতে ও পরে পড়িতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ কাজে ২।৩ দিনের মধ্যেই শিশুরা দক্ষ হইয়া উঠিবে। তাহার পর শিশুরা এক সপ্তাহ ধরিয়া যুক্তাক্ষর লিখিবার অভ্যাস করিবে। ইহার পর শিশুরা কিছু নীতিবাক্য, পদ্য ও গদ্য শিক্ষা করিবে। এইখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ছাত্রগণ যাহাতে অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে এইরূপ গদ্য, পদ্য ও নীতিবাক্য শিখাইতে হইবে। পূর্বের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আকবরের শিক্ষা-পদ্ধতির এইখানেই বিশেষ পার্থক্য। পূর্বে ছাত্রগণ না বুঝিয়াই পদ্য, গদ্য, মুখস্থ করিত, কিন্তু তাহাতে আসল শিক্ষা হইত না বলিয়া—আকবর এইরূপ নির্দেশ দেন। ছাত্রদিগকে প্রত্যহ লেখা অভ্যাস করণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। প্রথম স্তরে ছাত্রদের অক্ষর-জ্ঞান, শব্দার্থবোধ, কবিতা ও নীতিবাক্য বোধগম্য হওয়া ও লেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আকবর শাহের মতে তাঁহার

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

পদ্ধতি অনুসরণ করিলে অপচয় নিবারণ হইবে এবং ছাত্রগণ অল্পসময়ের মধ্যে বহু বৎসরের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিবে।

মাদ্রাসার জন্য আকবর ভিন্ন পাঠ্যক্রমের নির্দেশ দিয়াছিলেন। নীতি-বোধক পুস্তক, গণিত, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, পরিমিতি গার্হস্থ্য, বিজ্ঞান তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, শাসনবিধি, পদার্থ-বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় মাদ্রাসার অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও পাতঞ্জল শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম

উপরে আকবরের যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূল কথা হইল দ্রুততা। ছাত্রদের শিক্ষালাভে যে অপচয় হইত, সেই অপচয় নিবারণ করিবার জন্যই তিনি এই পদ্ধতির উদ্ভব করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার পদ্ধতির মূল কথা হইল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ছাত্রদের অনুপ্রবেশ ও তাহা বোধগম্য হওয়া। পূর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয় বোধগম্য হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত না। আকবরের নির্দেশ-পত্র দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন আধুনিক যুগের একজন শিক্ষাবিদ্।

আকবরের নির্দেশ-পত্র হইতে মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ঐ শিক্ষাক্রম অতিশয় উচ্চস্তরের ছিল। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল যে পাঠ্যক্রমটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। উহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় ছিল। ঐ পাঠ্যক্রমে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও বর্তমানের সময়ের জন্য মনস্তত্ত্বসম্মত।

আকবরের শিক্ষাদর্শ খুবই উচ্চ ধরণের ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। তাহার কারণ ছিল, শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন আলাদা সরকারী বিভাগ ছিল না বলিয়া। তাহা হইলেও দিল্লী, ফতেপুরসিক্রি, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং সুযোগ্য শিক্ষকগণ ঐ বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করিতেন।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পরবর্তী বাদশাহ। জাহাঙ্গীর নিজে খুব শিক্ষিত ছিলেন। তিনি একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাহা হইল এই যে ওয়ারীশহীন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে,

জাহাঙ্গীর ও শাহ-জাহানের সময়ে শিক্ষা

তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকার দখল লইবে এবং ঐ সম্পত্তির আয়, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, সংস্কার বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি সংস্কারে ব্যয় করা হইবে। জাহাঙ্গীর ঐ আইন অনুযায়ী বহু মাদ্রাসা নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য অর্থ ব্যয় করেন। জাহাঙ্গীর সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকরদের বিশেষভাবে সমাদর করিতেন।

শাহ্‌জাহান শিক্ষা বিস্তারের চেয়ে স্থাপত্য ও শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান দিল্লীর জুম্মা মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে একটি উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি অন্যত্রও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বার্ণিয়ার শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে একটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাহজাহানের রাজত্বকালে সরকারের উদাসীনতার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল। তাহা ছাড়া বেসরকারী সাহায্যও এই সময় অতিশয় কম ছিল, কারণ ধনী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বচ্ছল অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে বলিয়া শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেন না।

শাহ্‌জাহানের পুত্র ছিলেন দারাশিকো। তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তি সম্রাটবংশে আর কেহ ছিলেন না। দারাশিকো উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দারাশিকো উপনিষদাদি সংস্কৃত গ্রন্থ প'ড়তে খুব ভালবাসিতেন এবং ঐ সব গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেন। দারাশিকোর পাণ্ডিত্য এত ছিল যে আজও ষোড়শ শতাব্দীর একজন সম্রাট পুত্রের পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। আওরঙ্গজীবের পরিবর্তে তিনি যদি ভারতবর্ষের সম্রাট হইতে পারিতেন। তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক অবস্থার ভিন্নরূপ দেখা যাইত।

দারাশিকোর পাণ্ডিত্য

শাহ্‌জাহানের পরবর্তী সম্রাট হইলেন তাঁহার পুত্র আওরঙ্গজীব (১৬৫৮—১৭০৭)। আওরঙ্গজীব অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। আওরঙ্গজীব কোরাণ ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আওরঙ্গজীব বহু শিক্ষক ও খোজাদের তত্ত্বাবধানে ধর্ম এবং যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু বিদ্বেষ খুবই প্রবল ছিল। তিনি যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, তখনই তিনি হিন্দুদের মন্দিরাদি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ধ্বংস করেন এবং

আওরঙ্গজীবের আমলে শিক্ষা-ব্যবস্থা

হিন্দুদের শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করেন। তিনি সরকারী ব্যয়ে বহু মসজিদ সংস্কার করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ ও ওলন্দাজদের একটি গির্জা অধিকার করিয়া তথায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আওরঙ্গজীব বহু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা করেন। গুজরাট, অযোধ্যা অঞ্চলে ঐ সময়ে বহু অশিক্ষিত মুসলমান ছিল। আওরঙ্গজীব ঐখানকার অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করেন। তিনি গুজরাটের বোহরা শ্রেণীর মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য অনেক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজীব বাল্যকালে যে ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মোটেই খুশী ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি এক মৌলভীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবের সিংহাসন লাভের খবর জানিতে পারিয়া আওরঙ্গজীবের সাথে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মৌলভী সাহেব যে তাঁহাকে ভুল শিক্ষা ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার জন্য আওরঙ্গজীব মৌলভীসাহেবকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। আওরঙ্গজীব ও মৌলভী সাহেবের কথপোকথন হইতে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আওরঙ্গজীবের মতামত জানা যায়। আওরঙ্গজীব মৌলভী সাহেবকে বলেন যে মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবকে শিখাইয়াছিলেন যে ফারঙইস্তান (ইউরোপ) ছোট একটি দ্বীপ এবং সেই স্থানের সর্ব-শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন পর্তুগালের রাজা। পর্তুগালের রাজার পর স্থান ছিল ওলন্দাজদের রাজা এবং তৃতীয় শক্তিশালী রাজা ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা। ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজগণ ছিলেন ভারতবর্ষের সামন্ত রাজগণের মত। ইউরোপের রাজগণ ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম শুনিয়া কম্পিত হইত। এইরূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আওরঙ্গজীব মৌলবী সাহেবকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে মৌলভী সাহেবের উচিত ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শক্তি, ঐশ্বর্য, ধর্ম, শাসন-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, বিশেষত্ব ইত্যাদি আওরঙ্গজীবের কাছে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা। কিন্তু তৎপরিবর্তে তাঁহাকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হইয়াছিল।

আওরঙ্গজীবের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধারণা

আওরঙ্গজীব বলেন যে দশ বার বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে আরবী ভাষাই শেখান হইয়াছিল এবং নীতি ও ব্যাকরণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করা হইয়াছিল। আওরঙ্গজীব বলেন যে, যদি আরবী ভাষা না শিখাইয়া তাঁহাকে মাতৃভাষা শেখান হইত তাহা হইলে সমস্ত বিষয়বস্তু তিনি বহু পুর্বেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবকে যে দর্শন-বিষয়ক শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তিমূলক। আওরঙ্গজীব বলেন যে দর্শন-শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিক্ষার্থীর মন যুক্তিশীল হয়। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া রাজপুত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাকে অজ্ঞ রাখার জন্য আওরঙ্গজীব মৌলভী সাহেবকে তিরস্কার করেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি তিনি মৌলভী সাহেবের নিকট উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা হইলে অ্যারিষ্টটল যেমন আলেকজাণ্ডারের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সম্মান লাভ মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবের নিকট হইতে পাইতে পারিতেন। কিন্তু মৌলভী সাহেব তাহা করেন নাই, তাই তিনিও মৌলভী সাহেবকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারিবেন না। কিন্তু মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবকে উপযুক্ত শিক্ষাদান না করিতে পারিলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষে আরঙ্গজীবের মনকে বিষাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহার জন্য নানা দিক হইতে দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আওরঙ্গজীবের কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইতিহাস, ভূগোল, আন্তর্জাতিক জ্ঞান, মাতৃভাষা এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী অঞ্চল ও রাষ্ট্রসম্বন্ধের সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তির বিকাশ ও জীবনের ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার রীতি, চরিত্রগঠন, ইত্যাদি হইবে আওরঙ্গজীবের শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আকবরের ন্যায় আওরঙ্গজীবের শিক্ষাধারার মধ্যেও ক্রুততা পরিলক্ষিত হয়। এই দিক দিয়া উভয় সম্রাটের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু অন্য কোনও দিকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নাই। আকবর ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার মতাবলম্বী, পক্ষান্তরে আওরাঙ্গজীব ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা-দুষ্ট।

আওরঙ্গজীবের পরবর্তী যুগে মুঘলসাম্রাজ্যের পতন শুরু হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শিক্ষার বিস্তার আর কোনও সম্রাট বিশেষ ভাবে করিতে পারেন নাই। কোন কোন স্থানে মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। দিল্লীর সরকারী গ্রন্থশালার প্রসার অবশ্য সেই যুগেও হইয়াছিল।

মুসলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) মুসলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই শিক্ষার প্রধান প্রেরণা ছিল ধর্মীয়। সাধারণতঃ মক্তবগুলি স্থাপিত ছিল মসজিদের বারান্দার এক কোণে, আর মসজিদের কাছেই স্থাপিত ছিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলবীগণ শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেইখানে ধর্মতত্ত্ব বহুলপরিমাণে শিক্ষাদান করা হইলেও জাগতিক বিষয়সমূহও শিক্ষাদান করা হইত। কিন্তু মক্তবে প্রধানতঃ কোরান পাঠ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। আরবী ও ফার্সী ভাষা সামান্যই শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রগণ শুধু 'বয়েৎ' মুখস্থ করিত, প্রকৃত অর্থবোধ তাহাদের কিছুই হইত না। গণিত সামান্যই শিক্ষা দেওয়া হইত। সুতরাং মক্তবের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং ধর্মীয় সংস্কারপূর্ণ ছিল। মক্তবগুলি সরকারী সাহায্য পাইত বটে, কিন্তু আকবরের পূর্ববর্তী কোন সুলতান ও সম্রাটই মক্তবের পাঠক্রমের কোনও রূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন নাই। ফলে শিক্ষা-পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই। উচ্চবংশের অনেক সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোক শিক্ষার অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদিগকে ধর্মান্ধতার সংস্কারে আবদ্ধ করাই ছিল মসজিদ-সংলগ্ন মক্তবের উদ্দেশ্য।

ধর্মীয় প্রেরণা

(২) পর্দাপ্রথা মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। ফলে স্ত্রী-শিক্ষার অবহেলা দেখা যায়। বালিকারা সাত বৎসর পর্যন্ত মক্তবে পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহার পরই বালিকারা অন্তঃপুরে যাইয়া আবদ্ধ হইয়া যাইত। অন্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছিল, এই কথা আমরা মালোয়ারাজ্যের মুসলমানী শিক্ষাবিস্তারের কথা হইতে জানিতে পারি। কিন্তু অত্যন্ত সামান্য সংখ্যকই শিক্ষিকা নিয়োগ করা হইয়াছিল। রাজ-অন্তঃপুরের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্যই বিশেষ করিয়া ঐ পদ্ধতি অবলম্বিত হইত, সাধারণ লোক ঐ সুবিধা পাইত না বলিলেই চলে।

স্ত্রীশিক্ষার অবহেলা

সুলতানা রিজিয়া অত্যন্ত সুশিক্ষিতা ছিলেন। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমও সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং তিনি "হুমায়ুন-নামা" রচনা করিয়াছিলেন।

হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী সালিমা সুলতানা একজন বিদুষী নারী ছিলেন। আকবরের ধাত্রী মাহম আনগ বিদুষী রমণী ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের কয়েকটি কক্ষে বালিকাদের জন্য প্রতিদিন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রাজপরিবারের বালিকারা ছাড়াও প্রাসাদস্থ কর্মীদের মেয়েরাও সেইখানে শিক্ষালাভ করিত। জাহাঙ্গীর-পত্নী নূরজাহান বিভিন্ন ভাষার অধিকারিণী ছিলেন এবং অতিশয় সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজকার্যে সাহায্য করিতেন। জাহাঙ্গীরও রাজকার্যে স্বীয় পত্নীর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। শাহ্‌জাহান-পত্নী মমতাজ বেগম ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। জাহানারা ছিলেন সম্রাট শাহ্‌জাহানের জেষ্ঠা কন্যা। জাহানারা অত্যন্ত বিদুষী নারী ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর কবরের জন্য একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা সেই যুগের সম্রাট-পুত্রীর কবি-প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। জাহানারার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন লতিউন্নীসা। তাঁহার ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজীবের কন্যার নাম জেবুন্নিসা বেগম। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ অধিকারিণী ছিলেন। আওরঙ্গজীবের তৃতীয়া কন্যা বদ্‌রুন্নীসাও পণ্ডিতা ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

মুসলিম নারী বিদুষীদের কথা

(৩) ইস্‌লামীয় শিক্ষা এই দেশের মাটিতে খুব বেশী করিয়া শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ দেশের সুলতান ও বাদশার পৃষ্ঠপোষকতায়। যদি সুলতান বা বাদশাহ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হইত, কিন্তু তাহা না হইলে শিক্ষার অধোগতি হইত।

ইসলামীয় শিক্ষার প্রকার

(৪) মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র কয়েকটি ছাড়া সাধারণতঃ খুব বেশী বড় হইত না। মাত্র কয়েকটি ছাত্র লইয়াই মসজিদে বা মসজিদ-সংলগ্ন গৃহে মক্তব বা মাদ্রাসার কাজ শুরু হইত। এই ছোট প্রতিষ্ঠান সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। এই কারণে দেখা যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করার সাথে সাথে তাঁহাকে পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কারও করিতে হইত।

মক্তব ও মাদ্রাসার ধ্বংসের কারণ

(৫) আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুরাও মুসলমানী শিক্ষার অংশ গ্রহণ করে এবং তখন উভয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিতেছিল। আওরঙ্গজীব এই সাংস্কৃতিক মিলনের পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও এই মিলনের গতি অব্যাহতই ছিল। সংস্কৃতি সম্পর্কে এই মিলন স্বাভাবিক ভাবেই চলিতেছিল, এই কথা বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ এই যে এই দেশের বেশীর ভাগ মুসলমানই ধর্মান্তরপ্রাপ্ত এবং তাহারা এই দেশেরই লোক। তাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেও পূর্বসংস্কার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা ধর্মোপদেশ গ্রহণের সময়েও দেশীয় ভাষাতেই উহা গ্রহণ করিতে প্রয়াসী ছিল। আরবী-ফার্সী-শব্দবহুল হইলেও উর্দু এই দেশেরই ভাষা। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিতেছিল। দিল্লী, বদাউন, আগ্রা, আমেদাবাদ, ফিরোজাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে ইসলামীয় শিক্ষার বহু কেন্দ্র যেমন গড়িয়া উঠে, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিতে মিলনের ধারাও এই সময়ে দেখা যায়।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর হ্রাসপ্রাপ্তি

(৬) হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষায় মুসলমান শাসনের আমলে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। হিন্দু ছেলেদের পাঁচ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ হইত। মুসলমান শিশুদেরও ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন বয়স হইলে বিদ্যারম্ভ উৎসব বা (বিস্‌মিল্লাহ) উৎসব করিতে হইত। মুসলমান শিশু পূর্বোক্ত বয়সে সুন্দর পোষাকে ভূষিত হইয়া বহু লোকের সামনে আসিয়া বসিত। তখন মৌলভী সাহেব তাহাকে কোরাণের বয়েৎ শুনাইয়া তাহাকে উচ্চারণ করিতে বলিতেন। বলা বাহুল্য যে শিশু উহা পারিত না, তখন তাহাকে বিসমিল্লাহ বলিতে বলা হইত। এই সময় হইতে তাহার বিদ্যারম্ভ হইত। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। উভয় সম্প্রদায়ের শিশুকেই মুখস্থ করিয়া শিখিতে হইত। হিন্দুদের পাঠাশালা ও টোল ছিল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। সেইরূপ মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মক্তব ও মাদ্রাসা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল।

হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার সাদৃশ্য

মুসলমান যুগে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

পুঁথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান রাজত্বকালে খুব উন্নতি দেখা না গেলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ যদি শিক্ষা কথাটির দ্বারা প্রতীয়মান হয়,

তাহা হইলে এই যুগে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশেষ পশ্চাদপদ ছিল তাহা মনে হয় না। মুসলমান সুলতান ও বাদশাহগণ জাঁকজমক ভালবাসিতেন এবং বিভিন্ন প্রকারের বিলাস দ্রব্যের আমদানী করিতেন। ফলে শিল্পিগণ শিল্পোন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছিলেন। শিল্পিগণ বাদশাহের মনোরঞ্জনার্থে নানা জিনিষ তৈয়ারী করিতেন এবং রাজা বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের মধ্যেও উহা প্রাধান্য বিস্তার করিত। কাশ্মীরী শাল, মসলিন বস্ত্র ইত্যাদি একদিন যে সমগ্র জগতের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, তাহা রাজা-বাদশাহদের প্রেরণার ফলেই। এই যুগে রন্ধন-শিল্প, শিল্পের পর্যায়ে উঠিয়াছিল। আদব কায়দা প্রভৃতি শিক্ষালাভের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত। অলঙ্কারাদিরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি এই যুগে দেখা যায়।

শিল্পোন্নতি

ইসলামীয় রীতিনীতি অনুযায়ী নৃত্য, গীত ও চিত্রকলা বর্জনীয় ছিল, কিন্তু তথাপি এই সময়ে বিভিন্ন চারুকলাগুলির যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছিল। কাব্যের প্রতিও বিশেষ অনুরাগ এই যুগে দেখা যায়। কিন্তু এই সকলই অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

কাব্য ও চারুকলার অগ্রগতি

এই যুগে সবচেয়ে বেশী বিকাশ ও প্রসার লাভের সুযোগ হইয়াছিল স্থাপত্য শিল্পের। বিদেশী মুসলিম দেশগুলি হইতে স্থাপত্য শিল্পীরা রাজা বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দেশে আগমন করেন। তাঁহারা এই দেশের পদ্ধতির সহিত মুসলিম দেশগুলির পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া স্থাপত্য শিল্পে এক নূতন পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। এই নূতন পদ্ধতি আজও ভারতে বিশেষ রীতি-পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। তাজমহল, জুম্মা মসজিদ, ইৎমদ্দৌল্লা প্রভৃতি সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবে আজও অদ্বিতীয়।

ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা মুসলিম যুগে হিন্দুদের মানবিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম দুই ধর্মের মধ্যে এক তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা যায়, কিন্তু পরে আর সেই মনোভাব থাকে না। দীন এলাহি ধর্ম হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্যতম মিলন প্রচেষ্টা। নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ মানবিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পশ্চাতে মুসলমান ধর্মের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের প্রভাব অনেকখানি বিদ্যমান আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাম্প্রদায়িক মিলন

এই সমস্ত ধর্ম ভারতবর্ষে এক নূতন ভাববন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার প্রভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটিয়াছিল।

সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

মুসলিম যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণাদাতা হিসাবে রাষ্ট্রই প্রধান বলিয়া মনে করা হয়, অতীত যুগে সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল না। রাজা সাধারণতঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতেন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। তাহার উপর রাজা-বাদশাগণ বিত্তবান ব্যক্তি হিসাবে সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য অংশ গ্রহণ করিতেন। এই সকল বিষয়ে সমাজের ধনবান ব্যক্তিগণের দায়িত্ব ছিল বেশী, এবং তাঁহারা সেই দায়িত্ব পালন করিতেন। প্রত্যেক বংশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে যাহাতে বজায় থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখার দায়িত্ব বংশের প্রধান ব্যক্তির। এই কারণে উচ্চ-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের সন্তানদিগকে স্ব স্ব কর্মধারা বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে সাহায্য করিত। গ্রাম্য গীতাদি উৎসব, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি লোক-শিক্ষার উত্তম বাহন ছিল।

লোকশিক্ষার ব্যবস্থা

মেলাসমূহ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিত। তাই রাজা-বাদশাহদের চেষ্টায় শিক্ষা প্রসারের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই তাহা অসম্পূর্ণ। বহু বৎসর পরে ইংরেজ-শাসন কালে এডাম সাহেব বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যখন অনুসন্ধান করেন, তখন গ্রাম্য সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার যে স্বাভাবিক রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে নানা দুঃখদৈন্য ও রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রপীড়িত হইয়াও ভারতবর্ষ কখনও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়ে নাই। ইহা সত্য যে ভারতীয় মন প্রগতি-বিমুখ এবং অতীতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল, ইহাও সত্য যে পরাজ্ঞান লাভ জাগতিক অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তবুও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইংরাজ বা অন্য কোন ইউরোপীয়গণ সংস্কৃতিতে কদাচ ভারতবাসী হইতে উন্নত ছিলেন না।

বর্তমান যুগ

প্রথম অধ্যায়

ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি—ইংরাজ আমলের সূত্রপাত

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক গগনে ইউরোপীয় বণিকগণের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং এই নানা জাতির বণিকগণের মধ্যে ইংরাজ বণিকগণ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া এদেশে স্বীয় শাসন-অধিকার লাভ করেন। ভারতবর্ষে এইরূপে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজ আমলের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয়ই আলোচ্য বিষয়। ইহাকে ছয় যুগে বিভক্ত করা চলে। **প্রথম যুগ**—কোম্পানীর রাজত্বের সুরু হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। **দ্বিতীয় যুগ**—১৮১৩ খৃষ্টাব্দের "চার্টার এ্যাক্ট"—এর পর হইতে ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত। **তৃতীয় যুগ**—১৮৫৪ হইতে ১৯০০ সাল—এই যুগে এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং এদেশীয়গণ এই শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহী হইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করেন। **চতুর্থ যুগটির** সুরু ১৯০১ খৃষ্টাব্দ লর্ড কার্জনের আমল হইতে ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় মন্ত্রীর হস্তে শিক্ষাভার আসা পর্যন্ত। **পঞ্চম যুগ** হইতেছে ১৯২১ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্তন পর্যন্ত। **ষষ্ঠ যুগ** ধরা চলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত।

ইংরাজ আমলে ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের যুগ-বিভাগ

এই ছয় যুগের এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি আমরা আলোচনা করিব।

প্রথম যুগ :—ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন স্থিতি লাভ করে। ইহা হইল ইতিহাসের ঘটনা। তবে এইটুকু বলা যায় যে এই সময়টি শিক্ষা-বিস্তারের অনুকূল ছিল না। শান্ত-পরিবেশই হইল শিক্ষার পক্ষে

অনুকূল। এই সময়ে জনসাধারণ সর্বদাই এক অস্বাভাবিক আতঙ্কের মধ্যে কাল কাটাইত। ঘোর অরাজকতার মধ্যে দেশবাসী নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্যই উদ্‌গ্রীব ছিল, শিক্ষার পরিচর্যা তাহারা করিবে কি করিয়া? কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, শাসন সম্পর্কিত অব্যবস্থায় দীর্ঘ কালের মধ্যেও ভারতীয় শিক্ষা-প্রচেষ্টা একেবারে ধ্বংস হয় নাই। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব যখন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন স্যার জন এডাম এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাংলার কয়েকটি জেলায় অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণী প্রদান করেন (১৮৩২-৩৮) তাহা হইতেই আমরা শিক্ষা-প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ইতিপূর্বে রাজকীয় ব্যাপার ছিল না। রাজা বা কোন ক্ষমতাশালী ও অর্থশালী ব্যক্তি এই ব্যাপারে কিছু বেশী উৎসাহ প্রদান ও আনুকূল্য করিতেন মাত্র।

প্রথম যুগ—১৮১৩ খৃঃ পর্যন্ত রাজশক্তির নিক্রিয়তা জন-সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা

এডামের সংগৃহীত তথ্যাবলী

কিন্তু এই দেশে গ্রামীন-সভ্যতার মধ্যে এমন একটি বিশেষ শক্তি ছিল যাহার বলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার-দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে থাকিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হইয়াছিল। এই শক্তি হইল গ্রামীন স্বায়ত্ত-শাসন-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা। অবশ্য ঐ সমাজ-ব্যবস্থা অরাজকতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য অনেক আঘাত পাইয়াছিল, ফলে তাহার প্রাণ-শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। তাই শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিবর্তে গতানুগতিকতা ও কূপমণ্ডুকতা দেখা দিয়াছিল। তথাপি এই শিক্ষাধারার স্রোতটি ক্ষীণ হইলেও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই—ইহা জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির বলিষ্ঠতার একটি অনস্বীকার্য প্রমাণরূপে গণ্য হইবে।

ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজ-শক্তির উপর নির্ভর-শীল ছিল না

শিক্ষার এই দৃঢ়তার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় শিক্ষার অপার্থিব উদ্দেশ্য। এদেশে শিক্ষাকে জীবনধারণের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে আরো উচ্চ কোনও উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করা হইত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকেরা ইহাকে জীবনের একটি কর্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন এবং বংশধারার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-গ্রহণ ও শিক্ষাদান এই উভয়বিধ কাজ-ই পবিত্র কর্মরূপে গণ্য হইত। জীবনের অবশ্য প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখা হইত না বলিয়া উক্ত

শিক্ষার অপার্থিব উদ্দেশ্য আরোপই ইহার কারণ

শিক্ষা জীবনাশ্রয়ী না হইয়া অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট ছিল বটে, তথাপি ইহার মধ্যে এমন একটি মহত্ত্ব ছিল যাহা সর্বযুগে সর্বকালে শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। বর্তমান যুগে শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিলেও সেই মহত্ত্ব বর্তমান শিক্ষা-প্রচেষ্টায় আছে কিনা সন্দেহ।

অন্য দিকে রাজদরবারের কাজে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিলই এবং বংশানুক্রমিকভাবে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল বলিয়া ঐ সব বৃত্তি-অধিকারিগণ নিজ বংশধরদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। এ ছাড়া নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমাজ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিত।

বৃত্তিভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল

কিন্তু বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের শাসনে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর হওয়ায় জনসাধারণের দৈন্যদশা বাড়িতে থাকে। এই দারিদ্র্য ও অরাজকতা-জনিত দস্যুতা বৃদ্ধি পায়, ফলে বিত্তবানের সংখ্যা কমিতে থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সমাজ-ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গী জড়িত এই স্বাভাবিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ক্রমে এই শিক্ষার অভাবে দেশবাসীর কুসংস্কার ও নৈরাশ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বিদেশী আক্রমণাদিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষতি

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত এদেশে শিক্ষা-সংক্রান্ত কোনও কাজেই হাত দেয় নাই। এই সময় হইতে গীর্জা ও বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এই শিক্ষা বিস্তারের কারণ সৈন্যাবাস-সমূহে কোম্পানীর কর্মচারীবর্গের শিশুদিগকে শিক্ষাদানের জন্য। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী সনদ লাভ করিয়া শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয় ও পূর্বতন শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথা-অনুযায়ী এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগকে শিক্ষা অর্জনে উৎসাহ প্রদর্শনে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহারা শাসকের দায়িত্ব হিসাবে এই কাজ গ্রহণ করেন নাই—রাজকীয় প্রথার অনুবৃত্তিরূপেই ইহা করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে শিক্ষা দায়িত্ব বিষয়ে উদাসীনতা

শাসন-ক্ষমতার অধিকারী কোম্পানী প্রধানতঃ বাণিজ্য বিষয়েই আগ্রহী ছিলেন এবং শিক্ষা-ব্যাপারে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শুধু মাত্র কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ রাজনৈতিক প্রয়োজন দেখাইয়া অনিচ্ছুক

কর্মকর্তাদের নিকট হইতে উহা বাবদ সামান্য অর্থ মঞ্জুর করান।

উদাসীনতার কারণ—
(১) ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি
(২) এদেশীয়দের বৈরিতার ভীতি

শিক্ষা-ব্যাপারে কোম্পানীর উদাসীনতার আরেকটি কারণ ছিল। তখন শিক্ষা-কার্য প্রধানতঃ মিশনারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোম্পানী মিশনারীদের ধর্মপ্রচার-কার্যে বেশী উৎসাহ দিতেন না—তাঁহাদের মনে সন্দেহ ছিল যে উহা জনসাধারণের বিরূপতা সৃষ্টি করিতে পারে যাহার ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে। এজন্য এদেশের প্রজাবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। তাহা ছাড়া সে যুগে ইংলণ্ডেও রাষ্ট্র সরাসরিভাবে শিক্ষার দায়িত্ব লইত না।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীদের শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ-প্রকাশ

অবশ্য কোম্পানীর প্রথম আমলে কোম্পানী খৃষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার্থ এ দেশে মিশনারী আমদানী করিতেন। যাহাতে কর্মচারীবৃন্দ খৃষ্টধর্মের অনুষ্ঠানাদির সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারেন সেজন্য ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রতি কারখানায় ও ৫০০ টনের অধিক ভারবহনক্ষম জাহাজে একজন করিয়া ধর্ম-যাজক রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ও অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত। ঐ সময় হইতেই কোম্পানীর কর্মচারীদের সন্তানদিগকে শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। কিন্তু কোম্পানী শীঘ্রই অনুভব করিলেন যে, শাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রদর্শনই যুক্তিযুক্ত। ইহা সত্ত্বেও ঐ যুগে মাদ্রাজে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে

মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম যুগের কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

রেভাঃ ষ্টিভেন্সন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেন্ট মেরীর চ্যারিটী স্কুল, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি পর্তুগীজ শিশুদের ও একটি তামিল ভাষাভাষী শিশুদের স্কুল এবং কলিকাতায় ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ রিচার্ড কেরল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটী স্কুল এবং কলিকাতায় ১৭৩১ খৃঃ খৃষ্টীয় শিক্ষা-বিস্তার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটী স্কুল—এই শিক্ষালয়গুলি উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারী অথবা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সন্তানই বেশী শিক্ষা লাভ করিত। শিক্ষাক্রম প্রধানতঃ লেখাপড়া ও গণিত-

সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান—ইহাতেই আবদ্ধ ছিল। ঐ সকল বিদ্যালয় বদান্য ব্যক্তিদের দানে ও কোম্পানীর বরাদ্দ সাহায্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হইত। ১৭৮২ খৃঃঅব্দে আরোও কয়েকটি চ্যারিটী স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু এদেশীয়গণের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অধিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইংরাজ-আমলাদের এদেশীয় ভাষা ও আইনের জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার অনুভব

ইতিমধ্যে আর এক ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইল—এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানী আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ। ইংরেজ বিচারকগণকে ঐ বিষয়ে উপদেশাদি দিবার জন্য ভারতীয় কর্মচারিগণকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশীয় বিচার-ব্যবস্থায় ইংলণ্ডীয় আইন-কানুন অনুসরণ করা হইত। কিন্তু ইহাতে ভারতীয়গণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। তাই ১৭৮১ খৃঃ এই বিধি রচিত হইল যে, এ দেশীয়দের সম্পত্তি ও অর্থ লেনদেন বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা এদেশের আইন-কানুন অনুযায়ী হইবে।

ভারতীয়গণের বিচারে ভারতীয় আইন ও বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োগ সিদ্ধান্ত

ফলে ঐ সময় হইতেই এদেশের আইন-কানুন জানার প্রয়োজন দেখা দিল। ইহা ছাড়া কোম্পানী প্রজা-সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে চাহিলেন—এই কারণে দেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, এদেশীয় শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯১ সালে জোনাথন ডানকান কর্তৃক বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শিক্ষালয় দুইটি প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বহু ভারতীয় বদান্য ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করেন।

এ পর্যন্ত কোম্পানী নিজ স্বার্থেই শিক্ষাব্যাপারে যাহা কিছু করিয়াছিলেন। নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দিবার ও শাসনকার্যে সুবিধার্থ শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু মিশনারীগণ ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ও সেবা বৃত্তির অনুপ্রেরণায় অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের শিশুদিগকে শিক্ষাদানে ও এদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করিতে অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। পর্তুগীজগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন ও পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করেন। তৎপরে দিনেমারগণ ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজ অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের

কাজ শুরু করেন। ইহাদের মধ্যে জিজেনবাগ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭১৩ খৃঃ এদেশে তামিল ভাষার ছাপাখানা প্রবর্তন করেন ও ১৭১৬ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলেন। পর্তুগীজদের মধ্যে অন্যতম রূপে শূয়ার্টজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মাদ্রাজে শিক্ষাবিস্তারের কার্যে উদ্যোগী ছিলেন। বাংলাদেশে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রমুখ প্রোটেষ্ট্যান্ট মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন।' কেরী ছিলেন অভিজ্ঞ প্রচারক, ওয়ার্ড ছিলেন ছাপাখানার কাজে কুশলী এবং মার্শম্যান ছিলেন সুশিক্ষক। কেরী ছিলেন জ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কেরী তথায় ছিলেন ভারতীয় ভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ। ইহারা যশোহর ও দিনাজপুর জেলায় এবং কলিকাতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। ইহাঁদের বিশেষ দান ছিল বাংলা গদ্য সাহিত্যে। ধর্ম-প্রচার ও অন্যান্য কার্যের জন্য বাংলা গদ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেরী ও মার্শম্যান এই দিকে ব্রতী ছিলেন। ইহার পূর্বে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী মিশনারীদের কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিলেও ইতিমধ্যে তাহারা ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রতি অধিক ঝুঁকিয়াছিলেন এবং ইহাঁদের প্রচার-কার্যে বিরোধিতা করিতেছিলেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী চুঁচুড়াতে ও ভিজাগাপট্টমে এবং বেরেলীতে কাজ সুরু করেন। তাঁহাদের কাজকেও কোম্পানী সুনজরে দেখেন নাই।

মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ও কোম্পানীর শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য মধ্যে পার্থক্য

কয়েকটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির শিক্ষা-প্রচেষ্টার পরিচয়

সুতরাং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোম্পানী শিক্ষা ব্যাপারে অতি সামান্যই আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে চার্লস গ্রাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্টীয় শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবর্তনের জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন এবং মিণ্টো প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য কোম্পানী কর্তৃক সাহায্য প্রদানের পক্ষে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন। ইহার ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট রচিত হয়। এই চার্টার অ্যাক্ট-এর দ্বারা ইংরাজী আমলের শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বিতীয় যুগে পদার্পণ করিল।

কোম্পানীর পক্ষে শিক্ষা প্রচেষ্টা চালানোর অনুকূলে অভিমত সৃষ্টি

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব আংশিক স্বীকার

এতক্ষণ আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যুগে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করে নাই। এই বিষয়ে তাঁহারা যতটুকু কাজ করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র একান্ত স্বার্থের জন্যই। শিক্ষা প্রসারের কোনও সদুদ্দেশ্য কোম্পানীর ছিল না। ইউরোপীয় কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এবং বড় জোর খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই শিক্ষাকে এদেশে চালু করেন। ইহা ছাড়া দেশীয় প্রজাবৃন্দের সম্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলা মীমাংসার দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করিবার নিমিত্ত এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণ করিতে প্রাচ্য বিদ্যাসংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি গ'ড়তে হয়। পূর্ব উদাহরণ মত রাজকীয় অর্থসাহায্য শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কোম্পানী মনস্থ করিয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর রাজনৈতিক কূটনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মিশনারীগণ ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র উর্বর করিতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কোম্পানীকে চাপ দিতে লাগিলেন যাহাতে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপ চাপ ছাড়াও ইংল্যাণ্ডেও এই সময় রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা বিষয়ে মতবাদ প্রবল হইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে উক্ত প্রভাব ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই সকল একত্রিত হওয়ার ফলস্বরূপ কোম্পানী শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার করেন। এই কারণগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকারের কারণসমূহ

ইংল্যাণ্ডের নবযুগের সূত্রপাত ও ভারতের শিক্ষা ব্যাপারে তাহার প্রভাব

এই সময়ে (১৭৯০—১৮২০) ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের প্রতি নবজাগ্রত চেতনার সঞ্চার হয়। ইহা ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের প্রথম

যুগ। ধনতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠার এই যুগে সাধারণ ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-যাত্রার মানের বৈষম্য ও শ্রমিকগণের শোচনীয় জীবন-যাত্রা অনেক মানব-প্রেমিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখনো সমাজতন্ত্রবাদ জন্মলাভ করে নাই এবং এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে জনসাধারণের অজ্ঞতা ও জড়তা-ই ইহার কারণ। তাই তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন অনুভূত হইতেছিল। এই সকল শিক্ষা ও সংস্কারমূলক আন্দোলনে হোয়াইট ব্রেড, ব্রহাম প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। বার্ক ছিলেন অদ্বিতীয় বাগ্মী। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কুশাসন সম্পর্কে বিখ্যাত বক্তৃতা দান করেন। বার্ক একজন মানবহিতৈষী ছিলেন এবং ভারতীয়-গণের দুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে নিছক শাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া এদেশের জনগণের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট প্রিয় হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ও উইলবারফোর্স মিশনারীসুলভ দৃষ্টিতে এদেশে শিক্ষা-আন্দোলন পরিচালনা করেন। গ্রাণ্ট যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম এই দেশে আসেন।

ইংল্যাণ্ডের নব যুগ চেতনার প্রভাব—ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব ও গণচেতনার আবির্ভাব

ইনি ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পান। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি ১৮০২ সালে ভারতের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার একটি বিবরণী রচনা করেন। এই বিবরণীতে তিনি সমাজের যে চিত্র অঙ্কন করেন তাহা অতীব শোচনীয়, বাস্তব অবস্থা হইতে ইহা অতিরঞ্জিতই ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার এই লেখার প্রেরণা প্রশংসনীয়—তিনি ভারত-বাসীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ও হিতাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে এই দেশের সামাজিক অবস্থা ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎগামী সমাজ হইতেও অনেক বেশী শোচনীয় এবং একমাত্র শিক্ষা-প্রসার দ্বারাই ইহার উন্নতি সম্ভব। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে তিনি যে পরিকল্পনা প্রদান করেন তাহা হইল সর্বসাধারণের মধ্যে এদেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারদ্বারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া

বার্ক, গ্রাণ্ট প্রমুখ ভারত-হিতৈষীদের মত ও প্রচেষ্টা

অধিকতর বুদ্ধি, অর্থ ও আগ্রহযুক্ত এদেশীয়গণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার। উইলবারফোর্স মানবপ্রেমী ও দাসপ্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লিয়ামেণ্টে নির্বাচিত হন। তিনি ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নূতন সনদের মঞ্জুরীর কালে পার্লামেণ্টে এই সিদ্ধান্তটি মঞ্জুর করাইয়া লইলেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি ও নৈতিক চেতনার উন্নতি করা হউক। ডিরেক্টারগণ এই সিদ্ধান্তটি ভালো চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহারা ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করিলে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে না—তাহা ছাড়া তাঁহারা ভারতে শিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির অভাব নাই ; হিন্দুদের মধ্যে নূতন ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ফলে গ্রাণ্ট ও উইলবারফোর্সের প্রচেষ্টা পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী হারায়। কিন্তু ইহা শিক্ষা-আন্দোলনের ইন্ধন জোগায়। কোম্পানীর অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে লর্ড মিণ্টো অন্যতম। তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ কার্য করেন। তিনি প্রাচ্য-বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহার কার্য-বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে এদেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে ; অনেক মূল্যবান পুঁথি-পত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যাও বিরল হইতেছে। সরকার হইতে এদেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন। যে, ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সাম্রাজ্যের অংশরূপে এদেশের মহৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান এই ভাবে ধ্বংস হইতে দিলে তাহা অপেক্ষা দুঃখজনক কিছু নাই।

উইলবারফোর্স-এর চেষ্টায় কোম্পানীর সনদে শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ

লর্ড মিণ্টো প্রভৃতির প্রাচ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ

নানা আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্বিবেচনা কালে ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার আলোচিত হইয়াছিল।*

ঐ আলোচনায় দুই মতের সৃষ্টি হয়। একটি মত হইতেছে পূর্বোল্লিখিত গ্রাণ্টের অনুরূপ; তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডীয় শিক্ষা ও খৃষ্টধর্মের প্রসার সাধনই কল্যাণকর। অন্য মতটি হইল লর্ড মিণ্টোর মতের অনুরূপ। অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার সাধনে উৎসাহিত করিলেই সে দেশের কল্যাণ হইবে। উভয় পক্ষই উভয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ চালান। এই সময়ের কিছু পূর্বে ভেলোরে ছোটখাট সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। যদিও ইহা সামান্য ব্যাপার, তথাপি মিশনারী প্রচেষ্টার বিরোধী পক্ষ ইহাকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরেন ও ধর্ম-প্রচারকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। ইহা সত্ত্বেও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২১ জুলাই ১৩ নং সিদ্ধান্তে ঘোষিত হয় যে, ভারতের প্রজাবৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার দায়িত্ব ইংল্যাণ্ডের রহিয়াছে। এই জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা

ভারতীয়দের শিক্ষাবিষয়ে দুইটি ভিন্ন মত

*১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার।

That it is the duty of this country to promote the interest and happiness of the native inhabitants of British dominions in India, and such measures ought to be adopted as may find to the introduction among them of useful knowledge and of religious and moral improvement.

.........A sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India.

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষা প্রসারের জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের সুপারিশ একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। কারণ ভারতে শিক্ষার প্রসার রাষ্ট্রের দায়িত্ব—ইহা এই প্রথমেই ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ডেও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই নীতি স্বীকৃত য় নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ২০ হাজার পাউণ্ড ঐ দেশের শিক্ষা প্রসার ব্যয় করিবার নির্দেশ দেন।

সংস্কৃতি ও নৈতিক উন্নতি কামনায় যে দেশে যাইতে চাহিবেন, তাহাদিগকে আইনগত পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহার দ্বারা মিশনারীগণ শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের সুবিধা ও অধিকার লাভ করিলেন। ইহাদের বিরুদ্ধবাদীগণও একটি সুযোগলাভে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা উক্ত সনদে এই সিদ্ধান্তটুকু সংযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি সাধন, বিদ্বজ্জনের বিত্তান্বেষণে অনুপ্রেরণা দান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা প্রদানার্থ বার্ষিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। উক্ত সনদ দ্বারা ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব আইনগতভাবে স্বীকৃত হইল।

সিপাহী বিদ্রোহ মিশনারীদের কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি করেন

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ

ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে দায়িত্ব স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু উহার কর্মপন্থা লইয়া তিনটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ দেখা দিল। (১) ওয়ারেন হেষ্টিংস ও মিণ্টোর শিক্ষা সম্পর্কে মতবাদের সমর্থকরূপে একদল প্রাচীনপন্থী অফিসার আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান বিস্তারকেই কল্যাণকর মনে করিলেন। (২) মনরো, এলফিনষ্টোন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারকেই কল্যাণকর মনে করিলেন। (৩) গ্রাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম মতকে সমর্থন করিলেন—ইহারা ছিলেন প্রাচীনপন্থী। বোম্বাই প্রদেশের বিশিষ্ট অধিবাসীগণ দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিলেন। রামমোহন রায় প্রমুখ প্রগতিপন্থীগণ তৃতীয় মতের সমর্থক হইলেন। এই ভাবে তিনটি মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কোনও একটি মতবাদকে সমর্থন করার পরিবর্তে তিনটি মতকে সমান রূপে সমর্থন ও অসমর্থন করিতে লাগিলেন—ফলে শিক্ষা-বিস্তারের আইনগত দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত হইতেই অনেক বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম

প্রাচ্য শিক্ষার অনুকুল মত

দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকুল মত

শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপ্যাচে এমন এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যাহার ফল কিছুই হইল না। তাহাতে ঘোষিত হইল যে, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতির ন্যায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে সেগুলি হয়তো ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমমান-বিশিষ্ট নহে। কিন্তু ঐগুলির প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করিলে উভয় দেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইবে এবং তাহাতে এদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। তাই এদেশীয় পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত শিক্ষায় ইচ্ছুক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শিক্ষক হিসাবে উৎসাহজনক মাহিনায় নিয়োগ করা হউক। এই ভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের প্রস্তাব থাকিলেও শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রস্তাব থাকিলেও শিক্ষা-বিস্তারের কার্যে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কোন কাজ করা হয় নাই।

কোম্পানীর প্রথম মতের পোষকতা

প্রস্তাবটি কার্যকরী হয় নাই

কিন্তু ইতিমধ্যে কোম্পানী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শিক্ষা-বিস্তার দায়িত্বকে রূপায়িত করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীগণের মধ্যে লর্ড ময়রা* ও সার চার্লস মেটকাফের প্রচেষ্টা অন্যতম। লর্ড ময়রা গভর্নর-জেনারেল হিসাবে ১৮১৫ সালের ২রা অক্টোবর যে কার্য-বিবরণী লেখেন তাহাতে তিনি লিখেন যে, যদিও ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা

ইংলণ্ডে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল অভিমত

Lord Moira who later became Lord Hastings observed :

"I must think that the sum set apart by the Honourable Court for the advancement of science among the natives would be much more expediently applied in the improvement of schools than in gifts to seminaries of higher degree.

"The moral duties require encouragement and experiment. The arts which adorn and embellish life will follow in ordinary course, It is for the credit of British name that this beneficial revolution should rise under British sway. To be the source of blessings to the immense population of India is an ambition worthy of our country. The government never will be influenced by the erroneous position that to spread information among men is to render them less tractable and less submissive to authority."

করাই প্রাধান্য পাইবার যোগ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে শাসকরূপে শুধু ঐ কাজ করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না—এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়াও একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাইলে তাহারা স্বাধীনতা দাবী করিতে পারে অনেকের এই কুযুক্তির প্রত্যুত্তরে মেটকাফ* তাঁহার ১৮১৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের ডেসপ্যাচে লেখেন যে, ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনের পথেই ইংরাজগণ ভারত-শাসনের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার ও ভারতবাসীর শুভেচ্ছা পাইতে পারেন। ইহাদের এইরূপ উদারনীতির পশ্চাতে ইউরোপের অর্থাৎ ইংলণ্ডের উদারনীতি ক্রিয়াশীল ছিল। ইংল্যাণ্ডে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল—ঐ সময়ে ফ্যাক্টরী আইনের সংস্কার হইতেছিল—ভূমিদাসদিগকে মুক্তি দেওয়া হইতেছিল ও দাসত্ব-প্রথা রহিত করণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল। সুতরাং সে দেশে ভারতবাসীর প্রতি মানবীয় সহানুভূতির উদ্রেক ঘটানো সহজ ছিল ও তাহার ফলেই কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে ব্যয় করিতে সম্মত হইলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর জন্য জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন গঠন করিলেন। ঐ কমিটিতে প্রিন্সেপ, উইলসন প্রমুখ এদেশীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিগণ ছিলেন[১]। ঐ কমিটি সংস্কৃত আরবী

উদারনৈতিকগণের প্রভাব

Sir Charles Metcalfe observed :

"The world is governed by an irresistable power which gineth and taketh away dominion, and vain would be impotent Prudence of man against the operations of its Almighty influence. All that rulers can do is to merit dominion by promoting the happiness of those under them. If we perform our duty in this respect, the gratitude of India and the admiration of the world, will accompany our name through all ages, whatever may be revolutions of futurity ; but if we withhold blessings from our subjects from a selfish apprehension of possible danger at a remote period, we shall not deserve to keep our dominion. We shall merit that reverse which time has possibly in store for us, and shall fall with the mingled hatred and contempt, hisses and excretions of mankind."

(১) এই কমিটির সভাপতি হইলেন Dr. H. H. Wilson, তিনি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে বিরাট পণ্ডিত। সরকারী সাহায্য এক লক্ষ টাকা এই কমিটির হাতে শিক্ষা ব্যাপারে ব্যয় করিবার জন্য দেওয়া হইল। বস্তুতঃ পক্ষে ১৮২৩ সনের পূর্বে এই অর্থ উপযুক্ত ভাবে ব্যয় করা হয় নাই। কলিকাতার সরকারী কলেজসমূহ এবং চুচুড়া ও অন্যান্য স্থানের বিদ্যালয়গুলিও কমিটির অধীনস্থ করা হইল।

শিক্ষার অগ্রগতিতেই উৎসাহ দিলেন ও দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়কে পুনর্গঠিতকরণ, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আগ্রা ও দিল্লীতে দুইটি প্রাচ্যবিদ্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষার পুঁথি-পুস্তকের পুনর্মুদ্রন ও ইংরাজী পুস্তকসমূহ সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি কার্যগুলি সম্পন্ন করিলেন। কমিটি প্রাচ্যবিদ্যা বিস্তারের জন্য চেষ্টিত হইলে, সরকারী নির্দেশ স্পষ্ট না হইলেও অনুরূপ ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কথাও সরকারী নির্দেশে ছিল। পক্ষান্তরে কমিটির প্রাচ্য-শিক্ষার প্রতি এই অনুরাগ রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীয় প্রগতিপন্থী ব্যক্তিগণ সমর্থন করিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে ইহার পরিবর্তে ইংরাজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন দ্বারাই এ দেশের সত্যিকার উপকার হইবে।* কোম্পানীর

রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ

In a memorial to Lord Amherst, the then Governor-General, Raja Rammohon Roy wrote on the 11th December 1823 : "We find the government are establishing Sanskrit school under Hindu Pundits, to impart such knowledge as is current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to possessors or society."

He observed, "No improvement can be expected from inducing youngmen to consume a dozen of years of the more valuable periods of their lives acquiring the niceties of Byakarana or Sanskrit grammar.

Nor will youths be better fitted to be better members of society by the Vedanta Doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no real entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better, As the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

ডিরেক্টারগণও এই মতকে যথার্থ বলিয়া মনে করিতেন—তাঁহারাও জানিতেন যে প্রাচ্যশিক্ষা ফলপ্রসূ হইবে না। সংস্কৃত ও আরবীভাষার কাব্যমূল্য কিছু থাকিলেও ইহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবকাশ নাই বরং এই শিক্ষাদ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোর্ট অব ডিরেক্টার্স ১৮২৪ সনের ফেব্রুয়ারী তারিখের ডেসপ্যাচে বলেন যে কলিকাতা মাদ্রাসা ও বারাণসী সংস্কৃত কলেজ-সংসদ এবং কলিকাতার নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আগাগোড়া ভুল করিয়া করা হইয়াছে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, হিন্দু বা মুসলমানী শিক্ষার ব্যবস্থা নয়।

জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন অবশ্য নিজেদের কাজ অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে সাধারণ লোকেরাও তখনও বিদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে উৎসাহী নয়, অতএব প্রাচ্যবিদ্যা উন্নয়নের চেষ্টা তাঁহারা উপযুক্ত ভাবেই করিয়াছেন।

ডিরেক্টারদের প্রতিবাদের ফলে কমিটি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা ও আগ্রার মহাবিদ্যালয়ের সহিত ইংরাজী শিক্ষার শ্রেণীযুক্ত করিয়া সমালোচনা এড়াইতে চাহিলেন। দিল্লী ও বারাণসীর বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেই উক্ত আন্দোলনের সমাপ্তি হয় নাই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে পুণা সহরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ সালে পেশোয়ার রাজত্বের অবসান ঘটে। পেশোয়া বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতেন। ঐ খরচের পরিবর্ত হিসাবে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা-দীক্ষায় উৎসাহ দিবার মানসে এই মহাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হইল। এদিকে বোম্বেতে ১৮১৫ সনে Society for Promoting the education of the poor within the Government of Bombay" নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। ঐ সংস্থা স্থাপন করেন তদানীন্তন বোম্বের গভর্ণর Sir Evan Napier. পরে এই সংস্থাটি বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি নামে পরিচিত হয়। এই সংস্থা ১৮১৫ সনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করে, তাহা ইউরোপীয় শিশুদের জন্য, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের কয়েকজন দেশীয় শিশু ইংরাজী শিক্ষার লোভে ভর্তি হয়। পরে ১৮১৮ সনে

পুণা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এই এডুকেশন সোসাইটি 'গিরগাম' 'মাজাগাও' প্রভৃতি দুর্গে দেশীয় বালকদের বিদ্যালয় স্থাপন করে। সেখানে ইংরাজী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দান করা হইত এবং এই বিদ্যালয়সমূহে বহু দেশীয় ছাত্র বিনা দ্বিধায় পড়াশুনা করিত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বোম্বের গভর্ণর এলফিনষ্টোনের অনুপ্রেরণায় 'বম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী' নেটিভ স্কুল এ্যাণ্ড স্মল বুক নামে একটি বিশেষ কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। উহার উদ্দেশ্য ছিল—(১) আঞ্চলিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-দান পদ্ধতির উন্নতি সাধন। (২) পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, (৩) জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি, (৪) ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। (৫) আঞ্চলিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা এবং (৬) ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যের জ্ঞানার্জনের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণকে উক্ত কার্যে উৎসাহী করা। এলফিনষ্টোনের মতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে আঞ্চলিক ভাষা-ই প্রধান ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্যরূপেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন সাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিস্তার মাতৃভাষায় ঘটাইলে তাহাদের মধ্যে অধিক আগ্রহীগণ ঐ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের প্রেরণাতে ইংরাজী শিখিবে। কিন্তু গভর্ণরের পরিষদের অন্যতম সভ্য ওয়ার্ডেন তাঁহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট ধরণের ইউরোপীয় জ্ঞান স্বল্প-সংখ্যক এর মধ্যে বিস্তার করিলে ঐ ব্যক্তিগণ আঞ্চলিক ভাষায় উক্ত জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিতে পারিবেন।

এলফিনষ্টোনের মতামত ও প্রচেষ্টা

ওয়ার্ডসের ভিন্ন মত

এই মত-পার্থক্যের জন্য ডিরেক্টারগণ কর্তৃক এলফিনষ্টোনের সকল কর্মপন্থা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা উক্ত নেটিভ এডুকেশন কমিটীর হাতেই প্রদেশের ভার প্রদান করেন ও স্কুলের পুস্তক প্রকাশের জন্য বার্ষিক ৬০০৲ সাহায্য মঞ্জুর করেন। নিজ পরিকল্পনাকে এইভাবে খর্বিত হইতে দেখিয়া এলফিনষ্টোন দুঃখ প্রকাশ করেন। এলফিনষ্টোনের পরিচালনাধীনে সিন্ধু ব্যতীত সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে একটি শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পরিচালিত হয়। উহা হইতে জানা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রদেশে ১৭০৫টি বিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৫১৪৩ জন ছাত্র ছিল। উক্ত অঞ্চলের লোক

সংখ্যা অনধিক ৪৭ লক্ষ ছিল। অবশ্য এই পরিসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইতিপূর্বে অন্য তথ্যাদি হইতে গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদের সভ্য প্রেণ্ডার গ্যাস্ট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশের প্রতি গ্রামে এক বা একাধিক বিদ্যালয় ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত পরিসংখ্যানের সময় স্থানীয় উৎসাহে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ঠিকমত গণনা করা হয় নাই।

বোম্বাইয়ে শিক্ষার পরিসংখ্যানলব্ধ তথ্যাবলী

মাদ্রাজে স্যার মনরো কর্তৃক ১৮২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একটি শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সেই মত অধীনস্থ কালেক্টার-দিগকে নিজ নিজ জেলায় বিদ্যালয়সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা জোগাড় করিতে বলিলে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জানা গেল যে ১২,৪৯৮ বিদ্যালয়ে ১,৮৮,৬৫০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। কিন্তু মনরোর মতে এই সংখ্যাগুলি প্রামাণ্য নহে, কারণ গ্রাম্য-বিদ্যালয় ছাড়াও গৃহস্থের ঘরে যে অধ্যয়ন ব্যবস্থা সেকালে ছিল উহার সংখ্যা ঠিকমত গণনা করা হয় নাই। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ঐ প্রদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপ্তি ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা কম হইলেও ইউরোপীয় দেশের কয়েক বৎসর পূর্বের অবস্থার তুলনায় অধিক ছিল। বেলারী জেলার সম্বন্ধে যে তথ্য প্রদত্ত হয় তাহাতে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা প্রদেশ-এর তুলনায় কম দেখানো হয়। মনরো মনে করেন যে, গৃহস্থ বিদ্যালয়গুলি গণনা না করার ফলেই উহা হইয়াছে। কানাড়া জেলার কালেক্টার সংখ্যা গণনা হইতে বিরত হন এবং এইরূপ মন্তব্য করেন যে, এই জেলার শিক্ষা-ব্যবস্থা অধিকাংশই গৃহস্থের ঘরোয়া ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়—অতএব এইরূপ পরিসংখ্যান সাহায্যে সঠিক কিছু জানা অসম্ভব। এই পরিসংখ্যান হইতে অনেকগুলি তথ্য জানা যায়। তাহার মধ্যে গৃহস্থ বিদ্যালয় অন্যতম। ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত গৃহস্থগণ নিজ গৃহের সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহস্থের অন্তর্গত রাখিতেন—সাধারণতঃ নিজেদের বা বৃত্তিপ্রাপ্ত পণ্ডিতদ্বারা এরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। মনরো উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বে জানিতেন না বলিয়া ঐ সংখ্যা গণনার নির্দেশ দেন নাই। এজন্য অনেক কালেক্টার উহা গণনার বহির্ভূত রাখিয়াছিলেন। কালেক্টারগণের মধ্যে বেলারীর ক্যাম্পবেল সাহেব বিদ্যালয়গুলির কার্য-

মনরোর শিক্ষা-পরিসংখ্যা

প্রণালী ও পাঠ্যসূচীর পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ইহার স্বল্পব্যয়ী সুব্যবস্থার প্রশংসা করেন এবং সর্দার পোড়োদের সাহায্যে প্রথম শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মনিটার পদ্ধতি—যাহা ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছিল—তাহা এই সর্দার পোড়ো-পদ্ধতি হইতেই জন্মলাভ করে। সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, উপযুক্ত পুস্তক ও সুশিক্ষকের অভাবই বিদ্যালয়সমূহের প্রধান ত্রুটি। তাই

মনরোর প্রস্তাবাবলী

১৮২৬ সালের ১৪ই মার্চ মনরো যে প্রস্তাবগুলি করেন উহাদের মধ্যে এই দুইটি বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাদ্রাজ স্কুলবুক সোসাইটী উপরোক্ত দুইটি কার্য করিতেছিলেন, তাই মনরো উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উক্ত কার্য সম্পাদন বাবদ প্রতি মাসে ৭০০৲ সাহায্য মঞ্জুর করেন। ইহা ব্যতীত তিনি প্রতি কালেক্টরেট বা জেলায় একটি করিয়া ভাল হিন্দু ও একটি করিয়া মুসলমান বিদ্যালয়কে উন্নত করার জন্য মাসিক ১৫৲ হিসাবে সাহায্য ও প্রতি তহশীলে একটি করিয়া ভাল বিদ্যালয় গড়িয়া উঠার জন্য মাসিক ৯৲ হিসাবে সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এইভাবে ২০টি কালেক্টরেটে ২০ × ১৫৲ × ২ = ৬০০৲ ও ৩০০টি তহশীলে ৩০০ × ৯৲ = ২৭০০৲ এবং স্কুলবুক সোসাইটির সাহায্য ৭০০৲ মোট ৪০০০৲ মাসিক বা ৪৮০০০৲ বার্ষিক খরচের একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়া জানান যে, প্রথমেই ঐ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না—কারণ বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে এলফিনষ্টোন সাহেবও ঠিক অনুরূপ প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় বিদ্যালয়কে দিয়া শিক্ষাকার্য চালানো যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই—এই কারণেই ডিরেক্টারগণ তাঁহার অভিমত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে ডিরেক্টারগণ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মনরোর প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য

মনরোর পরবর্তীগণ কর্তৃক সুপারিসসমূহ অবহেলিত

গ্রহণ করেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মনরোর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পরবর্তীগণ তাঁহার মত সহানুভূতি ও কল্পনার অধিকারী না থাকায় পরিকল্পনার অগ্রগতি শ্লথ হইল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টারগণ উক্ত পরিকল্পনার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষাদানের সুযোগ ও সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয়ের মধ্যে উন্নত ধরণের শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সব উচ্চশিক্ষিত ও অধিক অবসর

উপভোগকারিগণ সরকারী কাজে অংশ লইতে পারিবেন এবং তাঁহারাই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার করিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা বাংলার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

সুতরাং মনরো যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা একেবারে বন্ধ না হইলেও ইহার পর হইতে তাহা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

বিশ বৎসরে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহের বিস্তার

তবে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কুড়ি বৎসরে কোম্পানী যে ক্রমশঃ শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি আগ্রহ দেখাইয়া ছিলেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী শিক্ষা ব্যাপারে কিঞ্চিদধিক ৫০০০ পাউণ্ড মাত্র ব্যয় করিয়াছিলেন—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যয় ৪৫ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতেই উক্ত সত্য প্রমাণিত হয়।

মিশনারী ও জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি

কোম্পানীর চেষ্টা ছাড়াও জনসাধারণের ও মিশনারী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টাও বিবেচনার যোগ্য। এদেশীয়গণের নিজ প্রচেষ্টায় অনেক বিদ্যালয় যে চালু ছিল এলফিনষ্টোন ও মনরো পরিচালিত পরিসংখ্যান হইতে তাহা ভালভাবে বুঝা যায়। কিন্তু এই শিক্ষালয়গুলি সরকার হইতে বিশেষ সাহায্য পায় নাই। নবদ্বীপের কিছু কিছু টোল ও দুই একটি মাদ্রাসা কিছু সরকারী সাহায্য পাইত বটে, কিন্তু ইহাকেই স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। সরকারী সাহায্য অভাবে স্থানীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা দিন দিন ধ্বংস পাইতেছিল।

সংগঠিত মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

মিশনারীগণ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার হইতে এদেশে শিক্ষা-প্রসার এর সুযোগ সুবিধা ও অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে অনেক মিশনারী সোসাইটী এদেশে শিক্ষা-বিস্তার কার্য পরিচালনা করেন। তাহাদের মধ্যে জেনারেল ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায়, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে চুঁচুড়া, বহরমপুর, ত্রিবাঙ্কুরের নেওর ও নাগের কলি, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে কাজ শুরু করেন। চার্টার মিশনারী সোসাইটী কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ শাখা স্থাপন

করিয়াছিলেন ও কলিকাতা শাখার অধীনে বর্ধমান, আগ্রা, মিরাট, বারাণসী, জৌনপুর, আজমগড় প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। বোম্বাই শাখার কাজ মাত্র নাসিকে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মাদ্রাজের তিন্নিভেলী অঞ্চলে তাহারা ১০৭টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ওয়েসলিন মিশন প্রধানতঃ মহীশূরের গুব্বি, ত্রিচিনোপল্লী ও মহীশূর অঞ্চলে কেন্দ্র করিয়াছিলেন। স্কচ মিশনারী সোসাইটী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন। তাঁহাদের অধীনে বোম্বাই-এ জন উইলসন (১৮২৯), কলিকাতায় আলেকজাণ্ডার ডাফ (১৮৩০) ও মাদ্রাজে জন এণ্ডারসন (১৮৩৭) শিক্ষাবিদ্ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রায় প্রতি মিশনকেন্দ্রে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ চলিত। কিন্তু শিক্ষা প্রসারই মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল না—তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম প্রচার। এই জন্যই তাহারা স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর কর্মচারীদের মত দেশীয় ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখান নাই এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম যুগে ইহারা ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন নাই। ডাফ সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ইংরাজী শিক্ষালয় স্থাপন করেন ও মিশনারীগণকে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেন। ইহার পর মিশনারী পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।

দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রচেষ্টা ও কার্য

মিশনারী প্রচেষ্টা ছাড়াও এদেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এইযুগে শিক্ষা বিস্তারের কার্যে অগ্রসর হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে একটি সংস্থা গঠিত হয় ও উক্ত সংস্থা এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য একটি ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক্ সোসাইটী ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু সরকারী অর্থ-সাহায্য পাইত।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা-প্রসার কার্যে কোম্পানী অথবা মিশনারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা অগ্রসরশীল ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের চার্চ্চের কয়েক জন সভ্য বোম্বাইএর বাসিন্দা ছিলেন ও তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশীয় নারীর গর্ভে যে সব ইউরোপীয়দের সন্তান

জন্ম লাভ করিয়া এদেশেই পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিত ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আগত নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গগণ এদেশেই বসবাস করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের সন্তানদের শিক্ষা ও ধর্ম-শিক্ষার জন্য বোম্বে এডুকেশন সোসাইটী গঠন করেন। তাহারা রেভাঃ রিচার্ড কোং কর্তৃক ১৭১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন ও অনুরূপ বিদ্যালয় চালু করেন। এঁদের বিদ্যালয়ে ভারতীয়দের সন্তানদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত এবং এলফিনষ্টোন এদেশীয়দের শিক্ষার প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা ভারতীয়দের শিক্ষাদানের উপযোগী পুস্তক তৈরী করা ও এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহকে সাহায্য করার ভারও গ্রহণ করেন। শেষোক্ত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠানটি দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া যায় ও দ্বিতীয়টি বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী এই নামে অভিহিত হইতে থাকে। ঐ প্রতিষ্ঠান ১৮২৩ সালে একটি সাব কমিটী গঠিত করিয়া শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা রচনার ভার দেন। সাব কমিটী ঠিক করেন যে, (১) পুস্তক প্রণয়ন, (২) ৬টি দেশীয় ভাষাভাষী শিক্ষককে শিক্ষা দান করা ও তাহাদিগকে দিয়া ৬টি মনিটোরিয়্যাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা ও (৩) ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় গঠন করা হইবে। কমিটী এই উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করে ও এই উদ্দেশ্যে পূর্বে আলোচিত স্মারক-পত্রটি রচিত হয়। এলফিনষ্টোনের চেষ্টাতে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী সরকারী সাহায্য পাইয়াছিল এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভালভাবে কাজ করিয়াছিল।

বোম্বে এডুকেশন সোসাইটী

বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটীর জন্মলাভ

অনেক ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, উহা পরে এলফিনষ্টোন স্কুল নামে খ্যাত হইয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদ্বারা পরিচালিত ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত হইতেছিল ও বোম্বাইয়ে আঞ্চলিক ভাষায় একটি কারীগরী ও একটি চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সোসাইটী বিভিন্ন জেলা ও থানায় ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন ও

এলফিনষ্টোন স্কুলে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনা

প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ সময়ের মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশী পুস্তক দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষার পুস্তকসমূহ লাভজনকভাবে বিক্রয় হইয়াছিল। বাংলাদেশে ঐ সময় সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহ অবিক্রীতই থাকিত। এইভাবে বোম্বাই প্রদেশ মাতৃভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথ দেখাইয়া ছিলেন; বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তখন এদেশে ইংরাজী বনাম সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষাদান লইয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্ভাবনার কথা ভালভাবে ভাবাও হয় নাই।

এ দেশীয় শিক্ষিতগণের চাকুরীর অধিকার লাভ

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী নূতন সনদ পাইলে ঐ উপলক্ষে যে ঘোষণা প্রচারিত হয় তাহাতে এদেশীয়গণ শিক্ষিত হইলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কোম্পানীর অধীনে চাকুরী লাভের অধিকারী হইবেন। দ্বিতীয়তঃ এই সনদে মিশনারীগণকে অবাধে ভারতে প্রবেশ করিবার অধিকারী করা হইল। তৃতীয়তঃ বাংলা প্রেসিডেন্সীর অধীনে অন্য প্রেসিডেন্সীদ্বয় স্থাপিত হইলে বাংলার গভর্ণর অন্য দুইটি প্রদেশের উপর আধিপত্যের অধিকার পাইলেন। ঐ গভর্ণরের আইন-সভ্য হিসাবে মেকলে সাহেব এদেশে আসিলেন এবং এই ব্যক্তির এদেশে আগমন নানাভাবে এদেশীয় শিক্ষা-জগতে স্মরণীয় হইয়া আছে। পরবর্তী বিবরণে তাহার প্রমাণ পাইব।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ভারতে কি ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে তাহা লইয়া তিনটি ভিন্ন মত ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই দেখা দিয়াছিল। এই মত তিনটির মধ্যে দুইটি মতই প্রাধান্য পায়। এই মত লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। একটি মত হইল সংস্কৃত ও আরবী ভাষার প্রচলন, ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন এবং ইহাদের শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রবর্তন করা। আরেকটির মাধ্যম হইল ইংরাজী ভাষা—ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন সাধন। শিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটীতে দশ জন সভ্য ছিলেন। তাহার মধ্যে এইচ্ টি. প্রিন্সেপ-এর নেতৃত্বে ৫ জন সভ্য প্রথমোক্ত মতটি সমর্থন করেন। এই মতের সমর্থনে ইহাদের যুক্তি এই যে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে উল্লিখিত আছে, "সাহিত্যের সংস্কার ও উন্নতি সাধন ও দেশীয় পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সাধনের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে" এবং সেখানে এই সাহিত্য কথাটির অর্থ সংস্কৃত ইত্যাদি এ দেশীয় সাহিত্যগুলিই বুঝাইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে যদিও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝানো যায়—কিন্তু এদেশীয়গণ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন তাই উহা সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার বিস্তার-কার্যে ব্যয়িত হওয়াই উচিত। ইহার বিপক্ষ দলটি এদেশীয় শিক্ষার ঘোরতর পরিপন্থী ছিলেন—তাঁহাদের ধারণায় এই শিক্ষা ছিল অন্তঃসারশূন্য। ইংরাজী শিক্ষাই যে উন্নতির এক-মাত্র উপায় তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কমিটীতে দুই পক্ষের সংখ্যা সমান হওয়ায় কোন্ মতটি গৃহীত হইবে ইহা ঠিক হইতেছিল না। প্রথম দলটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা এত দিন কলিকাতা মাদ্রাসা পরিচালনা ও আরবী সংস্কৃত পুস্তকাদি মুদ্রণে ঐ অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ইতিমধ্যে আবার রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীয়গণ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

শিক্ষার ধরণ ও মাধ্যম লইয়া তিনটি মত

এই সময় বড়লাটের পরিষদের আইন-সভ্য হিসাবে লর্ড মেকলে এদেশে আসিলে তাঁহাকেই ঐ কমিটীর সভাপতি করা হয়। মেকলে দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করেন। লর্ড মেকলে সভ্যদের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন নাই—কিন্তু বড়লাটের পরিষদ-সভ্য রূপে তিনি কমিটীর কার্য-বিবরণী দাখিল করেন এবং তিনি উহাতে প্রাচ্যশিক্ষা সমর্থনকারীদের কার্যের স্বতীব্র সমালোচনা করেন। * তিনি সাহিত্য বলিতে ইরাজী সাহিত্য এবং পণ্ডিত বলিতে ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিতদেরই উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে ১৮১৩ সালের ঐ সনদটির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন যাহাতে উহা ঐরূপ অর্থই প্রকাশ করে। প্রাচ্য-শিক্ষা সমর্থকগণ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পরাজয় আসন্ন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, যে প্রাচ্য-বিদ্যা-শিক্ষালয়গুলি তৈয়ারী হইয়াছে সেগুলি অন্ততঃ বিনষ্ট না হয়; বিশেষ করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। তাহার কারণ এইগুলির পশ্চাতে অনেক দান রহিয়াছে এবং উহা যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জনসাধারণ ক্ষুণ্ণ

মেকলের অভিমত ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বিরূপ ধারণা

* *Macaulay's Minute* :

"It seems to be the opinion of some gentlemen who compose the Committee of Public Instruction that the course which they have hitherto pursued was strictly prescribed by the British Parliament in 1813 and......if that opinion be correct, a legislative act will be necessary to warrant a change......It does not appear to me that the Act of Parliament can by any art of interpretation be made to bear the meaning which has been assigned to it. It contains nothing about the particular languages or Sciences which are to be studied. A sum set apart for the revival and promotion of literature, and the encourgement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of sciences among the inhabitants of British territories. It is argued, or rather taken for granted, that by literature Parliament can have meant only Arabic and Sanskrit literature, that they never would have given the honorable appellation of a 'learned native' to a native who was familiar with the poetry of Milton, the Metaphysics of Locke, and the Physics of Newton ; but they meant to designate by that name only such persons as might have studied in the sacred books of the Hindoos of the uses of CUSA GRASS and all the mysteries of absorption into the deity.

হইবে। কিন্তু মেকলে সাহেব ইহারও বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি এই মন্তব্য করেন যে সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার দ্বারা নানা ভ্রান্ত মত ও কুসংস্কারগুলিকে বদ্ধমূল করিতে সাহায্য করা হয়। এদেশীয় প্রচলিত ভাষাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত হইল যে এগুলি অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং উহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হইবার অযোগ্য। তিনি বলেন যে তিনি প্রাচ্য-ভাষা-সমূহ জানেন না, কিন্তু ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদসমূহ পড়িয়া দেখিয়াছেন এবং ঐ সব বিষয়সমূহে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মেকলে আরও বলেন যে ইউরোপীয় লাইব্রেরীর যে কোন একটি শেলফে ভারত ও আরবদেশের সমস্ত প্রাচ্যভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহ ধরিয়া যাইবে। অর্থাৎ মেকলে সাহেব প্রাচ্যভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যাল্পতা সম্পর্কে শ্লেষপূর্ণ উক্তি করেন।*

যদিও ইংরাজ সরকার ধর্ম ব্যাপারে নিরপেক্ষতা দেখাইবার পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি সুশিক্ষার খাতিরে সংস্কৃত আরবীর স্থলে ইংরাজী শিক্ষাই প্রচলিত করা কর্তব্য মনে করেন। অপরপক্ষে সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক ছাপানো হয় অথচ ইহা বিক্রয় হয় না, ইহা দেখাইয়া ইংরাজী পুস্তকসমূহের চাহিদা আছে তাহা মেকলে সাহেব প্রমাণ করেন। তাই প্রথম কার্যে অর্থ ব্যয় যে নিরর্থক তাহা বলেন। এদেশীয় আইন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থ সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই যুক্তি দেখান যে ঐ সকল ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহ যদি ইংরাজীতে অনুবাদ করানো হয় তাহা হইলে ঐ জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে লর্ড মেকলে Infiltration Theory প্রকাশ করেন।

মেকলের infiltration Theory

* *Macaulay's Minute*

"I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done what I could do to form a correct estimate of their value. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works. I have conversed both here and at home, with men distinguished by their proficiency in the English tongue. I am quite ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalist themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the Committee who support the oriental plan of education.

এই মতে এই বলা হয় যে, মুষ্টিমেয় সুযোগ সুবিধা ভোগকারী ও বুদ্ধিমানকে ভালভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা দান করিলে তাহা ক্রমশঃ নিম্ন-স্তরে ছড়াইয়া পড়িবে; যেমন জলের উপরিভাগে কোনও দ্রব্য ছড়াইয়া দিলে তাহা ধীরে ধীরে নিম্ন ভাগের জলেও মিশিয়া যায়। সেইরূপে শিক্ষিতের প্রভাব অশিক্ষিতের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িবে।

মুসলমানগণের কলিকাতা মাদ্রাসা সংরক্ষণ আন্দোলন

কিন্তু ইতিপূর্বে মেকলের মত ছড়াইয়া পড়ায় অনেক মুসলমান কলিকাতা মাদ্রাসা বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে আবেদন জানান। তাই বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক যদিও মেকলের মত স্বীকার করিয়া লইলেও অন্যান্য প্রাচ্য-বিদ্যায়তনগুলি বন্ধ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ঐ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছাত্রগণকে বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে না। ইহা ছাড়া কোনও পণ্ডিত বা মৌলভীর পদ শূন্য হইলে ইহার পুরণের যুক্তি-যুক্ততা বড়লাট বিচার করিয়া দেখিবেন। তিনি সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক মুদ্রণ ব্যাপারে ব্যয় হ্রাস করেন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষয় কার্যকরী করিবার ও কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবনের দায়িত্ব কমিটীর হস্তে প্রদান করেন।

মেকলের সমালোচনা

আমরা দেখিতে পাই লর্ড মেকলে এদেশের শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই যে তাঁহাকে ইংরাজী-শিক্ষা প্রবর্তক বলেন তাহা ভুল। তিনি এদেশে আগমনের পূর্বে ভারতে এই মতবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীয় ব্যক্তিগণ ইংরাজী-শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠেন এবং রাজা রামমোহন রায় তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেলের কাছে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য আবেদন জানান। তাহা দ্বারা প্রাচ্য বিদ্যাসমর্থক ও ইংরাজী ভাষা সমর্থকদের মধ্যে বহু দিন যাবৎ বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া ছিল। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবাসী ইংরাজীভাষা শিক্ষালাভের জন্য পূর্ব হইতেই উন্মুখ হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্বের ব্যাপারে ও সিদ্ধান্তের কার্যে তাঁহার ভূমিকা বেশ কিছুটা আকস্মিক। তবে তাঁহার বাক-চাতুর্য যে ঐ দ্বন্দ্বে অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা

প্রবর্তন এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে ইহা মনে করা চলে। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এলফিনষ্টোন কর্তৃক বোম্বাই প্রদেশে দেশীয় ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল উহাই ভাষা-দ্বন্দ্বের মীমাংসার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মেকলে এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে হীন চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি ঐ কারণেই সংস্কৃত ও আরবী ভাষাকে কুসংস্কারের ধারকরূপে দেখেন। তাঁহার অজ্ঞতা-প্রসূত এই উক্তি ও ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে বিজেতা-সুলভ দম্ভ প্রশংসনীয় মনে করি না। অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লর্ড মেকলেই দায়ী এবং তাঁহার প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষার ফলেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পুর্বেই বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, লর্ড মেকলে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে ছিলেন না। কিন্তু তবুও যদি তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে ভারতবাসী ইংরাজী শিক্ষা যদি নাও পাইতেন তাহা হইলেও তাহারা স্বধর্ম-অনুযায়ী ও সময়-অনুযায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু করিতেন। ইতিমধ্যে লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্যার জন এডাম বাংলাদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। তিনি এই কার্যে ১৮৩৫ হইতে ৩৮ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন ও তিনটি রিপোর্ট প্রদান করেন।

স্যার জন এডাম ছিলেন স্কটল্যাণ্ড হইতে আগত একজন ধর্মপ্রচারক। ১৮১৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুরস্থ মিশনারীদের সহিত কাজ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন ও রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

এডাম পরিচিতি

এডাম সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি এদেশের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। তিনি নিজে বার বার অনুরোধ করিয়া লর্ড বেন্টিঙ্ককে উক্ত কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিতে রাজী করান। এই পরিসংখ্যান সম্বন্ধে তাঁহার তিনটী রিপোর্ট তৎকালীন এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি আলোকপাত করিয়াছে।

এডামের প্রথম রিপোর্ট

প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত এডামের রিপোর্টটির পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্যরূপে গণ্য করা যায় না। তাঁহার রিপোর্ট হইতে জানা যায়

যে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল। তখন ঐ প্রদেশ দুইটিতে লোকসংখ্যা ৪ কোটির অধিক ছিল না। সুতরাং হিসাবমত দেখা যায় যে প্রতি ৪০০ জন লোকের জন্য গড়ে একটি বিদ্যালয় ও প্রায় প্রতি গ্রামে একটি করিয়া বিদ্যালয় থাকিবার কথা। মনে হয় ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু এডাম সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন যে, ঐ বিদ্যালয়-সংখ্যার মধ্যে সাধারণ পরিচালিত ও গৃহপরিচালিত শিক্ষালয়গুলির সংখ্যা ধরা হইয়াছে। এই দুই ধরণের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পার্থক্য ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষাদানের জন্যই পরিচালনা করেন। বিদ্যালয় সংখ্যা গণনায় এগুলির সংখ্যা সাধারণতঃ ধরা হয় না, কিন্তু বিদ্যালয় হিসাবে এগুলিও গণনার যোগ্য।

এডামের প্রথম শিক্ষা-পরিসংখ্যান তথ্যাবলী

প্রথম রিপোর্টটির পরে স্যার জন এডাম তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রদান করেন। তিনি রাজসাহী জেলার নাটোর থানার মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও সংখ্যা গণনা করেন। ঐ থানার গ্রামসংখ্যা ৪৮৫ ও লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৫,২৯৬। ঐ অঞ্চলে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২৬২ জন ছাত্র পড়ে। অথচ দেখা যায় যে ২৩৮টি গ্রামের ১,৫৮৮টি পরিবার তাহাদের ২,৩৮২ জন শিশুর জন্য গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ৩৮টি টোলে ৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। সমগ্র অঞ্চলে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ৬,১২১।

এডামের দ্বিতীয় শিক্ষা পরিসংখ্যান তথ্যাবলী

এডাম সাহেবের তৃতীয় রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার প্রথম অংশে তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলায় যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন তাহা তিনি বিবরণীতে প্রকাশ করেন। তাঁহার ঐ পরিসংখ্যানের মধ্যে ৮ রকমের বিদ্যালয়ের কথা বলা হইয়াছে। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী নূতন ও প্রাচীন, ও ইংরাজী এবং বালিকা বিদ্যালয়। ঐ সব বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২,৫৬৭, তাহার মধ্যে বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৯৯টি। মোট ছাত্রসংখ্যা ৩০,৯১৫ জন। এই সংখ্যায় গৃহস্থ বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্রসংখ্যা ধরা হয় নাই। তিনি পৃথকভাবে ঐ সব জেলার একটি করিয়া থানার গার্হস্থ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং মুর্শিদাবাদ সহরে ঐ ধরণের বিদ্যালয় সংখ্যা গণনা করেন। ইহাতে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত

দুইটি রিপোর্টের সামঞ্জস্য

অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৯৬,৯৭৪ এবং গার্হস্থ্য ও সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ২,১২০। অতএব প্রতি ২৫০ জনের গড়ে এক একটি বিদ্যালয় দাঁড়ায়। ইহাতে এডাম সাহেবের প্রথম রিপোর্টকে ভিত্তিহীন বলা চলে না। অবশ্য ছাত্রসংখ্যা বিচারে দেখা যায় বিদ্যালয়ের তুলনায় তাহা খুবই কম, মাত্র ৬, ৭৮৬ জন। ইহার কারণ গার্হস্থ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সর্বসমেত খুব কম-ই হইত।

এডাম সাহেবই সর্বপ্রথম এ দেশের বয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষিতের হার বাহির করেন। তিনি শিক্ষার পরিমাণ হিসাবে ছয়টি শ্রেণীতে উহা বিভক্ত করেন এবং ঐ পরিসংখ্যান গ্রহণ করেন। তাঁহার অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রায় ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২১,৯১১ জন সাক্ষর-ব্যক্তি ছিল।

এডাম রিপোর্টে বয়স্ক শিক্ষার তথ্য

উক্ত পরিসংখ্যান হইতে প্রধানতঃ দুই রকমের বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়। একটি ছিল প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য ও অন্যটি উন্নততর জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যালয়। হিন্দুদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের বিদ্যালয় ছিল টোলে এবং মুসলমানদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের স্থান ছিল মাদ্রাসায়। এই জ্ঞানের মাধ্যম ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী। এই উভয় ধরণের বিদ্যালয়ই শাসক, ধনী ও জমিদার শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিত। এই ধরণের শিক্ষালয়গুলির শিক্ষক উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষাদানে পটু ছিলেন। সাধারণতঃ এই শিক্ষালয়গুলির নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল না। শিক্ষকের গৃহে, ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে অথবা মন্দির ও মস্‌জিদে বিদ্যালয় বসিত। শিক্ষাকাল সুনির্দিষ্ট ছিল না। শিক্ষা সাধারণতঃ অবৈতনিক ছিল।

দুই ধরণের বিদ্যালয়ের কথা

শিক্ষকগণ অর্থপ্রাপ্তি অপেক্ষা ধর্মীয় প্রেরণা হইতেই শিক্ষকতা করিতেন। শিক্ষা তো অবৈতনিকই ছিল-ই, আবার অনেক সময় শিক্ষক নিজ ব্যয়ে ছাত্রদের আহার ইত্যাদি জোগাইতেন। শিক্ষকগণ শাসকদের নিকট হইতে ভূমি, ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে নিয়মিত অর্থসাহায্য এবং সাধারণ গৃহস্থদের নিকট শ্রদ্ধার দান পাইতেন। হিন্দুদের টোলগুলিতে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রগণই পড়াশুনা করিত, কিন্তু মাদ্রাসায় অনেক সময় হিন্দুছাত্রও

বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও শিক্ষকের বেতন-সংক্রান্ত তথ্য

অধ্যয়ন করিত। বাংলার কয়েকটি জেলায় পার্শী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই হিন্দু দেখা গিয়াছিল। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান আধুনিক কলেজসমূহের মত। হিন্দু ও মুসলমানী উচ্চ-শিক্ষার সাধারণ দুর্বলতা ছিল—গোঁড়ামি ও একদেশদর্শিতা, তাই সমাজেও ঐ দোষ বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধরণের শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও মক্তব ছিল। এখানে প্রাথমিক ধরণের লেখাপড়া এবং লিখিত ও মৌখিক গণিত শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার শিক্ষকগণ সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন—অনেকের শিক্ষা ছিল নিম্নস্তরের। পাঠশালার আয় ছিল খুবই স্বল্প। এই জন্যই ইহাদিগকে কৃষি-ব্যবসায় বা অন্য কোনও দ্বিতীয় বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইত। ছাত্রদের মাহিনা ধরা-বাঁধা ছিল না—তবে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নগদ অর্থ অথবা দ্রব্য-সামগ্রী দিত। উচ্চ বর্ণের ছাত্রসংখ্যা বেশী ছিল বটে, কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী ও কৃষক সন্তান পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতে দেখা যায়। পাঠশালায় কিছু সংখ্যক বালিকাও অধ্যয়ন করিতে যাইত। সাধারণতঃ কোনও লোকের বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে অথবা শিক্ষকের গৃহে পাঠশালা হইত এবং সময়সূচী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারিত হইত। ভর্তির কোন নির্ধারিত সময় ছিল না ও শ্রেণী-বিভাগও ছিল না—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। সর্দারপোড়োগণ প্রথম প্রবেশকারীদের শিক্ষায় সাহায্য করিত। ভারতের এই ব্যবস্থা হইতেই ইংল্যাণ্ডে মনিটার-প্রথা প্রবর্তন করেন। ছাপানো পুস্তক ছিল না—লেখার জন্য তালপাতা প্রভৃতি পত্র, খাগের কলম, কাঠকয়লা হইতে প্রস্তুত কালি, শ্লেট ও শ্লেট-পেন্সিল ব্যবহৃত হইত। স্বল্পব্যয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার ত্রুটির মধ্যে শিক্ষাক্রমের স্বল্পতা, কঠোর শাস্তিদান-প্রথা এবং হরিজন সন্তানদের প্রবেশাধিকারে বাধাই প্রধান। শিক্ষকগণের আর্থিক অনটন অপর একটি দোষ যাহার ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাব ঘটিত। এই যুগে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই লেখা পড়া জানিত, কিন্তু নিম্নতর বর্ণের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব অল্পই ছিল। হরিজনদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক ছিল না

বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান

বিদ্যালয় পরিচালনা বিষয়ের তথ্য

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কোম্পানীর যুগের শাসন-ব্যবস্থা এদেশের শিক্ষাসম্পদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং অন্যান্য অশান্তির প্রকোপ হেতু দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত লোপ পাইতেছিল।

এডামের অভিমতসমূহ

এডাম তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি পরিবেশনান্তে এই অভিমত পোষণ করেন যে, এ দেশীর শিক্ষা-ব্যবস্থাই এ দেশীয়গণের উন্নতির প্রধান ব্যবস্থা। সুতরাং ঐ ব্যবস্থারই উন্নতি সাধন করিয়া এ দেশের শিক্ষা ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সাধন সম্ভব। এজন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য—

(১) প্রথমে এক বা একাধিক জেলাকে পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হউক।

(২) ঐ জেলা বা জেলাগুলিতে এডামের পন্থায় নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হউক।

(৩) বর্তমান ভারতীয় ভাষায় শিক্ষক ও ছাত্রের ব্যবহারের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করা হউক।

(৪) প্রতি জেলায় একজন প্রধান কার্য-পরিচালক ও পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন—তিনি নিজ জেলায় অনুসন্ধান কার্য চালাইবেন, পুস্তকসমূহ শিক্ষকদের নিকট প্রচার করিবেন ও তাহার ব্যবহার শিখাইবেন—পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং পারিতোষক ইত্যাদি বিতরণ করিবেন। ইনিই জেলার শিক্ষা পরিচালনার রূপায়নে দায়ী হইবেন।

(৫) শিক্ষকদের মধ্যে পুস্তকাদি বিতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে উৎসাহ দিতে হইবে এবং যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাঁহারা পারিতোষকাদি পাইবেন। শিক্ষকদিগকে পড়িবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে নর্মাল বিদ্যালয় খুলিয়া ছুটীর সময়ে বছরে ২।৩ মাস উহাতে পড়িয়া তাঁহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।

(৬) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা ও কৃতকার্যদিগকে পারিতোষকাদি দিয়া উৎসাহ সঞ্চার করা কর্তব্য।

(৭) এডাম শিক্ষকদিগকে নিজ বিদ্যালয়ের এলাকাবর্তী গ্রামে বসবাস করিতে উৎসাহী করার জন্য তাহাদিগকে ভূমি দান করার প্রস্তাব করেন ও সরকার কি ভাবে ঐ জন্য ভূমি সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার পরিকল্পনাও প্রদান করেন।

এডামের রিপোর্টগুলিতে এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপযুক্ত দৃষ্টির পরিচয় জানিতে পারা যায়। এদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি উন্নয়নে এডামের সিদ্ধান্তগুলি সামান্য পরিবর্তিত করিলে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হইতে পারিত। কিন্তু মেকলে সাহেব এই সকল সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। তিনি এডামকে পরিসংখ্যান সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন নাই এবং ঐ সকল রিপোর্ট সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন তাহাতে পরোক্ষভাবে উহাকে বাতিলই বলা চলে। তৎকালীন শিক্ষকগণের অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও সংকীর্ণ জ্ঞানের পরিসর যে বৃদ্ধি করা ও সংস্কার করা যায় তাহা মেকলে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বরং অযোগ্য শিক্ষকগণকে তাড়াইবার জন্য উচ্চ ইংরেজী জ্ঞান-সম্পন্ন বৃত্তিধারী নূতন শিক্ষকদের চাহিদা বাড়াইতে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের একটি পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই মন্তব্যসহ রিপোর্টটি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এডামের কার্যসমূহের মৌখিক প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রিপোর্টগুলি মঞ্জুর করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, এডামের সুপারিশসমূহের অনুরূপ কার্য বোম্বাইয়ে অনুসৃত হইতেছে। সুতরাং তাহার ফলাফল দৃষ্ট হইবার পূর্বে ঐ সুপারিশসমূহ গ্রহণ না করিয়া বাংলার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালাইয়া যাওয়াই উচিত। ইতিমধ্যে বোম্বাইএর নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী শিক্ষকগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে অনুপ্রেরণা প্রদান করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ কার্যকরী হইতেছে তাহা তিনি জানার প্রস্তাব করেন। এই ভাবে এডামের এর প্রস্তাবগুলি এক পার্শ্বে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে থমাসন কর্তৃক এডাম সাহেবের অনুরূপ পদ্ধতিতে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষোন্নতি প্রচেষ্টা কার্যকরী করা হয়।

এডামের রিপোর্টের সমালোচনা

রিপোর্টের ফলাফল

ইহার পর ১৮৪০ হইতে ১৮৫৩ মধ্যে বাংলার শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কমিটী অফ্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের পরিবর্তে কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠন ও ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সরকারী কার্যে নিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা। উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে

কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন-এর পরিবর্তে কাউনসিল অফ পাবলিক এডুকেসন গঠন

এমন কি ছোট খাট চাকুরীতেও শিক্ষিতগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব দেন—তাহা ডিরেক্টারগণ কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়। ১৮৫৪ সালের মধ্যে কাউন্সিল অব এডুকেশন ১৫১টি শিক্ষালয় পরিচালনা করেন। শিক্ষালয়গুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩, ১৬৩। ইংরাজী শিক্ষার উপরই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

ইতিমধ্যে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটীর কার্যপদ্ধতি নূতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদান বুঝিয়া ছিলেন। তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় লেখাপড়া গণিত ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান, বীজগণিত, জ্যামিতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এগুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় আখ্যা না দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। এই এডুকেশন সোসাইটী দ্বারা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১৫টি এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া বোম্বাই, থানা, পান্বল ও পুনাতে ৪টি ইংরাজী বিদ্যালয় তাহারা স্থাপন করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত ছিল এইরূপ যে, এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের উপযুক্ত বাহন মাতৃভাষা—বিদেশী ইংরাজী ভাষা দ্বারা ইহা সম্ভব নহে।

বোম্বাই নেটিভ এডুকেশন বোর্ডের কাজ

বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী-এর সাহায্য ছাড়া বোম্বাই প্রদেশে সরকার কর্তৃক ১৮৩৭ সালের পুনা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে একটি মারাঠী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহাতে ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য শ্রেণীর ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। বোম্বেতেও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৭ খৃঃ এলফিনষ্টোন অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্মৃতি হিসাবে এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউট গঠিত হয় এবং কোম্পানী তাহাতে অর্থ সাহায্য করেন। কোম্পানীর তরফ হইতে পুরন্দর তালুকে ৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এসিস্ট্যান্ট কালেক্টার সটরীড এর নির্দেশে ঐগুলি স্থাপিত হয়। শিক্ষকদের মাসিক বেতন ৩৷৷০ হইতে ১৫৲, গড়ে ৪৷৷০ ছিল।

এলফিনষ্টোনের ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

বোম্বাই অঞ্চল সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তাঁহারা ইংরাজী, মাতৃভাষা ও সংস্কৃত এই তিনটী ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিয়াছিলেন—কিন্তু এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছিলেন যে মাতৃভাষাই শিক্ষা দ্বারাই সুষ্ঠুভাব সম্পাদিত হয়—ইহাই বাহন হওয়া উচিত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী উঠিয়া যায়। ইহার স্থলে ৩ জন সোসাইটী কর্তৃক নির্ধারিত সভ্য ও কোম্পানী কর্তৃক মনোনীত ৪ জন সভ্য মোট ৭ জন সভ্য মনোনীত বোর্ড অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ও এই সোসাইটির হাতে শিক্ষা সংক্রান্ত ভার প্রদান করা হয়। নেটিভ এডুকেশন বোর্ড মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের যে প্রচেষ্টা দেখাইয়াছিলেন তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহারা দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি বিধানের কোনও প্রচেষ্টা দেখান নাই।

শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার সাফল্য

বোর্ড স্থাপিত হইবার পরে বোম্বাই প্রদেশেও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হইবে না ইংরাজী হইবে ইহা লইয়া বোর্ডের সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কর্ণেল জারভিস ও তিন জন ভারতীয় সদস্য মাতৃভাষার স্বপক্ষে ও অন্য দুই জন ইউরোপীয় সদস্য ইংরাজীর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মতদ্বৈধতার ফলে মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

মাতৃভাষা উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃত হইল না

এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। দেশীয় শিক্ষালয়ে কোনও সাহায্য করা হয় নাই, পরন্তু মনরো কর্তৃক জেলায় ও তহশিলে যে স্কুলগুলি খোলা হইয়াছিল বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে সেগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটী নাম দিয়া একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খোলা হয়—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহার কলেজ বিভাগ খোলা হয়। তবে মিশনারীদের দ্বারা অনেকগুলি ইংরাজী বিদ্যালয় চলে বলিয়াই সরকারী নিরুদ্যমতার হ্রাস হয়। প্রদেশে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩০,০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০০০ ছাত্র ইংরাজী শিক্ষা অর্জন করিয়াছিল।

মাদ্রাজের হতাশাজনক অগ্রগতি

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যায় শিক্ষা-ব্যবস্থা বঙ্গীয় সরকারের হস্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারের হাতে গেলে

তাহারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের নীতি গ্রহণ করেন। ইহারা এডাম সাহেবের অভিমত গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহাতে সুফল ফলিতে দেখা যায় ও ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে উক্ত কার্যে থমাসন ও রীডের প্রশংসা করিয়া অন্যান্য প্রদেশকে ঐ প্রদেশের কার্য হইতে শিক্ষা লাভ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়।

উত্তর প্রদেশের অগ্রগতি

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয়। তখন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ তিন ধর্মের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের স্কুলে লেখাপড়া ও গণিত শেখানো হইত; অন্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ ধর্মীয় পুস্তকই পড়ান হইত, কিন্তু উহার অর্থ উপলব্ধি করার মতও জ্ঞান দেওয়া হইত না। তবে এই প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক অমৃতসর স্কুলটি খোলা হয়। উহাতে হিন্দী, ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত ও গুরুমুখী এই ৫টি বিভাগ ছিল। ঐ স্থানে ইংরাজী শিক্ষার ত ব্যবস্থা ছিলই, তাহা ছাড়া লেখা পড়া, গণিত, জ্যামিতি ও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৫৩ সালের মধ্যে আর কোনও বিদ্যালয় খোলা হয় নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। মিশনারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে খৃষ্টধর্ম প্রচার সহজ হইবে ও বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে মিশনারীদের সহিত কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে উদারনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মচারীদের অনেকের মনে ভারতীয়দের প্রতি মঙ্গলেচ্ছা বৃদ্ধি পায়। ইহাদের মনে এই ধারণাই ছিল যে, শিক্ষা-বিস্তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নহে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে দরিদ্রদের প্রতি করুণা। তাই শিক্ষা-বিস্তার কার্যকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য অপেক্ষা ধর্মীয় ও মানবীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম হিসাবেই দেখা হইত। এই কার্যে মিশনারীদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত হইত। তৃতীয়তঃ বেন্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তিতে এদেশে প্রবল ধর্মীয় বাধা না আসায় ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়ায় মিশনারীদের সহিত অন্তরঙ্গতা রক্ষায় রাজনৈতিক অসুবিধার ভয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। উপরোক্ত কারণগুলিই মিশনারীদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধির কারণ ছিল। বেসেল মিশন সোসাইটী (জার্মান) ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাজ আরম্ভ

পাঞ্জাবের অগ্রগতি

মিশনারী প্রচেষ্টার বৃদ্ধি

করিয়া কানাড়া ও মালয়ালম ও তৎ-সন্নিহিতস্থ স্থানগুলিতে কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে। জার্মানীর প্রোটেষ্টান্ট লুথারিয়ান সোসাইটীও ভারতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন। উইমেনস্ এসোসিয়েশন অফ এডুকেশন ও ফিমেলস্ ইন দি ওরিয়েণ্ট ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে যথেষ্ট কার্য করেন। আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট ইউনিয়ন, আমেরিকান বোর্ড চার্চ মিশনারী সোসাইটী প্রমুখ আমেরিকান মিশনারী আসাম, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কাজ শুরু করেন। এই ভাবে জার্মান ও আমেরিকান মিশনসমূহের কাজ এই সময়ে শুরু হয় ও প্রসার লাভ করে।

বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচয়

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ

পূর্বালোচনা

পূর্বের অধ্যায়গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যুগে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আন্তরিক ভাবে কোনও প্রচেষ্টা করে নাই। মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে প্রচেষ্টা করেন—তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ ছিল। খৃষ্টধর্ম প্রসারের নিমিত্ত জনসাধারণের মধ্যে তাঁহারা শিক্ষার প্রসার করেন। প্রথম দিকে মিশনারীগণের এই শিক্ষা-বিস্তার শাসক-সম্প্রদায় সুনজরে দেখেন নাই। তাঁহাদের ধারণা ছিল ইহাতে এদেশীয়গণ ইংরাজ শাসনের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবেন। তাহার পর পরবর্তী যুগে শাসক-সম্প্রদায় রাজ্যশাসনের নিমিত্ত কর্মচারী তৈরী করিবার জন্য এদেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিলেন ও মিশনারীদের এই বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠাও অগ্রগতি লাভ করে। মিশনারীগণের ইচ্ছা ছিল শিক্ষা-বিস্তার ক্ষেত্রে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হউক। সরকার ইহার বিরোধী ছিলেন; কারণ মিশনারীগণ তাহাতে ধর্মপ্রচারের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে পারেন, ফলে তাহা এদেশীয়গণের মনঃপুত না-ও হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাই উডের ডেস্‌প্যাচে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়া গ্রাণ্ট-ইন-এড পদ্ধতির সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ শাসক-সম্প্রদায়কে নূতন ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য করে। ফলে সরকারী শিক্ষালয়ের সংখ্যাই বাড়িতে থাকে। কিন্তু মিশনারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্যের উৎসাহ হ্রাস পায়। এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতে একটা নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। ইংরাজ রাজত্বকে তাহারা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা

উডের ডেসপাচ
গ্রাণ্ট-ইন-এড্ পদ্ধতি

রূপে মনে করিতে শুরু করে এবং ইংরাজী শিক্ষা-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, কারণ ইহার দ্বারাই তাহারা ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। ফলে ইহার পরবর্তী যুগে ভারতীয়দের নিজ প্রচেষ্টায় এদেশের শিক্ষা-বিস্তার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই অপর দুই প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টার তুলনায় নগণ্য হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভাবে ভারতীয় প্রচেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতীয় প্রচেষ্টার বৃদ্ধি

বলা বাহুল্য, মিশনারীগণ এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাঁহাদের পূর্ব প্রাধান্যের খর্বতা নীরবে গ্রহণ করেন নাই। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ইংল্যাণ্ডে যখন ভারতবর্ষে মিশনারী কার্যকলাপকে নিরুৎসাহিত করার জন্য জনমত গঠিত হইতেছিল, ঐ সময় ১৮৫৮ সনে চার্চ মিশনারী সোসাইটী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেন। (১) যেহেতু খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার দ্বারা এদেশীয়দের সত্যকার অগ্রগতি সম্ভব, সুতরাং সরকার কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচার দ্বারা এদেশের সত্যকার অগ্রগতির নিমিত্ত খৃষ্টধর্মীয় শিক্ষা-বিস্তারে অনুকূল মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। (২) সরকারী বিদ্যালয়েও বাইবেল শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। (৩) হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী ব্যয় বন্ধ করা উচিত। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইলেন। ১৮৫৮ সালে মহারাণী কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ঘোষিত হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া

ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ থাকে না, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীন হয়। এই সময় ইংলণ্ডেশ্বরী ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব লর্ড ষ্টানলি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাল করিয়া দেখিয়া একটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় ডেসপ্যাচ পাঠান। তিনি উডের ডেসপ্যাচের সঙ্গে একমত হইয়া উডের ডেসপ্যাচ সমর্থন করেন। মাত্র একটি বিষয়ে উডের ডেসপ্যাচের সঙ্গে লর্ড স্ট্যানলির মতদ্বৈধতা ছিল। উডের ডেসপ্যাচ প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় লোকদের সাহায্যে ও গ্র্যাণ্ট-ইন-এডের দ্বারা পরিচালনা করার সুপারিশ করেন। কিন্তু লর্ড স্ট্যানলি এই মতের

ষ্টানলির ডেসপ্যাচ

বিরোধিতা করিয়া বলেন যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে সরকারের উপর সাধারণ লোক আস্থা হারাইবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি সরকারের হাতে দিতে বলেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশমত শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন।*

ইহার পরবর্তী যুগে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ মিশনারীদিগকে গ্রাণ্ট-ইন এড দেওয়ার পরিবর্তে সরকারী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়েই বেশী

* Sir Charles Wood এবং Lord Stanleyর Education Despatch দুইটির সংক্ষিপ্ত সারাংশ Holwell রচনা করিয়াছেন। তাহা দিয়ে দেওয়া হইল।

Holwell's "Note on Education"

"The Indian Educational code is contained in the Despatches of the Home Government of 1854 and 1859. The main objective......... ... . is to divert the efforts of the Government from the education of the higher classes upon whom they had up to that date been too exclusively directed and to turn them to the wider diffusion of education among all classes of the people, and especially to the provision of Primary education for the masses. Such instruction is to be provided by the direct instrumentality of Govt. and a compulsory rate levied under the direct authority of Government is pointed out as the best means of obtaining funds for the purpose. The system must be extended upwards by the establishment of govt. schools as models to be superseded gradually by schools supported on the grant-in-aid principle. This principle is to be of perfect religious neutrality defined in regular rules adapted to the circumstances of each Province and clearly and publicly placed before the natives of India. ... ...

To provide masters, normal schools are to be established in each province, and moderate allowances given for the support of those who possess an aptness for Teaching and are willing to devote themselves to the profession of school masters... ... ...The medium of instruction is to be the vernacular languages of India, into which the best elementary treatises in English should be translated... ... ...the vernacular languages are on no account to be neglected, the English language may be taught where there is demand for it, but the English language is not to be substituted for the vernacular dialects of the country. The existing institutions for the study of classical languages of India are to be maintained and respect is to be paid to the hereditary veneration which they command. Female education is to receive the frank and cordial support of the government ... ... In addition to the government and aided colleges and schools for general education, special institutions for imparting special Education in Law, Medicine, Engineering, Art and Agriculture are to receive in every province the direct aid and encouragement of Government.

উদ্যোগ দেখাইলেন। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের পরে শিক্ষা বিভাগ মিশনারীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে ভীত হইলেন। বিশেষ করিয়া এদেশীয়গণের মধ্যে তখনও যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় নাই। ইহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা এবং মিশনারী প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অখৃষ্টান পরিদর্শকগণের সহিত মিশনারীদের সম্পর্ক ভাল ছিল না এবং তাঁহারা মিশনারী শিক্ষায়তনসমূহের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া সুনজরে দেখিলেন না। ইহার ফলে ব্যাসেল মিশনারী সোসাইটী প্রমুখ মিশনারী প্রতিষ্ঠান ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সরকারী আওতা হইতে মুক্ত হইয়া নিজস্ব ধারায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে শীঘ্রই তাহাদিগকে সরকারী বিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইল; এবং তাহার ফলে তাহাদের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল। সুতরাং স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পুনরায় মিশনারীগণ সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনার আওতায় আসিতে বাধ্য হইলেন। মিশনারীগণ এই অসুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হইয়া ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন শুরু করিলেন। তাঁহাদের অভিযোগ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচকে মোটেই কার্যকরী করা হইতেছে না।

উপরোক্ত আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত হইল। এই কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সিদ্ধান্তের ভার পাইলেন :—

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন

(১) ভারতীয় শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী বিদ্যালয়ের স্থান; (২) সরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার সম্পর্ক; (৩) ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের কার্যকলাপ।

To complete the system in each Presidency, a University is to be established on the model of the London university at each of the three presidency towns. These universities are not to be themselves places of education, but they are to test the value of education given elsewhere... ... ...Education is to be aided and supported by the principal officials in every district and is to receive besides, the direct encouragement of the state by the opening of government appointments to those who have received a good education, irrespective of the place or manner in which it may have been acquired and in the lower situations, by preferring a man who can read and write and is equally eligible in other respects, to one who cannot."

সরকারী বিদ্যালয়সমূহের কার্য সম্বন্ধে কমিশন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যেহেতু সরকারের আর্থিক সংস্থান কম এবং ভারতের শিক্ষা-ব্যাপারে করণীয় তুলনায় অত্যন্ত ব্যাপক, সেহেতু সরকারী সাহায্য দ্বারা জনসাধারণের প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকরী হইবে। সুতরাং সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া এবং সম্ভবমত স্থলে সরকারী শিক্ষায়তনের দায়িত্ব যোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়া জনসাধারণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান-ই সুবিবেচনার কার্য হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ভার জন-প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান যথা লোক্যাল বোর্ড; মিউনিসিপ্যালিটীর হাতে এবং মাধ্যমিক শিক্ষায়তনসমূহের ভার শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। অবশ্য এইরূপ যোগ্য প্রতিষ্ঠান না পাওয়া গেলেও বিদ্যায়তনগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হইবে না; কারণ তাহা হইলে বিদ্যায়তনগুলির ক্ষতি হইবে এবং জনসাধারণ মনে করিবে যে, সরকার শিক্ষা ব্যাপারে অনাগ্রহ হেতু দায়িত্ব এড়াইতেছেন। সুতরাং এই হস্তান্তর কার্য সুবিবেচনার সহিত করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যেন ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার সহিত উহা পরিচালনা করেন। নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের বা ব্যক্তি-বিশেষের উৎসাহকেই প্রাধান্য দিয়া গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তন করা হইবে। গ্রাণ্ট-ইন-এড ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ অথচ উৎসাহ-ব্যঞ্জক আইন প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। সাহায্য প্রাপ্তি ব্যাপারে আর্থিক পরিমাণ ও উহার প্রাপ্তির সময় সুনির্দিষ্ট থাকিবে এবং নিয়মিত সময়ে উহা প্রদান করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের যোগ্যতা ও সাহায্য লাভের সর্তাবলী নির্ণয়নে বিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিগণকেও সহযোগিতায় আহ্বান করিতে হইবে। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় শিক্ষক নিয়োগের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চল বা শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয়ে অধিকতর আর্থিক সুবিধা দিতে হইবে। বিদ্যালয় পরিচালন ও পাঠ্য নির্ণয়ন ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালকবর্গের প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদান করা হইবে। পদ-মর্যাদায় সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও সরকারী বিদ্যালয়ে বিভেদ দূর করিতে হইবে।

কমিশনের সিদ্ধান্ত

সরকারী বিদ্যায়তন সম্বন্ধে

বেসরকারী প্রচেষ্টার সাহায্য বিষয়ে

মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কথা বলা হয় যে, মিশনারী বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টায় আদর্শ স্থাপন ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারে সত্য, কিন্তু তবু তাহাদের প্রচেষ্টা অপেক্ষা স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টাই অধিকতর কাম্য বিবেচিত হওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা ভালো এবং সেই বিচারে ভাল মিশনারী বিদ্যালয় সাহায্য পাইবার যোগ্য। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ভার মিশনারীদের হস্তে প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হইবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী-প্রচেষ্টা অন্য সকল বেসরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা গৌণ হওয়া উচিত।

মিশনারী-পরিচালিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে

ধর্মশিক্ষা বিষয়ে কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি কোথাও বিদ্যালয়ে বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং উহাই সেই অঞ্চলের এক মাত্র বিদ্যালয় হয়, তবে অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ের ধর্ম-শিক্ষার শ্রেণীতে তাহাদের সন্তানগণকে যোগদান না করিতে দিলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। সরকার ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে নিরপেক্ষনীতিই মানিয়া চলিবেন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পরিমাপেই বিদ্যালয়ের যোগ্যতা বিচার করিবেন।

বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভার লোক্যাল বোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর হাতে প্রদান সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিলেন—কিন্তু ঐ হস্তান্তর কতকটা আইনগত ব্যাপার মাত্র—কারণ ঐ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ও কর্মচারীর প্রধান অংশ ছিল সরকারী এবং বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা মুখ্যতঃ সরকারী হাতেই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার ব্যাপার হইয়াছিল অন্য রকম। এই দুই স্তরের শিক্ষার সরকারী কর্তৃত্বের হস্তান্তর সম্পর্কে কমিশনের যে সুপারিশ ছিল, তাহা মোটেই কার্যকরী হয় নাই। সরকারের যুক্তি ছিল যে, কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মিশনারীদের হাতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু একথাও ঠিক যে এদেশীয়দের মধ্যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ছিল না, যাহাদের হস্তে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা যাইতে পারে।

কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ সরকার ও জনসাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করিলেন

এদিকে কমিশন যে গ্রাণ্ট-ইন-এড দ্বারা নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন, তাহা খুবই কার্যকরী হয়। দেশে ধীরে ধীরে শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি হইতেছিল এবং সরকারী-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল স্বল্প। ফলে জনসাধারণ স্বীয় প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। এদিকে মিশনারীগণ আর তাঁহাদের নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন না, কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে যে তাঁহারা ধর্মপ্রচার করিবেন, সেই উদ্দেশ্য তাঁহাদের ব্যাহত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেখা গেল যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এদেশীয় লোকদের প্রচেষ্টায়ই বেশী সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় অগ্রগতি লাভের আকাঙ্ক্ষাই এই সমস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাগণকে কার্যে প্রণোদিত করে। প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বেশীর ভাগ শিক্ষক হইতেন ইউরোপীয়, কারণ মনে করা হইত যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে এই দেশের শিক্ষকদের অপেক্ষা ইউরোপীয় শিক্ষকেরা বেশী কুশলী। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষকদিগকে ভারতীয় বিদ্যালয়ে নিয়োগ ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, কারণ তাঁহাদের মাহিনা ছিল খুব বেশী। কিন্তু শীঘ্রই দেশীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় শিক্ষার কাজে ব্রতী হইয়া আসেন। এমন কি তাঁহারা উচ্চ মাহিনার চাকুরীর সুযোগ ত্যাগ করিয়া দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্যার আর, পি, পরঞ্জপের নাম করা যাইতে পারে। এঁদের মত মহান্ শিক্ষাবিদ্গণ ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে স্বীয় স্বার্থজনিত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে দেশাত্মবোধের পরিচয় গিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগ বিগত ২০বৎসরের শিক্ষা-সম্পর্কিত অগ্রগতির হিসাব নিকাশ করেন। তাঁহারা শেষে এই মত প্রকাশ করেন যে, শিক্ষার বিস্তার করিতে যাইয়া শিক্ষার উৎকর্ষতার দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা অবহেলিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহারা শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইংলণ্ডেও এই সময়ে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিদানের জন্য আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। ইংলণ্ডের আন্দোলনের প্রতিফলন আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও দেখা গেল। ফলে

উৎকর্ষ বনাম বিস্তার প্রশ্ন

শিক্ষা-বিভাগ বে-সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার অধিকার নিয়ন্ত্রণ কি করিয়া করা যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতীয়গণ শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে চাহিলেন না। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিলেন যে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই তবে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিতে পারে। তাঁহারা আরও বলেন যে ইংলণ্ডে শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে, অতএব সেইখানে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় দূরের কথা নিম্নতম সংখ্যক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় নাই, সেইখানে উৎকর্ষতার প্রশ্ন একেবারেই উঠিতে পারে না। ভারতবর্ষে এখন বিস্তারের কার্যসূচীই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপভাবে 'শিক্ষা-বিস্তার ও উৎকর্ষতা' বিষয়ক দ্বন্দ্ব দেখা যাইতে লাগিল। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা তখনই হইল না। পরবর্তী কালে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে, ১৯১০-১২ খৃষ্টাব্দের মহামতি গোখেলের অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিলের পরে এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সিদ্ধান্তে এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখা গেল। পরবর্তী কালে হার্টগ কমিটির রিপোর্টেও শিক্ষার উৎকর্ষতা অবহেলা করিয়া উহার বিস্তার সাধন করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। উৎকর্ষতা বিষয়ে দৃষ্টিদান করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগ তথা সরকার, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ হস্তান্তরের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সেইগুলিকে আদর্শ বিদ্যালয় (Model School) রূপে রূপান্তরিত করিয়া বজায় রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে সরকার এই দেশীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে পূর্ণ সুযোগ প্রদান এবং সাহায্য-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির অনুসরণ করিতেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়। সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয় ৯ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এই অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় কয়েকটি সরকারী 'আদর্শ' বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য। বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম অর্থই ব্যয় হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য লর্ড কার্জন খুব বেশী মাত্রায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া

বলিয়াছেন যে ঐ সময়ে শিক্ষার বিস্তারও খুব বেশী হয় নাই, এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষতা বিশেষভাবে নিম্নগামী হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের পরই লর্ড-কার্জন শিক্ষাগত উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হন। এই কারণেই লর্ড কার্জন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে শিক্ষার বিস্তারই হইবে, শিক্ষাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাইবে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় শিক্ষায়তন বৃদ্ধির আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেও লর্ড কার্জন তাহার বিরোধিতা করেন, ফলে শিক্ষাগত বিস্তার বন্ধ হয়।

১৯০৪-এর রিজলিউশন

ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি বুঝিবার জন্য আমরা এইখানে শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে হান্টার কমিশনের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যে পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায় তাহা সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি লর্ড কার্জনের সময় পুনরায় বিচার করিয়া দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরের যে রূপ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা লর্ড কার্জন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া শিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। এই কমিটিতে কোন ভারতীয় না থাকায় ভারতীয়দের মনে লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। লর্ড কার্জন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনেও প্রথমে কোন ভারতীয়কে নেওয়া হয় না। পরে স্যার গুরুদাস ও সৈয়দ বিলগ্রামীকে নেওয়া হয়। ঐ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নীত করিবার জন্যও সুপারিশ করিবেন ইহাও স্থির হয়। আলোচনা চক্রের সুপারিশ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ফলে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-বিল উপস্থাপিত

করা হয়। ইহার ফলে ভারতীয় শিক্ষার নীতির উপর নির্ভর করিয়া Government of India Resolution বা ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে প্রচারিত হয়।

এই সিদ্ধান্ত বা Resolution-এর প্রথম ভাগে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডেসপ্যাচের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় শিক্ষার যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করা হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যে দোষ ত্রুটি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। মোটামুটি দোষ-ত্রুটিগুলি হইল নিম্নরূপ।—(১) সরকারী চাকুরীতে ঢুকিবার উদ্দেশ্যেই উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, (২) পরীক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (৩) শিক্ষার পাঠ্যক্রম বাস্তবতা-বিমুখ। (৪) বিদ্যালয় ও কলেজসমূহ ছাত্রদের বুদ্ধির উৎকর্ষতা সাধনে বিশেষ সচেষ্ট হয় নাই, তাহারা ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধির দিকেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষার স্থলে যান্ত্রিক শিক্ষাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫) ইংরাজী শিক্ষা অনুসরণ করিতে যাওয়ার ফলে মাতৃভাষা শিক্ষা অবহেলিত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে যে আশা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারিত হইবে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষত্রুটি

ভারত সরকারের রিজলিউশন শিক্ষা-সম্পর্কিত ত্রুটিগুলি দেখাইয়া সেই সম্পর্কে কতকগুলি সংশোধনমূলক প্রস্তাব করেন।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার রিজলিউশন ১৮৮২র ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশসমূহ মানিয়া লয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিক হইতে সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের দিক হইতে সরকারের বিশেষভাবে করণীয় ছিল, কারণ বিদ্যালয়ে গমনের উপযুক্ত শতকরা ২২·২ বালক ও মাত্র শতকরা ২·৫ বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করিত এবং শতকরা ১০ জন পুরুষ স্বাক্ষর ও হাজারে সাত জন মহিলা সাধারণ লেখা পড়া জানিত। সরকার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করেন যে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীরা গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে

প্রাথমিক শিক্ষা

এবং গ্রাম্য বিত্থালয়ের পাঠ্যক্রম হইবে সহরাঞ্চলের পাঠ্যক্রম হইতে ভিন্ন।*

মাধ্যমিক বিত্থালয়ে শিক্ষা

মাধ্যমিক বিত্থালয় সম্পর্কে Resolution ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিত্থালয়ে যে শিক্ষার বিকীরণ হইতেছে, তাহা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখা অবশ্য কর্তব্য কাজ।†

ভাষা শিক্ষা

ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে Resolution ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজীর কোন স্থান নাই। তাহা ছাড়া সরকারের অভিপ্রায় নহে যে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হবে। অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার একটি কার্যকরী মূল্য আছে এবং বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক বিত্থালয়ে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পড়ান হইয়া

* Government of Indian Resolution on Indian Educational policy : "The aim of the rural school should be not to impart definite agricultural teaching but to give to the children a preliminary training which will make them intelligent cultivators, will train them to be observers, thinker, and experimenters, in however humble a manner, and will protect them in their business transactions with their landlords to whom they pay rent and with the grain dealers to whom they dispose of their crops. The reading books prescribed should be written in simple language, not in unfamaliar literary style, and should deal with topics associated with rural life. The grammar taught should be elementary, and only native systems of Arithmetic should be used. The village map should be thoroughly understood, and a most useful course of instruction may be given in the accountant's papers enabling every boy before leaving school to master the intricacies of the village accounts and to understand the demand that may be made on the cultivator."

† The school "is actually wanted that its financial stability is assured that its managing body, where there is one, is properly constituted; that it teaches the proper subjects upto a proper standard; that due provision has been made for the instruction, health, recreation and discipline of the pupils; that the teachers are suitable as regards character, number, and qualifications; and that the fee to be paid will not involve such competition with any existing school as will be unfair and injurious to the interests of education'"

থাকে। কিন্তু এই কারণে মাতৃভাষার অবহেলা করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।*

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

১৯০৪-এর Resolution বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসম্বন্ধেও অভিমত প্রকাশ করে। তারপর ১৯০৪এর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হয়।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কারসমূহ আলোচনা করার পূর্বে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতব্দীর শেষভাগে একদল চিন্তাশীল ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয়দের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা বা National Education কি ভাবে দেশে অনুসৃত হইতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন যে শিক্ষার রূপ এমন হইবে যেখানে মাতৃভাষা হইবে শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যক্রম ভারতীয় কৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইবে এবং পাঠ্য-সূচীতে কারিগরি ও শিল্প-শিক্ষার এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে দেশ শিল্প প্রসারের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা

এই চিন্তাধারা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতীয় শিক্ষার ধারা অনুসৃত হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির নাম করা যাইতে পারে। যথা—লাহোরের দয়ানন্দ এঙ্গলো-বেদিক কলেজ, ইহা আর্য

* Ibid.

"English has no place, and should have no place in the scheme of Primary Education. It has never been part of the policy of Government to substitute the English language, for the vernacular dialects of the country. It is true that the commercial value which a knowledge of English commands and the fact that the final examinations of the English Schools are conducted in English cause the secondary schools to be subjected to a certain pressure to introduce prematurely both the teaching of English as a language and its use as a medium of instruction; while for the same reasons the study of the vernacular in these schools is liable to be thrust into the background. This tendency, however requires to be corrected in the interest of sound education."

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাদি, পরবর্তী অন্য পরিচ্ছেদে বিশদভাব দেওয়া হইল।

সমাজীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয়টি হইতেছে হরিদ্বারে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল। ইহা প্রাচীন আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরে তৃতীয় জাতীয় শিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে মিসেস অ্যানি বেসান্ট বেনারসে সেন্ট্রাল কলেজ স্থাপন করেন। চতুর্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তি নিকেতনে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলিতেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মাতৃভাষা শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির উদ্দেশ্য ছিল। ইতিপূর্বে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে। রাজনৈতিক চেতনা ভারতবাসীর মনে জাগ্রত হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং নেতাদের মনে জাতীয় শিক্ষার প্রশ্ন দানা বাঁধিয়া উঠে। এই সময়েই লর্ড কার্জন ভারতে আগমন করেন এবং শিক্ষা-সম্পর্কিত নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকেন। ভারতের শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে লর্ড কার্জন যাহা বলেন, তাহা হয়ত অনেকটা ঠিক, কিন্তু তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া সেই সব ভুল-ত্রুটির নিরসন করিতে অগ্রসর হন তাহা ভারতবাসীর মনঃপূত হয় না। তাহা ছাড়া লর্ড কার্জনের আর একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম ভারতবাসীর মনে আরও বেশী সন্দেহ উদ্রেক করে। তাহা হইতেছে সমগ্র বাঙালী সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ।

জাতীয় শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফলাফল হইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু। ইহাকে বলা হয় স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইল, বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। ইহার ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গভঙ্গ

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই ছাত্রসম্প্রদায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে। সরকার ছাত্রদের এই কাজ বরদাস্ত না করিয়া একটি ইস্তাহার জারী করে। ইস্তাহারটি হইল এই যে, ছাত্রগণ কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিবে না এবং যদি তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে খুব বেশী রকম শাস্তি দেওয়া হইবে। এই ইস্তাহারের ফল হইল সাংঘাতিক। বাঙলার সমগ্র ছাত্রসমাজ বিক্ষিপ্ত

স্বদেশী আন্দোলনে শিক্ষার রূপ

হইয়া উঠিল। ছাত্রগণ দলে দলে সরকারী বিধানে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি ত্যাগ করিতে লাগিল। দেশীয় নেতারা ছাত্রদের জন্য জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী প্রমুখ নেতাগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Education শীঘ্রই স্থাপিত হইল, এবং এই পরিষদের জন্য বহু লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল। শিশু শিক্ষার স্তর হইতে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হইল। কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন অরবিন্দ ঘোষ।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ

জাতীয় শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত কর্মধারা ইহাই প্রথম, তাহার পূর্বে অবশ্য হরিদ্বারের "গুরুকুল" শান্তি-নিকেতনের "ব্রহ্মচর্যাশ্রম" প্রভৃতি স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা স্বল্প প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিয়াছি। মাতৃভাষা শিক্ষা ও তাহার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার শিক্ষা দেওয়া ঐ সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে জাতীয় শিক্ষা অনুসৃত হয়, তাহাতে ঐ দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং তাহার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল শিল্প-শিক্ষা। যাদবপুরের বেঙ্গল টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট (Bengal Technical Institute) নামে একটি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

নানা কারণে জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রম বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ভাটা পড়িতেই জাতীয় শিক্ষার চাহিদাও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। জাতীয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল, এবং ছাত্রগণ পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহে ফিরিয়া গেল। শুধু রহিল Bengal Technical Institute উহা ধীরে ধীরে পরিণত হইল যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে শিক্ষা প্রসারের চাহিদা। সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ একান্ত কর্তব্য বলিয়া দেশীয় নেতাগণ মনে করিতে থাকেন।

* স্থানান্তরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১৯১০ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রাথমিক শিক্ষা* অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিবার জন্য একটি বিল Imperial Legislative Councilএ আনয়ন করেন। বিলটি প্রথমে পরিত্যক্ত হয়, আবার পরে বিলটি উত্থাপিত হয়। কিন্তু বিলটি পাশ হয় না।

গোখেল

গোখেলের বিলটি যখন বিরোধিতা করা হয়, তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে দরবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাষণের উত্তরে * ৫০ লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবার জন্য নির্দেশ দেন। এই টাকা বিশেষ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হয়। এত টাকা যখন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে, তখন গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিকরণের জন্য চাহিদার পূরণ না হইলেও চলে বলিয়া সরকার মনে করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় সরকার তাঁহার শিক্ষানীতি ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য ১৯১৩ সনের শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

১৯১৩ সনের শিক্ষা সম্পর্কিত রিজলিউশন

(১) শিক্ষার বিস্তার-সাধন না করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি সাধারণ ছাত্রদের জন্য কার্যকরী বিদ্যা দান, যথা হাতের কাজ শিক্ষা, বাগান করা, পরিবেশ পরিচিতি, ভূগোলের কার্যকরী জ্ঞান দান, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ইত্যাদি।

(৩) ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা, যাহাতে ভারতীয় ছাত্রগণ বিদেশ না গিয়াও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

(৪) গোখেলের ইচ্ছানুযায়ী প্রাথমিক অবৈতনিক ও আবশ্যিক না করিয়া ঐচ্ছিক করা উচিত এবং তাহার জন্য সম্রাটের দেওয়া টাকা প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হইবে।

* *His Majesty the George V, The King Emperor said :*

"It is my wish that there may be spread over the land, a network of Schools and Colleges, from which will go both loyal and manly and useful citizens, able to hold their own in industries and agriculture and all the vocations of life. And it is my wish, too, that the homes of my Indian subjects may be brightened and their labour sweetened by the spread of knowledge with all that follows in its train, a higher level of thought, of conduct, and of health. It is through education that my wish will be fulfilled, and the cause of education in India will ever be very close to my heart."

(৫) বালিকাদের জন্য শিক্ষা হইবে কর্মমূলক।

(৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কর্মমূলক হইবে।

(৭) শিক্ষকগণ শিক্ষণ গ্রহণ করিলে তবে তাঁহারা শিক্ষাদানের উপযুক্ত হইবেন।

মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি করে। ১৯০৪ এর Indian Universities Act অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে মঞ্জুরী দান করিত, এবং পাঠ্যসূচী বাঁধিয়া দিত এবং ছাত্রগণ ঐ পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ করিত। এদিকে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন হয়, কতকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকে। শিক্ষা-অধিকর্তা বা বাংলা সরকার এ সমস্ত বিদ্যালয়গুলির কোনও রূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিত না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় ঐগুলিকে পূর্বেই মঞ্জুরী দিয়া রাখিয়াছে; ফলে শিক্ষা-অধিকর্তা বা সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা দেখা যায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতীয় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। তাঁহারা স্বাধীন মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে ছিলেন। শিক্ষা-অধিকর্তার কোন ধার ধারিতেন না। শিক্ষা-অধিকর্তা বলিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুপযুক্ত বিদ্যালয়গুলির মঞ্জুরী দান করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা-প্রসার কার্যে বাধা জন্মাইতেছে। তাহা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে। এই কারণে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার মঙ্গলার্থে সুপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মঞ্জুরী দান করিবার অধিকার থাকিবে না, স্বীকৃতি দানের অধিকার থাকিবে সরকারের তথা শিক্ষা-অধিকর্তার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারমূলক সুপারিশের মধ্যে সরকারী সিদ্ধান্ত আরও মতামত প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এবং মহাবিদ্যালয়ের মঞ্জুরী দান করিবে না, ইহার সংস্কার হইবে অন্যান্য দিক হইতেও। বিশ্ববিদ্যালয় হইবে উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্র। নূতন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার সুপারিশও রিজলিউশন করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা

পূর্বেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ আলোচনাকালে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এই ডেসপ্যাচের স্থপারিশ অনুযায়ীই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনাভার দেওয়া হইয়াছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণের উপর। বলাই বাহুল্য যে এই সব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী আওতায় চলিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের উদ্দেশ্যগুলি একটি ঘোষণায় বিবৃতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য বিজ্ঞান ও কলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির ব্যুৎপত্তি লাভের পরিমাপ গ্রহণ করিয়া সনদ, সম্মান ইত্যাদি দেওয়া হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী চ্যান্সেলার ও ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ সৃষ্টি হয় এবং সিনেট গঠিত হয়। সিনেটের সভ্যদের মধ্যে পদাধিকার বলে চ্যান্সেলার ও ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, আর ছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা প্রমুখ সভ্যগণ ও সাধারণ সভ্যগণ। প্রাদেশিক গভর্নর হইতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং সপারিষদ গভর্নর দুই বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত করিতেন। সিনেটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরিচালনভার ন্যস্ত করা হয়। সিনেটের অনুমোদন ছাড়া অন্য কেহই পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিতে পারিত না। সিনেটের সভ্যদের বলা হইত ফেলো। সিনেটের ফেলো-সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফেলো সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে একটি বেশীসংখ্যক সমিতির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিবার মত বিরাট দায়িত্ব পালনের অসুবিধা দেখা যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফেলোর সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যাদি পরিচালনা করিবার জন্য একটি ছোট সমিতি বা সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রথম সময়ে এই যে সিণ্ডিকেটটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার কোন অনুমোদন এই বিশ্ববিদ্যালয়-আইনে ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন-ব্যবস্থা

কেবল পরীক্ষাদি পরিকল্পনা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত অ্যাক্টে প্রধাণতঃ পরীক্ষা গ্রহনের কথাই বলা হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ শিক্ষালাভের কথার উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অ্যাক্ট ঐ বিষয়ের প্রতি উপেক্ষাই দেখান হয় শুধু মঞ্জুরী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেকে মনে করেন যে প্রথম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ উচ্চ শিক্ষার মান বাধিয়া দেওয়া কিংবা উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থা করার মত অবস্থা তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের হয় নাই। কিন্তু এই যুক্তিকে মানিয়া লইতে পারা যায় না। এমন কি যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারত-বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হইয়াছে, সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও পুনর্গঠন হইয়াছিল। অতএব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত—ইহাদের শীঘ্রই পুনর্গঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বৎসর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ জন ছাত্র এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২১ জন প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে। ইহার পর মাধ্যমিক শিক্ষার খুব বেশী অগ্রগতি দেখা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার মোট প্রার্থী ছিল ৭,৪২৯। এই সংখ্যার মধ্যে ২,৭৭৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য ছিল চাকুরী লাভ। যে যত বেশী শিক্ষা লাভ করিবে, চাকুরী লাভের সম্ভাব্যতা তাহার তত বেশী। তাই উচ্চ-বেতনের আশা থাকার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকলেই কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহী হইত। এই কারণে কলেজীয় শিক্ষারও দ্রুত বিস্তার ঘটে। ইহার ফলে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রকার কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে বেসরকারী কলেজ স্থাপনের গতি ছিল দ্রুত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় তালুকদারদের প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌএ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রচেষ্টায় আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ স্থাপিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণেই অধিকতর গুরুত্ব দান

কলেজের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

ইহাই পরে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। লাহোরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রচেষ্টায় লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। ইহা পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজের তিনটি হিন্দু কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি কলেজের মধ্যে দুইটি কলেজই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলি সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কলেজের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে কলেজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃটিশ-ভারতে কলেজ স্থাপিত হয় ১৩৬টি এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থাপিত হয় ৪২টি। বৃটিশ ভারতের ১৩৬টি কলেজের মধ্যে ৪২টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ভারতীয়দের দ্বারা, ৩৭টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মিশনারীদের দ্বারা, ২৩টি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল সরকারের দ্বারা, ৬টি হইয়াছিল আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা, ৫টি মিউনিসিপালিটি দ্বারা এবং ১২টি ইউরোপীয়গণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। বাকী কয়েকটি অন্যান্য সাহায্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলেজী শিক্ষাতে ভারতীয়দের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলাহাবাদে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এইখানে দেখা যায়। এইখানে সংস্কৃত আরবী ও দেশীয় ভাষা সাহিত্যের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান আইনের ও চিকিৎসার পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিপ্লোমা প্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী প্রদান খুব বেশী সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিত রূপের আদর্শে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রসারণ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন সাধন হয়, তখন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পরিবর্তিত রূপকেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সংগঠিত রূপের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লন। কমিশনের ঘোষণার

বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ : (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে ; (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত যে সব কলেজ থাকিবে, সেই কলেজগুলির শিক্ষার মান নির্ণয় করিয়া, উহাদিগকে যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেই, উহাদিগকে মঞ্জুরী প্রদান করা হইবে ; (গ) কলেজের শিক্ষকবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবে ; (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক হিসাবে সিনেটর সভ্যসংখ্যা অতিরিক্ত হইবে না। ইহা ছাড়া শিক্ষা-কমিশন পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন এবং পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ রূপ কি প্রকারের হইবে, সেই বিষয়ে কমিশন একটি কথাও বলেন নাই। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোন উক্তি করেন নাই, কারণ ইহা তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত, এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের নীরব থাকা শোভা পায় নাই। সুতরাং এই কমিশনকে আদর্শ কমিশন বলা উচিত নয়। এক কথায় বলা যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়-এ্যাক্ট লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ধরিয়া রচিত হইয়াছিল, এই ক্ষেত্রেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিত রূপকে আদর্শ ধরিয়া কমিশন সুপারিশ করেন। ইহার ভিতর মৌলিকত্ব কিছু নাই। ভারতবাসীর অবস্থা ও আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। এই দেশের কলেজ সম্পর্কে মঞ্জুরী দিবার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করা হইয়াছে এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার ক্ষেত্রেও বাধা-নিষেধের নিগড় সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছিল। বিলেতে এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেগুলি মাত্র একটি বা দুইটি কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ সেই নজির দর্শান হইলেও নূতন বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় এলাকার জন্য স্থাপিত করিতে গেলেও বাধা দেখা যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি লইয়া ১৯০৪ এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচিত

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-বিধি (Indian Universities Act 1904) রচিত হয়।

এই এ্যাক্টের প্রথম প্রয়োজনীয় বিধি হইল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্মের সম্প্রসারণ।*

এ্যাক্টের দ্বিতীয় কথা হইতেছে সিনেটকে ছোট করিয়া গঠিত করা। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী সিনেটের ফেলো সংখ্যা ৫০এর নীচে হইবে না এবং ১০০এর উর্ধ্বে উঠিবে না। ফেলোগণ ৫ বৎসরের জন্য সিনেটের সভ্য হইবেন, সমগ্র জীবনের জন্য নহে।

এ্যাক্টের তৃতীয় কথা হইতেছে নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন। এই আইন অনুযায়ী ২০ জন ফেলো পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত হইবে এবং ১৫ জন ফেলো নির্বাচিত হইবে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

এ্যাক্টের চতুর্থ কথা হইতেছে সিণ্ডিকেটকে আইন বিধিবদ্ধ সংস্থা বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল।

এ্যাক্টের পঞ্চম কথা হইল কলেজকে মঞ্জুরী দান করিবার জন্য মাঝে মাঝে কলেজগুলিকে পরিদর্শন করিতে হইবে।

এই অ্যাক্টর ষষ্ঠ কথা হইল এই যে এই এ্যাক্ট সরকারকে সিনেটের বিধি-ব্যবস্থার উপর কিছুটা কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়াছিল। পূর্বে সিনেট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা রচনা করিতেন, কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিলে সিনেট রচিত বিধি-ব্যবস্থাকে ভিটো প্রয়োগ দ্বারা নাকচ করিতে পারিতেন। এই এ্যাক্টকে বলা হয় যে সিনেট যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কোন বিধি-ব্যবস্থা প্রনয়ণ করিতে না পারেন তাহা হইলে সরকার নিজেই উহা করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

এ্যাক্টের শেষ কথা হইতেছে, সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির অধীনস্থ কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থানসীমা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

* Section 3 of the 1904 Act

"The University shall be and shall be deemed to have been incorporated for the purpose (among others) of making provision for the instruction of students with power to appoint University Professors and lecturers to hold and manage educational endowments, to erect, equip and maintain University libraries, laboratories and museums, to make regulations relating to the residence and conduct of students and to do all acts, consistent with the act of incorporation and this Act, which tend to the Promotion of study and research."

ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ মহলে প্রতিক্রিয়া

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এ্যাক্টকে ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গণ আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মহামতি গোখেল ছিলেন রাজকীয় উপদেষ্টা সমিতির সভ্য। তিনি ইহাকে প্রতিপদে বাধা দানের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসিবার পূর্বে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তাদের লইয়া একটা শিক্ষা-সম্মেলন বসিয়াছিল। ঐ সম্মেলনে মূলার নামে একজন বে-সরকারীয় প্রতিনিধি আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় কোন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে স্থান পান নাই। এই বিষয় নিয়া কথা উঠিলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয়। এই সময় হইতেই ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌গণ ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিল প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেশবাসী আরও হতাশ হইয়া পড়েন। কারণ বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের কোনও রূপ ব্যবস্থা ছিল না। আর্থিক ব্যবস্থা না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

ভারতীয়গণ সিনেটের সভ্যদের নির্বাচন ব্যাপারেও খুশী হইতে পারেন নাই। নির্বাচিত সভ্যসংখ্যার উপর ভারতীয়েরা আপত্তি তোলেন। সভ্যদের উর্ধ্ব ও নিম্ন সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় ভারতীয়দের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে উপায়ে ইউরোপীয়দের সংখ্যা সিনেটে বর্ধিত অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয়গণ অসন্তুষ্ট হন এবং সরকারের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহারা অন্য দিকের এক ব্যাপারে খুব সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহা হইল মঞ্জুরী প্রদান সম্পর্কিত কড়াকড়ি ব্যাপারে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিকে মঞ্জুরী প্রদানে কড়াকড়ি করার উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়গণের কলেজ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া। তাহা ছাড়া ভারতীয়গণ সর্বশেষ একটি বিষয়ে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাহা হইল বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা। এই এ্যাক্টের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সরকারী বিভাগে পরিণত করা হইয়াছিল।

সরকারের প্রতিক্রিয়া

পক্ষান্তরে এই এ্যাক্ট পাশ হওয়ায় সরকার অত্যন্ত খুশী হয়। সরকার এই এ্যাক্টটিকে অত্যন্ত উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে এ্যাক্টটির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু মঞ্জুরী দানের কড়াকড়ির ফলে নূতন কলেজ স্থাপন ব্যাপারে খুবই অসুবিধা দেখা গিয়াছিল। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর কিছু দিনের মধ্যে কলেজের সংখ্যা বেশ কিছুটা কমিয়া যায়। ১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দে কলেজের সংখ্যা ১৭০ এ নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্যা বাড়িয়া ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছিল ২০৭টিতে। কলেজের সংখ্যা সাময়িকভাবে কমিয়া গেলেও ছাত্রসংখ্যা কিন্তু হ্রাস পায় নাই। ইহা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিতেছিল। ১৯০২ হইতে ২০ বৎসর কালের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চাকুরী লাভ করাই ছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ, যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের ভাল চাকুরী জুটিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রথম দিকেই শিক্ষিতদের পক্ষে চাকুরী ভাগ্যে অবনতি দেখা যায়, ফলে অন্য কোনও দিকে সুযোগ সুবিধার অভাবের জন্য ছাত্রগণ উচ্চতর শিক্ষালাভেই অগ্রসর হইয়া যাইত। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কলেজগুলির আয় বর্ধিত হইয়াছিল এবং এই সমস্ত শিক্ষার মানেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। সরকার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজীয় শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অধিক অর্থ মঞ্জুর করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে—সরকারী মঞ্জুরীকৃত অর্থের বেশীর ভাগ টাকা সরকারী কলেজ পরিচালনাতেই ব্যয় হইত, এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের খুব কম অংশই লাভ করিত।

এ্যাক্টের সমালোচনা

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেলেও, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত কম।

ইতিমধ্যে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নূতন রূপ দেখা যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কতকগুলি কলেজ থাকিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেই কলেজগুলির মঞ্জুরী দান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিত। এই কাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই

এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় উহার নিজ বিভাগগুলি মারফত বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে এইরূপ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংগঠিত হয়। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে ছাত্রাবাসে ছাত্রগণের বাস করিবার নীতিও গ্রহণ করা হয়। এই দেশেও ঐরূপ ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইবে বিবেচনা করিয়া সরকার তাহার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠন করার নীতি ঘোষণা করা হয়।*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৭-১৯ স্যাডলার কমিশন

এই ঘোষণার ফলে ১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সংগঠিত হয়। ডক্টর মাইকেল স্যাডলার এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই কমিশনকে বলা হয় স্যাডলার কমিশন।

* Indian Educational Policy, 1913.

"It is important to distinguish clearly on the one hand, the Federal University in the strict sense, in which several Colleges of approximately equal standing, separated by no excessive distance or marked local individually, are grouped together as a University, and on the other hand, the Affiliating University of the Indian type, which in its inception, was merely an examining body and, although united as regards the area of its operations by Act of 1904, has not been able to insist upon an identity of standard in the various institutions conjoined to it. The former of these types has in the past enjoyed some popularity in the United Kingdom, but after experience it has largely been abandoned there and the constituent Colleges which were grouped together have, for the most part, become separate Universities without power of combination with other institutions at a distance. At present there are five Indian Universities for 185 Arts and Professional Colleges in British India besides several institutions in native states. The day is probably far distant when India will be able to dispense altogether with the affiliating University, But it is necessary to restrict the area over which the affiliating universities have control by securing in the first instance a separate university for each of the leading provinces of India and secondly to create local teaching and residential Universities within each of the provinces in harmony with the best modern opinion as to the right road to educational efficiency. The Government of India have decided to found a teaching and residential University at Dacca, and they are prepared to sanction under certain conditions the establishment of

স্যাডলার কমিশনের সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুণী ও সক্রিয় সভ্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষের মতামত বহুলাংশে কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রভাবান্বিত করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্যই মূলতঃ এই কমিশন বসিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই কমিশন ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় মূল্যায়ন করিয়া তাহার পর শিক্ষা-সংস্কারগত সুপারিশ করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উদাহরণ মাত্র। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের রূপরেখা রচনা করেন।

স্যাডলার কমিশন বিশদভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের দুইটি বিষয় জানা দরকার। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলতঃ আবাসিক ছিল, যদিও বাহিরের শিক্ষার্থীদিগকেও কিছুসংখ্যক ভর্তি করা হইত। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয়তঃ যদিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-গ্রহণের পক্ষ হইতে কোন বাধা নিষেধ ছিল না, তাহা হইলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু হিন্দু ছাত্রদেরই ভর্তি করা হইত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। সরকার আগ্রহী হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায় বেসরকারী লোকের পক্ষ হইতে। পণ্ডিত মালব্য দেশীয় হিন্দু রাজা, বিত্তবান লোক ইত্যাদির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাধু উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া একটি বিষয় প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইতেছে

similar universities at Aligarh and Benares and elsewhere as occasion may demand. They also contemplate the establishment of universities at Rangoon, Patna and Nagpur. It may be possible hereafter to sanction the conversion into local teaching Universities, with power to confer degrees upon their own students, of those Colleges which have shown the capacity to attract students from a distance and have attained the requisite standard of efficiency. Only by experiment will it be found out what type or types of Universities are best suited to the different parts of India."

এই যে সরকার যদি বিরোধিতা না করে তাহা হইলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব।

এই সময়ে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রশ্ন দেখা যায়। এ পর্যন্ত যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহা সকলই স্থাপিত হয় ব্রিটিশ-ভারতে। ইহার পর দেশীয় রাজ্যগুলি আর পিছাইয়া রহিল না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিষয়ে বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে। উর্দু সেই বিশ্ববিদ্যালয় হয় শিক্ষার বাহন, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনায়াসে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইতে পারে।

দ্বিতীয় অবধানযোগ্য বিষয়টি হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের প্রণীত শিক্ষানীতির ফলে কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়, কিন্তু উহা পর্যাপ্ত ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। বেশীর ভাগ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কলেজগুলিতে, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা ও যত্নের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে। স্নাতকোত্তর বিভাগ কলা ও বিজ্ঞান এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, এই সময় হইতে শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অপর কোন কলেজে এম.এ., এম.এস. সি পড়া যায়। অতএব দেখা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন বসিবার পূর্ব হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

স্যাডলার কমিশন মন্তব্য করেন যে ১৮৮২ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-কমিশনগুলির সুপারিশে উচ্চ শিক্ষার স্বার্থ ঠিকমত পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহার কারণ প্রথমটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এবং দ্বিতীয়টিতে মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বিবেচিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতি ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যুক্তি দেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হইতে একটি পৃথক বোর্ডের অধীনে আনিতে হইবে। ইন্টারমিডিয়েট কোর্সকে প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষারূপে গণ্য করিতে হইবে এবং উহাকেও বোর্ডের

অধীন আনিতে হইবে। সরকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি লইয়া এই শিক্ষাবোর্ডটি গঠিত হইবে।

কমিশন মন্তব্য করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিসর খুব বেশী। উহার পরিচালনভার একটি প্রতিষ্ঠানের উপর থাকা খুবই অসুবিধাজনক। এই কারণে কমিশন প্রস্তাব দেন যে, (১) ঢাকায় একটি নিজস্ব শিক্ষালয় যুক্ত আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক; (২) কলিকাতা শহরের সকল কলেজকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত করা হউক; (৩) মফঃস্বলের মহাবিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হউক।

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কি ভাবে পরিচালিত হইবে সেই বিষয়ে কমিশন তাহার সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করেন। উহা নিম্নরূপ: (ক) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আইনের কঠোরতা কম থাকা উচিত; (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-কোর্স থাকা উচিত, (গ) ডিক্রী-কোর্স তিন বৎসরকাল হওয়া প্রয়োজন; (ঘ) অধ্যাপক ও রিডার নিয়োগের জন্য একটি বিশেষ নির্বাচন কমিটি থাকিবে এবং উহাতে বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবে; (ঙ) অনগ্রসর মুসলিম ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে; (চ) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবহিতি এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নতির জন্য শারীর শিক্ষণের জন্য একজন অধিকর্তা নিযুক্ত হইবেন; তাহা ছাড়া শিক্ষার্থী কল্যাণবোর্ড গঠন করা ও তাহাদের আবাসগুলি পরিদর্শনের জন্য পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করাও প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন বিষয়ে সুপারিশসমূহ

কমিশন স্ত্রীশিক্ষার প্রচারের জন্য পর্দাস্কুল স্থাপন ও স্ত্রীশিক্ষা--বোর্ড গঠন করিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম রচনা করিবার অভিমত প্রদান করেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ব্যবস্থার সুপারিশ

কমিশন বলেন যে শিক্ষণ প্রাপ্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কমিশন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষণ-বিভাগ খুলিবার জন্য কমিশন সুপারিশ করেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে সুপারিশ

কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা (Education) বিষয়টির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং ঐ বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করিয়া তাহার শিক্ষাদান ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, এই বৃত্তিমূলক দেশে শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখান হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেন।

কারিগরী শিক্ষার জন্য সুপারিশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশসমূহের মধ্যে প্রধান হইতেছে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। উহা ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্বে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পাটনায় ও বেনারসে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলিগড় ও লক্ষ্মৌএ, এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইগুলির মধ্যে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল স্বনামধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক। আলিগড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, সেইখানে মুসলমান ছাত্রদের পড়িবার বিশেষ বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু এবং ইংরাজী উভয় ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়।

কমিশনের সুপারিশ বিষয়ে ব্যবস্থা

কমিশনের অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শারীর-শিক্ষা বিভাগ স্থাপন, ইত্যাদি কিছু কিছু সুপারিশ কার্যে পরিণত করা হয় বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ সুপারিশই কাজে লাগানো হয় নাই। শিক্ষক-শিক্ষণ ও কারিগরী শিক্ষা-বিভাগ পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৫৪-১৯২১)

এইবার আমরা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনা করা।

উডের ডেসপ্যাচে মাধ্যমিক শিক্ষা

আমরা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেখা হইয়াছিল। উল্লিখিত সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শেষ দিকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় নাই। পরে গতি একটু শ্লথ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে আমরা তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা আঁচ করিতে পারি। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৯ এবং সেই সব শিক্ষায়তনে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৮,৩৩৫, কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৩৬৩ এবং ছাত্র সংখ্যা ৪৪,৬০৫।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের প্রচেষ্টা

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি না পাইলেও দুঃখের কিছু কথা নাই। উডের ডেসপ্যাচের পর প্রতি প্রদেশে গ্রান্ট-ইন-এডের প্রবর্তনের ফলে অনেক বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ইহার সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়।

এই স্থানে এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উডের ডেসপ্যাচের অল্প কিছুদিনের মধ্যে যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা প্রায় সকলই মিশনারীদের প্রচেষ্টায়, এই দেশীয় জনসাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-প্রচেষ্টা কল্পে খুব বেশী অগ্রসর হইয়া আসে নাই। কিন্তু তাহার অল্পদিনের মধ্যে এদেশীয় ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাড়া দিল এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে এই দেশীয়

বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে ভারতীয়গণ মিশনারীদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও ভারতীয় বেসরকারী প্রচেষ্টা মিশনারীদের চেয়ে বেশী দেখা যাইতে থাকে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত। ছাত্রসংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র সম্প্রদায়ের শতকরা ৫৫ ভাগ ভারতীয়গণের পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ বিদ্যালয়ই ভারতীয়দের পরিচালনাধীন ছিল। দেখা যায় মাধ্যমিক শিক্ষা এই দেশে যথেষ্ট স্বীকৃতি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষা মোটেই ত্রুটিশূন্য ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষা দিবার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তবুও মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তি শিক্ষাকে মোটেই স্থান দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ পক্ষে কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে ধরা হইয়াছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি

এই সময় মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলা হইয়াছিল; অবশ্য কোন কোন বিষয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাও বলা হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষা বিভাগ উহার প্রবর্তন করিতে সাহায্য করেন নাই।

অপর পক্ষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও, ডেসপ্যাচের পরে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হয় না। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ) পূর্বে ভারতবর্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য মাত্র দুইটি ট্রেনিং কলেজ ছিল, একটি মাদ্রাজে (স্থাপিত ১৮৫৬ খৃঃ) এবং অপরটি লাহোরে (স্থাপিত ১৮৮০ খৃঃ)।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সময় পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ডেসপ্যাচ ঐ বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও উহা অবহেলিত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এই সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত

(১) প্রবেশিকা-পরীক্ষান্তরের পূর্ব হইতেই শিক্ষার্থীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, একটি দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা এবং অপর দলকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যোগদান করিতে সুবিধা দেওয়া উচিত। কমিশন ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে শিক্ষিত বৃত্তিধারীরা সমাজে অধিক সুযোগ লাভের অধিকারী হইবে এবং ফলে বৃত্তি শিক্ষার প্রতি অধিক লোক আগ্রহী হইবে।

(২) কমিশন মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেন নাই। কেবল মধ্যে ইংরাজী স্তরে আংশিকভাবে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কমিশন বলেন যে ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষা ভালভাবে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয় নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণ ছাত্রদিগকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে আগ্রহী। ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষা বলা, কহা ও লেখাতে যাহাতে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে তাহাই তাহাদের লক্ষ্য, কারণ তাহা হইলে তাহারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৩) কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়েও তাঁহাদের মত প্রকাশ করেন। শিক্ষা কি ধরণের হইবে সেই সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন মত দেখা যায়। একমতে বলা হয় যে শিক্ষণকালে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয় সমূহেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে। আর এক মতে শিক্ষণ গ্রহণ কালে শুধু শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষানীতি শিক্ষাদানের কথাই বলা হইয়াছে। কমিশন শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে স্নাতক শিক্ষকগণ স্বল্পকালস্থায়ী শিক্ষণ কালে শুধু শিক্ষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করিবে, কিন্তু যাঁহারা প্রথম স্নাতক:তাহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

এই সমস্ত ছাড়াও কমিশন আরও একটি বিষয় সুপারিশ করেন। এ দেশীয় লোকগণ যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহার জন্য সমস্ত সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে স্থানীয় কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিবার সুপারিশ করেন। কমিশন গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথাকে আরও নিয়মিত করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিয়া সেই অনুসারে অর্থ সাহায্য করার প্রস্তাবও করেন।

কমিশনের বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়, কিন্তু উহাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল বলিয়া বৃত্তিশিক্ষা বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

কমিশনের সুপারিশে বৃত্তি শিক্ষার জন্য যে দলটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেই দল যে শিক্ষা গ্রহণ করিত, তাহার নাম ছিল বি-কোর্স। বি-কোর্স সাধারণে স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইলে ছাত্রগণ জীবনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। যাহারা বি-কোর্স অনুসরণ করিত তাহারা পরবর্তী কালে হইত সার্ভেয়ার বা ওভারসিয়ার। কিন্তু এই কাজ ছাত্রদিগকে যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিত না তাহা বলাই বাহুল্য। বি-কোর্স এই কারণে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। অতএব বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমস্যার সমাধান আর হইল না। জনসাধারণের মধ্যেও উহা অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। পক্ষান্তরে এই দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা সম্বন্ধেও কোনও অগ্রগতি দেখা যায় নাই। শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হইয়াছিল, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের আগ্রহ দেখা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ১৯০২-১৯২১ খৃষ্টাব্দে

১৯০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে যথেষ্ট বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১২৪ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৯০,১২৯। কিন্তু ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৭৫৩০ এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১১,০৬,৮০৩। বেশী সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়াছিল যে কতকগুলি কলেজে শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল, উপযুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে উহা গড়িয়া উঠে নাই, সেইরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ঐ সকল শিক্ষায়তনের শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত হয় নাই। এই কারণেই লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার সুচিন্তিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ে

মতামত প্রকাশ করা হয় যে, সরকার সমাজের প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।* প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে সত্যিই ঐ শিক্ষায়তনের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কিনা, শিক্ষায়তনটির আর্থিক অবস্থা ভাল কিনা ঐ শিক্ষায়তনে প্রত্যেকটি বিষয় নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা, ম্যানেজিং কমিটি যথোপযুক্ত ভাবে গঠিত কিনা, ছাত্রদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, শৃঙ্খলা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আছে কিনা, শিক্ষকদের সংখ্যা, গুণগত পারদর্শিতা, চরিত্র বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারেষি দ্বন্দ্ব ইত্যাদি আছে কিনা।

উপরে বর্ণিত যে সমস্ত সর্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সর্তগুলি যথাযথ রূপে পালিত হইলেই যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিত, এবং ফলে সরকারের সাহায্যও পাইতে সক্ষম হইত। পক্ষান্তরে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঐ সর্তগুলি পালন করিবার ক্ষমতা ছিল না তাহাদিগকে আরও বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিতে হইত। ঐসব বিদ্যালয় সরকারের মঞ্জুরী বা সাহায্য পাইতই না, তাহাদের ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর্যন্ত অনুমতি পাইত না।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সিদ্ধান্তের মতে ইহা প্রকাশিত হয় যে মঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রবেশিকা দিতে পারিত এবং যে সমস্ত ছাত্রগণ কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই, তাহারাই প্রাইভেট প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে ১৯০৪ এর ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত মতামত প্রকাশ করে যে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

* "That it (The School) is actually wanted; that its financial stability is assured; that its managing body where there is one, is properly constituted; that it teaches the proper subjects up to a proper standard; that one provision has been made for the instruction, health, recreation and discipline of the pupils; that the teachers are suitable as regards character, number and qualifications; and that the fees to be paid will not involve such competition with any existing school as will be unfair and injurious to the interests of the nation."

যে জ্ঞানমুখী ও শিল্পমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ছাত্রগণ জ্ঞানমুখী শিক্ষালাভ করিয়াই সরকারী চাকুরী পাইয়াছে, অতএব শিল্প শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন তাগিদ কোন দিক হইতেই দেখা যায় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অমঞ্জুরীপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইত না, মঞ্জুরীপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ছাড়া শুধু প্রাইভেট ছাত্র যাহারা কোনওদিন কোন বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করে নাই তাহারাই প্রাইভেট প্রার্থী হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। দেখা গেল অনেক অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয় প্রবেশিকা শ্রেণীর কয়েকটি শ্রেণীর নীচু পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করিত, এবং সেই বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পার হইয়া ছাত্রগণ মঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গিয়া প্রবেশ করিত। এই সব বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের আশা রাখিত না এবং প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রও তৈয়ারী করিত না। এই কারণে তাহারা মঞ্জুরী পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করিত না। ইহার ফলে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইল না।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই ঘোষণা করা হয় যে অমঞ্জুরীপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সার্টিফিকেট লইয়া মঞ্জুরীপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে না। এই বিজ্ঞপ্তির ফলে অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের পক্ষে টিকিয়া থাকা খুবই কঠিন হইয়া উঠিল। এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দেশের মধ্যে দেখা দিল এবং ক্রমে ইহা আন্দোলনের আকার ধারণ করিল। কিন্তু কোন আন্দোলনই অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের জন্য সরকার হইতে কোন সুবিধা আদায় করিতে পারিল না, ফলে বহু— অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইল। মঞ্জুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কড়াকড়ি হয়, তাহার মূলে ছিল রাজনৈতিক কারণ, এইরূপ সন্দেহ করা হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদান পদ্ধতির উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে সরকার যে সব বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন, সেই সব বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ঐসব বিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট বা শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষককে নিযুক্ত করা হইত। শিক্ষকদের সর্বনিম্ন মাহিনা

দেওয়া হইয়াছিল ৪০ টাকা* এবং ঐ বেতন ৪০০ টাকা পর্যন্ত কোনও সময়ে কেহ প্রধান শিক্ষক হইলে উঠিতে পারে এইরূপ বর্ধনশীল হারে বেতন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ছাত্রাবাস তৈয়ারী এবং ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহ শিক্ষাদানকালে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার এবং শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়। সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান সরকারী বিদ্যালয়ের অনুরূপ যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও ঐ সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়। যে অঞ্চলসমূহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চাহিদা আছে এবং আর্থিক পরিবেশ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী, সেইখানে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষাসিদ্ধান্তে অপর একটি বিষয় গৃহীত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্রকে অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক কাজের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত আরও একটি অভিমত প্রকাশ করে। শিক্ষা সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয়। তাহার কারণ এই নয় যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয় সরকারী বিদ্যালয় হইতে ভাল। তাহার কারণ এই যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি ব্যয় করিতে পারিবে এবং সেই শক্তি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য করিতে পারিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাসম্বন্ধে আরও একটি মত ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। ঐ মত অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে এবং যথাসম্ভব ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

ঐ শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষনপ্রাপ্ত নহেন, তাঁহারা শিক্ষাদানের কার্যের জন্য অনুপযুক্ত। তাহা ছাড়া তাঁহারা শিক্ষকদের জন্য বেতনের হার বৃদ্ধি, বৃদ্ধ শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

"It is not possible to have a healthy, moral atmosphere in any school, Primary, Secondary or at any college, when the teacher is discontended and anxious about the future."

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূতন সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রভূত অর্থ ব্যয় করার বিরুদ্ধে এই দেশীয়গণ সমালোচণা করেন। সরকারী বিদ্যালয় গুলিতে অধিক অর্থ ব্যয় হইলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খরচ কম হইবে, এইভাবে সমালোচকগণ মন্তব্য করেন। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ পাশাপাশি থাকিলে উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে, এই কারণে সমালোচকগণ প্রস্তাব করেন যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হউক। সরকারী বিদ্যালয় সমূহে ব্যয় বৃদ্ধির কথা নিম্নলিখিত উদাহরণ দৃষ্টে মানিয়া লইতেই হইবে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সরকারী বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয় হইত ৩৪ টাকা, তাহার মধ্যে সরকারের ব্যয় ছিল ১২ টাকা কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে খরচ বৃদ্ধির এক ভিন্নরূপ দেখা যায়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয় হইত ৭৫ টাকা এবং সরকারের ব্যয় ছিল ৫৪ টাকা। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ের খরচের রূপ সম্পূর্ণ অন্য রূপ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রতি খরচ ছিল ২২ টাকা এবং তাহার মধ্যে সরকারের ব্যয় ছিল ৪ টাকা। পক্ষান্তরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের স্থানে হয় যথাক্রমে ৫৩ টাকা ও ১০ টাকা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের খাতে মোট ব্যয় ৪গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সমালোচনা

পরে অবশ্য শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে সরকার বেশীর ভাগ স্থলে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইয়াছিল। যেখানে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা হয়, সেখানে বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কোন আশা নাই, ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। আর একটি কারণে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা হইয়াছিল, তাহা হইতেছে রাজনৈতিক কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ যাহাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিতে পারে, এইজন্য যেখানে বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষায়তন গড়িয়া তোলা যায় না, অথচ বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছাত্রসমাজের অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেইখানেই শুধু সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ছাত্রসমাজ সরকারী বিদ্যালয়ের আওতায় আসিয়া বিপ্লবীভাব ত্যাগ করিতে পারে এই আশায়ই সেইখানে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা হয়।

শিক্ষক শিক্ষণের দিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা খুব ভাল কথা। কিন্তু যিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন তিনি শিক্ষকতা কার্য করিবার অনুপযুক্ত, ইহা মনে করা ভুল। তাহার কারণ এই যে এমন শিক্ষক অনেক আছেন যাঁহারা শিক্ষণ প্রাপ্ত না হইলেও শিক্ষকতার জন্য বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি। তাহা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও খুব বেশী তখন ছিল না, যাহাতে খুব তাড়াতাড়ি সকল শিক্ষকবর্গ শিক্ষণ পাইতে পারেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৫টি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বৎসরে ১৪০০ মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয় কিন্তু তাহা হইলেও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে তৎকালীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগনের মধ্যে মোটে এক চতুর্থাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষণ প্রাপ্ত।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও মন্তব্য ও সুপারিশ করেন। পূর্বে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যে সব কমিশন বসিয়াছিল, সেই সমস্ত কমিশনের কার্য পূর্ণতার পরিচয় দিতে পারে নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই, এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ দুইটি স্তরের শিক্ষা ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই বিষয়ে পূর্ণতার দাবী করিতে পারে। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সীমারেখা প্রবেশিকা পরীক্ষা নয়, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। অতএব সরকারকে একটি নূতন ধরণের শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার নাম হইবে ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ। এই শিক্ষায়তণগুলি হয় আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর না হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হইবে। তাহা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা একটি বোর্ডের অধীনস্থ হইবে বলিয়াও কমিশন বলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। সরকার অবশ্য পরবর্তী কালেও ইহার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় সরকার এতদিন পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষা ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষাদানের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্পসমূহের উন্নতির জন্য সরাসরি কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া প্রথমেই ঐ শিক্ষার জন্য ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য সাধারণ বিদ্যালয়েই কিছু ব্যবহারিক কাজকর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ব্যবহারিক কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইলেই কারিগরী শিক্ষার কাজে ছাত্র-নিযুক্ত হইতে পারিবে।

চারু ও কলা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়া সরকার বলেন যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইবে ভারতীয় শিল্প-কলা শিক্ষা দিবার।

শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রসঙ্গে সরকার বলেন যে শিল্প বিদ্যালয়গুলি শিল্প কাজে জ্ঞানদান করিবার জন্য স্থাপিত হইলেও, তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই। অনেক ছাত্র নানা শিল্প অবশ্য শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু যাহা তাহারা শিখিয়াছে তাহা অনুসরণ করিবার মনোবৃত্তি তাহাদের নাই। তাহারা কেরাণীর কাজ বা অন্যান্য কাজেই যোগদান করিতে ইচ্ছুক। তবে অনেক স্থানে শিল্প শিক্ষার মান এতটা নিম্নে ছিল যে ঐ জ্ঞানকে মূলধন করিয়া তাহারা উৎপাদনের কাজে নামিতে পারিত না। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ও ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় শিল্পকাজ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিত না, তাহারা এমন সব শিল্পকাজ শিক্ষা করিত যাহার উৎপাদনাত্মক মূল্য গ্রামীন পরিবেশে উপযুক্ত নয়।

বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার বলেন যে ভারতীয় প্রয়োজনে ছাত্রদিগকে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে। বিলাতি বইতে কি আছে তাহা তাহাদের শিক্ষণীয় নয়।

কৃষি শিক্ষাদান সম্পর্কে সরকার অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষিজীবি, কিন্তু এইখানে কৃষি বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কম।

পরবর্তীকালে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। এই সময়ে সরকার প্রবেশিকার পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে কারিগরী শিক্ষার কাজও গ্রহণ করেন। অতীত কালে এইরূপ প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল কিন্তু উহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। কি কি কারণে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতেই কারিগরী শিক্ষা ভালভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বিত হইলে হয়ত কারিগরী শিক্ষার অসাফল্য দেখা যাইত না।

(ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিবার কালে, ব্যাঙ্ক, রেল বিভাগ, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাহাদের মন্তব্য গ্রহণ করা উচিত ছিল।

(খ) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

(গ) বে-সরকারী বিদ্যালয়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের সুবিধায় জন্য ঐ সকল বে-সরকারী বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইত, যাহাতে ঐ সব প্রতিষ্ঠান সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করিয়া কারিগরী ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(ঘ) যে সব শিক্ষক কারিগরী ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের জন্য ভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা।

(ঙ) দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করণ, যাহাতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রগণের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কিছু কিছু সুপারিশ করিলেও ঐ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। পক্ষান্তরে তখন সরকার মনে করিয়াছেন যে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে বিকল্প ব্যবস্থা হইলেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইবে।

পক্ষান্তরে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার জন্য জন-সাধারণ হইতে কোনও রূপ দাবী ছিল না। ইহার কারণ নিম্নরূপ।

(ক) ঐ সময়ে শিক্ষিত বেকারের কোনও রূপ সমস্যা ছিল না। তখনকার দিনে সামান্য একটু ইংরাজী শিখিতে পারিলেই সরকারী চাকুরী কিংবা বে-সরকারী চাকুরী লাভে কোনওরূপ অসুবিধা হইত না। ইংরাজী শিক্ষা বেশী হইলেত কথাই ছিল না। ইংরাজী জ্ঞানই চাকুরী লাভের পথ সুগম করিত। অতএব ইংরাজী শিক্ষাকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

(খ) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রগণ আসিত সাধারণতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহ হইতে। ঐ সমস্ত ছাত্রগণ বংশানুক্রমে বুদ্ধিজীবি, তাহারা হাতের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে অভ্যস্ত নয়। এই কারণে ছাত্রগণ কারিগরী কাজের প্রতি কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

(গ) তৃতীয়তঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার নীচু স্তরে হাতের কাজ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা না থাকার ফলে উপরের দিকে আর উহা গ্রহণযোগ্য হয় না।

(ঘ) বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থাকে যে অধিক অর্থের প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা না থাকায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার হয় নাই।

পূর্বে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এবং পরবর্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশীয় নেতারা সরকারকে এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে সরকার দেশের আর্থিক উন্নতির দিকে একেবারে দৃষ্টি দেন নাই, শুধু শোষণই করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপযুক্তভাবে স্থান পায় নাই এবং তাহার ফলেই দেশের আর্থিক অবনতি ঘটিয়াছে। দেশীয় নেতারা তাই জোর করিয়া বলিলেন যে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিশেষ স্থান অবলম্বন করিবে এবং তৎজনিত খরচাদি খুব বেশী হইবে না। নেতারা বলেন যে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত অতএব ঐ শিক্ষার ব্যবস্থা যেভাবেই হউক করিতে হইবে। নেতারা পরবর্তী কালে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সময় বৃত্তি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরাজী শিক্ষা

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় স্থরু হইতেই ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতে থাকে। আমরা মেকলের মিনিটে লক্ষ্য করিয়াছি কি করিয়া দেশীয় ভাষার দাবী লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা চালু হয়। পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়াছে যে সরকার অনেক সময়ে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং কোন কোন বিষয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষাদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু সরকার স্বীকার করিয়া লইলেও জনসাধারণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। কারণ তাহারা দেখিয়াছে যে ইংরাজী ভাষা শিখিলে এবং ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিলে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে এবং তাহার ফলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবিধাও হইয়া থাকে। এই কারণে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সকলেই গুরুত্ব দেয়। এদিকে ইংরাজী শিক্ষা করিলেই যখন চাকুরী মিলে তখন ইহা প্রায় সঙ্কীর্ণ অর্থে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে গিয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইলেও পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ইংরাজী শিক্ষার যে খুব কিছু উন্নতি হইয়াছিল এই কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ ঐ বয়সের ছাত্রদের পক্ষে বিদেশী ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি সম্ভব নয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা হইলেও সকল ক্ষেত্রেই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা চলিতে থাকে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় পরিষদে ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনা হয়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাব না করিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহনের উপযোগী ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয় নাই। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান হয় যে ইহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার অসুবিধা দেখা যাইবে, কারণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকায় ইংরাজী ভাষা জ্ঞানলভে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা জনসাধারণ যতটা জানে ততই দেশবাসীর

পক্ষে মঙ্গল। তাহা ছাড়া অন্য একটি বিষয়কেও অবলম্বন করিয়া বিলে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে অপত্তি জানান হয়। মাতৃতাষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের যোগ্য পুস্তক নাই এবং পরিভাষাও না থাকায় মাতৃষায় পুস্তক রচনা করতে অসুবিধা জনক হইবে। ঐ বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের সময় তৎকালীন শিক্ষা ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সভ্য স্যার হার্ণকোট বাটলার মন্তব্য কারন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন যে মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইলে শিক্ষার্থীরা অধিক বুাহপত্তির পরিচয় প্রদান করিবে। তবুও এই বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও আলোচনা প্রয়োজন।

স্যার বাটলারের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে স্যার সি শঙ্করণ ন্যায়ারের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলনে এই প্রশ্নটিও উঠে। কিন্তু ঐ সম্মেলন কোনওরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই। ফলে এই সময়েও ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে থাকিয়া যায়।

সে যাহা হউক ১৯০২ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। পুর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের সোয়াপাঁচ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আসিয়া দাঁড়ায় ৭৫৩০ তে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ছাত্রসংখ্যা ৫ লক্ষ ৯০ হাজার হইতে ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৬ হাজারে পৌছে। বলা বাহুল্য ১১ লক্ষ ৬২ হাজার ছাত্র ইংরাজী শিক্ষালাভে ব্রতী হয়। ইংরাজী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের দিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে জাতীয় শিক্ষার প্রতি দেশীয় নেতৃবর্গ বেশী গুরুত্ব আরোপ করিলে ইংরাজী শিক্ষার প্রভুত্ব খর্ব করিবার জন্য চারিদিক হইতে প্রস্তাব আসে। সবচেয়ে বিরোধিতা আসে মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে। তিনি এই সময়েই বলেন যে ইংরাজী ভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দী ভাষাই জাতীয় ভাষা হউক। অবশ্য গান্ধীর মত সকল নেতারা গ্রহণ করেন নাই।

উল্লিখিত সময়ে ইংরাজী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method) অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। শুধু শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরাই পড়াইবার অধিকারী ছিলেন। নীচু শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ট শিক্ষকের উপর ভার দেওয়া হইত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষা

(১৮৫৪ খৃ. হইতে ১৯০২ খৃ.)

এডামস্ রিপোর্টে এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছিল যে দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও প্রসারের মধ্য দিয়া শিক্ষার সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু এই মত পরে গৃহীত হয় নাই। যে পন্থা গৃহীত হইল, তাহা হইল, পূর্ব প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন করিয়া উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ নূতন ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এইভাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার সুরু হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার উপর সরকারী কৃপা দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে।

প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারে অবহেলা

ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ছিল উড্‌স্ ডেসপ্যাচ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উডস্ ডেসপ্যাচে বলা হয় "জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বাস্তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করার প্রচেষ্টা গৃহীত হওয়া বিধেয় এবং যে সকল ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় উহা লাভ করিতে পারে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" ডেসপ্যাচে আরও বলা হয় যে স্থানীয় প্রচেষ্টায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দান করা উচিত।

উডস্ ডেসপ্যাচ

কিন্তু ডেসপ্যাচে সাহায্য দান করার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইলেও পরবর্তী পাঁচ বৎসর শিক্ষাবিভাগ ঐ দিকে সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস জানিতে হইলে আমরা উহাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিতে পারি। যথা—(১) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ, (২) ১৮৫৯-৮২ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী, (৩) ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশসমূহ এবং (৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহ।

(১) **ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ**—প্রথমেই বলা হইয়াছে যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উডের ডেস্‌প্যাচে ভারতীয় পাঠশালাগুলিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য গ্রহণ করিতে হইবে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল, উহাতে বলা হইল যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শিক্ষা-কর বসাইতে হইবে এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে, দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে এই যে মতানৈক্য তাহার কারণ খুঁজিতে হইলে ইংলণ্ডের সমসাময়িক শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাইতে হয়। ইংলণ্ডে বিভিন্ন দলের মতদ্বৈধতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলি ডেসপ্যাচের সৃষ্টি।

(২) **১৮৫৯ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবাহ**—ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু মানুষের মনে কোন নীতির দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। কেহ কেহ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচের সুপারিস সমূহ অনুসরণ করিল, আবার কেহ করিল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ।

দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে মতদ্বৈধতার মূল হইতেছে তিনটি বিষয়—পুরাতন পাঠশালাগুলির দৃষ্টিভঙ্গী, স্থানীয় শিক্ষাকর ও সরকারী রাজস্ব হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে গ্রাণ্ট-ইন-এড দান।

দেশীয় পাঠশালাসমূহ—প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে দেশীয় পাঠশালা-সমূহের স্থান আছে কিনা তাহা নিয়া দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে মতদ্বৈধতা হয়। কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষে যত সংখ্যক পাঠশালা রহিয়াছে, তাহা থাকুক, তাহাদের অস্তিত্বের মধ্যে দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইবে, অন্যদল বলেন যে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা হইবে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায়। দুই মতের মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করিতেও কেহ কেহ সুপারিশ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করিতে বলা হয়। কয়েকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে অনুসৃত হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মাদ্রাজ—মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ থাকে। ঐ বৎসর সরকার পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরই ন্যস্ত ছিল। সরকারী বিদ্যালয় সেইখানেই খোলা হইত যেখান হইতে কোনরূপ বে-সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইত না। ১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল, ১৩,২২৩ এবং সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,২৬৩।

বোম্বাই—বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ভার ছিল শিক্ষ-বিভাগের উপর। ফলে ভারতীয় পাঠশালা সমূহ অবহেলিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পুর্বে পাঠশালাগুলি সরকারী সাহায্য পাইত না বলিলেই চলে। ঐ সময়ে বোম্বাইয়ের শিক্ষা অধিকর্তা পিল সাহেব পাঠশালাগুলিকে সাহায্য দিবার জন্য আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু খুব সামান্য সংখ্যক পাঠশালাকেই সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

বাংলা দেশ—বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইয়াছে পাঠশালার উপর ভিত্তি করিয়া।

তিনটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার পরিকল্পনা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা গেল। অন্যান্য প্রদেশগুলি উপরের একটি না হয় অন্য প্রদেশকে অনুসরণ করিয়াছে।

আর্থিক-সঙ্গতি—দুইটি ডেসপ্যাচের দ্বন্দ্বের মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির কথা একটি মূল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ডেসপ্যাচ গণ-শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষাকর আদায়ের প্রস্তাব করেন। সরকার পরে ইহার সংশোধন করিয়া বলেন যে স্থানীয় প্রয়োজন—যথা শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নতিমূলক কাজের জন্যই কর বসিবে, শুধু শিক্ষা প্রসারের জন্য কর বসিবে না। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা কর বসিলে অসুবিধার কারণ নাই, কারণ গ্রামাঞ্চলে ভূমি রাজস্বের উপর নির্ভর করিয়া স্থানীয় কর বসান যাইবে। শহরাঞ্চলে গৃহাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা কর আরোপ করিতে হইবে। বাংলাদেশে স্থানীয় কর বা শিক্ষা কর কিছুই বসিতে পারে না, কারণ লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশে তখন চলিতেছিল।

স্থানীয় কর বসানটা অনেকেই পছন্দ করেন নাই, কারণ তাঁহারা মত প্রকাশ করেন যে শিক্ষা বিস্তার সরকারী অর্থের বলেই হইতে পারিবে।

আবার কেহ কেহ শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থানীয় কর প্রবর্তনকে সুচক্ষে দেখেন। তাঁহারা মনে করেন যে শিক্ষার বিস্তার যখন করিতেই হইবে, তখন ক্রম-বর্ধমান সংখ্যার জন্য রাজস্বের উপর চাপ না দিয়া স্থানীয় কর আদায় করাই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

গ্রাণ্ট-ইন-এড—দুই ডেসপ্যাচের মধ্যে মতদ্বৈধতা হয় গ্রাণ্ট-ইন-এড লইয়া, একদল লোক মনে করেন যে স্থানীয় করকে জনসাধারণের দান বলিয়া মনে করা যায়, অতএব সরকার হইতে গ্রাণ্ট-ইন্-এড পাওয়ার যৌক্তিকতা রহিয়াছে। অন্য দল মনে করেন স্থানীয় কর বলিয়া যাহা আদায় করা যায় তাহা কর (Tax) এবং সেই জন্য সরকারের নিকট হইতে গ্রাণ্ট-ইন-এডের দাবী কিছুতেই শোভন হয় না।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ

উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় স্তরের আলোচনা করা হইতেছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্লথ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নিকট ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করিয়া সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন। ছয়টি বিভাগ যথাক্রমে হইতেছে—(ক) শিক্ষা-নীতি, (খ) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন (গ) পাঠশালাসমূহকে উৎসাহ প্রদান (ঘ) বিদ্যালয় পরিচালন, (ঙ) শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা, (চ) অর্থ ব্যবস্থা।

ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষা

(ক) **শিক্ষা-নীতি**—প্রাথমিক শিক্ষা-নীতি কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা হইবে জনগনের শিক্ষা এবং উহা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে। কমিশন আরও সুপারিশ করেন যে দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া কমিশন আরও বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা, অনগ্রসর জেলাসমূহে যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(খ) **আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন**—বিলাতের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসম্পর্কিত আইনে স্থির করা হয় যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ইংলণ্ডকে কতকগুলি বিদ্যালয় সম্পর্কিত জেলাতে বিভক্ত করা হয় এবং সেই জেলা পরিষদগুলিকে শিক্ষাকর বসাইয়া শিক্ষা পরিচালনা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কমিশন সেই নজির দেখাইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার ভার জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপাল বোর্ডগুলির উপর অর্পণ করিবার সুপারিশ করেন।

(গ) **পাঠশালাগুলিকে উৎসাহ প্রদান**—কমিশন দেশীয় পাঠশালাকে শিক্ষাপ্রসারের আওতায় আনিবার সুপারিশ করেন, অর্থাৎ পাঠশালাগুলি তুলিয়া না দিয়া ঐগুলির সাহায্যেই শিক্ষাবিস্তার সম্ভব বলিয়া কমিশন মনে করেন।

(ঘ) **বিদ্যালয় পরিচালনা**—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করেন যে সমগ্র প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা একরকম করিবার প্রয়োজন নাই, স্থানীয় পরিবেশের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া উহা নির্ণয় করিতে হইবে, যেখানে প্রয়োজন পাঠ্যক্রম সহজ করিতে হইবে, যেখানে প্রয়োজন উহাকে অধিকতর শক্ত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাই বিদ্যালয়ের পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিবেন। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের সময়ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ণীত হইবে বলিয়া কমিশন বলেন।

(ঙ) **শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা**—কমিশন শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্বন্ধে খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে, তাই কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেন।

(চ) **অর্থ-ব্যবস্থা**—কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সব সুপারিশ করেন, তাহার ফলে বহুদিনকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে কমিশনের সুপারিশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফাণ্ড গঠন করা হয়। তাহা ছাড়া কমিশন মিউনিসিপাল অঞ্চল ও গ্রাম্য অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফাণ্ড গঠন করিবার সুপারিশ করেন, যাহাতে একস্থানের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ অন্যস্থানের জন্য না খরচ হয়। কমিশন ইহাও স্থির করিয়া

দেন যে স্থানীয় ফাণ্ডের টাকা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে, উহা কোনও ক্রমে মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইতে পারিবে না। শেষ পর্যন্ত কমিশন সুপারিশ করেন যে সরকারের উচিত হইবে গ্রাণ্ট-ইন-এড দ্বারা স্থানীয় ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করা।

(৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ সরকার তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে যাইয়া লর্ড রিপণ মন্তব্য করেন যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলক ব্যবস্থার ফলে শুধু যে শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইবে এবং অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইবে, তাহাই নহে, ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত করিবে এবং তাহারা শাসনকার্য পরিচালনায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইবেন, তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিবেন। লর্ড রিপণ আরও বলেন প্রথম অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে কার্যে দক্ষতা না দেখা গেলেও, কিছুদিনের মধ্যে ঐসব প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবে।

লর্ড রিপণের নির্দেশের ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে লোকাল বোর্ড বা কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহ স্থাপিত হয়। লোকাল বা মিউনিসিপাল বডিদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালন স্থানীয় সংস্থাগুলির অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইল।

দেশীয় পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে কমিশন যে সুপারিশ করেন তাহা সর্বাংশে গৃহীত হয় না। শুধু পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দান করা হয় এবং পরীক্ষার ফলাফলের গুরুত্ব অনুসারে বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা হয় বলিয়া জানা যায়।

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে ৩,৯৫৪টি দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল, যুক্ত প্রদেশে ছিল ৬,৭১২টি। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সংখ্যা কমিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশীয় পাঠশালার সমস্যা দেখা যায় না। যে সমস্ত প্রদেশে পাঠশালাগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা

হয়, সেই সমস্ত প্রদেশে পাঠশালার বৈশিষ্ট্য চলিয়া যায়, আর যে সমস্ত প্রদেশে তাহা করা হয় না, সেইখানে পাঠশালাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

অর্থ-বরাদ্দ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর-শিক্ষার ক্রমশঃ বিস্তার হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ঐ সব খাতে প্রবাহিত হয় এবং ফলে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সরকারী ফাণ্ড হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ হয় ১৬·৭৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ঐ বাবদ ব্যয় হয় ১৬·৯২ লক্ষ টাকা মাত্র। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার পক্ষ হইতে যথোপযুক্ত ব্যয় হয় না। কিন্তু স্থানীয় সংস্থা অর্থাৎ লোকাল বডিস এই বিষয়ে অগ্রণী হয় এবং ১৮৮১-৮২ স্থানীয় সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ২৪·২ লক্ষ টাকা এবং ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ঐ সংস্থাই খরচ করে ৪৬·১ লক্ষ টাকা।

১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর সাক্ষরের যে শতকরা সংখ্যা দেখা যায় তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যলব্ধ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১০ জন, এবং মেয়েদের মধ্যে হাজার করা ৭ জন মেয়ে ছিল সাক্ষর।*

* Extracts from the Resolution on Educational Policy, 1902.

"The population of British India is over two hundred and forty million. It is commonly reckoned that fifteen percent of the population are of school-going age.

According to the standard there are more than eighteen millions of boys who ought to be at school, but of them only a little more of than one-sixth are actually receiving Primary education. If the statistics are arranged by Provinces, it appears that out of a hundred boys of an age to go to school, the number attending Primary schools of some kind ranges from between eight and nine in the Punjab and the United Provinces to twenty-two and twenty-three in Bombay and Bengal. In the census of 1901 it was found that only one in ten of the male population and only seven in a thousand of the female population were literate.

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি খুব শ্লথ হয়। যদিও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা হয়, তবুও উহার অগ্রগতি বিশেষ দেখা যায় না। ঐ বাবদ টাকা বেশী খরচ হইবে, ইহার সম্ভাবনা থাকিলেও, প্রাথমিক শিক্ষার যথোপযুক্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। ১৮৬৫-৬৬ এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে শিক্ষাবিষয়ক হিসাব-নিকাশ হয়, সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধিকরণের প্রস্তাব ছিল। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুপারিশ করেন। এই সকল বিবৃতি সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার গতি শ্লথ ছিল।

আমরা এই সমস্যার প্রতি যতই লক্ষ্য করি ততই আমাদের মনে হয় সরকারের পক্ষ হইতে কতকগুলি ত্রুটির জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়।—

(ক) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈথিল্য।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে অর্পণ।

(গ) দেশীয় পাঠশালাগুলিকে অবহেলা।

(ক) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈথিল্য

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন উঠে না, কারণ ইংলণ্ডেই তখন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয় নাই। কিন্তু ১৮৭০, ১৮৭৬ ও ১৮৮০র আইনগুলি দ্বারা ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়। ইংলণ্ডের আদর্শ লইয়া আমাদের দেশে কাজ অনেকটা চলিতেছিল। ইংলণ্ডে শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রতিফলনও আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়া যাইবার পরে এই নিয়া কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও এই বিষয়ে নীরব। বরোদার মহারাজা সরাজিরাও গাইকোয়ার দেশীয় রাজ্য বরোদায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। স্যর চিমনলাল, শীতলবাদ ও স্যর ইব্রাহিম রহমতুল্লা ব্রিটিশ

সরকারের কাছে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দাবী জানান, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ে সাড়া দেয় না। বেশী পীড়াপীড়ির পর সরকার জানান যে ভারতবর্ষে বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত, অতএব বিদেশী সরকার দেশীয় লোকদের শিশুকে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারিবেন না। কাজেই দেখা যায়, ভারত সরকার আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করেন নাই।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে অর্পণ

উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার শ্লথ গতির অন্যতম কারণ হইতেছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার স্বীয় দায়িত্ব বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং অনেকাংশে সেই হিসাবে সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন সংস্থা তখনকার দিনে ছিল না। যদি সত্যিই সরকার দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তবে কেন সরকার—আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিলেন না? স্বায়ত্বশাসনমূলক সংস্থার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(গ) পাঠশালাসমূহের অবহেলা

প্রাথমিক শিক্ষার শ্লথগতির মূলে রহিয়াছে আর একটি কারণ, তাহা ছিল পাঠশালাগুলিকে অবহেলা। সত্য বটে, পাঠশালাগুলি প্রাথমিক শিক্ষার কার্যসূচী পালন করিত না, কিন্তু সেইগুলিকে ধ্বংস না করিয়া সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অবদান

উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার গতি শ্লথ ছিল এবং

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিক হইতেই ইহার উন্নতি দেখা না গেলেও, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকটি ছোটখাট ব্যাপারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কয়েকটি ছোটখাট উন্নতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখা যায়।

(১) **বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ**—পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন গৃহই ছিল না। পাঠশালাগুলি বসিত মন্দিরে, মসজিদে, বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বৈঠকখানায় ইত্যাদি। বিদ্যালয়-গৃহ না থাকিলেও সমাজের ও ব্যক্তিবিশেষের আনুকূল্যে বিদ্যালয়ের কাজ চলিত। কিন্তু বিলাতে বিদ্যালয়-গৃহ ছাড়া বিদ্যালয় চলিবার মত উপায় নাই। পূর্বে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হইবে, তারপর সেইখানে বিদ্যালয় বসিবে, এইরূপ ব্যবস্থা। বিলাতে যখন পার্লিয়ামেণ্ট বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা মঞ্জুর করেন, তখন বহু বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়। ইহার প্রতিফলন ভারতবর্ষেও দেখা যায়। ভারতবর্ষেও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য সরকার টাকা মঞ্জুর করেন এবং সেই সময়ে অনেক বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হয়। কিন্তু সরকারের তখন বিদ্যালয় নির্মাণের খাতে অঢেল টাকা ছিল না, ফলে কিছু কাল পরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

(২) **শিক্ষকদের শিক্ষণ গ্রহণ ও গুণগত পারদর্শিতা বৃদ্ধি।** এই যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান বৃদ্ধি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাঠশালার শিক্ষকগণ হইতে শিক্ষাগত পারদর্শিতার ক্ষেত্রে বেশী উন্নত ছিলেন। তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষা যেমন বেশী ছিল, তেমনই ছিল শিক্ষা কাজে দক্ষতা, কারণ অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন।

(৩) **বালিকাদের জন্য ও নিম্নবর্ণ বালক-বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা**—পূর্বে দেশীয় পাঠশালাগুলিতে বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই বলিলেই চলে। কোন কোন পাঠশালায় দুই একটি বালিকা পড়িত মাত্র। তাহা ছাড়া নিম্নবর্ণের ছেলেরা পাঠশালাতে পড়িবার সুযোগই পাইত না। কিন্তু নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। অনেক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে লাগিল এবং অনেক নিম্নবর্ণের ছাত্রগণও বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইল।

(৪) **নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান**—পূর্বে ভারতবর্ষে সর্দার পোড়ার সাহায্যে শিক্ষকগণ পাঠশালায় শিক্ষাদান করিতেন। ভারতবর্ষের এই শিক্ষাদান কৌশল ইংলণ্ড গ্রহণ করে। ইহাতে খরচ হইত কম, এবং শিক্ষার্থীরাও কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু এই পদ্ধতিটি ভাল ছিল না। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ শিক্ষকগণ হইতে যে শিক্ষালাভ হইত, তাহা হইতে সর্দার পোড়োগণ হইতে শিক্ষা লাভ যে নিম্ন ধরণের হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক বিলাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি হইলে সর্দার পোড়োগণ দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিত হইল। ইহার প্রতিফলন ভারতেও দেখা গেল। ভারতবর্ষেও সর্দার পোড়োদের সাহায্যে আর শিক্ষাদান কার্য চলিল না। এদিকে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নানা রকম নূতন ব্যবস্থা দেখা গেল। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ছোটদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং অন্যান্য মনস্তত্বসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, ফলে শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দলাভ করিতে লাগিল।

(৫) **মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার**—দেশীয় পাঠশালায় মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার ছিল না। শিক্ষক বই ছাড়াই পাঠশালায় শিক্ষা দিতেন। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুদ্রিত পাঠ্য-পুস্তক দেখা গেল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মুদ্রিত পাঠ্য-পুস্তকসমূহ সরবরাহ হইল।

(৬) **পাঠ্যক্রম**—এই যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। পাঠশালাতে লেখা, পড়া ও অঙ্কশিক্ষার শুধু ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতে লেখাপড়া ও অঙ্ক শিক্ষা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্গত হইয়াছিল, যথা—কিণ্ডারগার্টেন, ড্রয়িং, বস্তুপাঠ, ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত ও আবৃত্তি, স্বাস্থ্যবিদ্যা, কৃষি-বিজ্ঞান, পরিমিতি, শারীর-চর্চা এবং হাতের কাজ। এই সবগুলি বিষয়ই যে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রচলিত ছিল তাহা নয়, প্রদেশ ভেদে বিষয়গুলি কমবেশী ছিল।

লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত

লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে আসিয়া শাসন ভার গ্রহণ করিবার পর ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। শিমলা কনফারেন্স ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের

আইন—সবই লর্ড কার্জনের আনুকূল্যে সংগঠিত হইয়াছিল। লর্ড কার্জন তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বস্তরের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিস্তারের চেয়ে উৎকর্ষতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি উৎকর্ষতা ও বিস্তার উভয়ের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেন। তিনি মন্তব্য করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন আশু কর্তব্য। তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার গতি পূর্বে শ্লথ ছিল এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পর আরও মন্দগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া লর্ড কার্জন বলেন যে সরকারী অর্থের অভাবেই প্রাথমিক শিক্ষা মন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই কারণে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য থোকে টাকা (capital grant) মঞ্জুর করেন। ইহা ছাড়া তিনি অন্য দিকে পৌনঃপৌনিক ব্যয়ের (recurring expenditure) জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। স্থির হইল এই অর্থ লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপাল বোর্ডকে দেওয়া হইবে এবং ঐ বোর্ডগুলি বর্ধিত হারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে। এইরূপ উদার ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮২,৯১৬, ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা বর্ধিত হইয়া দাঁড়ায় ৯৩,৬০৪এ, পরে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা গিয়া দাঁড়ায় ১,১৮,২৬২তে এবং ছাত্রসংখ্যা ১৯০১-২তে ছিল ৩০,৭৬,৬৭১ (১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের সংখ্যার দেড়গুণ)। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুসংখ্যা ছিল ৪৮,০৬,৭৩৬ (১৯০১-২ খৃষ্টাব্দের সংখ্যার দেড়গুণের উপরে)।

লর্ড কার্জনের উৎসাহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা সম্বন্ধেও আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সচেষ্ট হন এবং নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেন।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা

লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণলাভের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা

করেন। যেখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম, অর্থাৎ বাংলাদেশে, সেই স্থানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় অনেক স্থাপিত হয়। লর্ড কার্জন বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ-কাল দুই বৎসরের কম হইবে না। লর্ড কার্জনের এই প্রসঙ্গে বিশেষ অবদান এই যে তিনি স্থির করিয়া দেন যে প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষক গ্রামীন কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে ট্রেনিং গ্রহণ করিয়া যাইবেন যাহাতে তাঁহারা বেশীর ভাগ কৃষিজীবী অভিভাবকের সন্তানদিগকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন।

(খ) পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন

লর্ড কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুন্দর পাঠ্যক্রম রচনা করিবার কথা বলেন। তিনি তখনকার দিনে পাঠ্যক্রমকে সরল করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি পাঠ্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করিবার কথা চিন্তা করেন। লর্ড কার্জন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিবার কথা প্রস্তাব করেন। যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেইখানে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবশ্যই হইবে। শারীর শিক্ষাকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। তিনি কৃষিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার সুপারিশ করেন। লর্ড কার্জনের মত ছিল যে সহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রম রচিত হইবে এবং গ্রামীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হইবে পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া।

(গ) পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহায্য দান-প্রথা

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহায্য দান করা হইত। এই রীতি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবাধে চলিয়া আসে। লর্ড কার্জন এই নীতির বিরোধিতা করেন এবং অন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাহায্য দানের প্রথা প্রবর্তন করিতে বলেন। বলা বাহুল্য, লর্ড কার্জনের বিরোধিতার ফলে পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাহায্য দান প্রথার রদ হয়।

মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা

আমরা পূর্বেই জানিয়াছি যে, লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষা-খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয়-বরাদ্দ করেন। তাহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ-ভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ঐ সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার হিসাব দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, লর্ড কার্জনের আনুকূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটিয়াছিল। কিন্তু তারপরই দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টা। লর্ড কার্জনের ইচ্ছার ফলে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া উহার উৎকর্ষতার দিকে গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকেন। ভারতীয়গণ অবশ্য এই প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলেন না। এই সময় দেশীয় রাজ্য বরোদাতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়। ভারতীয়গণ বরোদার নজির দেখাইয়া ব্রিটিশ-ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানান। এই বিষয়ে উদ্যোক্তা ছিলেন মহামতি গোখেল। গোখেল ১৯১০ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যকীকরণের জন্য খুব চেষ্টিত হন এবং বস্তুতঃ পক্ষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিল আনয়ন করেন। কিন্তু শীঘ্রই এই বিলটি সরকারের অনুরোধে প্রত্যাহৃত হয়। সরকার মহামতি গোখেলকে আশ্বাস দেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করণে প্রস্তাবটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কিন্তু সরকারকে পরে নীরব দেখিয়া গোখেল পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করণের প্রস্তাব ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উত্থাপন করেন।* বিলটি এক বৎসর কাল

"The object of this Bill is to provide for the gradual introduction of the principle of compulsion into the elementary education system of the country. The experience of other countries has established beyond dispute the fact that the only effective way to ensure a wide diffusion of elementary education among the mass of the people is by a resort to compulsion in some form or other. And the time has come when a beginning at least should be made in this direction in India. The Bill is of a purely permissive character and

পরে আলোচনার জন্য পরিষদে উঠে। দুই দিন ধরিয়া এই সম্পর্কে বিতর্ক চলে। সরকারী সভ্যগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকার ফলে গোখেলের বিলটি আলোচনার শেষে পরাস্ত হয়। গোখেলের পক্ষে ১৩টি ভোট এবং বিপক্ষে ৩৮টি ভোট থাকায় গোখেল পরাজিত হন। গোখেল তাঁহার বিলের ভবিষ্যৎ আঁচ করিয়া বলিয়াছিলেন :

"We must be content to accept cheerfully the place that has been alloted to us in our onward march. The Bill, thrown out to-day will come back again, and again, till on the stepping stones of its dead selves, a measure ultimately rises, which will spread the light of knowledge throughout the land. It may be that the anticipation will not come true. ... .
But my lord, whatever fate awaits our labours, one thing is clear. We shall be entitled to feel that we have done our duty, and, where the call of duty is clear it is better even to labour and fail than not to labour at all."

গোখেল পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সকল প্রচেষ্টা বিফল গিয়াছে এই কথা বলা চলে না। এই ব্যাপারের পরে কেন্দ্রে একটি শিক্ষা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গোখেলের বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে গণশিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। পরবর্তী কালে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত প্রচেষ্টা এই বিলেরই ফল বলিয়া সকলে মনে করেন। যদিও সরকার মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিলটি নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলেও জনসাধারণের দাবী একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন নাই। গণশিক্ষার জন্য সেই যুগে যে চাহিদা দেখা যায়, তাহাকে একেবারে ছাটিয়া ফেলা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইল না। সরকারকে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, এমতাবস্থায়

its provisions will apply to areas notified by municipalities or district boards which will have to bear such proportion of the increased expenditure which will be necessitated as may be laid down by the government of India, by rules... ... ...finally the provisions are intended to apply in the first instance to boys though later on a local body may extend them to girls ; and age limits proposed are only six and eleven years.

সরকারের কাছে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময় অর্থাৎ ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁহার অভিষেক উৎসবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ইহার পরেই ভারত সরকার তাহার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

এই সিদ্ধান্তে বলা হয় যে অর্থের জন্য এবং প্রশাসনিক কারণে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্তু সরকার চান যে ঐচ্ছিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হউক। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার মতামত প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে যেখানে অনেক স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতই হয় নাই, সেইখানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার সার্থকতা নাই। কারণ যে অর্থ ছাত্রদের নিকট হইতে ফি বাবদ গ্রহণ করা হইতেছে, সেই অর্থ দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করা হইতেছে। অতএব এই টাকা সংগৃহীত না হইলে সরকারের রাজস্বের উপর খুবই চাপ বাড়িবে।*

Government Resolution on Educational Policy, 1913 :

"The proposition that illiteracy must be broken down and that Primary education has, in the present circumstances of India a predominant claim upon the public funds represent accepted policy no longer open to discussion. For financial and administrative reasons of decisive weight, the government of India have refused to recognise the principle of compulsory education ; but they desire the widest possible extension of Primary education on a voluntary basis. As regards free elementary education, the time has not yet arrived when it is practicable to dispense wholly with fees, without injustice to the many villages, which are waiting for the provision of schools, the fees derived from those pupils, who can pay them are now devoted to the maintenance and expansion of primary education, and a total remission of fees would involve to a certain extent a more prolonged postponment of a provision of schools in the villages without them. In some provinces elementary education is already free and in the majority of provinces liberal provision is already made for giving free elementary instruction to those boys whose parents cannot afford to pay fees. Local government have been requested to extend the application of the principle of free elementary education amongst the poorer and more backward sections of population. Further than this, it is not possible at present to go..."

সম্রাট পঞ্চম জর্জের ৫০ লক্ষ টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে দানের বিষয় উল্লেখ করিয়া সরকার বলেন যে ঐ টাকা বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয় হইবে।

প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন

মহামতি গোখেলের কাজ আংশিকভাবে গ্রহণ করেন বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য জাতীয়তাবাদী নেতা বিঠলভাই প্যাটেল। তিনি বোম্বাইয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বোম্বাইর মিউনিসিপাল অঞ্চলসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য একটি বিল আনয়ন করেন। ঐ বিলটি আইনে পরিণত হয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। বিঠলভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে বহু এলাকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। নিম্নের তালিকাটি হইতেই প্রাথমিক শিক্ষার আইনসমূহ ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত আইন*

বৎসর	প্রদেশ	আইনের নাম	ছেলে বা মেয়ের জন্য পাঠ্যতালিকা	শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চলের জন্য
১৯১৯ খৃ	পাঞ্জাব	প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট	শিক্ষা বালকদের জন্য	শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল
,,	যুক্তপ্রদেশ		উভয় সম্প্রদায়ের জন্য	শহরাঞ্চল
,,	বাংলা	,,	বালক পরে বালিকাদের জন্য (১৯৩২)	,,
,,	বিহার ও উড়িষ্যা	,,	বালকদের জন্য	উভয় অঞ্চল
১৯২০ খৃঃ	বোম্বাই	সিটি অব বোম্বে প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট	উভয় দলের জন্য	বোম্বাই সহরের জন্য
,,	মধ্যপ্রদেশ	প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট	,,	উভয় অঞ্চল
,,	মাদ্রাজ	এলিমেন্টারী এডুকেশন এ্যাক্ট	,,	,,

* সৈয়দ নুরুল্লা ও জে পি নায়েকের A Students' Histcry of Education in India হইতে গৃহীত।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার

উল্লিখিত সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আইন পাশ হইলেও, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন খুব বেশী হয় নাই। সেই দিক হইতে ভারতবর্ষের অবস্থা আশাজনক বলা চলে না।

যেখানে লোকসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ১২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা উচিত, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট শতকরা ২·৬। সাক্ষরের সংখ্যাও খুব নৈরাশ্যজনক। পরবর্তী কালে হার্টগ কমিটির রিপোর্টে এই সময় সম্পর্কে সাক্ষীদের সম্পর্কে যে মন্তব্য আছে তাহা হইতে জানা যায়—যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুরুষ সাক্ষরের শতকরা সংখ্যা মোট শতকরা ১·৪ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ১৩ হইতে ১৪·৪ এ দাঁড়াইয়াছে। মেয়েদের অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মেয়েদের সাক্ষরের সংখ্যা ছিল ·৭, পরে উহা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২-এ দাঁড়াইয়াছে।

লর্ড কার্জনের সময় প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা বিস্তার ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতার দিকে দৃষ্টি দেন। প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতার দিক হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কতটা উন্নত হইয়াছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা

(ক) **শিক্ষকদের শিক্ষণ**—১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্বন্ধে সরকারী প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেখা যায়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়ে এই বিষয়ে বেশী তৎপরতা দেখা যায়। অনেকগুলি সরকারী শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলা হয় এবং বেসরকারী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে সরকার ঐসব শিক্ষায়তনকে প্রচুর সাহায্য করেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯২৬ এবং মেয়েদের জন্য ছিল ১৪৬ এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ২৬,৯৩১। সেই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৬৭,৬১৩ এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এইরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ১১৩,৬৭৩।

এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনও বৃদ্ধি পায়। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ছিল গড়ে ৮ টাকা। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন কোন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ক্রমবৃদ্ধি অনুসারে মাহিনা নির্দিষ্ট হয়। ঐ সময়ে বোম্বাইয়ে শিক্ষকের গড়ে মাহিনা দেখা যায় ৩৩ টাকা। পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশেও শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ মাহিনার

ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্তই হয় নাই।

বিদ্যালয়-গৃহও শিক্ষোপকরণের দিক হইতে এই সময়ে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়-গৃহ যেমন তৈয়ারী হয়, সেইরূপ শিক্ষোপকরণেরও ব্যবস্থা হয়।

এই সময়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তন হয়। পাঠ্যক্রমে বিষয়ের পর বিষয় যোগ করিবার রীতি দেখা যায়। লর্ড কার্জনের আমলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন কিছু করা হইয়াছিল। ঐ পরিবর্তিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গেও আরও কিছু বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব থাকে। বিদ্যালয়-উদ্যান এবং প্রকৃতি-পাঠ শীঘ্রই কয়েকটি প্রদেশের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বৈতশাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা

(১৯২১ খৃঃ—১৯৩৭ খৃঃ)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে শাসন-সংস্কার আইন পাশ হইয়াছিল, সেই শাসন-সংস্কার আইন মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড এ্যাক্ট বলিয়া অভিহিত। এই শাসন-সংস্কারকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি বা দুইয়ের শাসন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলী দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হইল রক্ষিত বিষয়সমূহ (Reserved Subjects) এবং অপরটি হইল হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ (Transferred Subjects)। গভর্ণর হইতেছেন প্রাদেশিক শাসনকর্তার। তিনি রক্ষিত বিষয়সমূহের পরিচালনা কয়েক জন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারের সাহায্য লইয়া করিবেন এবং তিনি এই কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ভারত সরকারের মাধ্যমে ভারত-সচিবের কাছে দায়ী হইতেন। পক্ষান্তরে গভর্ণর হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের প্রশাসনিক পরিচালনা করিতেন কয়েক জন মন্ত্রীদের সাহায্যে। মন্ত্রীগণ ভারত-সচিবের কাছে এই জন্য দায়ী হইতেন না, দায়ী হইতেন আইন-সভার কাছে। আইন-সভায় কাছে বহু নির্বাচিত সভ্য থাকিতেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দুইটি ধারা ছিল বলিয়া এই শাসন-পদ্ধতিকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি বলা হইত।

দ্বৈত শাসন পদ্ধতি হস্তান্তরিত ও রক্ষিত বিষয়

শিক্ষা ছিল একটি হস্তান্তরিত বিষয়, অর্থাৎ এই বিভাগটি প্রদেশে একজন মন্ত্রীদ্বারা পরিচালিত হইত।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা প্রশাসন কার্য পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই কারণে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জানা উচিত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় রাজস্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—যথা ; কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও যুক্ত। কতকগুলি সংস্থা হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত,

তাহা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য, কতকগুলি সংস্থা হইতে যে রাজস্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা ছিল প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য, আর বাকী যে সব সংস্থা হইতে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা ছিল উভয়ের প্রাপ্য। রেল কাষ্টমস, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহা ছিল কেন্দ্রের প্রাপ্য। অরণ্য ইত্যাদি হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা ছিল প্রদেশের প্রাপ্য এবং ভূমি রাজস্ব, আয়কর আবগারী, সেচ ইত্যাদি বিভাগ হইত যে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা ছিল উভয়ের প্রাপ্য। শেষোক্ত অর্থ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার অনুযায়ী রাজস্বাদি বণ্টন তিনটি ভাগে বিভক্ত না হইয়া কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যেই বণ্টন হয়। ইহার ফলে কেন্দ্রের খুব ক্ষতি হয়। ফলে স্থির হয় যে প্রাদেশিক সরকার প্রতি বৎসর তাহার আয়ের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিবেন, এবং বাকী অর্থ প্রদেশের প্রয়োজনে খরচ করা হইবে।

প্রাদেশিক সরকারে বিভিন্ন বিভাগে কি হারে অর্থ বণ্টন হইবে তাহা লইয়া মতবিরোধ দেখা যায়। একটি মত হইল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার এবং মন্ত্রীগণ গভর্ণরের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে বসিয়া বিভাগগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ধার্য করিবেন। ইহার নাম হইল যুক্ত তহবিল (joint purse) প্রথা। বিরোধী মত হইল যে প্রাদেশিক রাজস্ব, রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং অর্থের সঙ্কুলান না হইলে দুইটি দলই আপন আপন সুবিধা অনুযায়ী অতিরিক্ত কর ধার্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। এই প্রথার নাম হইল পৃথক তহবিল (separate purse) প্রথা। দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটিই প্রাধান্য পায় এবং উহাই গৃহীত হয়। এই প্রথাটি হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের পক্ষে ক্ষতিকারক হইল। তাহার প্রধান কারণ হইল কেন্দ্রকে রাজস্বের অংশ দেওয়ার পর রাজস্বের স্বল্পতা এবং দ্বিতীয় কারণ হইল অর্থ ভাণ্ডারের দায়িত্ব রহিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারের উপর। তিনি হস্তান্তরিত বিভাগগুলিকে অর্থ-সাহায্য দিতে সর্বদাই কার্পণ্য দেখাইতেন।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় অপর একটি বিশেষ অসুবিধা দেখা গেল। প্রাদেশিক শিক্ষা-মন্ত্রী সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারী অর্থাৎ আই. ই. এস. দের (ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস) উপর খুব কমই কর্তৃত্ব করিতে পারিয়াছেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে শিক্ষা-বিভাগের বড় বড় চাকুরীতে আই. ই. এস.-গণ ছিলেন, এবং তাঁহারা উল্লিখিত সময়ে ঐ সমস্ত পদগুলি অধিকার করিয়াই ছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর অধীনে শিক্ষা-বিভাগটি আসার ফলে আই. ই. এস-দের ভবিষ্যৎ ক্ষমতা কিরূপ হইবে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। এদিকে ইহারা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মত বিশেষ দায়িত্ব বহন করিতেন বলিয়া তাঁহারা ভারত সরকার বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থার অধীন ছিলেন। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে খুব বেশী শ্রদ্ধার চোখে দেখিত না। তাঁহাদিগকে মনে করা হইত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহক। এইরূপ মনে করিবার কারণও ছিল। তাঁহাদের উচ্চ বেতন ছিল এবং তাঁহাদের জীবন-ধারণ পদ্ধতিও ভারতীয় জীবন-যাত্রার পদ্ধতির সমগোত্রীয় ছিল না। তাঁহারা চাকুরী করিতে যাইয়া দেশের কল্যাণ অপেক্ষা বৃটিশ সরকারের স্থায়িত্বের উপরই বেশী মনোযোগী ছিলেন। এই সময় দেশীয় মন্ত্রীদের দ্বারা শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সাথে আই. ই. এস. কর্মচারীবৃন্দের অনেক ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব দেখা যাইতে থাকে, আই. ই. এস. কর্মচারীবৃন্দ মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন। পক্ষান্তরে মন্ত্রীগণও তাঁহাদের প্রতি আস্থাহীন ছিলেন। এইরূপ যখন অবস্থা, তখন আই. ই. এস. কর্মচারীদের মারফৎ মন্ত্রীবর্গ শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিতেছিলেন। এই সময় তখন চারি দিকে নানা জটিলতা দেখা যাইতে থাকে। এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। অবশেষে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর কর্মচারীদের কাজ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি রয়েল কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনকে বলা হয় লি কমিশন (Lee Commission)।

আই. ই. এস কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা

লি কমিশন নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন।—

লি কমিশন

লি কমিশনের মতে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন কার্যে, বিশেষ করিয়া হস্তান্তরিত বিভাগের ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারী সমগ্র-ভারতের জন্য আর নিযুক্ত করা হইবে না। যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রাদেশিক কর্ম পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন প্রাদেশিক সরকার। সরকার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আই. ই. এস. কর্মচারী আর নিযুক্ত করা হয় না।

কমিশন আরও মন্তব্য করেন যে আই. ই. এস. কর্মচারীদের নিয়োগ-সংক্রান্ত সুবিধাগুলি বজায় থাকিল। কমিশনের মতে কোন চাকুরীতে যেখানে আই. ই. এস. কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আই. ই. এস. কর্মচারী পাওয়া যাইবে, তত দিন সেই পদে আর কোন প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না। কমিশনের মতে কোন আই. ই. এস কর্মচারীকে, সপারিষদ ভারত-সচিব ব্যতীত অন্য কেহ কাজ হইতে বরখাস্ত করিতে পরিবেন না। কমিশনের মতে ইউরোপীয় আই. ই. এস.-কে কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহের অভাব

দ্বৈত-শাসন পদ্ধতি যে সময়ে চালু হয়, সেই সময়ে আরও একটি বিশেষ-ব্যবস্থা শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত করে। আমরা এতদিন পর্যন্ত দেখিয়াছি কেন্দ্র আগ্রহ সহকারে প্রাদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য টাকা সরবরাহ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-সাহায্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। অর্থ-সাহায্য ত দূরের কথা, পক্ষান্তরে কেন্দ্রই প্রদেশের কাছে প্রাদেশিক রাজস্বের কিছু অংশ দাবী করিয়া আদায় করিয়া লইলেন। অবশ্য ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার রদ করা হয়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী শিক্ষাগত ব্যবস্থাটি শুধু প্রাদেশিক ব্যাপারই নয়, ইহা হস্তান্তরিতও বটে। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান নাই।

কেন্দ্রের অনাগ্রহ

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষা বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া। কিন্তু দ্বৈত-শাসন পদ্ধতির আমলে যখন আইন অনুযায়ী শিক্ষা বিষয়টি প্রাদেশিক ও হস্তান্তরিত বিষয় হইল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্টও হইলেন না, আগ্রহও দেখাইলেন না। ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি উঠিয়া গেল।

উপরে যে সমস্ত অসুবিধার কথা আলোচনা করা হইল, তাহা সকলই শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি অন্য ধরণের

অসুবিধা দেখা দিল। নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে একটি বিরাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। কংগ্রেসের কাছে মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার মনঃপূত না হওয়ায় কংগ্রেস এই সময় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সময়ে আর একটি আন্দোলনও চলিয়াছিল, তাহা হইল আইন অমান্য আন্দোলন। এই দুইটি আন্দোলনের জন্য ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের অসুবিধা ছাড়াও আরও একটি অসুবিধা সমগ্র ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছিল। তাহা হইল শোচনীয় আর্থিক অসুবিধা। শুধু সমগ্র ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি রূপ পাইল তাহা আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

কেন্দ্রের অনাগ্রহ সত্ত্বেও শিক্ষার অগ্রগতি

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি জানা যাইবে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	
	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১০	১৫	জানা নাই	৯,৬৯৭
কলেজ	১৬৫	২৭১	৪৫,৪১৮	৮৬,২৭৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,৫৩০	১৩,০৫৬	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫,০১৭	১,৯২,২৪৪	৬১,০৯,৭৫২	১,০২,২৪,২৮৮

উপরের সংখ্যাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার অগ্রগতি উল্লিখিত সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা এই সময়কার বিভিন্ন অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছি। রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সকল অসুবিধার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ হইতেছে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক ও

সামাজিক জাগরণ। এই জাগরণের ফলেই মানুষ শিক্ষাগ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছে। *

জনসাধারণের উদ্যোগের ফলেই এই সময়ে শিক্ষা-বিস্তার লাভ করিয়াছে। জনসাধারণ শিক্ষার মঙ্গলপ্রসারী ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং জন-সাধারণ তাহাদের সন্তানের শিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে, এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়।

হার্টগ কমিটি

শিক্ষার ব্যাপ্তি এই সময়ে যথেষ্ট হইলেও শিক্ষার উৎকর্ষতা এই সময়ে হ্রাস পায়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ শিক্ষার ব্যাপ্তির জন্য এতই আগ্রহী হইয়া উঠে, যে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। সরকার এই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সরকার শিক্ষার এই অবস্থাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। স্যর ফিলিপ হার্টগকে সভাপতি করিয়া তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

হার্টগ কমিটির সৃষ্টির মূলকথা

এদিকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইন অনুযায়ী, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একটি রাজকীয় কমিশন ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার ভারতীয়দের মনঃপূত না হওয়ায় নানাদিকে আন্দোলন চলিতে থাকে। সেই কারণে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একটি কমিশন স্যার জন

*"Quinquennial Review of the Progress of Education in India. 1927-32 A burst of enthusiasm swept children into School with unparralled rapidity, and almost child-like faith in the value of Education was implanted in the minds of people. Parents were prepared to make almost any sacrifice for the education of their children; the seed of tolerence towards the less fortunate in life was begetteng; ambitious and comprehensive programmes of development were formulated which were calculated to fulfil the dreams of a literate India; the Muslim community, long backward in Education pressed forward with eagerness to obliterate past deficiences; enlightened women began to storm the citadel of old time prejudice against the education of Indian girls; Government with the full concurrence of Legislative Councils, poured out large sums of money on education, which would have been regarded as beyond the realm of practical politics ten years previously,

সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে চুরাশি (এ) (৩) ধারা অনুযায়ী, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণ দিবার দায়িত্বও রাজকীয় কমিশনের উপর ন্যস্ত হয়। অবশ্য রাজকীয় কমিশন ইচ্ছা করিলে, একটি সহযোগী কমিটি স্থাপন করিয়া এই কমিটির দ্বারা শিক্ষাসংক্রান্ত অগ্রগতির হিসাব নিকাশ করাইয়া লইতে পারিবেন বলিয়া ঐ ধারায় নির্দেশ থাকে। ইহার ফলেই স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগ স্যাডলার কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ভারতীয় শিক্ষাসম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

এই কমিটি রিপোর্টে বলেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি চারিদিকে দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের বর্ধিত সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ লোকের যে বিতৃষ্ণা ছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে যে সব বিধি নিষেধ ছিল, সেই সব বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করিয়া মেয়েরা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মুসলমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। তাহারা শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহী হইয়াছে। নিম্নবর্ণের লোকেরা শিক্ষা পাইবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। এককথায় সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষার আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহা শিক্ষা-সম্পর্কীয় একটি দিক মাত্র। ইহার অপর দিকও রহিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়

কমিটি বলেন যে সমস্ত শিক্ষাস্তরেই অপচয় দেখা যায়। প্রাথমিক স্তরের অপচয় অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার ফলে সাক্ষরের সংখ্যা যতটা বৃদ্ধি পাওয়া দরকার, ততটা মোটেই হয় নাই। কারণ প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে যাহারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া উপনীত হয়। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সমাধান করিলেই সাধারণতঃ সাক্ষর হওয়া যায়, কিন্তু এই শ্রেণীতে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই আসিবার সুযোগ পায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে অপচয় ছেলেদের চাইতে অনেক বেশী।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা দিকে অগ্রগতি দেখা যায়। শিক্ষকগণের শিক্ষাগত মান উচ্চ, শিক্ষকগণ অনেকেই শিক্ষণপ্রাপ্ত, তাঁহাদের চাকুরীর

সর্তাবলীও আগের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে বিবেচনা করিলে মাধ্যমিক শিক্ষা তৎকালীন ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়কে জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিতে পারে নাই। মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্ববিত্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য পরীক্ষায় পাশ করা। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অসাফল্য জাতীয় জীবনে অপচয় সৃষ্টি করিয়াছে। মাধ্যমিক বিত্যালয়ে যদি কারিগরী বা শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে ততটা জাতীয় অপচয় হইতে পারিত না।

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি

বিশ্ববিত্যালয়ের ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করণের নীতিই দেখা হইয়াছে। বিশ্ববিত্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে ঔদার্যপূর্ণ কোন নীতি গ্রহণ করা হয় নাই, ফলে সেদিকেও অপচয় দেখা গিয়াছে।

বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষা

কমিটি আরও বলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে টাকা খরচের বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আইনসভাগুলি শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার অচিরে গ্রহণ করিবেন এবং সমস্ত অর্থবরাদ্দ মঞ্জুরও করিবেন। কিন্তু টাকাই সব নয়। টাকা সব প্রয়েজন মিটাইতে পারে না। প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শিক্ষার ভার গ্রহণ। সময়ের অপচয় নিবারণ করিতে হইবে, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের এই সারাংশ পড়িয়া স্বতঃই মনে হয় যে কমিটি শিক্ষার সম্প্রসারণকে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের মতে অতি সত্বর শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রসার হইবে পরে। এই সুপারিশ সরকার পক্ষ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। বাস্তবিক পক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী নীতিই ছিল শিক্ষা-বিস্তারের পরিবর্তে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি। কিন্তু সরকার পক্ষ চেষ্টা করিয়াও শিক্ষা সম্প্রসারণকে রোধ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টা ও দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিস্তার হইয়াই আসিতেছিল।

সরকারী মত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি

সরকারী মহল হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে অভিনন্দন জানাইলেও বে-সরকারী মহল কিন্তু হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে গভীরভাবে সমালোচনা করেন। প্রথমতঃ রিপোর্টে ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীদের দ্বারা শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার সম্প্রসারণ-নীতি অবিবেচনা-প্রসূত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয়গণ হার্টগ কমিটির এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকৃতি দিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে দ্বৈত-শাসন পদ্ধতিতে ভারতীয় মন্ত্রীগণ যে বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষা-সম্প্রসারণ এতটা করিতে পারিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষার সম্প্রসারণ তথা আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষার সম্প্রসারণ হইলেই যে উহা উৎকর্ষের পরিপন্থী হইল, ইহা মোটেই বলা চলে না। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা ভারতীয়গণ চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সাথে সাথে চাহিয়াছিলেন শিক্ষার সম্প্রসারণ। তাহা ছাড়া ভারতীয়গণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও অন্য প্রকারের সংস্কার দাবী জানায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে হার্টগ কমিটি ইংরাজী শিক্ষার মান নীচুতে নামিয়া গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন এবং কি ভাবে উহার মান উন্নয়ন করা যায় তাহার জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু বেসরকারী ভারতীয় মহল বলেন যে ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষার প্রতিক্ষেত্রে—যথা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং প্রস্তাব করেন যে ইংরাজী ভাষা শুধু ঐচ্ছিক হইবে, উহা কখনই আবশ্যিক হইবে না। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা বলেন যে, কোন ভারতীয় ভাষা, যথা হিন্দুস্থানী, ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে শিক্ষা দেওয়া হউক। সরকারী ও বেসরকারী বাদ প্রতিবাদ লইয়া বেশী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এই সকল সমালোচনা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে তৎকালীন ভারতবর্ষ শিক্ষাকে পশ্চিমী প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া নূতন সাজে ঢালিয়া সাজাইতে চাহিয়াছিলেন।

বেসরকারী মহল কর্তৃক কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা

বেসরকারী ও সরকারী মহলের মধ্যে রেষারেষি চলার ফলেই শিক্ষা সম্পর্কিত অভিমতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দৃষ্ট হয়। যদি সরকারী ও বেসরকারী মহল একত্র হইয়া শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে দুইয়ের

সমন্বয় সাধনের পথ

মধ্যে ব্যবধান হয়ত কমিয়া আসিত। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অন্য রকম। দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতা কখনই সম্ভব ছিল না। তৎকালীন একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাও সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় মন্ত্রীগণ প্রকৃতপক্ষে সরকারী সাহায্যে তাঁহাদের কর্মপরিচালনা করেন এবং মন্ত্রীগণ সাধারণ লোকের আস্থাভাজন ছিলেন না। আই. ই. এস. চাকুরিয়া-গণই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯২১-৩৭)

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। এই সময়কার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ।—

(১) **আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিবর্গের কংগ্রেস হয়, তাহাতেও ঐরূপ সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত হয়। ফলে ১৯২৪ সালে সিমলাতে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন বসে ও তাহাতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠিত হয়। ঐ বোর্ডের কার্য—

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

(১) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান
(২) অধ্যাপক আদান-প্রদান
(৩) কার্য পরিচালনাদি ব্যাপারে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন
(৪) এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতির বৈদেশিক স্বীকৃতি সংগ্রহ।
(৫) সাম্রাজ্যের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন।
(৬) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।
(৭) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অন্যান্য কাজ করা। এই বোর্ড নানা ভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্প্রসারিত করিয়াছে ও করিতেছে।

(২) **নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**—১৯১৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী ঘোষিত শিক্ষানীতিতে বলা হইয়াছিল যে, অন্ততঃ প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি নীতি হিসাবে গৃহীত হইবে। তদনুসারে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ্র ও আগ্রা প্রভৃতি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজের চিদাম্বরমে অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মালাই চেট্টিয়ারের নামানুসারে আন্নামালাই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসিত দিল্লীর জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জন্য। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশের কিয়দংশ ও গোয়ালিয়রের জন্য মঞ্জুরী প্রদানকারী (affiliating) আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আর চিদাম্বরমে স্থাপিত হয় আবাসিক আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে মৌঃ মহম্মদ আলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' নামক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৫ সালে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে ঐ সময়ে যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের মধ্যে (১) পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (২) কলিকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দির, (৩) কানপুরের হারনকেট বাটলার টেকনলজিকাল ইনষ্টিটিউট, (৪) দিল্লীর ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (৫) বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর সায়ান্স ও (৬) ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল ফর মাইনস উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বোম্বাইয়ে শ্রীমতী নাথিবাই থাকার্সের উওম্যানস ইউনিভার্সিটি নামক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উহার অধীনে ২টি কলেজ ও ২৩টি বিদ্যালয় ছিল।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ—পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে উহাকে তদানীন্তন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে মঞ্জুরী ও ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হওয়া আদর্শসম্মত নহে। উচ্চ-শিক্ষার প্রেরণা ও পরিবেশ প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অধ্যাপকবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর প্রেরণা পাইতে পারে। তজ্জন্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ই উৎকৃষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ

প্রাচীন যুগে ভারতের অতীত সমৃদ্ধির দিনে এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন অপেক্ষাকৃত প্রচেষ্টাসাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত ধরণের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯২১-৩৭)

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। এই সময়কার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ।—

(১) **আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিবর্গের কংগ্রেস হয়, তাহাতেও ঐরূপ সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত হয়। ফলে ১৯২৪ সালে সিমলাতে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন বসে ও তাহাতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠিত হয়। ঐ বোর্ডের কার্য—

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

(১) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান

(২) অধ্যাপক আদান-প্রদান

(৩) কার্য পরিচালনাদি ব্যাপারে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন

(৪) এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতির বৈদেশিক স্বীকৃতি সংগ্রহ।

(৫) সাম্রাজ্যের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।

(৭) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অন্যান্য কাজ করা। এই বোর্ড নানা ভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্প্রসারিত করিয়াছে ও করিতেছে।

(২) **নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**—১৯১৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী ঘোষিত শিক্ষানীতিতে বলা হইয়াছিল যে, অন্ততঃ প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি নীতি হিসাবে গৃহীত হইবে। তদনুসারে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ্র ও আগ্রা প্রভৃতি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজের চিদাম্বরমে অন্নামালাই...

নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মালাই চেট্টিয়ারের নামানুসারে আন্নামালাই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসিত দিল্লীর জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জন্য। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশের কিয়দংশ ও গোয়ালিয়রের জন্য মঞ্জুরী প্রদানকারী (affiliating) আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আর চিদাম্বরমে স্থাপিত হয় আবাসিক আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে মৌঃ মহম্মদ আলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' নামক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৫ সালে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে ঐ সময়ে যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের মধ্যে (১) পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (২) কলিকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দির, (৩) কানপুরের হারকোর্ট বাটলার টেকনলজিকাল ইনষ্টিটিউট, (৪) দিল্লীর ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (৫) বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর সায়ান্স ও (৬) ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল ফর মাইনস উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বোম্বাইয়ে শ্রীমতী নাথিবাই থাকার্সের উওম্যানস ইউনিভার্সিটি নামক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উহার অধীনে ২টি কলেজ ও ২৩টি বিদ্যালয় ছিল।

(৩) **বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ**—পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে উহাকে তদানীন্তন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে মঞ্জুরী ও ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হওয়া আদর্শসম্মত নহে। উচ্চ-শিক্ষার প্রেরণা ও পরিবেশ প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অধ্যাপকবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর প্রেরণা পাইতে পারে। তজ্জন্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ই উৎকৃষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ

প্রাচীন যুগে ভারতের অতীত সমৃদ্ধির দিনে এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন অপেক্ষাকৃত প্রচেষ্টাসাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত ধরণের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে অনেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মান্দ্রাজে উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয় ও হেইলি কলেজ অফ কমার্স নামক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত বৃত্তিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার বিশেষ পরিবর্তন বা অগ্রগতি ঘটে নাই। তবে উচ্চশিক্ষা পরিচালনার্থ কাউন্সিল ফর পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন আর্টস এ্যাণ্ড সায়ান্স নামক দুইটি কাউন্সিল গঠিত হয়। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩ এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Acts) দ্বারা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আইন দ্বারা এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন দ্বারা পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। সময়ের চাহিদা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে উচ্চতর শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইতে থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ঐ-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির সংখ্যাও দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়।

(৪) **গবেষণা বা রিসার্চ বিভাগের অগ্রগতি**—আলোচ্য সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গবেষণা বিভাগের অগ্রগতি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিয়াছিল। গবেষণা-সংক্রান্ত ডিগ্রী, বৃত্তি ও অনুসন্ধান কার্য দ্বারা লব্ধ তত্ত্বের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং এই কার্যে অগ্রগতি এই দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল।

গবেষণা বা রিসার্চ বিভাগের অগ্রগতি

১৯০২-২১ খৃষ্টাব্দে এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান বিভাগ ও গবেষণা বিভাগের কাজ আরম্ভ হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গবেষণা কার্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ১৯২১—৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গবেষণা কার্যের বিস্তার ঘটায়। গবেষণা বিভাগগুলিতে নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় বিদ্যোৎসাহী ছাত্রছাত্রীগণ ঐ বিভাগে কাজ করিবার জন্য আকৃষ্ট হয় ও উৎসাহিত বোধ করে।

সংযোগ বৃদ্ধি

(৫) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি—উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধূলা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পায়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে তর্ক প্রতিযোগিতারও প্রচলন হয়।

সামরিক শিক্ষা

(৬) সামরিক শিক্ষা—এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর স্থাপিত হয় ও সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় সমরবিদ্যা শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে।

ছাত্রাবাস ও ছাত্র-স্বাস্থ্য

(৭) ছাত্রাবাস ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য উপযুক্ত ছাত্রাবাস স্থাপন এবং ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্যপ্রদ ও নীতিসম্মত আবাসের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিতির জন্য অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। উপরের ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল বলা যায় না—তথাপি এ বিষয়ে যে অগ্রগতি সূচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ ছিল।

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে ইন্টারমিডিয়েট স্তর

আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে মান তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মান হিসাবে পর্যাপ্ত নহে। বিশেষতঃ শিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পরেই কলেজী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিলে অনেক ছাত্র গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মত পোষণ করেন যে ইন্টারমিডিয়েট মান পর্যন্ত শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রাখা হউক। কমিশন বলেন যে কতকগুলি নির্ধারিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংগে ইন্টারমিডিয়েট স্তর যুক্ত করা হোক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সুরু হইবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশের পর। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ক্লাশের সময়কাল হইবে ২ বৎসরের পরিবর্তে ৩ বৎসর। কমিশন বলেন মাধ্যমিক

বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এগজামিনেশান

ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এ্যাণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন স্থাপিত করা হইল।

উক্ত নির্দেশ অনুসারে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে রাখা হয় এবং পৃথক বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এ্যাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন গঠিত হয়। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় উহা কার্যকরী করিতে পাঁচ বৎসর সময় গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত ব্যবস্থা বলবৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ক্রমোন্নতির সময় গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্র এই প্রবর্তিত ব্যবস্থার মধ্যে অনেক অসুবিধা দেখা দিল।

প্রথমতঃ—ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ডিগ্রী কলেজগুলির সহিত ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলি সংযুক্ত থাকায় অন্য ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণী হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আয় হইত। সেই টাকা হইতেই ডিগ্রী ক্লাসের ব্যয় সঙ্কুলান করা হইত। কিন্তু ডিগ্রী কলেজগুলি হইতে যদি ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলি বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহা হইলে ডিগ্রী কলেজগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধা খুব বেশী রকম ভাবে প্রকট হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—ডিগ্রী কোর্সের সহিত সংযুক্ত না থাকায় ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিতে গুণী অধ্যাপকের অভাব দেখা দিল।

তৃতীয়তঃ—শিক্ষাগত ও আর্থিক উভয় কারণেই ডিগ্রী ক্লাস ও ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত থাকা উচিত। তাহার বিশেষ সুবিধা এই যে ডিগ্রী কোর্স হইতে যে আয় হয় তাহা ডিগ্রী ক্লাস একেবারে পরিচালনা করিবার জন্য যথেষ্ট নয়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের আয় হইতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয় পূরণ হইবে। ইহাই শেষ কথা নয়। অনুমানিত করা হইয়াছে এই যে ডিগ্রী ক্লাসের জন্য নিযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতেও পাওয়া যাইবে। যদি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ একেবারে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। কারণ অভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে চাকুরী করিতে রাজী নাও হইতে পারেন।

চতুর্থতঃ—ডিগ্রী কোর্সের কাল বৃদ্ধি না হওয়ায় শুধু এই ব্যবস্থার শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি দেখা গেল না, কিন্তু ৩ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতির উপর অধিক চাপ প্রদান করিবে বলিয়া বাধা পড়িতে লাগিল এবং তাহার ফলে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী এ্যাক্টসমূহ দ্বারা পূর্বোক্ত সংস্কার কার্যত পরিত্যক্ত হইল। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯২৬ সালের এ্যাক্ট দ্বারা ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পরিচালনের দায়িত্ব রাখিতে দেওয়া হইল। ১৯২২ সালে আগ্রাতেই, ১৯২৮ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অনুমতি পাইল। ঢাকা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহার কমিশনের নিয়মকে কার্যকরী করে। ঢাকা বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এ্যাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশান স্থাপিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পরের স্তর হইতে। যুক্তপ্রদেশের বোর্ড অব হাইস্কুল এ্যাণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশান স্থাপিত হয়। ঐ বোর্ডের কাজ হইল হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পরিচালনা, হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পাঠ্যক্রম স্থির করা, হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মঞ্জুরী প্রদান করা এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা। এই প্রদেশে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হাইস্কুলের সাথে সাথে বহু ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ডিগ্রী ক্লাসের তিন বছরের কাঠামো গ্রহণ করা হয় না। পাঞ্জাবে বোর্ড গঠিত পূর্ব উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মফস্বলে পড়িবার সুযোগ করিয়া দেওয়া এবং কলেজে ছাত্রদের ভীড় কমানো। পাঞ্জাবের মফস্বল এলাকায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের অসুবিধা ছিল বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ অনেকগুলি স্থাপিত হয়। বিহারেও অনেকগুলি ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক ভাবে স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবের ও বিহারের শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্টে দেখা যায় যে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আশানুরূপ কাজ হইতেছে না। অতএব সরকার আর এই খাতে অর্থ ব্যয় করিতে অক্ষম। যুক্তপ্রদেশ মাত্র ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশংসা করিয়া বলেন যে এই প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদান ভালভাবে হইতেছে।

ক্রমে বিবৃতি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠিত হয় ও বোর্ড উচ্চ মানের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের সাপ্রু কমিটিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। বিষয়টি পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড

আলোচিত হইয়াছে ও তাহারা ইন্টারমিডিয়েট কোর্সটির এক বৎসর হাইস্কুল কোর্সের সহিত এবং এক বৎসর ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও হার্টগ কমিটি

হার্টগ কমিটি আলোচ্য কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অগ্রগতির উপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কতকগুলি দোষত্রুটি দর্শাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষার ফলে যত সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হওয়া উচিত ছিল, তত সংখ্যক লোক বাহির হন নাই, তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিম্নগামী। অনার্স কোর্স ঠিকভাবে সংগঠিত হয় নাই, পুস্তকাগারের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা অত্যধিক ইত্যাদি। কমিটি সুপারিশ করেন যে দেশের এমন দিন সমাগত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। তবে দেশের উন্নতি হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯২২—৩৭)

উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা খুব বেশী সন্তোষজনক নয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা নানা কারণে মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষকদের আর্থিক ও নিরাপত্তার সমস্যার সমাধান হয় নাই।

এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এই বিস্তৃতির কারণস্বরূপ বলা যায়

(১) সাধারণ জাতীয় জাগরণ।

(২) গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ইতিপূর্বে শহরেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ছিল। এমন কি ছোট শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামের কৃষিজীবিগণ শহরে সন্তানকে শিক্ষালাভার্থে পাঠাইতে ভয় পাইতেন খরচের ভয়ে এবং ছাত্রগণ শহরের বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলের উৎসাহিত ব্যক্তিগণ বড় বড় গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে থাকায়, গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সন্তানগণও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাইতে লাগিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের কারণ

(৩) অনেক স্থলে সমাজসেবকগণ সমাজের মঙ্গলার্থে গ্রামে গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

(৪) পাশাপাশি গ্রামে দলাদলির মধ্য দিয়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

(৫) কোন কোন স্থলে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা জীবিকার অন্য কোনরূপ সংস্থান করিতে না পারিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলিয়া বসেন। এই ভাবেও অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়।

(৬) ইতিপূর্বে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ জাগ্রত হয়। সরকারও তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষালাভের অধিকতর সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে অনেক বিশেষ বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সরকারী চাকুরিতেও তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইল। ফলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হইল।

(৭) স্ত্রীশিক্ষাও অধিকতর বিস্তার লাভ করিল এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে চাকুরী করার বিরুদ্ধ সংস্কার কিছুটা কাটিয়া যাওয়ায় আর্থিক প্রেরণাতেও স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিল।

উপরোক্ত কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কিরূপ বিস্তার লাভ করিল তাহা ১৯২২ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে জানিতে পারা যাইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি*

	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
মঞ্জুরীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,৫৩০	১৩,০৫৬
মঞ্জুরীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৪৭২

অবশ্য এই অগ্রগতিকে উল্লিখিত সময়ের বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। বস্তুতঃ ১৮৮২ সাল হইতে এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

*Nurulla and Nayak এর A Student's History of Education Indian হইতে গৃহীত

বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উল্লিখিত সময়ে তাহা বজায় থাকে বলিলেই ঠিক হইবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যেমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল, ছাত্রসংখ্যাও তেমনি দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষের কিছু বেশী ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ লক্ষে পরিণত হয়, ইহার মধ্যে বালিকার সংখ্যা প্রায় ২½ লক্ষ ছিল।

শিক্ষার মাধ্যম

শিক্ষার মাধ্যম—আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রায় ভারতের সর্বত্র মাতৃভাষা মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু উহার রূপায়ন কয়েকটি কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষায় ইংরাজী ভাষাই মাধ্যম হওয়ায় অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংরাজীকেই শিক্ষার মাধ্যম রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরাজী জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হইত, তাই অভিভাবকগণ চাহিতেন তাহাদের ছাত্রছাত্রী ইংরাজীতে অধিক জ্ঞান লাভ করে।

(৩) যে অঞ্চলে একাধিক মাতৃভাষা রহিয়াছে (যেমন মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল) সেখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম নির্ণয়ের অসুবিধা হেতু উহা কার্যকরী করা কঠিন ছিল। উত্তর প্রদেশে হিন্দি ও উর্দু লইয়া সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিক্ষকের সমস্যা

শিক্ষার সমস্যা
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষা

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল—আলোচ্য সময় মধ্যে উহা বেশ কিছুটা উন্নতি লাভ করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি ও উহাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৮৮ ও ১৪৭ জন। বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার মাদ্রাজে শতকরা ৮৫, দিল্লীতে ৮৩, বাংলায় ২১, বোম্বাইতে ২৩, উত্তর প্রদেশে ৬৭ উড়িষ্যায় ৭০ ছিল। সুতরাং শিক্ষকগণের মধ্যে বেশ উচ্চ অংশই শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন।

এই সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছাড়াও আর একটি সমস্যা বিশেষ ভাবে দেখা দেয়।

বহু বিদ্যালয় আলোচ্য সময়ে স্থাপিত হয়, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নয়। শিক্ষকদের বেতন ছিল খুব কম। চাকুরী সম্বন্ধে নিশ্চয়তার যেমন অভাব ছিল, তেমনই অব্যবস্থা ছিল বৃদ্ধবয়সে শিক্ষকগণের ভরণপোষণের ব্যাপারে। শিক্ষকদের এই অসুবিধা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তৃপক্ষ ঘটনাটা বুঝিতে পারেন যে যদি শিক্ষকগণের চাকুরীর সর্তাবলী শিক্ষকদের অনুকূল করিয়া না রচনা করা যায়, তাহা হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি কখনই হইবে না, অবনতিই হইবে।

শিক্ষকের অন্যান্য অসুবিধা

উল্লিখিত সময়ে শিক্ষকদের অসুবিধা সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি। বিভিন্ন প্রদেশ নানাভাবে শিক্ষকদের অসুবিধা দূর করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে সমস্ত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে। বিভিন্ন প্রদেশে প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সরকার গ্র্যাণ্ট-ইন-এডের সর্তাদির মধ্যে শিক্ষকের উপযুক্ত হারে বেতন দানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকদের চাকুরি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ম্যানেজিং কমিটির সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আরবিট্রেশন বোর্ডসমূহও অনেক প্রদেশে গঠিত হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থাসমূহকে শিক্ষকতা বৃত্তির নিশ্চয়তা বা উৎসাহ প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট মনে করা যায় না। তথাপি এই বিষয়ে যে অবহিতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষকের অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আরও কতকগুলি সমস্যা দেখা দিল। সকল শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে চাকুরি পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল, ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িল। কৃষিজীবী ও কারিগর শ্রেণীর লোকের সন্তানগণ শিক্ষালাভে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের পৈত্রিক বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ না পাওয়ায় তাহারা বেকার হইয়া 'না ঘাটকা না ঘরকা' হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্য দিকে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহারা শিক্ষালাভের পরে অনেক সময়েই গৃহস্থালীতে নিযুক্ত থাকেন। বালিকারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগ শিখিবার সুযোগ পাইত না। তাই তখন বালিকাদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও

বেকার সমস্যা

এবং বালকদের জন্য কোনও একটি কারিগরী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং বিভিন্ন প্রদেশে সাধরণ মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত কোনও একটি কারিগরী শিক্ষা ও মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার প্রতি মনোযোগ এই সময়ে দেখা যায়। কিন্তু মাদ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে এই দিকে কিছুটা অগ্রগতি দেখা গেলেও বাংলা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায় নাই। পাঞ্জাবে কৃষিশিক্ষা ও মাদ্রাজে কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ, বই-বাঁধাই, সূতা কাটা ও বোনা প্রভৃতি বেশ অগ্রগতি লাভ করে।

কারিগরী শিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে একটি প্রশ্ন দেখা দিল—বালিকাগণ বালকদের সহিত একত্রে ও একই বিষয় শিখিবে কিনা। সহ-শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত প্রবল থাকায় বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় কোন কোন স্থানে স্থাপিত হয়। কিন্তু কোথাও কোথাও সহ-শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং ঐ সব বিদ্যালযের জন্য মহিলা শিক্ষিকাও নিয়োগ করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ ঘটায়, অনেকে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ঐ শিক্ষার মান কিছুটা নামিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এই আশঙ্কা যে সত্য, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। তবে গ্রাম্য বালকবালিকাগণ অপেক্ষাকৃত অসুবিধার মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান কিছুটা নিম্ন হওয়া সম্ভব।

মাধ্যমিক শিক্ষা ও হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

হার্টগ কমিটি তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিটি যতটা বিশদ-ভাবে নিরীক্ষা করিয়া দেখেন, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহারা ততটা বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা কয়েকটি বিষয়ের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিটি বলিয়াছেন যে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করাটার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ফেলের সংখ্যা অত্যধিক। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রাদেশিক

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐ পরীক্ষার অপচয় কত বেশী। বোম্বাইতে ঐ বৎসরে শতকরা ৪২ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে এবং সংযুক্ত প্রদেশে পাশ করে শতকরা ৫৫। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের শতকরা এই দুই সীমার মধ্যে অবস্থিত। হার্টগ কমিটি বলেন যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এই অপচয়ের কারণ শ্রেণী-পরীক্ষায় প্রমোশন সম্পর্কে শিথিলতা। নীচের শ্রেণীগুলিতে যদি ছাত্রগণ উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া প্রমোশন পাইয়া যায় তাহা হইলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তাহাদের ফলাফল আশাপ্রদ হইবে না, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

তাহা ছাড়া অন্য দিকেও অপচয় দেখা যায়। যদি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার উদ্দেশ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ, তাহা হইলে ঐ দিকেও অপচয় রহিয়াছে। যাহারা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও বহু ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান হইতে উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ	পাশের শতকরা যাহারা ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশের প্রথম বৎসরে ভর্তি হইয়াছে।
বোম্বাই	৫৯ · ৯
বাংলা	৮০ · ৩
সংযুক্তপ্রদেশ	৪২ · ৮
পাঞ্জাব	৩৫ · ১
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৪ · ৬
মধ্যপ্রদেশ	৬৭ · ৬
আসাম	৪৭ · ৯

যে সমস্ত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে চেষ্টা করে নাই, তাহারা হয় চাকুরী পাইয়াছে না হয় ব্যবসায়ে নামিয়াছে, না হয় সম্পূর্ণ বেকার হইয়া বসিয়া আছে। শিল্প-বিদ্যা, কারিগরী-বিদ্যা কিংবা বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা যদি ম্যাট্রিক কোর্সে থাকিত তাহা হইলে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে ভর্তির সংখ্যা আরও কম হইত।

কমিটি বলিয়াছেন যে বহু ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিয়া, সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় করিতেছে। তাই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন—

(১) ভারতবর্ষের বেশী লোকই কৃষিজীবী, অতএব গ্রাম্য মধ্যস্তরের বিদ্যালয়গুলিতে বেশীর ভাগ ছাত্রকে যাহারা কৃষিসংক্রান্ত গ্রাম্য উপজীবিকা গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা থাকিবে।

(২) মধ্যস্তরের শেষে শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজের জন্য উপযুক্ত কিছু-সংখ্যক ছাত্রদের, সেই রকম শিক্ষাদান করিবার জন্য ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে থাকিবে।

(৩) শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং শিক্ষকদিগকে মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষকদের চাকুরীর সর্তাবলী শিক্ষকদের সুবিধার্থ রচিত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৯২১-৩৭)

আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। ভারতীয় জনসাধারণ নিরক্ষরতা দূরীকরণকে জাতীয় অগ্রগতির সর্বপ্রাথমিক কার্যসূচী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। মহামতি গোখেল প্রমুখ নেতাগণ তাঁহাদের এই মনোভাবকে যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

১৯১৮ সনে ভিটলভাই প্যাটেলের চেষ্টায় বোম্বাই শহরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়, সুতরাং সরকার সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তাহাদের পূর্ব শৈথিল্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত উদ্দেশ্যে শীঘ্রই বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত এ্যাক্টসমূহ রচিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনসমূহ *

বৎসর	প্রদেশ	এ্যাক্টের নাম	ছেলে অথবা মেয়ের জন্য আবশ্যিক	গ্রামাঞ্চল বা সহরাঞ্চলের জন্য
১৯১৯	পাঞ্জাব	প্রাইমারী এডুকেশন	বালিকদের জন্য	উভয় অঞ্চল
,,	সংযুক্ত প্রদেশ	,,	উভয় শ্রেণীর জন্য	মিউনিসিপ্যাল
,,	বাংলা	,,	বালিকদের জন্য (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সংশোধনী আইনে বালিকাদের জন্য	,,
,,	বিহারওউড়িষ্যা	,,	বালকদের জন্য	উভয় অঞ্চল
১৯২০	বোম্বাই	সিটি অব বম্বে পি. ই. এ্যাক্ট	উভয় শ্রেণীর জন্য	শুধু বোম্বাই সহর
,,	মধ্যপ্রদেশ	পি. ই. এ্যাক্ট	,,	উভয় অঞ্চল
,,	মাদ্রাজ	এলিমেণ্টারী এডুকেশন এ্যাক্ট	,,	,, বোঃ শঃ ব্যতীত
১৯২৩	বোম্বাই	পি. ই. এ্যাক্ট	,,	বোম্বাই প্রদেশ
১৯২৬	আসাম	,,	,,	উভয় অঞ্চল
,,	সংযুক্ত প্রদেশ	ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পি.ই. এ্যাক্ট	,,	গ্রামাঞ্চল
১৯৩০	বাংলা	বেঙ্গল (রুরাল) পি. ই. এ্যাক্ট	,,	

যত প্রদেশে যত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাশ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা এই পুস্তকে সম্ভবপর নহে, তবুও বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা গেল। তাহা ছাড়া ঐ আইনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা যাহা ঐ অ্যাক্টের আগে বা পরে ঘটিয়াছিল, তাহারও সামান্য বিবরণ দেওয়া হইল। বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইন সংক্ষিপ্ত ভাবে বিচার করিবার পূর্বে সমস্ত প্রাথমিক আইনের মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ সকল এ্যাক্ট দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা দরকার।

(১) স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রচুর দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(২) ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান উক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিজ এলাকায়

* Nurullah and Nayek রচিত A Students 'History of Education in India হইতে গৃহীত।

শিক্ষা-সংক্রান্ত অভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত বুঝিলে প্রয়োজনমত যে কোন অঞ্চলকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনিতে পারিবেন এবং তদনুযায়ী আইন প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষাকর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৫) যে কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইলে ঐ অঞ্চলের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উক্ত উদ্দেশ্য পূরণার্থ সরকারী সাহায্যের অধিকারী হইবেন।

(৬) বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণতঃ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স ৬+ হইতে ১০+, পাঞ্জাবে হইয়াছিল ৭+হইতে ১১+এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে হইয়াছিল ৬+হইতে ১১+।

(৭) মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চলের অভিভাবকগণকে অবাধ্যতার দরুণ গ্রেপ্তার করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

মাদ্রাজ—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে প্রদেশের মধ্যে একটি অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অনুসন্ধানের যে ফল প্রকাশিত হয় তাহা সত্য সত্যই তথ্যবহুল ও শিক্ষাপ্রদ। উক্ত অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অধিবাসীর সংখ্যা যেখানে ৫০০ এর অধিক, তথায় প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকিলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

বাংলা—এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত তিনটি পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়।

(১) **পঞ্চায়েৎ পরিকল্পনা**—ইহা বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসনবিধি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ অনুসারে গঠিত। প্রতি পঞ্চায়েতে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ঐ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ হয় ১ হাজার টাকা। বিদ্যালয়ের পরিচালনের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়।

(২) **বিস পরিকল্পনা**—বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কিত পরিকল্পনাকে রূপ দান করিবার জন্য ইভান ই বিসকে ভার দেওয়া হয়। তিনি পরিকল্পনা রচনার জন্য পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া দেখেন যে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে একের বেশী বিদ্যালয় রহিয়াছে, পক্ষান্তরে অনুন্নত অঞ্চলে কোনও বিদ্যালয় নাই। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে সমগ্র অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যেক এক মাইল পরিধিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া যে অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশী এবং যেখানে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেইখানে ঐ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিবে দুই পক্ষ—এক পক্ষ হইতেছে প্রাদেশিক সরকার এবং অপর পক্ষ হইতেছে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালিটি। মিউনিসিপালিটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী শিক্ষা সেস্ আদায় করিতে পারিবে।

বিস পরিকল্পনা

(৩) তৃতীয় পরিকল্পনাটি বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ইহা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় (গ্রামঞ্চলের) প্রাথমিক শিক্ষা-আইন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই আইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া স্থির হয়। জেলার সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদ্বারা স্কুল বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব হয়। স্থির হয় যে জেলা স্কুল বোর্ড নিজ নিজ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিবেন। এই এ্যাক্টে বলা হয় যে জেলা স্কুল বোর্ড জেলায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার কল্পে জেলার মধ্যে শিক্ষা সেস বসাইতে পারিবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সরকার হইতে সাহায্যও লাভ করিবে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গ্রামাঞ্চলের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইন

বোম্বাই—বোম্বাইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একটি শিক্ষা-সংক্রান্ত স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়! কমিটিতে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, (১) প্রথমে বালকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তনের জন্য অনুসন্ধান-কার্য চালাইতে হইবে। (৩) প্রদেশের মধ্যে যে সব

বোম্বাইয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

অঞ্চল বিদ্যালয়হীন আছে, সেই সব অঞ্চলে ১০ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর এক দশমাংশ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পুরণ করিতে হইবে। (৪) প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করিতে হইবে। তাহার পরে ধীরে ধীরে সেইখানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। কমিটির হিসাব অনুসারে এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হইলে ১১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই টাকার মধ্যে ৭৭ লক্ষ টাকা সরকারের দেয়।

বিহার—১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্র হইয়া শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

(ক) প্রতি স্কুল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ও তথ্যজ্ঞাপক মানচিত্র রক্ষা করিবেন।

(খ) প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে ২৫ জন করিয়া ছাত্রছাত্রী থাকিবে।

(গ) প্রতিটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ জন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন।

(ঘ) যে সমস্ত অঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায় আছে, সেই সমস্ত স্থানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ রাখিতে হইবে।

(ঙ) সরকার যেহেতু রাজী নয়, অতএব বোর্ডকেই, অবৈতনিক শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে, সেই ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবে।

(চ) সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে এখনও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় আসে নাই, কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে উহা প্রবর্তিত হইতে পারে মাত্র।

পাঞ্জাব—প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে এই প্রদেশে স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর ফল লাভের প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জেলাবোর্ডের জন্য সরকার নির্ধারিত অর্থসাহায্যের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করেন। ইহা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইহাদ্বারা ইহাই স্বীকৃত হইয়াছিল যে যে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অধিক অর্থ প্রয়োজন, সেই জেলা অধিক অর্থ পাইবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারেও সরকার খুবই সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে

পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে ঐ বিদ্যালয়ে কত জন ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় আসে। যদি যত জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে ধরিবে তাহার শতকরা ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশ—এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় জেলাবোর্ড-সমূহকে সরকারী সাহায্য দান পরিকল্পনা প্রণিধানযোগ্য। এই পরিকল্পনার প্রতি বোর্ডের আয় অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের জন্য বাঁধা বরাদ্দ করা হইত এবং সেই অনুসারে সরকারী সাহায্যও পাওয়া যাইত।

প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতএব প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আরও বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা হইতেছে এই অবস্থা আমরা দেখিলাম। কিন্তু শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা এই অভিমত পোষণ করেন যে যদি প্রাথমিক শিক্ষার বেশী বিস্তার হয় তাহা হইলে সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি গুণগত অনগ্রসরতার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্যই ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য হার্টগ কমিটির নিয়োগ করা হয়।

হার্টগ কমিটি অন্যান্য শিক্ষাস্তরের সম্বন্ধে যেমন মন্তব্য ও সুপারিশ করেন, সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও মন্তব্য ও সুপারিশ করেন। কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের সমস্যা

হার্টগ কমিটির প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত অভিমত

এবং গ্রামাঞ্চলে এত বেশী দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কূপমণ্ডুকতা যে সাধারণ লোক সহজে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। বিদ্যালয়ের পরস্পর দূরত্বও খুব বেশী এবং সেই কারণে বিদ্যালয়ে যাতায়াতও খুব অসুবিধাজনক। তাহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বসতি খুবই বিরল এবং সেইখানে বিদ্যালয় পরিচালনার উপযোগী ছাত্রসংখ্যা হওয়াও মুশ্‌কিল। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি, আবহাওয়ার বিরুদ্ধতা ইত্যাদি অসুবিধাজনিত বাধাও বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বাধা নিষেধও অত্যন্ত প্রবল। জাতিভেদের

প্রাবল্য রহিয়াছে, এই কারণে একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বর্ণের শিশুরা পড়িতে চায় না। কমিটি ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রথম শ্রেণীর প্রতি এক শত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন পঞ্চম শ্রেণীতে যাইয়া পৌছে। ইহার কারণ অনেক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে দুই এক বৎসর মাত্র পড়িয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ও পড়া ছাড়িয়া দেয়। তাহা ছাড়া প্রতি শ্রেণীতে বহু ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ থাকিয়া যায়। এ দিকে যাহারা ২।১ বৎসরের জন্য লেখাপড়া শিক্ষা করে, তাহারা চর্চার অভাবে অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যায়। ফলে তাহারা যে নিরক্ষর ছিল সেই নিরক্ষরই থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে অনেক প্রদেশে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে এক শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বেশী। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এমন কোন শিক্ষা দান কৌশল শিক্ষা করেন নাই, যাহার ফলে তাঁহারা একাই পাঁচটি শ্রেণী সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। আবার কোনও কোনও অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কম। আবার কোনও স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ শিশুশ্রেণী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিশুরা যাহা শিক্ষালাভ করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষার দিক হইতে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। শিশুরা অর্জিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে।

শিক্ষাদান পদ্ধতিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নত ধরণের নয়, তাহার কারণ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতনও এত অল্প যে ঐ বেতনে সুযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সংখ্যাও অত্যল্প। এই সময়ে বাংলাদেশে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭৫ টির কিছু বেশী। এতএব বৎসরে একবার করিয়া পরিদর্শকের একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সৌভাগ্য হইত না। মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সেইখানে অনেকেই উহা মান্য করে না। স্থানীয় বোর্ডও ঐজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রতিও দৃষ্টি প্রদান করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম গ্রাম্য জীবনের উপযোগী নয়। উহা গ্রাম্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করিতে

হইবে। কমিটি ইহাও মনে করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষারও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

হার্টগ কমিটির সুপারিশসমূহ—হার্টগ কমিটি ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসন্ধান করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং সাথে সাথে সুপারিশও করিয়াছেন। কমিটি সুপারিশে বলেন যে, শিক্ষা পরিচালনার বেশী বিকেন্দ্রীকরণ উচিত হইবে না। স্থানীয় বোর্ডের হাতে না থাকিয়া সরকারের হাতেই শিক্ষার কর্তৃত্বভার বেশী থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ কমিটি সুপারিশ করেন, প্রাথমিক শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চার বৎসর করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি করিতে হইবে। চতুর্থতঃ শিক্ষকদের বেতনের হারও বর্ধিত করা প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ শিক্ষকদের শিক্ষণ লাভের সময় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ঝালাই পাঠ (Refreshers Courses) গ্রহণ করিবেন। ষষ্ঠতঃ বিদ্যালয়ে কার্যকাল এবং ছুটি স্থানীয় জীবন ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করিতে হইবে। সপ্তমতঃ পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং উহা গ্রাম্য জীবনের উপযোগী করিয়া রচনা করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হইবে যেন স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। অষ্টমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষাদানের দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে। এই শ্রেণীতেই সবচেয়ে বেশী অপচয় ও স্থিতাবস্থা দেখা যায়। অপচয় ও স্থিতাবস্থা যাহাতে হ্রাস পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নবমতঃ বিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিবে গ্রামোন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে। দশমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যালয় বৎসরে একবার পরিদর্শিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া কোন অঞ্চলে তাড়াতাড়ি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা না করিয়া প্রথমে সেইখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিবেশ রচনা করিতে হইবে।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা—হার্টগ কমিটির রিপোর্ট সরকারী মহল অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। হার্টগ কমিটি বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তাদের নিকট হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং প্রায় প্রত্যেক অধিকর্তার রিপোর্টেই প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও স্থিতাবস্থা,

সরকারী অভিমত

স্থানীয় বোর্ডগুলি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অধিক কর্তৃত্ব প্রকাশ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অভাব ইত্যাদির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ রহিয়াছে। এই কারণে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের উপর বেশী গুরুত্ব না দিয়া ইহার ভিত্তি দৃঢ়ীকরণের জন্য উৎকর্ষ বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকারী অভিমত ছিল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান। সরকারী কর্মচারীগণ হার্টগ কমিটির রিপোর্টেও অনুরূপ সুপারিশ দেখিয়া হার্টগ কমিটির সুপারিশসমূহ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। আরও একটি বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণ হার্টগ কমিটির সুপারিশ অভিনন্দিত করে। হার্টগ কমিটি বলেন যে স্থানীয় বোর্ডের উপর শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও মানের নিম্নগতি সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীগণও ঐ একই কথা মনে করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানের নিম্নগতির জন্য স্থানীয় বোর্ডকেই দায়ী করেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তারে বোর্ডই বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বোর্ডসমূহের অযোগ্যতার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিণতি ঐরূপ হইয়াছিল।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের প্রতি বেসরকারী নেতৃবৃন্দের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। বেসরকারী মহল হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার একান্তভাবেই প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা উহার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বেসরকারী মহল দেখান যে গণশিক্ষার অগ্রগতি ভারতবর্ষে অত্যন্ত শ্লথ ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। ভারতবর্ষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষিতের হার ছিল মোট শতকরা ৩.৫, এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ৮এ, অর্থাৎ প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ১ ভাগও বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ব্যাপার। এতএব শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা নহে।

বেসরকারী অভিমত

বেসরকারী অভিমত প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে ছিল। বেসরকারী মহলের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা সরকার পরিচালিত না হইয়া স্থানীয় বোর্ডের হাতে থাকাই ভাল। বেসরকারী মহল মনে করেন যে

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয়ের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা ভুল সংখ্যাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেসরকারী মহলের মতে শিক্ষার ব্যাপ্তিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের উপর সরকার বেসরকারী মহলের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমালোচনা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে এবং ব্যবধান যথাসম্ভব দিনে দিনে বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার সমর্থন করেন নাই, কমিটি বলিয়াছেন প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সতর্কতার মনোভাব অবলম্বন করিতে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়াও গুণগত বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা চলিতে পারিত বলিয়া বেসরকারী মহল মনে করিয়াছিলেন। এই কারণেই কমিটি জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারেন নাই। কিন্তু হার্টগ কমিটির রিপোর্টের মধ্যে অনেক ভাল কথা ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাঠ্যসূচীর সংশোধন, বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সুপারিশসমূহ খুবই মূল্যবান ছিল এবং পরবর্তী শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে কমিটির এই সুপারিশগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

১৯২৭—৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি—হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ঐ সময়ে ভারতের জনগণের আর্থিক অবস্থার শোচনীয় পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার খুবই ব্যাহত হয়। নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলেই উল্লিখিত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে।*

	১৯২১—২২	১৯২৬—২৭	১৯৩১—৩২	১৯৩৬—৩৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৫৫,০১৭	১,৮৪,৮২৯	১,৯৬,৭০৮	১,৯২,২৪৪
ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা	৬১,০৯,৭৫২	৮০,১৭,৯২৩	৯১'৬২,৪৫০	১০২,২৪,২৮৮

* Nurullah & Nayek এর A students' History of Education in India হইতে অংশ গৃহীত।

উপরের সংখ্যাগুলিকে হইতে দেখা যাইবে যে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬—২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও প্রায় ২০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩১—৩২ এবং ১৯৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই, বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু ছাত্রসংখ্যা ১৯২৬—২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সমান হারে বাড়িয়া গিয়াছে।

অতঃপর আমরা উল্লিখিত সময়ে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিশেষ কোন আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখিতে পাই না। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছু কিছু গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইতে দেখিতে পাই। অন্যান্য প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে। আবশ্যিক প্রাথমিক প্রথার প্রবর্তনের অগ্রগতি খুবই শ্লথ। এই ভাবে চলিলে ভারতবর্ষে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে বহু বৎসর সময় লাগিবে। তাহা ছাড়া আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা পছন্দসই নয়। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিশুসংখ্যার মাত্র শতকরা ৬০ হইতে ৮০জন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে। এই সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যে অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই, সেই সমস্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়েও ভর্তি হয়। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি-সংখ্যাও সন্তোষজনক নয়, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেরূপ হারে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে, প্রায় সেই হারেই আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চলেও দেখা যায়। তাহা ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর উপযুক্ত চাপও দিতেছেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য না হইয়াছে ক্ষেত্র প্রস্তুত, না হইয়াছে আগ্রহ সৃষ্টি।

উল্লিখিত সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতি কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা পূর্বে ছিল শতকরা ৪৪ জন, ইহা এই সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৫৭তে। শিক্ষার উৎকর্ষতার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

চিকিৎসা বিদ্যা

বাংলাদেশে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার কাজ প্রথমে স্থরু হয়। ঐ সময়ে কলিকাতায় নেটিভ মেডিকেল ইউনিট স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় বিলাতী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানী চিকিৎসাবিদ্যাও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শুধু বিলাতী চিকিৎসা বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চলিতে থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর লাহোরে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে বোম্বাইয়ে ছিল লাইসেনসিয়েট কোর্স, অন্যান্য স্থানে ব্যাচিলার অব মেডিসিনের কোর্স। এই সমস্ত কলেজ ছাড়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে সরকারী মেডিকেল স্কুলও ছিল, যেমন বাংলা দেশে ৪টি, মাদ্রাজ ১টি, বোম্বাইয়ে ৩টি, পাঞ্জাবে ১টি এবং উত্তর প্রদেশে ১টি। সরকারী মেডিকেল স্কুল ছাড়া বেসরকারী মেডিকেল স্কুলও কয়েকটি ছিল; যথা—বাংলাদেশে ৪টি, আসামে ১টি, সিন্ধুতে ১টি, পাঞ্জাবে ৪টি বেসরকারী মেডিকেল ছিল। মাদ্রাজে মিউনিসিপালিটি পরিচালিত একটি মেডিকেল স্কুল ছিল। বেসরকারী মেডিকেল স্কুলগুলির মধ্যে ৪টি সরকারীসাহায্য পাইত। ইহাদের মধ্যে একটিতে হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যা এবং দুইটিতে মুসলমানী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রথম দিকে ভারতীয়গণ চিকিৎসা-বিদ্যা লাভ করিতে, বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। ইহার কারণ ছিল সংস্কার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ভারতীয়গণ সংস্কারমুক্ত হইয়া চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণে ব্রতী হইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৪৬৬ এবং মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৭২৭। ইহাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল মেডিকেল কলেজে ৭৬ জন এবং মেডিকেল স্কুলে ১৬৬ জন।

ইহার পর হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুলে যাইয়া

ছাত্রছাত্রীগণ ভীড় জমাইতে থাকে। ফলে এই শিক্ষার প্রসারও হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তাহাদের মধ্যে ৭টি সরকারী, ২টি বেসরকারী ১টি বোম্বাই কর্পোরেশন এবং ১টি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। মেডিকেল স্কুলের সংখ্যাও ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং মেডিকেল স্কুলের সংখ্যা হয় ৩০টি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মহিলাদের জন্য লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতায় ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন স্থাপিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এবং এই স্থানেই অল-ইণ্ডিয়া-ইন্‌সিটটিউট অব হেলথ এ্যাণ্ড হাইজিন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হেলথ এ্যাণ্ড হাইজিনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স শিক্ষাদানের কাজ এবং রিসার্চের কাজ হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিদ্যা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল কলেজে এবং স্কুলে যথাক্রমে ৫ হাজার এবং ৭ হাজার। মহিলা বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৪৭ ও ৯৩৬।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে কলিকাতা কাউন্সিল অব এডুকেশনে প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদাতা অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ঐ পদ পূরণ করিবার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য দুইটি প্রস্তাব আসে একটি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা, অপরটি একটি পৃথক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা, পরের প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা হয়। পরে উহা স্থানান্তরিত করা হয় এবং হাওড়ার শিবপুরে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বাংলাদেশ হইতে অনেক আগেই আরম্ভ হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এডুকেশন সোসাইটির অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এলফিনষ্টোন ইন্‌ষ্টিটিউটে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হয়। বোম্বাইয়ে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুনায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যন্ত্রবিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত কৃষি ও বনবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হয়। মাদ্রাজে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে একটি সার্ভে স্কুল ছিল। ঐ স্কুলটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত করা হয়। এদিকে

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহারানপুরে সেচ বিভাগ সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি শ্রেণী খোলা হয়। পরে ঐ শ্রেণীটি রুরকীতে স্থানান্তরিত হয় এবং উহা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লাহোরে একটি সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে পাটনাতেও একটি অনুরূপ কলেজ স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং করাচীতে দিন্‌শা কলেজের শাখারূপে একটি বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কলেজ গড়িয়া উঠে। ইহা ছাড়া ভারতে অনেক টেকনিক্যাল স্কুলও স্থাপিত হয়।

আইন শিক্ষা

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে মুসলমানী আইন শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দু আইন শিক্ষা দিবার জন্য বেনারস সংস্কৃত কলেজে অতিরিক্ত সরকারী সাহায্য দান করা হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় আইন শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজের সঙ্গে শাখা-শ্রেণী হিসাবে আইন-শ্রেণী গড়িয়া তোলা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় স্থায়ী আইন-শ্রেণী স্থাপিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই সময়ে আইনের প্রফেসারের পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০১-০২ হইতে আইন শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টের উভয়ের পরিচালনাধীনে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পাশ করিবার পর হাইকোর্টের কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য পৃথক পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজ সরকার এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থায়ী ল-কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটি সহকারী ল-কলেজ স্থাপিত হয়। ঐখানে বৈকালিক শ্রেণীতেও কাজ চলিত। কিন্তু মধ্য-প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাতে অন্যান্য কলেজের সাথে ল-কলেজের কাজ চলিত। আসামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাথে ওকালতি শিখিবার শ্রেণী যুক্ত ছিল। আইনের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে হইলে কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজে বি. এ. পরীক্ষা পাশের পর ২ বৎসর পড়িতে হইত, পরে এই প্রথার পরিবর্তন হয় এবং আইনের কোর্স তিন বৎসর ব্যাপী হয়। বোম্বাইয়ে ও পাঞ্জাবে আইনের কোর্স ৩ বৎসরের ছিল। প্রতি বৎসর একটি করিয়া পরাক্ষা দিতে হইত। গ্রাজুয়েট না হইলেও আইন পড়া চলিত এবং সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সিয়েট অব ল খেতাব পাওয়া যাইত। ঐ

খেতাব পাইয়া যদি কেহ পরে বি. এ. পাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আইনের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারিতেন।

কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভ্যগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি কৃষি-সম্মেলন হয়, ঐ সম্মেলনেও একই প্রস্তাব পুনরায় গৃহীত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ভোয়েলংকর এই দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি করিয়া মন্তব্য করেন যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষার সংযোগ করার বিশেষ প্রয়োজন। পরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কৃষি সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। এই সময় নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকগণকে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা-দেওয়ার কথা আলোচিত হয়। তাঁহাদের সম্পর্কেও কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত হয় যে কলিকাতা, বোম্বাই মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোনও স্থানে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। মাদ্রাজের সেইদাপেট শহরে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। কানপুর ও নাগপুরে কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানের জন্য ডিগ্রীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুসায় কৃষি-সম্পর্কিত সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট খোলা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট অব এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রী এবং ডেয়ারিং প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া কানপুর, নাইনি, কোয়েম্বাটুর, লায়ালপুর ও নাগপুরে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয় এবং পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা কৃষি-বিভাগ পৃথক কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উড ও এ্যাবট রিপোর্ট

১৯২১ হইতে ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার ক্রমপর্যায়ের উন্নতি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। এই সময়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভারত সরকার এই কারণে ব্রিটিশ সরকারকে কয়েক জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌কে এই ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইংলণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন দুই জন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌কে এই

উড ও এ্যাবট রিপোর্ট

কারণে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষার প্রাক্তন পরিদর্শক মিঃ এ. এ্যাবট এবং অনুসন্ধান অধিকর্তা মিঃ এস্. এইচ. উড. তাঁহারা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের রিপোর্ট দান করেন। এই রিপোর্টটির শিরোনামা ছিল, "Report on Vocational Education in India, with a section on General Education and Adminstration".

এই রিপোর্টটি কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তার পরিচয় দেয়, আবার প্রাথমিক ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা মূল্যবান সুপারিশ করে।

সাধারণ শিক্ষা ও প্রশাসন সম্পর্কে সুপারিশ

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশু-শ্রেণীসমূহে পুরুষ শিক্ষকের পরিবর্তে যথাসম্ভব মহিলা শিক্ষিকা দেওয়া হইবে।

(২) শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের সাধারণ ও স্বাভাবিক আগ্রহ ও কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। এই স্তরে পুস্তকের প্রভাব থাকিবে কম।

সাধারণ শিক্ষার জন্য সুপারিশ

(৩) গ্রাম্য নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীসমূহ ছাত্রদের আবেষ্টনীসমূহের সঙ্গে বিজড়িত থাকিবে।

(৪) মাতৃভাষাসমূহ হইবে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু ইংরাজী হইবে বিদ্যালয়সমূহের আবশ্যিক শিক্ষণীয় ভাষা।

(৫) ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস করিতে হইবে।

(৬) বিভিন্ন ধরণের সৃজনাত্মক কর্ম প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৭) চিত্রকলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

(৮) দৈহিক শিক্ষা শুধু নিয়ন্ত্রিত খেলাধূলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন মূলক শিক্ষণে সন্নিবেশিত থাকিবে না। খেলার মাঠ হইবে বালক ও কিশোরদের জন্য আরামদায়ক ও শ্রমাপহরক স্থান।

(৯) শিক্ষক-শিক্ষণ হইবে দুই পর্যায়ের, প্রথম পর্যায় হইবে শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্বে শিক্ষণ গ্রহণ এবং দ্বিতীয় পর্যায় হইবে শিক্ষকতা গ্রহণের পর কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ঝালাই (Refresher course) পাঠ গ্রহণ।

(১০) পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার মত সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার সঙ্কোচন কিছুতেই চলিবে না।

(১১) কিছু পরিদর্শক এবং শিক্ষকদের বিদেশে যাইয়া শিক্ষণ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

অভিজ্ঞ ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্‌গণ **কারিগরী ও বৃত্তিমূলক** শিক্ষার উপর যে সুপারিশগুলি করিয়াছেন, তাহা হইল নিম্নরূপ।

(১) এই রিপোর্টের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কারিগরী শিক্ষাকে বৌদ্ধিক শিক্ষার সমপর্যায়ে স্থাপন করা। একটি ধরণের শিক্ষা অপরটি হইতে কোন কারণেই নিকৃষ্ট নয়।

কারিগরী শিক্ষার জন্য সুপারিশ

(২) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী-শিক্ষা, শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নয়, পরন্তু সাধারণ শিক্ষা হইতেছে একই শিক্ষার প্রথম দিকের এবং কারিগরী শিক্ষা হইতেছে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন গতিপথে একটির পর আর একটি।

(৩) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা একই বিদ্যালয়ে দেওয়া সমীচীন নয়, কারণ দুই ক্ষেত্রের ছাত্রগণের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন।

(৪) কারিগরী শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়। সাধারণ শিক্ষায় বিদ্যালয় সাধারণভাবে ছাত্রকে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া ছাত্রকে গড়ে, এই কারণে শিক্ষা ও বাণিজ্যিক বিভাগগুলি এই কারিগরী বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সহযোগিতা করিবে ও সম্পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতেই কারিগরী শিক্ষা ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু এইরূপ সহযোগিতা ভারতবর্ষে বিরল।

(৫) কারিগরী শিক্ষার একটি সরকারী উপদেষ্টা সমিতি প্রত্যেক প্রদেশে গঠন করিতে হইবে। এই উপদেষ্টা সমিতিতে থাকিবেন, শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, শিল্পবিভাগের অধিকর্তা, কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের দুই তিন জন অধ্যক্ষ এবং চার পাঁচ জন দক্ষ ব্যবসায়ী। এই সমিতি প্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য-বিভাগের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবেন।

(৬) কারিগরী বিদ্যালয়সমূহকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, একটি হইবে সিনিয়র এবং অপরটি জুনিয়র শিল্প-বিদ্যালয়। অষ্টম শ্রেণী পাশ করিবার পর ছাত্রগণ জুনিয়ার বা নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। আর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর ছাত্রগণ যাইতে পারিবে উচ্চ শিল্প বিদ্যালয়ে।

(৭) যাহারা চাকুরীতে পূর্বেই প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা দানের জন্য শিল্প-বিদ্যালয়গুলি তাহাদের সুবিধার জন্য দিবাভাগে ও রাত্রিভাগে যখন বিদ্যালয়গুলি খোলা রাখা দরকার তখন খোলা থাকিবে।

(৮) ভারতবর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে চিত্রকলা শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে, ফলে কলা সম্পর্কিত ভারতীয় ঐতিহ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব শিল্প ও কলা শিক্ষা দিবার জন্য প্রভূত বন্দোবস্তু হওয়া অত্যন্ত দরকার। শুধু-যে যে বিদ্যালয়ে শিল্প ও কলা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সম্প্রসারণই হইবে না, প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৯) যে স্তরে আগমনের পর ছাত্রগণ কারিগরী বা বৃত্তি শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইবে, সেই স্তরে তাহাদিগকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহারা কারিগরী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত কিনা। বিদেশে অন্যান্য স্থানে যে ভাবে ছাত্রদের উপযুক্ততা বিচার করা হয়, সেই ভাবে এই দেশেও ছাত্রদের উপযুক্ততা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

উড এবং এ্যাবটের সুপারিশসমূহ বহু দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ইত্যাদি কারণের জন্য কার্যকরী করা হয় নাই। এই সময়ে কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজের জন্য অনেক কেন্দ্রে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, প্রাদেশিক সরকার কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও এই বিষয়ে দৃষ্টিদান করেন। কিন্তু উড ও এ্যাবটের সুপারিশ অনুযায়ী যে ধারা অবলম্বন করিয়া কারিগরী শিক্ষা দেওয়া দরকার, ঠিক সেই ভাবে শিক্ষাদান করা হয় নাই। ১৯৪৬-৪৭ সনে ভারত সরকার দিল্লীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়কে "দিল্লী পলিটেকনিকে" পরিবর্তিত করিয়াছেন; এই পলিটেকনিক স্কুল হইতে চারিটি শাখা-বিদ্যালয় বাহির হইয়াছে, যথা—(১) ১০-১১ বৎসরের ছাত্র হইতে ১৬-১৭ বৎসরের

ছাত্রদের জন্য একটি শিল্প-বিদ্যালয়, (২) ১৭ বৎসরের উর্দ্ধে যুবকদের জন্য কারিগরী বিদ্যালয়, (৩) বাজারের সাধারণ শিল্পীদের পুত্রকন্যাদের জন্য একটি গ্রাম্য শিল্প-বিভাগ ও (৪) বিভিন্ন ধরণের বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র। এই বিদ্যালয়গুলি উড এবং এ্যাবট রিপোর্টের সম্পূর্ণ সুপারিশ অনুযায়ী সৃষ্টি হইয়াছে। এই শিল্পবিদ্যালয় হইতে যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাহির হইত, তাহারা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করিত। উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ২ বৎসরের জন্য। এইখানে স্কুল-ফাইনেল পাশ ছাত্রগণ ব্যবহারিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করিত। গ্রাম্য শিল্প-শিক্ষা বিভাগে এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে শারীর-শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, কাঠের কাজ, বয়ন-শিল্প, ধাতু-শিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষার অগ্রগতি (১৯৩৭-৪৭)

স্বাধীনতার পূর্বযুগ

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ। নানা জটিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা উত্তেজনা, আশংকা ও ভীতি-বিহ্বলতায়, নানা অসন্তোষ, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় শাসক ও শাসিত উভয় গোষ্ঠিকেই দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। ইংরেজদের হাত হইতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল; ভারতবাসী সেই ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করিতেছিল, আবার ভারতবাসী যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, সেই ক্ষমতা তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া নেওয়াও হইয়াছিল (মন্ত্রীত্ব ত্যাগ ও সেকসন ৯৩র শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন)। এদিকে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল। রাজনৈতিক ঘটনাবলী জটিল আকার ধারণ করিয়া রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সনের মণ্টফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী শাসনসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে হস্তান্তরিত (Transferred) ও রক্ষিত (Reserved) বিষয়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ঐ আইনে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ আসিলেও, প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মন্ত্রীদের বিশেষ কোন ক্ষমতাই প্রশাসনিক ব্যাপারে ছিল না। কারণ অর্থ ছিল রক্ষিত বিষয়ের অন্তর্গত এবং ব্রিটিশ সরকার উহা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি সাধারণ লোকের আস্থাভাজন নহেন এবং তিনি সরকারী সচিব আই. ই. এস দ্বারাই পরিচালিত হইতেছেন। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে আমরা দেখিতে পাই যে হস্তান্তরিত ও রক্ষিত বিষয়ের অবসান ঘটিয়াছে এবং প্রাদেশিক শাসনভার সম্পূর্ণভাবে আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীবর্গের উপর ন্যস্ত।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন

এই নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনে ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতেই প্রশাসন ক্ষমতা থাকিবে। গভর্ণরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারগণের অস্তিত্ব বিলোপ হইল। অবশ্য গভর্ণরের হাতে কতকগুলি ক্ষমতা রহিল, যাহার ফলে মন্ত্রীবর্গের নির্দেশ নাকচ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সময়ে প্রতিদিনকার শাসন-কার্যকালে উহা প্রয়োগ করা হইবে না বলিয়া ব্রিটিশ সরকার কথা দেন। তবে যদি ব্রিটিশ সরকার মনে করেন যে উহা ভারতবর্ষের মঙ্গলের পরিপন্থী হইবে, তবে গভর্ণর ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এই ভারত সংস্কার আইন কার্যে পরিণত করা হইলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে। এবার অন্ততঃপক্ষে এই কয়টি প্রদেশে শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুত হইবে বলিয়া আশা করা গেল, কারণ অর্থ ও নীতি কোন দিক হইতেই প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে বলিয়া মনে করা হইল না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত করা গেল না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস নির্দিষ্ট প্রদেশগুলিতে শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইল। মিত্র পক্ষের যুদ্ধ ও শান্তির উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেসের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেসীমন্ত্রীগণ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন এবং প্রদেশগুলিতে ৯৩ ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার শাসনভার গ্রহণ করেন। একদিকে যুদ্ধ চলিতেছে, অন্য দিকে দেশের অভ্যন্তরে নানা রকম রাজনৈতিক অশান্তি। এই কারণে দেশে শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয় নাই বলিতে পারা যায়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ভারত ছাড় (Quit India) আন্দোলনে ভারতবাসীকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়, শিক্ষার জন্য নূতন করিয়া সংগঠনও বাধাপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র নির্দিষ্ট প্রদেশসমূহে পরিচালনা করেন। যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেই সমস্ত স্থানেও পরে শিক্ষা-মন্ত্রীগণ শিক্ষা ব্যাপারে তৎপর হইয়া উঠেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি মন্থর হওয়ার বিশেষ কারণ হইল এই যে যুদ্ধের শেষের দিক হইতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশের মধ্যে এমন

একটি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখা দিল যে অন্যান্য সমস্ত গঠনমূলক কাজের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর কাহারও আর রহিল না।

উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার যে অগ্রগতি দেখা যায়, তাহা আমরা বিভিন্ন দিক হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিব। প্রথমতঃ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইন ও শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ উচ্চতর মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা, তৃতীয়তঃ বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি এবং চতুর্থতঃ বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত সংস্কার আইন ও শিক্ষা

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত সংস্কার আইন অনুযায়ী শিক্ষা প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু এই আইন অনুযায়ী শিক্ষা শুধু প্রদেশের হাতেই থাকিবে না। ইহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থারও অন্তর্গত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্টফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত এলোমেলো ছিল, কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইন ভারতের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করে, একটি কেন্দ্রীয়, অপরটি প্রাদেশিক।

(ক) শিক্ষা-সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ হইতেছে নিম্নরূপ।

(১) কলিকাতা মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলিকাতা এবং ইম্পিরিয়েল ওয়ার মিউজিয়ম।

(২) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) কেন্দ্রীয় শাসিত দেশসমূহে শিক্ষা-ব্যবস্থা

(৪) প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা

(৫) প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ

(৬) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

(খ) প্রদেশের অধীন শিক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ ছাড়া যাবতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯৩৭—৪৭)

এই দশকে নানা সঙ্কট চলিতে থাকিলেও এবং শিক্ষার অন্যান্য পর্যায়ে অগ্রগতি আশানুরূপ না হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। অবশ্য দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার বিস্তারের উপযোগী পরিবেশ ও নানা সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণগুলি এইরূপ :—

আলোচ্য সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

(১) জাতীয় আন্দোলন সুরু হইয়াছিল দীর্ঘকাল আগে। এতকাল পর্যন্ত তাহা শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে সীমিত ছিল। ১৯৩০-এর পর হইতে তাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ১৯৩৭-এর স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর আশা ও উৎসাহ অনেক বাড়িয়া গেল। জনসাধারণের চিত্তের জাগরণ ঘটিল। শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,২৬,২২৮ জন (বর্তমানে পাকিস্তানে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যাসহ)। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়াও এই সংখ্যা দাঁড়াইল ২৪১,৭৯৪ জন (পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যতিরেকে)।

শিক্ষিত জনসাধারণের চাহিদা

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ায় নানা ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত জনসাধারণের চাহিদা দ্রুত বাড়িতে লাগিল। যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এমন বিষয় সমূহের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। সরকারের পক্ষ হইতে সেই বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরও দরকার হইল। ফলে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া গেল।

মুক্তহস্তে দান

(৩) যুদ্ধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিপুল মুনাফা লুটিয়া লইল। তাহাদের মুনাফার একাংশ দানের আকারে শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইতে লাগিল। এই ভাবে অর্থপুষ্ট হইয়া শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতে লাগিল।

শিল্প-বিস্তার ও শিক্ষার চাহিদা

(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রুত শিল্প-বিস্তার ইত্যাদি কারণে নতুন নতুন নগর পত্তন হইতে থাকিল। পুরাতন নগরগুলিও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নাগরিক সমাজে শিক্ষার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ফলে উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি—১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫টি। অর্থাৎ প্রায় ৭৯ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মোট ১৫টি। কিন্তু ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই দশ বছরে আরও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় বাড়িল। পূর্বে প্রায় প্রতি সাড়ে পাঁচ বছরে একটি করিয়া সংখ্যা বাড়িয়াছে অথচ এই সময় ১০ বছরে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় হইল—ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৭), উৎকল (১৯৪৩), সাগর (১৯৪৬), রাজপুতানা (১৯৪৭)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাথাভারী (Top-heavy)। একথা অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্ত মাথাভারী। অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ে যে বিপুল পরিমান অর্থব্যয় হয় তাহার তুলনায় অনেক কম পরিমাণ অর্থ প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয়িত হয়। অবশ্য টাকার অঙ্কেই শুধু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে একথা অবশ্য বলা যায় যে, উচ্চতর পর্যায়ে যতখানি মনোযোগ দান করা হইয়াছে, প্রাথমিক পর্যায়ে সে তুলনায় কিছু হয় নাই। ফলে ভিত্তি হইয়াছে কাঁচা। ১৯৩৭-৪৭ এই দশকের শিক্ষা অনুধাবন করিলেও একই ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে।

অনেকে মনে করেন, যে উচ্চতর শিক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভিত্তি কাঁচা থাকায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে কারণে উচ্চতর শিক্ষার ধারা খর্ব করিয়া ফেলা দরকার। যে টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ হইতেছে, সেই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সার্থকরূপে অনায়াসে ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ মনে করিতেছিলেন, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের রাধাকৃষ্ণান কমিশনে লিপিবদ্ধ আছে যে অন্যান্য পশ্চিমী দেশের তুলনায় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা অপ্রচুর। সার্জেণ্ট রিপোর্টেও অনুরূপ মন্তব্য রহিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে যদি লোকসংখ্যার অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পড়েন তাহাদের সংখ্যা হিসাব করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে

যুদ্ধপূর্ব জার্মেনীতে ৬৯০ জন লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত, ইংলণ্ডে ৮৩৭ জন লোকের মধ্যে পড়িত একজন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ২২৫ জন লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত এবং রাশিয়াতে পড়িত ৩০০ জন লোকের মধ্যে একজন। আর ভারতে ২২০৬ জন লোকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে একজন।

অতএব এই সব বিবৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মোটেই মাথা-ভারী (Top-heavy) নয়, এবং অন্যান্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তার আরও প্রয়োজন।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্য দিকে ত্রুটি দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতেছে, তাহারা হয়ত অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত নয়। আমাদের দেশে উল্লিখিত সময়ে সর্বনিম্ন পারদর্শিতা থাকিলেও নির্বাচন করিয়া বা বাছাই করিয়া ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইত না। যে অর্থের সংস্থান করিতে পারিত, তাহাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইত। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে সমৃদ্ধির আরও একটি অন্তরায় ছিল। যাহারা সত্যিকারের মেধাবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপযুক্ত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিত না। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেও, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের জন্য যত সংখ্যক স্নাতক প্রয়োজন, সেই সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের কথা

মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯৩৭—১৯৪৭)

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। প্রকৃত পক্ষে ১৯১৯ সালের আইনে যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এত দিনে তাহার অবসান ঘটিল। ১৯১৯ সালের আইনে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াও পরিবর্তিত, অপরিবর্তিত, নিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি নানা জটের সৃষ্টি করিয়া শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে অচল করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে বিভিন্ন প্রকার জট হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইল।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক পরিচালনায় থাকা সত্ত্বেও উক্ত দশকে মাধ্যমিক শিক্ষার এমন কিছু অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। অবশ্য একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নানাবিধ গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার ফলে সামগ্রিক ভাবেই শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল। এই দশকের শিক্ষার মানাবনতির জন্য অনেকে আরও দুই একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, ক্রম-বর্ধমান মূল্যমান অথচ শিক্ষকতায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেতন বর্ধিত না হওয়ায় অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি শিক্ষার অবনতির অন্যতম কারণ হইয়াছিল। ১৯৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩০৫৬ অথচ ১৯৪৬—৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৯০৭টিতে। দেখা যাইতেছে ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই বৎসরের প্রতি বৎসরে প্রায় ১১৫টি করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। এই ভাবে শিক্ষার পশ্চাৎগতির জন্য শুধুমাত্র একপক্ষকে দায়ী করা যায় না। এক দিকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ জীবনের সর্বস্তরে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলিয়াছিল। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট তীব্রতম হইয়া উঠিতেছিল। এই রকম অবস্থায় শিক্ষার প্রসার ঘটা দুঃসাধ্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। উপরের যে সংখ্যা হইতে মনে হইতেছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে

মাধ্যমিক শিক্ষার অবনতি

বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল তাহা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ ১৯৪৬—৪৭ খৃষ্টাব্দে যে হিসাব লওয়া হয় তাহাতে পাকিস্তান বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। তাহা হইলেও একথা বলা যায় যে আগের দশকগুলিতে যে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল, এই দশকে তাহা সম্ভব হয় নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার এই মন্থর গতির কারণ কি? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচন সাপেক্ষ ভর্তিই কি মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির কারণ? না, তাহা নয়। তাহার কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাছাই করিয়া ভর্তি করা হয় না। যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে চায়, সেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে। তবে কি ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার এমন অবস্থা হইয়াছে, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যার আর বৃদ্ধি হইবে না। না, তাহাও নয়। অন্যান্য পশ্চিমীদেশগুলির সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম।

মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির কারণ

মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী বলিয়া মনে হয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি শৃঙ্খলের মত। ইহার কোন একটি অংশ দুর্বল হইলেই সমগ্র অংশেই তাহার প্রভাব পতিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রগতি না হওয়ায়—তাহার প্রভাব মাধ্যমিক শিক্ষার উপর পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পশ্চাতে আরও একটি কারণ ছিল। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবন-যাত্রার ব্যয়—তথা শিক্ষার ব্যয় বাড়িয়া যায়। ইহার সর্বাধিক চাপ আসিয়া পড়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের উপর। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে মধ্যবিত্তদের গৃহ হইতে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এই সব গৃহের ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। দরিদ্র গৃহস্থের ছেলে মেয়েরাও উপরোক্ত কারণগুলির জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচন হওয়ার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গতি মন্থর হয়। এইরকম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিকে বৌদ্ধিক নির্বাচন আখ্যা না

দিয়া অর্থনৈতিক নির্বাচন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত। কারণ বিত্তবান গৃহের ছাত্র হইলে সে যদি মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত নাও হয়, তবুও সে পয়সার জোরে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হইতে পারে। সে বিদ্যালয়ে যে স্থানটি দখল করিয়াছে সেই স্থান অন্য মেধাবী গরীব বা মধ্যবিত্ত ছাত্র গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য মেধাবী ছাত্র স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার অনুপযুক্ত বড় লোকের ছেলে বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইয়া দেশের অগ্রগতিতে বাধা জন্মাইতেছে। কারণ সে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কিছু করিতে পারিবে না।

শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব

অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার যে ত্রুটি দেখা গিয়াছে সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষাবিভাগকে নিম্নলিখিত কার্যগুলি করা দরকার। প্রথমতঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুযায়ী নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ বিদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যেরূপ প্রসার হইতেছে সেই রকম ভাবে ভারতেও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে, এবং তৃতীয়তঃ মেধাবী, গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবেই মাধ্যমিক শিক্ষা সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে স্থান লাভ

১৯৩৭-৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ মাতৃভাষার বাহন হিসাবে স্থান লাভ। এতকাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন ছিল ইংরাজী। কিন্তু এই দশকে ক্রমাগত স্বদেশী ভাবধারার প্রসার, দেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতি, মাতৃভাষা প্রয়োগের জন্য নানাবিধ আন্দোলন, প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পূর্বে মাতৃভাষা সম্পর্কিত যে সমস্ত বাধা-নিষেধ দেখা গিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত সময়ে সমস্তই দূরীভূত হইয়াছিল। মাতৃভাষায় ভাল ভাল পুস্তক রচিত হইল। যে সমস্ত Term অনূদিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা অনূদিত হইল, অবশ্য সমস্ত প্রদেশেই যে এক রকম অনুবাদ হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু কাজ চালাইবার মত ব্যবস্থা সর্বদিকেই হইল। বীজগণিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান হইতে লাগিল। পুরাতন শিক্ষকগণ অতি শীঘ্রই নূতন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার যতনা মনোযোগী হইলেন, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী নজরে পড়িল কারিগরী শিক্ষার প্রসারের উপর। উড ও এ্যাবটের রিপোর্ট কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য নানা মূল্যবান স্বপারিশ করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী কারিগরী শিক্ষার সংগঠনের কাজ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় কারিগরী শিক্ষার চাহিদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার উড ও এ্যাবটের রিপোর্টের স্বপারিশ অনুযায়ী ঠিক ভাবে কাজ না করিয়া নানা জায়গায় কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে লাগিলেন। দলে দলে অনেক ছাত্র কারিগরী কাজ শিখিতে অগ্রসর হইল। তাহা ছাড়া প্রাদেশিক সরকারও নানাস্থানে কৃষি শিল্প, ও বাণিজ্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সরকার অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও এই দিকে সরকার সমভাবে গুরুত্ব দেয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সময়ে অগ্রগতি দেখা যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট ২৩টি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় ছিল। উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৬-৪৭-এ হয় ৩৪টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৭—৪৭)

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখিয়াছি, বিভিন্ন প্রদেশে সহরাঞ্চলের ও গ্রামাঞ্চলের জন্য অনেক জায়গায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে। কিন্তু আইন পাশ হইলেও উহা কার্যকরী খুব শীঘ্র হইয়া উঠে নাই, তাহার ফলে ঐ সময়ে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার মন্থর গতি লক্ষ্য করিয়াছি। আলোচ্য সময়েও প্রাথমিক শিক্ষার খুব যে বেশী অগ্রগতি হইয়াছে, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। কংগ্রেস মন্ত্রিত্বকালে, বিভিন্ন প্রদেশ এবং যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেই সমস্ত প্রদেশে বাধ্যতা-

মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রীগণ ঐ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে দেখা যায় না।

নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা *

প্রদেশের নাম	বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা		বালক-বালিকা উভয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা	
	সহর	গ্রাম	সহর	গ্রাম
বিহার	১৭	—	—	—
বোম্বাই	৯	১৩৪	১১০	৫,১০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৪	১০৩১	—	—
পূর্বপাঞ্জাব	৩৭	১৪২০	—	—
মাদ্রাজ	১৬	৩১	১২	১,৬০৭
উড়িষ্যা	১	১	—	—
পশ্চিমবঙ্গ	১	—	—	—

উপরের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিবার প্রচেষ্টার দিক হইতে বোম্বাই প্রদেশের স্থান সর্বোচ্চে। বোম্বাইর পর মাদ্রাজ, পূর্বপাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শের দিক হইতে এই সব প্রদেশের প্রচেষ্টা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহি, কিন্তু তাহার পূর্বযুগে প্রাথমিক

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থা

* Nurullah & Nayek-A Students' History of Education in India হইতে গৃহীত।

শিক্ষার অবস্থা ঐরূপ হওয়া কদাচ উচিত নয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা তখন নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত। অতএব প্রাথমিক শিক্ষার এইটুকু অগ্রগতি লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭ জন, কিন্তু ১৯৪১ সনে ব্রিটিশ ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২·২। পূর্বের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি কিছুটা হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে উহা আনুপাতিক নয় বলিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে ঐ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত মন্থর গতিসম্পন্ন ছিল। আসলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া সাক্ষরের হার বৃদ্ধি পাইলেও নিরক্ষর লোকের সংখ্যা সমাজে খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতএব যদি সাক্ষরের হারের শতকরা সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বেশী না হয়, তাহা হইলে শিক্ষার অগ্রগতি হইয়াছে, ঐ কথা মোটেই বলা চলে না।

উল্লিখিত সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের কাল দশ বৎসরের মধ্যে পাঁচ বৎসর কাল মাত্র। কিন্তু এই সময়েও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এবং অন্যান্য দলীয় মন্ত্রীসভা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কল্পে নিম্নলিখিত ভাবে চেষ্টা করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

(১) **নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**—যে সব গ্রামে বিদ্যালয় নাই, সেই সব গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইল। কিন্তু ইহা এত ধীর গতিতে চলিয়াছিল যে অধিকাংশ গ্রামই বিদ্যালয়হীন অবস্থায় রহিয়া গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রথমে যে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, ৯৩ ধারার শাসনাধীনে তাহার অভাব দেখা যায়।

(২) স্থানীয় প্রশাসনমণ্ডলীর (যথা, মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড; ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির) হাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু তাহাও পরিমাণে এত কম যে আশানুরূপ শিক্ষার অগ্রগতি হয় নাই।

(৩) নূতন নূতন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হইল। এই বিষয়ে লোকালবোর্ড, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল।

(৪) চালু বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। যাহাতে বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থাও চলিতে লাগিল।

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৮৯,৬০১। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা কমিয়া দাঁড়াইল ১,৮১,৯৬৮। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহা আরও কমিয়া আসিয়া দাঁড়াইল ১,৭২,৬৬৩ টিতে। এই ভাবে দ্রুত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া আসার কারণ হইল, বহু নিম্নমানের বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া হয়, আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে অর্থকৃচ্ছ্রতা।

কারিগরী শিক্ষা

উড এবং এ্যাবট্সের স্থপারিশ অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষা খুব বেশী কার্যকরী হয় নাই, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উল্লিখিত সময়ে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কারিগরী শিক্ষার নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এদিকে যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রশক্তির জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিতেই, ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ইহাকে সাধারণতঃ বলা হয় সার্জেন্ট পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মধ্যে কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে স্থপারিশ রহিয়াছে।

(ক) প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে, শিক্ষার সর্বপ্রথম স্তর হইতেই ছাত্র-ছাত্রীদিগকে কিছু হাতের কাজ করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম এমনি ভাবে রচিত হইবে যে, তাহাতে যেন জ্ঞানমুখী ও কর্মমুখী কাজের ব্যবস্থা থাকে।

(খ) কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ হিসাবে থাকিবে। ইহাকে কোন ক্রমেই জ্ঞানমুখী শিক্ষা হইতে নিম্নস্তরের বলিয়া মনে করা হইবে না।

(গ) কারিগরী শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে বাণিজ্যিক শিক্ষা, চারুকলা শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষা।

(ঘ) নিম্নরূপ কারিগরী বিদ্যালয় থাকিবে।

(১) নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয়—উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণ ১৪ বৎসর বয়সে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। এইখানে শিক্ষাকাল হইবে দুই বৎসর।

(২) তাহা ছাড়া থাকিবে শিল্পমুখী হাইস্কুল। এই স্কুলের শিক্ষাকাল ৬ বৎসর। শিক্ষার্থীরা আসিবে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরের স্তর হইতেই। শিল্পমুখী হাই স্কুলে থাকিবে নানারূপ শিল্প যথা,—ধাতুশিল্প, দারুশিল্প, বয়নশিল্প ইত্যাদি নানারূপ শিল্পের ব্যবস্থা এবং জরিপ, ড্রয়িং, খাতাপত্র ও হিসাব রাখা, সর্টহাণ্ড, টাইপরাইটিং, বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র লেখা ইত্যাদির ব্যবস্থা। শিল্পমুখী বিদ্যালয়ে চারুকলা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

(৩) যাহারা শিল্পমুখী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া আরও উচ্চস্তরের কারিগরী বা বাণিজ্য-সংক্রান্ত আরও উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতে চায়, তাহারা তিন বৎসরের জন্য (১৭ হইতে ২০) উচ্চতর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে (High Technical Institute) ভর্তি হইতে পারিবে। এইখানে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে। ইহার পরও যাহারা আরও শিল্পমুখী জ্ঞান আহরণ করিতে চায়, তাহারা দুই বৎসরের জন্য (২০ হইতে ২২ বৎস) উচ্চতর ডিপ্লোমার (Advanced Diploma) জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

(ঙ) যেখানে পারা যাইবে সেখানে একমুখী কারিগরী (Mono-technics) প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বহুমুখী কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Poly-technics) গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(চ) উপযুক্ত গরীব ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সার্জেন্ট পরিকল্পনা উপরোক্ত সুপারিশগুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে ঐ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হইলেও উল্লিখিত সময়ে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা (১৯৩৭-১৯৪৭)

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য অন্য এক শীর্ষে আলোচিত হইবে। এই স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর বুনিয়াদী শিক্ষার কিরূপ অগ্রগতি হইয়াছিল, তাহাই আলোচ্য।

ক্ষমতা লাভের পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কয়েকটি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইলেন। এত কাল ধরিয়া কংগ্রেস জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে সব আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, মাদক দ্রব্য বর্জন এবং অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ। বলা বাহুল্য যে, এই ত্রিধারা আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন-ব্যাপারে ক্ষমতা লাভের পর দেশবাসী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী জানাইল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা অসুবিধার সম্মুখীন হইলেন, কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন বহু ব্যয়সাধ্য। এই টাকা সংগ্রহ করা মুশ্‌কিল, কারণ নূতন করিয়া কর ধার্য করিয়া শিক্ষার জন্য টাকা যোগাড় করা খুবই অসুবিধাজনক। তাহা ছাড়া মাদক দ্রব্য বর্জন হইতে সরকারের আয়ের বিপুল ক্ষতি হইতে লাগিল। এই আয়ের কিছু অংশই শিক্ষার খাতে ব্যয় হইত। সংকট হইল যে মাদক দ্রব্য বর্জন করিতে গেলে বিপুল পরিমাণ আয় কমিয়া যায়, তাহার ফলে শিক্ষার জন্যও ব্যয়ের টাকা কমে, আবার মাদক দ্রব্য প্রচলন অব্যাহত রাখিয়া শিক্ষার সাফল্যও আশা করা যায় না।

এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

তৎকালীন মন্ত্রীমণ্ডলী এই পরিকল্পনায় যুগপৎ উভয় সমস্যার সমাধান দেখিয়া সাগ্রহে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন।

অবশ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে যদি এই পরিকল্পনার সার্থকতা বিচার করা যায় তাহা হইলে ইহাকে খাটো করা হয়। আসলে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার মধ্য দিয়া একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়িয়া তোলার চেষ্টা এই প্রথম সুরু হইল। দ্বিতীয়তঃ যে দার্শনিক ভাবাদর্শ দ্বারা তৎকালীন রাজনীতি প্রভাবিত হইয়াছিল এবং স্বাধীন ভারতের যে রূপ গঠনের কথা তৎকালীন নেতারা চিন্তা করিয়াছিলেন বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা জাতি তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে ইহাই মনে করা হইয়াছিল এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার রূপদানে তৎকালীন নেতৃবর্গ সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

গান্ধীজি তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে এই শিক্ষার দোষগুণ লইয়া বাদানুবাদ সুরু হইয়া গেল এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাবলম্বন সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা সমালোচনা সুরু হইল। এইরকম অবস্থায় ১৯৩৭ সালের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ডক্টর জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রথম সম্মেলন বসিল ওয়ার্ধায়। এই সম্মেলনে সাতটি কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রিগণ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীবৃন্দ ও জাতীয় কর্মীবৃন্দ সমাগত হইলেন। সভাপতি মহাশয় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সকলের সামনে উপস্থিত করিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, সাত বৎসরব্যাপী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র দেশে প্রসারিত হইবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার বাহন হইবে মাতৃ-ভাষা। মহাত্মাজীর পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

সভায় এরূপ আশা প্রকাশ করা হয় যে এই স্বাবলম্বী বিদ্যালয়গুলি বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করিতে সক্ষম হইবে। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আপন আপন প্রদেশে এই শিক্ষা রূপায়নে ব্রতী হইলেন।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা পুনরায় উপস্থাপিত হয় এবং জাতির ভবিষ্যত শিক্ষা-পরিকল্পনা হিসাবে ইহাকে সমর্থন করা হয়। যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন সেগুলিতে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্যমের সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হইলেন।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভার বহির্ভূত দুই একটি রাজ্যেও ইহার বিস্তার সুরু হইল। কাশ্মীরের তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা কে, জি, সাইদিয়ান বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কাশ্মীরেও বুনিয়াদী শিক্ষার সূচনা হইল।

কাজ সুরু হইতে না হইতেই পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইবার ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা ক্ষমতা ত্যাগ করিলেন। সামগ্রিক ভাবে শাসন-ক্ষমতা ইংরাজের হাতে পুনরায় চলিয়া যাওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া গেল। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ এই পাঁচ বছর বুনিয়াদী শিক্ষার অতিশয় সংকট কাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার সাথে সাথেই ১৯৫২ সাল নাগাদ জাতীয় আন্দোলন তীব্রতম হইয়া উঠিল। জাতীয় আন্দোলন বুনিয়াদী শিক্ষার উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে।

অবশ্য ১৯৩৭ এর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বাতিল হওয়ার সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা রূপায়নের কাজ যে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এমন নয়। বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর এবং বোম্বাই এর কোথাও কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ধীর গতিতে চলিতেছিল। বিহারের প্রাদেশিক সরকার ইহাকে বিলুপ্ত না করিয়া রাষ্ট্রিয় নীতি হিসাবেই ইহাকে পরিচালিত করিতেছিলেন। উড়িষ্যাতেও ইহার অগ্রগতি বিশেষ রুদ্ধ হয় নাই। কাশ্মীর তো স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল। সেখানেও কাজ চলিতেছিল। কয়েক জন গান্ধীবাদী কংগ্রেস-কর্মী বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে বেসরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইতেছিলেন। বেসরকারী পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সরকারী উপদেশ নির্দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে ওয়ার্ধা। বস্তুতঃ ওয়ার্ধা হইতেই যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে ওয়ার্ধা কেন, বেসরকারী পরিচালনায় যেখানে যত বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, এগুলি অবিমিশ্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। মূলতঃ এগুলি ছিল গান্ধী-আশ্রম। এই আশ্রমগুলিতে যেমন সর্বোদয় সমাজ গঠনের কাজ চলিত, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনও পরিচালিত হইত। বলা যায়, ওয়ার্ধা সেবাগ্রাম এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার মস্তিষ্ক স্বরূপ ছিল।

১৯৪২ এ রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতম হইয়া উঠিল। ব্যাপক ধরপাকড় সুরু হইল। গান্ধী আশ্রমগুলির বহু নেতাকে কারাবরণ করিতে হয়। ফলে বেসরকারী পরিচালনায় বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি সাময়িক ভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের ২১ জন কর্মীর মধ্যে ১৪ জনই কারাবরণ করিলেন। উড়িষ্যায় অবস্থা চরমে পৌঁছায়। বহু শিক্ষক গ্রেপ্তার হইলেন। অনেক বুনিয়াদী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ সাল মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এত সমস্যার মধ্যেও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তাহাদের স্বল্প আয় ও আয়োজন সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশের মেদিনীপুরের বলরামপুর, সেবাগ্রাম, (মধ্যপ্রদেশ), জামিয়া, মিলিয়া, (দিল্লী), তিলক বিদ্যাপীঠ (পুনা) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ন মন্দগতিতে চলিতে লাগিল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ স্থরু করেন এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দেই মন্ত্রীসভাগুলিকে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এই দুই বৎসরেই তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও কর্ম নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধায় শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হয় এবং একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই ৯৮টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই শিক্ষার পরিদর্শকদের জন্যও শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। উত্তর প্রদেশেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারকল্পে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এলাহাবাদ ও কাশীতে শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশীর শিক্ষণ বিদ্যালয় পরে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হয় এবং এইখানে পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। বিহার ও বোম্বাইয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ স্থরু হইল এবং কতকগুলি আত্যন্তিক এলাকা (Intensive area) গঠিত হইল। কাশ্মীরে কে, জি, সাইয়াদিনের নেতৃত্বে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার স্থরু হয়। শ্রীনগরে ১০২ জন ছাত্রের জন্য একটি শিক্ষন মহাবিদ্যালয় এবং জম্মু ও শ্রীনগরে পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উড়িষ্যাতেও মধ্যপ্রদেশের মত কাজ শুরু হইয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ক্ষমতা ত্যাগ করার সময় সমগ্র ভারতে ১৪টি বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রদেশগুলিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বুনিয়াদী শিক্ষা আরও প্রসার লাভ করে। প্রায় সমস্ত প্রদেশগুলিতেই বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হয়, এবং বহু দেশীয় রাজ্যেও ইহা অনুসৃত হইতে থাকে।

বয়স্ক শিক্ষা তথা সামাজিক শিক্ষা
(১৯৩৭—১৯৪৭)

ভূমিকা—আমাদের দেশ শিক্ষার দিক হইতে খুবই অনগ্রসর। প্রাথমিক শিক্ষার অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমস্থমারী অনুযায়ী সাক্ষরের হার মোটে শতকরা ১২'২ জন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম-স্থমারী অনুযায়ী সাক্ষরের হার ছিল মোটে শতকরা ৭ জন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের বেশী সংখ্যক লোকই সাক্ষর নয়, নিরক্ষর। বয়স্করা নিরক্ষর রহিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারাও সাক্ষরের হার বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা। একবার যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা যায় তাহা হইলে সাক্ষরের হার উর্ধ্বগামী হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ত এক দিনে সম্ভব নয়, উহাও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যে ত বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া যাইতেছে। তাহাদের জন্য কিছু করা প্রয়োজন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে দেশীয় রাজ্য বরোদা দৃঢ় পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়, বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বরোদা অনুরূপভাবে অগ্রগতির সূচনা করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ও তার কিছু পরে বয়স্কদের নিজেদের পড়িবার জন্য ভ্রাম্যমান পাঠকেন্দ্রাদি খোলা হয়। ইহার কিছু পরেই অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানে পাঠাগার-সমিতিসমূহ স্থাপিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের দেওয়ান গ্রাম্য বয়স্কদের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি সান্ধ্য-বিদ্যালয় খোলেন এবং অনেক-গুলি ভ্রাম্যমান পাঠাগারের ব্যবস্থা করেন। মণ্টফোর্ড সংস্কারের পর বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি আরও দ্রুত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব সরকার বয়স্ক শিক্ষার জন্য চেষ্টিত হন। ১৯২২—২৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বয়স্ক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ছিল ৬৩০টি এবং ১৯২৬—২৭ খৃষ্টাব্দে বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৭৮৪টিতে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে ২৭টি বয়স্কদের বিদ্যালয় খোলা হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ সরকার ছয়টি মিউনিসি-পালিটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন সান্ধ্যকালীন বয়স্ক বিদ্যালয় খোলার জন্য। বাংলাদেশে এই সময়ে ৪০টি বয়স্ক বিদ্যালয় খোলা হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার অবনতি দেখা যায়। তাহার কারণ, অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক গোলমাল। পাঞ্জাবে বয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯৮,৪১৪, কিন্তু ঐ সংখ্যা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আসিয়া দাঁড়ায় মাত্র ৫০০০ হাজারে। পাঞ্জাবে ঐ সময়ে একটি নূতন পরীক্ষা করা হয়। নর্মাল স্কুলের শিক্ষকগণকে বয়স্ক শিক্ষার কাজ করিতে বলা হয়। কাজ সেই দিক হইতে ভাল হয়।

অগ্রগতি

কংগ্রেস মন্ত্রীগণ বিভিন্ন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর দেখা যায় বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রচুর উৎসাহ। ডক্টর সৈয়দ আহমদ ছিলেন বিহারের শিক্ষামন্ত্রী। তিনি নিজে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রদেশের মধ্যে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান।* কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত বয়স্ক শিক্ষাসমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি বলেন যে আমাদের দেশে কোটি কোটি লোক নিরক্ষর এবং তাহাদের শিক্ষাদান করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যদি তাহাদের শিক্ষা দেওয়া না হয় তাহা হইলে আমাদের

* Dr Syed Mahmud বলেন, "It is essential that we should keep before us the aims and objectives of the Adult Education movement. In Western countries. Adult education aims at extending and expanding the minimum school education received by the labourers and farmers, but in a country like India with her extremely low percentage of literacy and her backward socio-economic organisation, the objectives of the moment should be (1) to teach the illiterate adult the three R's and (2) to impart knowledge closely correlated to his working life and give him a grounding in citizenship. These two aspects are closely inter-conected as mere literacy without the broader aspects of education would not equip him to lead a better and fuller life and no sound adult education is feasible without a minimum of literacy. It is esential that these two processes should be carried on simultaneously as to a large extent they are complementary to one another.

No Government can make any appreciable headway with its schemes for the promotion of the socio-economic welfare of its people unless the people are prepared to meet the Government halfway and offer it responsible co-operation. .... This responsibe co-operation is only feasible when the people possesses some amount of education."

দেশের অগ্রগতি কোন কালেই হইবে না। তৎকালীন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী সি, রাজাগোপালচারী নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা ব্যাপারে মনঃসংযোগ করেন এবং তাহাদের জন্য তামিল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বিভিন্ন প্রদেশে এই সময় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বোম্বাই, পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও বয়স্ক শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম নিখিল ভারত বয়স্ক শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হয়।

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎসাহী ডক্টর ফ্রাঙ্ক সি. লাউবাক (Dr. Frank C. Laubach) তিন বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। ডক্টর লাউবাক হইতেছেন এক জন আমেরিকার ধর্মযাজক, তিনি বয়স্ক শিক্ষার যে পদ্ধতি বাহির করেন, সেই পদ্ধতি অনুসারে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বয়স্ক শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ডক্টর লাউবাক তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে। পূর্বে ভারতবর্ষ পরিদর্শন কালে ডক্টর লাউবাক ভারতবর্ষের নিরক্ষরতার অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ হইতে পারে কিনা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং "India shall be literate" নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহাতে ভারতবর্ষে তাঁহার পদ্ধতি প্রয়োগের কথা লিখিয়াছিলেন। তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ডক্টর লাউবাক ৪২টি শিক্ষণ-কেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত কেন্দ্রে ২২৬টি আলোচনা-সভার ব্যবস্থা হয় এবং চল্লিশ সহস্রের অধিক লোক এই সব কেন্দ্রে যোগদান করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষার কাজ খুব বেশী দ্রুত অগ্রসর হয়, নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা সরকারের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই কারণে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ডক্টর লাউবাকের ভারত পরিদর্শন এবং নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা-দানে তাঁহার উৎসাহ পরিদর্শন করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য বহু সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। একমাত্র বাংলাদেশেই নিরক্ষর বয়স্কদের বিদ্যালয় ছিল ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১০,০০০টি। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২

খৃষ্টাব্দে ২২,৫৭৪টি হয়। বাংলা দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে নিরক্ষর বয়স্কদের প্রথম পাঠের জন্য পুস্তক রচিত হয়। সরকার সেই সব পুস্তক কিনিয়া বিনা পয়সায় নিরক্ষর বয়স্কদের পড়িতে দেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের পর বয়স্ক শিক্ষার কার্যসূচীর মন্দা দেখা যায়। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীগণই বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব ত্যাগের পর বয়স্ক শিক্ষা অভিযানে ভাটা পরে। তারপর দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্যও বয়স্ক শিক্ষার সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেও কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বয়স্ক-শিক্ষার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মহীশূরে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে নিরক্ষর বয়স্কদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৮৮ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬,২০১। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৯৪১টি বিদ্যালয় ও ৭৮,৬১১ জন শিক্ষার্থীতে। এদিকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সার্জেন্ট রিপোর্টে বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সুপারিশ দেখা যায়।

কমিটি মন্তব্য করেন যে যদিও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপরই বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে, তবুও যাহারা কিছুটা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের শিক্ষার মান স্থির রাখিবার জন্য তাহাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটি আরও মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ হইলেও বহু কোটি নিরক্ষর বয়স্কদের সমস্যা থাকিয়া যাইবে। কমিটি বলেন যে দেশের নিরক্ষরতার সমস্যা কিছুতেই দূর করা যাইবে না, যতদিন পর্যন্ত না শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাথে সাথে নিরক্ষর বড়দের নিরক্ষরতা দূর না করা হয়। বড়দের প্রাথমিক শিক্ষা কায়েম করিতে হইলে লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, গ্রামোফোন, রেডিও, খবরের কাগজ, বই, বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্য দিয়া বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনা করা হইবে, প্রথম পাঁচ বৎসর ব্যয়িত হইবে শিক্ষক-শিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য।

কমিটি আরও বলেন যে বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের, কিন্তু যথাসাধ্য বেসরকারী ঐচ্ছিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা

১৯৩৯-১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই লিপ্ত ছিল। এই যুদ্ধের মধ্যে একটি কথা সকলের মনে হইয়াছে। তাহা হইতেছে, কেন এই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, কেন এই হানাহানি, অনেকেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন এবং মনে করিয়াছেন, যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যাহা আমাদিগকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে, যাহার ফলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়াছে শিক্ষাবিদ্‌দের মনে এই প্রশ্ন। ফলে যখনই বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইয়াছে তখনই বিভিন্ন দেশসমূহে হইয়াছে শিক্ষাদান-পদ্ধতির ও পাঠ্যক্রমের সংস্কার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে Dr. Radha Krishnan বলিয়াছিলেন, "The world charter drawn up by the United Nations at San Franscisco provides us with an instrument for peace but the machine cannot work successfully unless the spirit of co-operation is there. The best plan will fail, if it has not the backing of social, political and spiritual forces of the people. For the modification of the human spirit for peace and world community, we look to the educational agencies."

এদিকে ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার দেখিতে পাই (ফিশার আইন), দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর দেখিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন মূলক বাটলার আইন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষও বাদ পড়ে নাই। ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড বা সার্জেণ্ট পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনেক দিন হইতে দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই বোর্ড ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করিতে প্রয়াসী হন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড ও তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের

যুগ্ম প্রচেষ্টায় একটি নূতন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তৎকালীন শিক্ষা-সচিব স্যার জন সার্জেন্ট এই পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই পরিকল্পনা সার্জেন্ট-পরিকল্পনা নামে খ্যাত। ১৯৪৪ সালে এই পরিকল্পনা রচিত হয় কিন্তু তাহা সর্বতোভাবে রূপায়িত করার আগেই নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির ইহা একটী মূল্যবান অবদান। প্রতি স্তরের অর্থাৎ পূর্ব বুনিয়াদী স্তর হইতে বিশ্ববিত্যালয়ের স্তর পর্যন্ত, কারিগরী শিক্ষা হইতে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা এবং মূকবধিরদের শিক্ষা ইত্যাদি সবই এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। ইহাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে, কারণ ভারতের সর্ব স্তরের শিক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অনধিক ৪০ বৎসর সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষার মান বিলাতের শিক্ষার মানের অনুরূপ করা।

সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় শিক্ষার স্তর-বিন্যাস

(ক) নার্সারি স্তর :—(বয়স—৩-৫)

সার্জেন্ট স্কীমে ৩ হইতে ৫ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য এরূপ সুপারিশ করা হয় যে বিনা বেতনে এই শিক্ষার আয়োজন করা উচিত। এই বিত্যালয়গুলি মহিলা শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

(খ) প্রাথমিক স্তর (বুনিয়াদী শিক্ষা—৬-১৪ বৎসর)

সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করেন।* ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বা গান্ধীজির ঘোষণায়

Extract from Sargent Report :

Basic education (Primary and Middle) as envisaged by the Central Advisory Board, embodies many of the educational ideas contained in the original Wardha scheme,though it differs from it in certain important particulars. The main Principle of learning through activity has been endorsed by educationists all over the world. At the lower stage, the activity will take many forms, leading gradually upto a basic craft or crafts suited to local conditions. So far as possible the whole of the curriculam will be harmonised with this general conception. The Three Rs. by themselves can no longer be regarded as an adequate equipment for efficient citizenship. The Board, however; are unable to endorse

ইংরাজী বাদে প্রবেশিকা মানের সমতুল ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছিল, কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১৪ বৎসর মোট ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়।

সার্জেন্ট্ পরিকল্পনায় ইহাকে দুই স্তরে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা— ৬ হইতে ১১ বছর, মোট ৫ বছর

(২) উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা—১১ হইতে ১৪ বছর, মোট ৩ বছর

(১) নিম্ন বুনিয়াদী স্তর :—সার্জেন্ট-স্কীম্ বহুলাংশে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে যেমন ইংরাজী বর্জন, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদান এবং কোনো উৎপাদনাত্মক শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল। সার্জেন্ট্ পরিকল্পনায় উৎপাদনাত্মক শিল্পকে পরিত্যাগ করিয়া শিশুদের শিক্ষামূলক শিল্পশিক্ষা দানের কথা বলা হয়। উপরন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা অধিক সংখ্যায় শিক্ষিকা নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্জেন্ট্ স্কীমে আর একটি নূতন কথা বলা হয়, ইহা ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ছিল না। প্রাথমিক স্তর শেষ করার পর বাছাই করিয়া যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্য শুধু তাহারাই উচ্চ বিদ্যালয়ে যাইবে আর বাকী সকলে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইবে।

(২) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়—(১১-১৪ বৎসর)

এই স্তরের পরিকল্পনায় ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সহিত বহিরঙ্গে মিল থাকিলেও কয়েকটি মৌলিক পার্থক্যও লক্ষিত হয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ন্যায় সার্জেন্ট্ স্কীমেও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষার কথা বলা হয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার গান্ধীজির 'plus vocation minus English' এই নির্দেশমানা হইয়াছিল। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারটি প্রাদেশিক সরকারের

the view that education at any stage can or should be expected to pay for itself through the sale of articles produced by the pupils. The most that can be expected in this respect is that sales should cover the cost of the additional materials and equipment required for practical work.................. On leaving (the Schooi), the pupil should be prepared to take his place in the community as worker and as a future citizen. He should also be insp'red with the desire to continue his education through such means as a national system of education may place at his disposal.

হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বৃত্তি হিসাবে কোন শিল্প শেখার কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেন্ট স্কীমে তাহা বহাল রহিল। এমন কি খানিকটা উৎপাদনাত্মক শিল্পের কথাও বলা হইল। সার্জেন্ট স্কীমে ১১ হইতে ১৪ বৎসর সহশিক্ষা মানা হয় নাই। আলাদা শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। এমনকি শিক্ষণীয় বিষয়ও আলাদা করিয়া দেবার কথা উঠিল। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়কারী প্রার্থনার কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেন্ট স্কীমে তাহা বর্জন করা হয় এবং ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই স্তরের পরীক্ষা বিদ্যালয়ে শেষ করিয়া বিদ্যালয় হইতে সার্টিফিকেট দিবার কথা বলা হইয়াছিল। পরিকল্পনায় বলা হয় যে, এই স্তরে যাহারা অধ্যয়ন শেষ করিবে তাহারা একটি শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করিবে। যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হইবে তাহারা উচ্চ শিক্ষায় নিম্ন শিল্প বিদ্যালয় বা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে যাইয়া দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করিবে। আর বেশীর ভাগ সাধারণ ছাত্র তাহারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা (১১—১৭ বৎসর)

এই স্তরের শিক্ষাকাল ৬ বৎসর কাল, এই শিক্ষাকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হিসাবে ধরা হইবে না। এই শিক্ষাকাল হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।* এই ৬ বৎসরের শিক্ষাকেও সার্জেন্ট স্কীমে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শিল্প-বিদ্যালয়। যাহারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহারা তাহার পরবর্তী তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্স সমাপ্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিবে। যাহারা শিল্পবিদ্যালয়ে বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছে তাহারা শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতেও ভর্তি হইতে পারে। সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃ-ভাষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেন্ট রিপোর্ট'এ নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

"High school education should on account be considered simply as a preliminary to university education, but as stage complete in itself ...while it will remain a very important function of the high schools to pass on their most able pupils to universities or other institutions of equivalent standard the large majority of High School learer, should receive an education that will fit them for direct entry into the occupation and professions.

সার্জেন্ট স্কীমে শিল্প শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা কতকাংশে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার প্রভাবের ফল, কতকাংশে যুদ্ধের প্রভাবের ফল। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় জাতির অর্থনৈতিক মান দ্রুত উন্নত করিয়া তোলার প্রচেষ্টা ছিল। সার্জেন্ট স্কীমেও নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদের দৃষ্টিকোণ হইতে এই জিনিষটিকে দেখা হইয়াছিল। শিল্প-শিক্ষার কাল নির্ধারিত হইয়াছিল পর্যায়ক্রমে ৮ বৎসর (১৪-২২)। এই আট বছরের শিল্প-শিক্ষার কালকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল।

(১) নিম্ন-শিল্প বিদ্যালয় (Junior Technical School):—উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৪ বছর বয়সে ছাত্রেরা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে।

(২) শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয় বা পলিটেক্‌নিক জাতীয় স্কুল:—১১ হইতে ১৭ বৎসর বয়সের ছাত্ররা ইহাতে পড়াশুনা করিবে।

নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১১ বছর বয়সেই এই শিল্প-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া ১৭ বছর বয়সে এখানকার শিক্ষা শেষ হইবে। যাহারা উচ্চ বুনিয়াদীর পাঠ শেষ করিয়াছে তাহারাও উপযুক্ত শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইতে পারিবে।

উচ্চ-শিল্প বিদ্যালয়:—(১৭ হইতে ২০)

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এখান হইতে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

শিল্প-কলেজ:—(২০-২২) খুবই উচ্চমানের শিক্ষাদান চলিবে। শিক্ষা শেষে উচ্চতর ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

শিল্প-শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে বাণিজ্যিক শিক্ষা, চারুকলা শিক্ষা এবং কৃষি-শিক্ষা। কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়া সমস্ত রকমের গ্রামীন বিদ্যালয়ে (শিল্প ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। উচ্চ শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।*

Sargent report-এর সুপারিশ:

"The Academic High School will impart instruction in the Arts and pure Sciences, while the Technical School will provide training in the applied Sciences and industrial and commercial subjects. In both types the Junior departments covering the present middle stage will be very much the same and there will be common core of the "humanities" through-out. Art and Music should be an integral part of the curriculum in both."

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৭ হইতে ২০ বৎসর)

সার্জেণ্ট স্কীমে ইণ্টারমিডিয়েট্‌ স্তর উঠাইয়া তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। এই স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ রাখার কথাও বলা হইয়াছিল। সকল ছাত্রই যাহাতে এইস্তরে ভিড় না জমায় তাহার জন্য পাশাপাশি একটি শিল্প-শিক্ষার খাত সৃষ্টি হয়। সার্জেণ্ট-কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি ত্রুটি দর্শান। সবচেয়ে বড় ত্রুটি হইল ঐ শিক্ষার ফলে সমাজের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হইতেছে না। পরীক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এবং পুস্তককেন্দ্রী-শিক্ষাকেই আসল শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া যে সব ছাত্রছাত্রী দারিদ্রতা-বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের জন্য অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থাও নাই।*

শরীর শিক্ষা

সার্জেন্ট স্কীমে বিদ্যালয়গুলিতে টিফিন সরবরাহ, ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছিল। সেই সাথে শরীরচর্চার সময় ও সুযোগ বাড়ানোর কথাও বলা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে অসুস্থ ছাত্রছাত্রী কিংবা খাদ্যাভাবে পীড়িত ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লাভ নাই। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থার সাথে সাথে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয়-গৃহ ও পরিবেশ এবং আসবাবপত্রের কথাও উঠে। কমিটি সে বিষয়েও সুপারিশ করেন।

Sargent report বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন

"Indian universities as they exist today, despite many admissible features do not fully satisfy the requirements of a national system of education. In order to raise standards all round, the conditions of admission must be revised with the object of ensuring that all students are capable of taking full advantage of a university course. The Proposed reorganisation of the High School System will facilitate this. Adequate financial assistance must be provided for poor students. The present Intermediate Course should be abolished. Ultimately the whole of this course should be covered in the High School, but as an immediate step the first year of the course should be transferred to High School and the second to the universities. The minimum length of the university course should be three years.

জড়বুদ্ধি, ক্ষীণমেধা এবং বিকলাঙ্গদের শিক্ষা

সার্জেন্ট স্কীমে ইহাদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে যে এই সমস্ত ছেলের পড়াশুনা হয় না তাহা অনুভব করিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় নিরক্ষরতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। এই পরিকল্পনায় বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছিল।*

শিক্ষক-শিক্ষণ

সার্জেন্ট স্কীমে শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা সুপারিশ করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইলে শিক্ষকতার মান আরও উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কমিটি সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধেও ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সহিত মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় শিক্ষকদের ত্যাগের উপর নির্ভর করিয়া এবং জীবন-যাপনের আয়োজন ন্যূনতম রাখিয়া বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার কথা বলা হইয়াছিল। ইহা যতখানি ভাবাবেগ-প্রসূত ছিল ততখানি বাস্তবানুগ ছিল না। কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনায় উহা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষকের

* সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য আছে।

"The normal age range of adult education should be 10 plus to 40.

As far as possible separate classes should be organised, preferably during the daytime, for boys between ten and sixteen years, as it is undesirable from many points of view, to mix boys and men in adult classes......

In order to make adult instruction interesting and effective, it is necessary to make fullest possible use of visual and mechanical aids, such as pictures, illustrations, artistic and other objects, the magic lanterns, the Cinema, the gramophone, the radio etc., dancing particulary folk dancing, music, both vocal and instrumental and dramas will also be useful.

বেতন ৩০৲—৫০৲ এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটের বেতন ৭০৲—১৫০৲ টাকা, তদুপরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাসার ব্যবস্থা অন্যথায় মাসিক ১০৲ টাকা ভাতা ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির সুযোগের সুপারিশ করা হইল। ১৯৪৪ সালের আর্থিক মানের ভিত্তিতে ইহা উপযুক্ত মনে হইতে পারে। সার্জেন্ট রিপোর্টে বর্ণিত আছে যে পূর্ব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন শিক্ষক, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন শিক্ষক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ২০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দুই বৎসরের ট্রেনিং প্রাপ্ত হইবেন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আণ্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে ২ বৎসর এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে ১ বৎসর শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা বিচার

ইহার পূর্বে বহু বার শিক্ষা-সংস্কারের জন্য নানা কমিটি-কমিশন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার সমস্ত স্তর লইয়া সামগ্রিক ভাবে পারস্পরিক সংগতি রক্ষা করিয়া একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা-রচনা সার্জেণ্ট স্কীমেই প্রথম দেখা গেল। সেই জন্য পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইহার পূর্বে সরকারী তরফে যে সব কমিটি বা কমিশন গঠিত হইয়াছে তাঁহারা কেহই তাঁহাদের সমস্যাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মনে ইংল্যাণ্ডের ছবি সারাক্ষণ ভাসিয়াছে এবং ইংল্যাণ্ডের মতই তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু সার্জেণ্ট স্কীমেই প্রথম ভারতীয় দৃষ্টিতে ভারতের আশা, প্রয়োজন, সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা রচিত হইল।

এই পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর হইতে শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায় এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প-শিক্ষার একটি ধারা গড়িয়া তোলার সুপারিশ থাকায় ভারতের শিল্পমান দক্ষতার ক্রমোন্নয়ন করা সম্ভব হইবার আশা ছিল এবং ভারতে দ্রুত শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির আশা ছিল।

শিক্ষার যে পরিমাণ অপচয় এতকাল চলিতেছিল তাহা সমূলে বিনষ্ট করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শিক্ষাগ্রহণের পর জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে যাহাতে ব্যর্থতার সৃষ্টি না হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষকদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ণের প্রচেষ্টা করিয়া বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দান করা হয়।

দুইটি বিষয়ে এই পরিকল্পনার ত্রুটি ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। সকল স্তরে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়া যাওয়ায় ইহা রূপায়িত করার আর্থিক বাধা ছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার জন্য বাজেটের যতটা অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত তাহা তো হয়ই নাই, ইহা শাসকদের সহানুভূতিও আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু সার্জেন্ট্-পরিকল্পনা যথার্থ ই দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। ভারতের মত অনগ্রসর দেশে ব্যয়-বাহুল্য যে ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষা আরও অনেক ব্যয়বহুল হইয়াছে। সার্জেন্ট-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ব্যয় হইবে ৩১৩ কোটি টাকা। ঐ সময়ে ফি ইত্যাদি হইতে শিক্ষার আয় সাড়ে পয়ত্রিশ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করিতে হইলে প্রয়োজন আরও ২৭৭½ কোটি টাকা। কিন্তু এই টাকা প্রথমেই খরচ হইবে না। ৪০ বৎসরে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যখন পূর্ণাঙ্গ হইবে তখন প্রতি বৎসরে লাগিবে ৩১৩ কোটি টাকা। কিন্তু এত টাকা আসিবে কোথা হইতে? দেশ যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন দেশ রক্ষার জন্য টাকা যেদিক হইতে হউক যোগাড় করা হয়। কিন্তু অশিক্ষা-রূপ যুদ্ধের আক্রমণে কি কোনও রূপে টাকার ব্যবস্থা করা যাইবে না? জাতীয় ঋণ গ্রহণ করিয়া এই টাকা অনায়াসে তোলা যাইতে পারে। শিক্ষার জন্য যদি টাকা খরচ হয়, সেই টাকা কখনও বিফলে যাইবে না, শিক্ষার ফলে দেশ যখন সমৃদ্ধ হইবে, তখন যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সুদে আসলে জাতীয় ভাণ্ডারে জমা পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, ত্রুটি শিক্ষণের ব্যবস্থা আগে করিয়া পরে এই পরিকল্পনা সুরু করিতে বলা। তাহা হইলে এই পরিকল্পনা সুরু হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবার কথা।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সার্জেন্ট-পরিকল্পনা সর্বতোভাবে অনুসৃত হইলে জাতির মঙ্গল হইত। ইহা শাসকের মনোভাব লইয়া রচিত না হইয়া যথার্থই শিক্ষা পরিকল্পনা হইয়া উঠিয়াছিল।

স্যার জন সার্জেন্ট প্রকৃতই শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। তিনি যদিও মৌলিক কোনো পরিকল্পনা রচনা করেন নাই, পূর্বেকার পরিকল্পনার ভাল ভাল অংশগুলি সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করিয়াছিলেন, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইতিপূর্বে এত ভাল পরিকল্পনা সরকার পক্ষ হইতে রচিত হয় নাই। কারণ যুদ্ধের সময় সকল দেশের নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছিল যে, যে দেশের কারিগরী শিক্ষার মান যত বেশী উন্নত, যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা সে দেশের তত অধিক। ভারতবর্ষ ইংরেজের সম্রাজ্যের অন্তর্গত হিসাবে যুদ্ধে নামিয়াছিল এবং ভারতের মত বিশাল দেশে কারিগরী শিল্পের অভাব, কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের অভাব ইংরাজের কাছে বিপুল ভারস্বরূপ ছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে লিপ্ত প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা ধারার পরিবর্তন সুরু হইল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার প্রাধান্য সূচিত হইল। এই প্রভাব ভারতেও পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার একটি সমান্তরাল ধারা পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় একথা মনে করা হইয়াছিল যে শিল্প-শিক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ ধারা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অচিরে ভারত শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হইতে পারিবে।

আর একটি বিষয়ে সার্জেন্ট-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সারা ভারতে এত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ। সার্জেন্ট-কমিটির হিসাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ১৯৮৫ খৃঃ পর্যন্ত সময় নির্ধারিত করা হইয়াছিল। মনে করা হইয়াছিল এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হইবে। কিন্তু অত্যুৎসাহী স্বাধীন ভারত সরকার মনে করিলেন, ১৯৮৫ খৃঃ পর্যন্ত অনেক বেশী সময়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা যাইবে।

কিন্তু এখন লক্ষ্য করা যাইতেছে, স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিগত কয়েক বৎসরের প্রগতি দেখিয়া বরং এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে ১৯৮৫ সালের মধ্যেও হয়ত ভারত সরকার সম্পূর্ণ ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমর্থ হইবেন না।

১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই দশ বৎসরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও ওয়ার্ধা স্কীম ও সার্জেন্ট-পরিকল্পনা শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। বলাই বাহুল্য, পরবর্তী কালে ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার, কোনো প্রদেশে 'সার্জেন্ট স্কীমের' প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

সার্জেন্ট স্কীম সত্যই শিক্ষাব্রতীর দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত সার্থক পরিকল্পনা যাহা অনুসৃত হইলে সত্যই ভারত উন্নত হইত।

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য

সারা পৃথিবীতে যে বিপুল মানব-গোষ্ঠী বাস করে আমরা সাধারণভাবে তাহাদের কয়েকটি জাতির সমষ্টি বলিয়া থাকি। যেমন—ব্রিটিশ জাতি, আমেরিকান জাতি, ভারতীয় জাতি ইত্যাদি। কিন্তু কি কারণে এইরূপ 'জাতি' আখ্যা দেওয়া হয় এবং এক হইতে অন্যকে পৃথক করা হয়? তাহার উত্তরে বলা যায়, এক জাতির জীবন-ধারায় এমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহা অপর জাতির জীবন-ধারায় দেখা যায় না। প্রত্যেক জাতির জীবন-ধারায় এই যে বিশিষ্টতা—ইহা কোনো একটি বিষয়ে অনুশীলনের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। ইহা সমগ্র জাতির সমগ্র জীবন চর্য্যার ফল। সমগ্র জাতির জীবন-যাপনের ক্ষেত্রটিকে আমরা মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করিতে পারি।

বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য

(ক) সমাজ-জীবন (খ) অর্থনৈতিক-জীবন (গ) রাজনৈতিক-জীবন (ঘ) ধর্ম বা অধ্যাত্ম-জীবন।

এইগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নয়, পরন্তু পরস্পর সম্পৃক্ত ও সাপেক্ষ। এই সমস্ত বিষয়গুলির মূল ভিত্তি হইল জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। ধরা যাউক, ভারতীয় জাতির সমাজ-জীবন। ইহা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। বাহিরের নানা প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে সত্য কিন্তু স্বকীয় ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহা বর্তমান রূপে উপনীত হইয়াছে। সমাজ-জীবন বলিতে আমরা কতকগুলি সামাজিক আচার আচরণ প্রথা মূল্যবোধ, রীতি-নীতি বুঝিয়া থাকি। এইগুলি সুপ্রাচীন কাল হইতে নানা ভাবে বিবর্তিত হইতে হইতে বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। কাজেই বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় জীবনে যে সমাজ-জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার মূল রহিয়া গিয়াছে অতীত ঐতিহ্যে।

সমাজ-জীবন

অর্থনৈতিক একটি বিশেষ রূপ আমরা ভারতীয় জীবনে লক্ষ্য করিতেছি, যাহার সহিত হুবহু অন্য কোনো জাতির মিল নাই। এই অর্থনৈতিক বিশেষ রূপটিও ক্রম-বিবর্তনের খাত বহিয়া বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে।

অর্থনৈতিক জীবন

একই ভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-জীবন অতীত কালের দীর্ঘ-দিনের চর্য্যার মধ্য দিয়া এক বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে —যাহার সহিত অন্য জাতির রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-জীবনের সংগে অবিকল মিল থাকা অসম্ভব।

রাজনৈতিক ধর্মীয় জীবন

প্রত্যেক জাতির জীবনের এই বিশিষ্টতা প্রকটিত হয় জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া। কাজেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাই জাতির বিশিষ্ট জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখার, তাহাকে উজ্জীবিত করার এবং অপর জাতির সংগে যুক্ত করার ভূমিকা গ্রহণ করে। কাজেই কোনো জাতির উত্থান বা পতনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে এক একটি বিধ্বংসী যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে ব্যাপক ভাবে শিক্ষা-সংস্কারের আয়োজন পড়িয়া যায়। জাতি তাহার পতনের দিনে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অনুভব করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজার প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।

কাজেই ইহা সহজবোধ্য যে কোন জাতি যখন অনুভব করে যে তাহার দেশে প্রবর্তিত জাতীয়-শিক্ষা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ তখনই তাহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

উপরের আলোচনা হইতে জাতীয়-শিক্ষা জাতির জীবনে কিরূপ স্থান অধিকার করে পরে তাহা বুঝা যাইবে।

কাজেই, জাতির সমগ্র অতীত-ভবিষ্যৎ যে জাতীয়-শিক্ষার উপর নির্ভর করে তাহার বৈশিষ্ট্য কি জানা দরকার।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উত্থান বা পতনের জন্য দায়ী থাকে, কাজেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে জাতীয়-শিক্ষার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতির সর্বতোভাবে কল্যাণ সাধন। প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার শিক্ষারই সর্বোত্তম ও মহত্তম লক্ষ্য হইল জাতির কল্যাণ-সাধন। জাতীয় শিক্ষা জাতির জীবনের সর্বাংগীন কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

জাতীয়-শিক্ষা সমগ্র জাতির জীবনে ব্যাপ্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী লইয়া কোনো জাতি গঠিত হয়। জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল মানবের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলিয়া জাতির সর্বস্তরে ইহা পরিব্যাপ্ত থাকে। যদি এমন হয়, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বা সামাজিক কৌলীন্য ইত্যাদির আনুকূল্যে জাতির একাংশ শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করিতেছে অপরাংশ বঞ্চিত হইতেছে তাহা হইলে তাহাকে কোনোমতেই জাতীয়-শিক্ষা বলা যায় না। জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সমান সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-পরিমণ্ডলে লালিত হইবার অবকাশ যেখানে অবারিত তাহাকেই জাতীয়-শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

সমগ্র জাতির জীবনে ব্যাপ্ত

শুধু তাহাই নহে। একটি সমাজ বিভিন্ন বয়সের নরনারী লইয়া গঠিত। শৈশব লইতে যৌবন পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন সীমিত করিয়া যদি পরবর্তী কালের জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলেও সে শিক্ষা-ধারা হয় খণ্ডিত। কাজেই যে শিক্ষা-ধারার মধ্যে সমাজের সকল সভ্যর শিক্ষার আয়োজন থাকিতে হয়। কিন্তু সমগ্র শিক্ষা-ধারার মধ্যে প্রধান অংশ জুড়িয়া থাকে বাল্য ও যৌবনের শিক্ষা-ব্যবস্থা।

সকলের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা পাইবার দাবী সকলেই জানাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যে বিশ্বাসী কারণ শক্তি, আগ্রহ, সামর্থ, বুদ্ধি ও প্রবণতার পার্থক্য। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যে মানবগোষ্ঠী লইয়া জাতি গঠিত হয় তাহা যেমন বয়স, সামাজিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা বা ধর্মীয় চিন্তাধারায় পৃথক পৃথক হয় তেমনি পার্থক্য দেখা যায়, আগ্রহ, রুচি, বুদ্ধি ইত্যাদিতেও। এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া জাতীয় শিক্ষা সর্বাধিক মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের সহায়ক হইবার পরিবেশ রচনা করে।

আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষাধারার পার্থক্য

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অপর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিষয়বস্তু। জাতির মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া লইয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। জাতির মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য আবার নির্ভর করে জাতি চিরাচরিত যে পদ্ধতিতে ও

বিষয়বস্তু

প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিয়া আসিয়াছে তাহার উপর। কাজেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর একদিকে যেমন জাতির চিরায়ত্ত ঐতিহ্যগুলি প্রভাব বিস্তার করে অপরদিকে তেমনি জাতির প্রাকৃতিক পরিবেশও প্রভাব বিস্তার করে। তাই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মানস-গঠন ও বর্তমান পারিপার্শ্বিক বুঝিয়া এমন শিক্ষা-উপাদান নির্বাচিত করে যাহার প্রয়োগ-প্রভাবে জাতির মানস ক্ষেত্রের উদ্বোধন ঘটিতে থাকে, জাতির প্রতিভা নানাদিকে নিত্য বিকশিত হইয়া উঠে। যে শিক্ষার মধ্যে এই জাতীয়-উপাদান থাকে না তাহাকে কোনো ক্রমেই জাতীয় শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যায় না।

বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মর্মমূল হইতে রস গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সুষম বৃদ্ধির জন্য বাহিরের রৌদ্র বাতাসও নিত্য প্রয়োজন। অপরাপর জাতির জীবন চর্যার সুফল, নানা কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয় লব্ধ নানা জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রয়োগ-বিদ্যা গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইতে পারিলে সত্বর সমুন্নতি সম্ভব হয়। জাপান ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কাজেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ইহা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য যে জাতীয় শিক্ষার মূল জাতির প্রাণকেন্দ্রে যেমন প্রবিষ্ট থাকিবে বাহিরের বহু জাতির বহু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করিয়া নিত্য সমৃদ্ধ হইতে হইবে।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শ

প্রত্যেক জাতির সামনে কতকগুলি ভাবাদর্শ থাকে। এই পরিকল্পিত ভাবাদর্শগুলিই জাতির জীবনের নিয়ামক হয়। জাতি নিজস্ব পন্থায় এই ভাবাদর্শগুলিকে উপলব্ধি করিতে চায়। এইগুলির মধ্যে বর্তমানে সর্বপ্রধান ভাবাদর্শ হইল রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। অতীতে যখন রাষ্ট্রশক্তি প্রধান ছিল না তখন আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ প্রধান ছিল। যে ধরণের ভাবাদর্শই প্রবল থাক না কেন,—তাহা উপলব্ধির জন্য জাতি যে সুশৃঙ্খল শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। অর্থাৎ জাতির ভাবাদর্শ যদি একনায়কতন্ত্র সমর্থক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকূলে যায় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সেই ধরণের ব্যক্তিত্ব গঠনের আয়োজন ও চেষ্টা করিবে। জাতির ভাবাদর্শ যদি গণতন্ত্র-সম্মত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে যায়, জাতি সেই ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিবে জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়া। তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার ইহাও এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে, জাতীয় শিক্ষা জাতির ভাবাদর্শ উপলব্ধির সহায়ক উপায় মাত্র। যে

ভাবাদর্শ দ্বারা জাতি পরিচালিত হয় তাহাকে জাতির জীবন-দর্শন বলা যাইতে পারে। কাজেই শিক্ষা-দর্শনের ব্যবহারিক রূপ হইয়া দাঁড়ায়।

উপরে সুশৃঙ্খল শিক্ষাধারার কথা বল হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাধারা একটি সুপরিকল্পিত সুশৃঙ্খল শিক্ষাধারা। ইহা এরূপ ভাবে বিন্যস্ত থাকে যে জাতির প্রতিটি সভ্য এক স্তর হইতে অন্য স্তরে স্বাভাবিক ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষা সমাপ্ত করে। যে শিক্ষা সমাপ্ত করে তাহা ব্যর্থতার বোঝা না হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমাজের প্রয়োজনীয় সভ্য হইতে সহায়তা করে। তাহার বদলে বিশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত, জাতির প্রয়োজনের দিকে অপ্রয়োজনীয় কোনো শিক্ষাধারাকে জাতীয়-শিক্ষা বলা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ভাল ভাল বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া লইয়া কোনো জাতি নিজের জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিতে পারে। কিন্তু ভাল ভাল কয়েকটি ফুল লইয়া তোড়া বাঁধার মতন জাতীয়-শিক্ষা গঠন করা যায় না।

স্বাধীনতা

জাতীয়-শিক্ষার সর্বশেষ সর্ত হইল স্বাধীনতা ; অর্থাৎ পরিচালনার দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সমগ্র শিক্ষাধারা পরিচালনাকে আমরা কয়েক বিষয়ে ভাগ করিয়া লইতে পারি। শিক্ষার বাহন, শিক্ষা পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা।

মাতৃভাষা

জাতীয়-শিক্ষা তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন শিক্ষার বাহন থাকে মাতৃ-ভাষা। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই জাতির জীবনের সর্ববিধ রূপের প্রকাশ। মাতৃ-ভাষাতেই সংরক্ষিত থাকে, উৎসব, অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ কাজকর্ম, সকল ব্যাপারে ভাষাই প্রধান। সেই ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য ভাষাতে যে ধরণের শিক্ষাই প্রবর্তিত হউক না কেন তাহাকে জাতীয়-শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যায় না। অন্য ভাষা আশ্রয় করা মাত্রই শিক্ষা সকল দিকে পরাধীনতা অবলম্বন করে। সেখানে শিক্ষার বদলে ভাষাই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। তাই মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদান জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম সর্ত।

শিক্ষার পরিচালক-মণ্ডলীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সরকার, উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এক দিকে পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করেন, শিক্ষকবৃন্দ অপর দিকে শিক্ষা পরিচালনা করেন। উভয় প্রকার পরিচালক-মণ্ডলীকে সর্বতোভাবে স্বাধীন হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো ধরণের

পরাধীনতার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা স্বকীয় রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। জাতীয় প্রতিনিধি ছাড়া অপর কেউ জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে পারেন না, জাতীয় চরিত্রের প্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারেন না। সরকার এক দিকে শিক্ষা-পরিচালনার জন্য নানা নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে থাকেন অপর দিকে শিক্ষকেরা তাহা অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু সরকার যদি জাতীয় না হন তাহা হইলে জাতির বিশেষ মর্যাদা রক্ষা করিয়া শিক্ষা-পরিচালনা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। সেজন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

পরিচালনা

সর্বশেষে সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল তিনটি বৈশিষ্ট থাকে, **ব্যাপ্তি, বিষয় ও পরিচালনা**। এই তিনটি বিষয়ে জাতীয়তা বজায় থাকিলেই শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় হইয়া উঠে। ইহার কোনো একটির অভাব ঘটিলে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আর জাতীয় আখ্যা দেওয়া যায় না।

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গেলে তাহাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা দরকার। **প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উত্তর স্বাধীনতা যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা**।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা যাহাকে আমরা ইংরাজী শিক্ষা বলিয়া থাকি তাহা কতখানি জাতীয়-শিক্ষা ছিল তাহা আমাদের দেখিতে হইবে।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, জাতির প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে, প্রাচীন যে শিক্ষাধারার প্রচলন ছিল তাহাকে ধ্বংস করিয়া নহে, তাঁহার সংস্কারের মধ্য দিয়া। কিন্তু অ্যাডাম্স্ রিপোর্টে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে চিরকাল ধরিয়া হিন্দু-মুশলিম-বৌদ্ধ আদর্শ অনুযায়ী দেশে যে শিক্ষাধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল। তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন শিক্ষাধারার প্রতিষ্ঠা হইল। কাজেই প্রাক্-স্বাধীনতা আমলের যে দেশব্যাপী শিক্ষাধারা—তাহাকে কোন মতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ

নূতন শিক্ষাধারা

দ্বিতীয়তঃ, আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জাতীয় শিক্ষার সর্বোত্তম ও মহত্তম উদ্দেশ্য হয় জাতির সামগ্রিক কল্যাণ-সাধন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া এই

শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে জাতির কল্যাণ চিন্তা কিছুই ছিলনা। তৎকালীন শিক্ষাপরিচালকদের প্রতিভূ মেকলে ইউরোপীয় সভ্যতার কিছু অংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায়—"Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."—সৃষ্টিই ছিল এই শিক্ষা-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য। কাজেই যে হীন উদ্দেশ্য লইয়া এই শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার জন্য ইহাকে জাতীয় শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যায় না।

বিভাগীয় শিক্ষাদর্শ

একজাতি যখন নিজেদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে এবং অপর সকল জাতিকে হীন মনে করিয়া নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি অপর জাতির উপর চাপাইবার চেষ্টা করে তাহাকে কোনো মতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। নুরুল্লা এবং নায়কের ভাষায়, "The British people of the Victorian era complacently believed that their language, literature and educational methods were the best in the world and that India could do no better than adopt them in toto."

বিদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতির চাপ

প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাব শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বক্ষণ প্রবল ছিল। ফলে তাঁহারা দেশীয় সকল কিছুকেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। লর্ড মেকলে হইতে যদি ইংরাজীর সূত্রপাত ধরা যায়, তাহা হইলে মেকলে কি দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজকে দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই ভাষায়—"I have never found one among them (i. e. the orientalists) who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature." ফলতঃ ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবে অন্ধ হইয়া তাহা ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী করিয়াছিলেন বলিয়া তখনকার শিক্ষাকে কোনোমতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না।

তৎকালীন শিক্ষা পরিচালনায় তিনটি দল কর্তৃত্ব করিত। প্রথম ছিল—মিশনারীরা, যাঁহারা সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যাপ্টিজম্-এর জলস্পর্শে পবিত্র করিয়া উদ্ধার করিবার আশায় ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক

ধর্মান্ধ মনোভাব

ব্যাপক কর্তৃত্ব দখল করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত এডুকেশান মিনিটে মেকলে উল্লেখ করিয়াছিলেন,—"It is my firm belief if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respective classes in Bengal thirty years hence."

এই সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধ মনোভাব দ্বারা তখনকার শিক্ষা দূষিত ছিল, কাজেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা কি ভাবে বলা যায় ?

এই শিক্ষার আরও উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া উপর তলার স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ফলে পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহা ছিল খণ্ডিত ও সঙ্কীর্ণ। তাই ইহা জাতির আশা-পূরণে সহায়ক হইতে পারে নাই।

এই শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল দেশীয় সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত, ইহার মাধ্যম ছিল বিদেশী ভাষা, নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বতোভাবে পরাধীন ; কাজেই এই সময়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না।

ইংরাজ শাসন-কালীন ভারতের শিক্ষা-পরিচালনার কর্তৃত্ব তিনটি দলের হাতে ছিল। প্রথম দল ছিল মিশনারীরা, যাঁহাদের লক্ষ্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দল ছিল শাসক-গোষ্ঠী, তৃতীয় দল—দেশীয় বা বিদেশীয় বেসরকারী ব্যক্তিদের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। বেসরকারী ব্যক্তিদের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা আবার দুই ধরণের ছিল। কেউ কেউ সরকারী আওতার মধ্যে থাকিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন আবার কেউ কেউ সরকারী কর্তৃত্বের বাহিরে থাকিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন।

ইংরেজ শাসনকালে জাতীয় শিক্ষা গড়িয়া উঠে নাই

পূর্বে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ইংরাজ শাসন কালে ভারতে জাতীয় শিক্ষা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পূর্বে বৃটিশযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে ত্রুটিগুলির কথা উল্লিখিত হইয়াছিল সেগুলিকে এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(১) ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতের জাতীয় জীবন ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাহাকে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করে নাই। অবশ্য ভারতের সহিত যে সম্পর্ক সেখানে এরূপ আশাও করা যায় নাই। মিশনারীরা ভারতকে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া

মনে করিত, কোম্পানী ইহাকে মুনাফা লুটিবার ব্যবসাক্ষেত্র বলিয়া জানিত।

(২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় নাই বলিয়া শিক্ষায় তাহার প্রভাব অনুভব করা যায় নাই। অবশ্য ইহার জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্তরে ব্যাপক প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহাও বলা যায় না।

(৩) ইহার আদর্শ ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত পক্ষে স্বদেশীয়দের দ্বারা সামান্যতম জাতীয় ভাবধারা উজ্জীবনের প্রচেষ্টাকেও শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখিত না।

(৪) বার বার ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ। প্রথম দিকে বেসরকারী শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টাকে অবদমিত করা হইয়াছিল আবার শেষ দিকে মিশনারী, সরকার, বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছিল, সময়ে সময়ে ইংল্যাণ্ডে যে ধরণের সংস্কার সাধিত হইত, ভারতেও তাহা অনুসৃত হইত।

(৫) ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আসিতে দেওয়ার বিপক্ষে শাসকগোষ্ঠী সদা সজাগ থাকিত।

(৬) শিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষক ও পরিচালক সংগ্রহ ঠিক মত হইত না।

(৭) একটি সুষ্ঠু সামগ্রিক পরিকল্পনার একান্ত অভাব ছিল।

অবশ্য ইহাও সত্য নহে যে এই দীর্ঘকালের ইংরাজ শাসন কালে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো উদ্যম ছিল না। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সরকারী আওতার মধ্যে থাকিয়া কোথাও কোথাও শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল আবার স্বাধীনভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে হাতে-কলমে পরীক্ষার আয়োজনও কোথাও কোথাও হইয়াছিল।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠন করিয়া ভারতীয়দিগকে শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা প্রচলিত তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। একই সময়ে ইরাক, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে দ্রুত উন্নতি ভারতীয়দের ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছিল ও সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করিবার প্রেরণা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষা যাঁহারা চালাইতেছিলেন তাঁহারা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক দল স্বাধীনভাবে, অন্য দল সরকারী শাসনযন্ত্রের

আওতার মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের কার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। যখন এই শিক্ষা-আন্দোলন সুরু হইল তখন বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, কারণ ইংরেজের রোষ সহ্য করিয়া তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যেগুলি টিকিয়া যায় সেগুলির মধ্যে গুরুকুল, এস্, এন্, ডি, টি, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বিদ্যাপীঠ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, হিন্দুস্তানী তালিমি সংঘ, পণ্ডিচেরী আন্তর্জাতিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রধান। প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া ব্রিটিশ যুগের দীর্ঘকাল তমসাচ্ছন্ন যুগের মধ্যে ভারতীয়দের উৎসাহের ক্ষীণশিখা জ্বলিতেছিল, পরবর্তী কালে উত্তর-স্বাধীনতা যুগের যাবতীয় শিক্ষা-সংস্কারের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলিই। কাজেই এই প্রতিষ্ঠান-গুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের বর্তমানের যাত্রাপথের পাথেয় যোগায়।

গুরুকুল

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সূচনা কালে যখন সত্যযুগে ফিরিয়া যাওয়ার আন্দোলন প্রবল হয় তখন আর্য-সমাজ 'গুরুকুল' প্রতিষ্ঠা করে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন ইহার প্রধান উদ্গাতা। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের ন্যায় তপোবনে ব্রহ্মচর্য পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া আদর্শ নাগরিক গঠন ছিল ইহাদের আদর্শ। শহর হইতে দূরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের মধ্যে এই তপোবন প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার পরিচালকবৃন্দ এক নূতন পরীক্ষা সুরু করেন। হরিদ্বারে কাংরী গুরুকুল ও মথুরায় বৃন্দাবন গুরুকুল স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী কালে উভয় গুরুকুলই নানা শাখায় প্রশাখায় পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্মধারা প্রায় একরূপ। সাধারণতঃ ৭-৮ বৎসর বয়সের ছাত্রের এখানে ভর্তি করা হয় এবং চৌদ্দ বৎসর পর পাঠ সমাপ্ত করিলে স্নাতক উপাধি পাওয়া যায়। আরও দুই বৎসরের পাঠ শেষ করিলে বাচস্পতি (এম, এ) উপাধি পাওয়া যায়। এখানকার শিক্ষার ভাষা হিন্দী এবং এইখানে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

গুরুকুলের শিক্ষা-প্রণালী কতকটা কঠোর। গ্রীস দেশের স্পার্টার সহিত তাহার খানিকটা তুলনা করা যাইতে পারে। সহশিক্ষা এখানে অনুমোদিত নহে এবং চারুকলা শিল্প ইত্যাদি অবহেলিত। ছাত্রদের অনাড়ম্বর কঠোর

জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া প্রতিটি দিন অতিবাহিত করিতে হয় এবং ২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ২৪ বৎসর নিরামিষ আহার্য গ্রহণ করিয়া শুচিশুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে হয়। প্রাচীন হিন্দুধর্মাদর্শ অনুযায়ী এখানকার আয়ুর্বেদ বিভাগ দেশীয় ভেষজ-বিজ্ঞানের চর্চা ও ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত আছে।

বৈদিক আদর্শ সামনে রাখিয়া মহিলাদের জন্য গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা, দেরাদুনের কন্যাগুরুকুল, বরোদার আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়। ষোল বৎসরের আগে কেহ এখানে বিবাহ করিতে পারে না। নারীদের শিক্ষার প্রতি উভয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ যত্নবান।

বোম্বাই-এর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়—বোম্বাই

ডাঃ ডি. কে. কার্ভে ১৮৯৬ সালে হিন্দু বিধবাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন পুনায়। এই প্রতিষ্ঠান দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকে। ডাঃ কার্ভে ভারতীয় নারীদের উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করিতে থাকেন এবং নূতন ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হন। ডাঃ কার্ভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নারী ও পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। এই ভিন্নতা বজায় রাখিয়া তিনি ভারতীয় নারীদের আদর্শে শিক্ষার পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত পাঠ্যসূচীতে শিক্ষা সমাপ্তির কাল ধরা হইয়াছিল ১৮ বৎসর। কেননা তখনকার দিনে ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালিকারা প্রায়শঃ অবিবাহিত থাকিত না।

ডাঃ কার্ভের পরিকল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অতি দ্রুত এই প্রতিষ্ঠান উন্নত ও সুসংগঠিত হইয়া উঠে। শীঘ্রই সারা ভারত এমন কি ভারতের বাহির হইতেও এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের আগমন ঘটিতে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মহিলাদের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পাঠ্যতালিকার মধ্যে সংগীত, অংকন-বিদ্যা ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাধান্য আছে। বাহিরের ছাত্রী যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিতে পারে না তাহাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিদ্যালয় হইতে করা হয়। ইহা বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা-সংসদের অনুরূপ।

বিদ্যাপীঠসমূহ

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতা, ঢাকা, পুনা, আমেদাবাদ, বেনারস, আলীগড়, লাহোর, যাদবপুর প্রভৃতি স্থানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ আরম্ভ করে। বিদ্যাপীঠগুলির এরূপ আদর্শ ছিল যে, এইগুলি এমন জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে যাহাতে দেশভক্ত তরুণরা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। পরে এই সমস্ত বিদ্যাপীঠ নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়।

জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী সমগ্র ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন বিদেশী শিক্ষালাভ হইতে বিরত থাকিতে। ফলে ছাত্রগণ বিদেশী শাসকদের অর্থে পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এই ব্যাপারে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শৌকত আলি আলিগড়ে গমন করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি উপস্থিত করা মাত্র ছাত্রগণ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয়করণের জন্য দাবী জানায়। কিছু দিন এইরূপ চলিলে পর ছাত্রদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাত্র তাহাদের পুরাতন দাবী জানাইতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐ ছাত্রদলকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করে। ছাত্রগণ বাহিরে আসিয়া তৎক্ষণাৎ একটি জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া নামে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। হাকিম আজমল খাঁ ও ডাঃ এম. এ. আনসারি জামিয়া-মিলিয়া-ইস্‌লামিয়াকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আলিগড় হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন।

জামিয়া-মিলিয়ার উদ্দেশ্য

জামিয়া-মিলিয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্রদের মধ্যে নাগরিকের সুগুণগুলি ফুটাইয়া তোলা যাহাতে তাহারা ভারতবর্ষের কৃষ্টির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিতে পারে। জামিয়া-মিলিয়াতে যে

জাতীয় শিক্ষা দান করা হইতেছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয় ও পশ্চিমী কৃষ্টির সমন্বয় সাধন করা।

জামিয়া-মিলিয়া-ইস্‌লামিয়া যে কয়েকটি প্রকৃষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা হইতেছে—(১) জামিয়া-মিলিয়া সরকারের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে না। জামিয়া-মিলিয়ার আইন-কানুন, পাঠ্যক্রমে ইত্যাদি সমস্ত জামিয়া-মিলিয়াই রচনা করিবার অধিকারী।

জামিয়া-মিলিয়ার নীতি

(২) জামিয়া-মিলিয়ার উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপন্থী এমন কোন সর্তে জামিয়া-মিলিয়া কোন স্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবে না।

(৩) জামিয়া-মিলিয়াতে সকল শিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে উর্দু, কিন্তু যদি বিশেষ কোন অবস্থার সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে অন্য ভাষায়ও শিক্ষা দান করা যাইবে।

(৪) ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইবে।*

জামিয়া-মিলিয়ার অন্তর্গত নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে।

(১) এইখানে একটি আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। এইখানে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহার সংশ্লিষ্ট একটি বৃহৎ পরীক্ষাগার এবং বিধান পরীক্ষাগার আছে।

(২) এইখানে একটি আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এইখানে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া শিল্প ও কলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) এইখানে একটি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

* The highest aspiration of the Jamia is to evolve a pattern of life for the Indian Mussalman which will have Islam as it focussing point and will be so designed as to harmonise our national culture with the universal culture of mankind. It builds on the principle that true religious Institution will stimulate patriotism and desire for unity among the Mussalmans and create the ambition to excel in the service and advancement of real national interests : so that utlimately India may have her full shaie of service in the common life of mankind and in the realisation of profess peace and justice."

—Jamia Milia Islamia a Pamphlet published by the Maktaba Jamia Ltd. Delhi.

এই বিদ্যালয়ে প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের কতকগুলি প্রজেক্ট স্থায়ী এবং কতকগুলি প্রজেক্ট সাময়িক। স্থায়ী প্রজেক্টগুলির মধ্যে আছে :

(১) একটি ব্যাঙ্ক

(২) একটি পুস্তক ও মনোহারী দোকান

(৩) একটি ফল ও মিষ্টির দোকান

(৪) হাঁস মুরগী পালন ব্যবস্থা

(৪) জামিয়া-মিলিয়ার ১নং কেন্দ্র—এইখানে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(৫) জামিয়া-মিলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সংশ্লিষ্ট জামিয়া-মিলিয়া রাসায়নিক শিল্প-বিভাগ। এইখানে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হয়।

(৬) উর্দু শিক্ষাকেন্দ্র—এইখান হইতে অনেক উর্দু ভাষায় লিখিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশন হইতে জামিয়া-মিলিয়া প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে।

(৭) সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠান আছে।

(৮) মক্তব—জামিয়া পুস্তককেন্দ্র। এই জামিয়া পুস্তককেন্দ্র হইতে বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(৯) একটি গ্রামীন শিক্ষাকেন্দ্র। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক যথা—পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান-কৌশল, শিল্পকাজ, সাহিত্য রচনা মূল্যায়ন, পরিদর্শন এবং প্রশাসন সম্বন্ধে এইখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

জামিয়া-মিলিয়া পরিচালনার জন্য বাহির হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিতে হয়। এইখানকার কর্মীরা সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতেন। হায়দরাবাদের নিজাম ও ভূপালের শাসনকর্তা এই প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। সবচেয়ে বেশী অর্থ আসিত 'হামদরদে জামিয়া' নামক প্রতিষ্ঠান হইতে।

শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র—পণ্ডিচারী

শ্রীঅরবিন্দ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিদ্যালয় হইতেই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষার একটি নূতন ধারা অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সেই শিক্ষার ধারা অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত শিক্ষাক্রম ঐ কেন্দ্রে অনুসৃত হইয়া থাকে।

(১) **শিশুশ্রেণীর স্তর**—চার বৎসর বয়সে এইখানে শিশুদের ভর্তি করা হয়। এইখানে খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের তিন বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) **প্রাথমিক শিক্ষাস্তর**—প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম চার বৎসরের। এই স্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়—ইংরাজী, ফরাসী ও মাতৃ-ভাষা। বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজ-বিদ্যা এবং ড্রইং এই স্তরে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩) **উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা**—এই স্তরের শিক্ষাকাল ৭ বৎসর। ইহার মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের ২ বৎসর কালও যুক্ত আছে। এই-খানকার পাঠ্যক্রমে প্রাথমিক কোর্সের তিনটি ভাষা—অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ-বিদ্যা, ড্রইং ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর—ডিগ্রী পাইবার জন্য তিন বৎসর শিক্ষাকাল। ডিগ্রী পাইবার পর আরও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২ বৎসরের জন্য শিক্ষা-গ্রহণ করিতে হয়। এইখানে কোন কোন বিষয় ফরাসী ভাষায় শিক্ষা-দেওয়া হয়।

কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্র—ঐ শিক্ষাকেন্দ্রে দারুশিল্প, ধাতুশিল্প, যন্ত্র শিল্প, ফটোগ্রাফি, অঙ্কন বিদ্যা, সর্ট হ্যাণ্ড, অভিনয় বিদ্যা, বুক কিপিং, কমার্শিয়েল করসপণ্ডেন্স, এমব্রয়ডারি, কুটির শিল্প, সীবন শিল্প, আর্কিটেকচারেল ড্রইং ও ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান শিক্ষা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ট্রেনিং স্কুল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ কিছুদিন পূর্বে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত মোগা নামক স্থানে মিশনারিগণ

একটি উন্নত ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত ধরণে পরিচালিত হওয়ায় পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং মিশনারীদের অর্থ সাহায্য করেন।

এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মান হয়। ছাত্রগণ নিজেদের কাজ নিজেরাই করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠান-গুলি আবাসিক।

বিদ্যালয়গুলিতে কোনও ধরণের ভৃত্য নাই, এমন কি পাহারাদার বা ঝাড়ুদার, কিছুই নাই। ছাত্রগণকেই পর্যায়ক্রমে সমস্ত রকমের কাজ করিতে হয়। বিদ্যালয়গুলির সংলগ্ন প্রায় ৪০ একর জমি আছে, এই জমিতে ছাত্রদের কৃষিকাজ করিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করিত।

প্রত্যেক ছাত্র তাহার নিজ ব্যক্তিগত পরিশ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হইতে মজুরী পাইত। রান্নার ব্যাপারে ছাত্রগণই সব কাজ করিত, কিন্তু সকল ছাত্রের রান্না একসাথে হইত না। ২০টী করিয়া একটি দল গঠিত হইত। প্রত্যেক দল তাহাদের রান্নার ব্যবস্থা করিত। সকলেরই সকল রকম কাজ করিতে হইত। ছেলেদের সকলকে সীবন শিল্প, দারু শিল্প ও চর্ম শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল।

মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া কার্যকরী সমিতি ছিল। এই সমিতির সভ্য নয় জন—শাখাশ্রেণী সহ আটটী শ্রেণী হইতে আট জন ছাত্র এবং প্রধান শিক্ষক এক জন এই নয় জনকে হইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত। বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ এই সমিতিকে করিতে হইত। মোগায় প্রজেক্ট-পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্বভারতী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের সন্নিকটে খানিকটা জায়গা কিনিয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন এ জায়গার নাম ছিল ভুবন-ডাঙ্গা। ভুবনডাঙ্গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া মহর্ষি মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন এবং প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে কয়েকদিন শান্ত জীবন যাপন করিয়া যাইতেন। নাগরিক কোলাহল ও কৃত্রিমতা-মুক্ত এই শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মহর্ষিকে যেমন আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমনি বালক রবীন্দ্রনাথকেও

মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুকাল পর এখানে একটি আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে এই আশ্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। বর্তমানে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পার্লামেণ্ট উনত্রিংশ ধারা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এই দুইটি প্রধান এলাকায় বিভক্ত বিশ্বভারতীতে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মরত আছে।

(১) **পাঠ-ভবন।** ইহা একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এখানে ৬-১২ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা শিক্ষালাভ করে। শিক্ষাদানের ভাষা বাংলা ও ইংরাজী। আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত। গণিত, সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন বিষয় পাঠনার ব্যবস্থা আছে।

(২) **শিক্ষা-ভবন।** (স্নাতক পর্যায়ের কলেজ)

এই কলেজে তিন বছরের বি, এস সি কোর্স, তিন বছরের বি, এ কোর্স, উভয়ই অনার্সসহ, নানা ভাষায় তিন বছরের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স (বিদেশী ভাষার মধ্যে চীনা, জাপানী, তিব্বতীয়, ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজী) পাঠদান করা হয়।

(৩) **বিদ্যা-ভবন।** স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ও গবেষণার জন্য কলেজ। নানা ভাষায় এম, এ ও নানা বিষয়ে এম্. এস্. সি. ও দুই বৎসরের গবেষণা চলে।

(৪) **রবীন্দ্র-ভবন।** রবীন্দ্র-সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিতে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার কাজ চলে।

(৫) **বিনয়-ভবন।** এখানে বি, এড্, এম্, এড্ ইত্যাদি পাঠনার কাজ চলে। ইহা প্রধানতঃ শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য।

(৬) **কলা-ভবন।** ভারতীয় কলা, অংকন, চারু ও কারু শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৭) **সংগীত-ভবন।** এখানে সংগীত, নৃত্যকলা শেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সবই শান্তিনিকেতনে অবস্থিত। ইহা ছাড়াও শ্রীনিকেতনে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। যথা—

(৮) **শিক্ষাসত্র।** ইহা একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

(৯) **শিল্প-সদন।** এখানে নানা শিল্প শিক্ষাদানের আয়োজন আছে।

যথা, বাঁশ বেতের কাজ, কাগজ তৈরী, বই বাঁধাই, দড়ির কাজ, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, বয়ন, কিছু কিছু বিজলি সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা।

(১০) **পল্লী শিক্ষা-সদন।** এখানে তিন বছরের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ, চার বছরের কৃষি বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হয়।

(১১) **শিক্ষাচর্চা।** নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পঃ বঙ্গ সরকার প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করেন।

ইহা ছাড়াও পল্লী শিক্ষা-সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী লোক শিক্ষা সংসদ মারফত কাজ ইত্যাদি নানা জাতীয় শিক্ষামূলক কাজকর্ম চলে।

বিশ্বভারতীর নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ আছে। এই প্রকাশন বিভাগ রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশে ও ভারতীয় নানা মূল্যবান বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশে এবং খুব অল্প দামে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিরিজের ভাল ভাল বই প্রকাশে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র দর্শন ও সাহিত্য প্রসারে ও প্রচারে এই প্রকাশন-বিভাগের ভূমিকা উজ্জ্বল।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বলা হইয়াছে—

"Visva-Bharati grew out of Santiniketan Asram founded by the poet's father in 1863. The Asrama meant, to be a retreat where seekers after truth might come to meditate in peace and seclusion. In 1901 an experimental school was started at Santiniketan by Rabindranath Tagore with the object of providing for an education which would not be divorced from nature, where the pupils could feel themselves to be members of a large community and where they could learn and grow in an atmosphere of freedom, mutual trust and joy. Since Santiniketan has been the seat of Visva-Bharati an international university seeking to develop a basis on which the cultures of the East and the West may meet in common fellowship."

—Visva-Bharati Prospectus.

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা

কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যেমন স্তরের পর স্তর ক্রমপরিবর্তন স্বরু হইল তেমনি এই ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ও নিত্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। এই যে স্তরপরম্পরা অতিক্রমণ—ইহা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে দার্শনিক মতবাদ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা তাঁহার শিক্ষাসম্পর্কিত মতবাদকে সর্বাংশে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁহার চিন্তাধারার মূর্তরূপ বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহার সকল প্রকার সত্তার উপর বিরাজিত থাকিত কবিধর্মী মন। এই কবি-মন তীব্র আবেগের সহিত প্রচলিত শিক্ষাধারার কুপ্রভাবে আমাদের চিত্তসংকট অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তেমনি দরদী মন লইয়া তিনি ভারতের মৌলিক প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় এক দিকে দেখা যায় বর্তমানের ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ ও বেদনা, অপর দিকে দেখা যায় অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলার সার্থক প্রচেষ্টা।

তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে সচেতন ভাবে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে আর অচেতন ভাবে তাঁহার বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ উপন্যাসে প্রক্ষিপ্ত কোনো কোনো উক্তিতে। এইগুলিতে একদিকে যেমন তাঁহার চিন্তাধারার ক্রমপরিবর্তন, নতুন নতুন মত লইয়া পরীক্ষা, নানা ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাতে একটি সঠিক পথ আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায়, আবার অন্য দিকে কোথাও কোথাও তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিমনের সহৃদয়তা, অতীত ভারতের প্রতি বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা, মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় অবগাহন করিবার পূর্বে আগে তাহার উৎস-মূল অনুসন্ধান করিয়া লওয়া কর্তব্য। কাজেই কিভাবে রবীন্দ্রমানস পরিবর্ধিত ও পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে তাহা জানিয়া লইতে হইবে।

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের পটভূমিকা

রবীন্দ্র-দর্শন বা রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন হঠাৎ এক দিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন অভিন্ন। তিনি জীবনে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

সারা জীবন তিনি অভীষ্ট লাভের যে সাধনা করিয়াছেন তাহা সুন্দরের সাধনা। সুন্দরের সাধনার মধ্য দিয়া জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সত্য লাভ করিবার চেষ্টা তাহার সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে দেখা যায়। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার জীবন-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন অভিন্ন। কাজেই তাঁহার শিক্ষা-দর্শনের মধ্যেও ঐ একই ভাবকল্পনা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বোধের বিকাশ দ্বারা মানুষের সুন্দরতম পবিত্রতম সত্তায় উত্তরণ তাঁহার শিক্ষা-দর্শনের চিরন্তন লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু কোনো ব্যক্তির জীবন-দর্শন তাঁহার পারিবারিক আবেষ্টনীর আনুকূল্য ছাড়া এবং যুগধর্মের আপেক্ষিকতা ছাড়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় তাহা কি ভাবে যুগধর্ম ও পারিবারিক প্রভাব-প্রসূত তাহা জানা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও তাহার পশ্চাতে পারিবারিক ও যুগধর্মের প্রভাব।

(১) ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বদাই ভাসিত। অতীতকালের তপোবন, রাজা, নাগরিক-জীবন, সব কিছুই যেন তাঁহার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিত। তাঁহার নানা কবিতায়, নানা প্রবন্ধে এই প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষাকে অতীত ভারতের তপোবনের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করিবার একান্ত বাসনা পোষণ করিতেন। নববর্ষের দীক্ষা কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

অতীতকালের ভারতপ্রীতি

"না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফুলে ফুলে সুবিচিত্র।

পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
সে সকল লাজ, তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা।"

তাঁহার প্রার্থনা, তপোমূর্তি, প্রাচীন ভারত ও তপোবন এই চারটি কবিতায় প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র অতি সুন্দর ভাবে আন্তরিকতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রার্থনা কবিতায়— "ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
... ...
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত।"

তপোমূর্তি কবিতায়— "একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি আহুতি
ভাষা হারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করিছে আকুতি।"

প্রাচীন ভারত কবিতায়—"হেথা মন্ত্র স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহা মৌন ব্রাহ্মণ মহিমা"

তপোবন কবিতায়— "স্রোতস্বিনী তীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে,
শিষ্যগণ বিরলে তরুর তলে
করে অধ্যয়ন প্রশান্ত—প্রভাত বায়ে,
ঋষি কন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন"।

এইরূপ উদ্ধৃতি তাঁহার বহু কবিতা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় তপোবন সভ্যতার একটি রঙীন চিত্র তাঁহার মনে সদাই জাগরূক ছিল। রবীন্দ্রনাথ তপোবনকেই শিক্ষালাভের আদর্শ স্থান বলিয়া মনে করিতেন। গ্রাম্য বা নাগরিক সমাজের দৈনন্দিন সাংসারিক সংকীর্ণতা কল-কোলাহল হইতে শিশুকে দূরে রাখিয়া তপোবনের শান্ত প্রকৃতি-ক্রোড়ে মানুষ করিয়া তোলার বাসনা লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার সহিত রুশো ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সহিত মিল লক্ষ্য করা যায়।

শান্ত প্রকৃতি-ক্রোড়

তাঁহার এই অতীত-প্রীতির পশ্চাতে পারিবারিক ও যুগধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ভারতের উপনিষদের যুগ রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের বর্ণোজ্জ্বল তপোবনে, রাজ-প্রাসাদে, মগধে তাঁহার চিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইত—ইহার পশ্চাতে দুইটি কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহাদের পরিবারে সাহিত্য ও ধর্মচর্চার অনুকূল পরিবেশ গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে বাড়ীতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় চর্চা দিবারাত্র চলিত। তাহার উপর রবীন্দ্রনাথকে বালকবয়সেই সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথকে কালিদাস, মেঘদূত, রঘুবংশ প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্যগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল।

সাহিত্য ও ধর্মচর্চার অনুকূল পরিবেশ

ফলে কিশোর বয়সেই কবি-চিত্তে উপনিষদের যুগের ধ্যান-গম্ভীর উদার মহনীয় রূপটি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণটি হইল—যুগ-ধর্মের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাল—বাংলা তথা ভারতের নব-জাগৃতির কাল। জাগৃতি বা রেনে‌ঁশার অপর লক্ষণই হইল—অতীত কালের গৌরবময় যুগের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করা এবং বর্তমানে সেই গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পরই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই নবজাগৃতির প্রতীক। তাই তাঁহার কবিমন তীব্র আবেগের সহিত অতীত ভারতের রূপটি বার বার কল্পনা করিত এবং গভীর আকুতির সহিত বর্তমানে রূপায়নের চেষ্টা করিত।

যুগ-ধর্মের প্রভাব

(২) তাঁহার শিক্ষাচিন্তার অপর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহা উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। শুধু মাত্র শিক্ষাদর্শনেই নহে, তাঁহার সমগ্র কবিসত্তাই উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদে আচ্ছন্ন ছিল। রবীন্দ্র-মানস সুন্দরের পথে জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্যের সাধনা ও আনন্দে উত্তরণ—ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। ইহার সার্থকতার জন্য মানব-জীবনে অপরিহার্য হইল বোধির উদ্বোধন—এই যে বোধির বিকাশ ও তাঁহার দ্বারা জীবনের অন্তর্লোকের সৌন্দর্যানুভূতি—

উপনিষদীয় অধ্যাত্ম-বাদের প্রভাব

তদ্দ্বারা আনন্দলোকে উত্তরণ—ইহাই তাঁহার শিক্ষা-চিন্তাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র প্রতিদিনের তুচ্ছ প্রয়োজনের বহু ঊর্ধ্বে তিনি শিক্ষাকে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনকে মিটাইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাকে সেই মত সংগঠন—শিক্ষার হীন আদর্শ মানুষের জীবন দৈনন্দিন প্রয়োজন-ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার জন্যই সৃষ্ট নয়? তাহার আরও ঊর্ধ্বে উত্তরণ চাই। শিক্ষাকে আলোকের সংগে তিনি তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—আলোকের প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম মেটানোর জন্যই শুধু নয়, আরও প্রয়োজন আছে সেটা হইল—জাগার প্রয়োজন। শিক্ষাকেও তিনি সেই অর্থেই দেখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বোধির জাগরণ ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। তাঁহার এই চিন্তাধারার পশ্চাতেও আমরা যুগধর্ম ও পারিবারিক প্রভাব লক্ষ্য করি।

পারিবারিক প্রভাব

পারিবারিক প্রভাব

একথা সত্য যে ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর এই পরিবারের মানসিক জগতে বিপ্লব সাধিত হয়। অতুল ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও এই পরিবারের অনেক ঐহিক সুখ-শান্তিতে তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। "অতুল ধনসম্পদের দ্বিরদ সৌধে লালিত দেবেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই চিন্তার অসহ্য দংশনে পীড়িত হইয়া সত্যসন্ধ জীবনকে ধ্যানালোকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

তিনি সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন মন্থন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রাখিয়া ঠাকুর-পরিবার ও ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যক্তিগত সাধনা ও ভক্তি-মার্গের একটি মণ্ডল গড়িয়া উঠিল। এই মণ্ডলের চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথ এই পরিমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে পরিবর্ধিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রসত্তায় যে উপনিষদের প্রভাব তাহার মূল কারণ এইখানে।

দেবেন্দ্রনাথ চিত্ত-সংকটে অস্থির হইয়া পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এক দিন "এষাস্য পরমাগতি, রেষাস্য পরমা সম্পদ্ এষোস্য পরম আনন্দঃ"—উপনিষদের এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত-সংকটের অবসান ঘটিল। তিনি নিজের জীবন-চর্যাকে অধ্যাত্ম মানসলোকে

উত্তীর্ণ করাইয়া তুরীয় আনন্দে জীবনকে মগ্ন করাইলেন। এই সংযত জীবনচর্যা ও অনন্তর আনন্দ উপলব্ধির সময়ে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে রাখিয়াছিলেন। মহর্ষির সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দম্ বা অমৃতের স্পর্শ সঞ্চারিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার শিক্ষাচিন্তায় অন্তরৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ বোধির উদ্বোধনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সাধনা।

যুগপ্রভাব ঃ—

রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের পর হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে আলোড়ন স্থরু হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগৃতির লক্ষণ-সম্পন্ন এক বিশাল গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। জাগৃতি বা রেনেশাঁর এক লক্ষণই হইল অতীতের গৌরবের প্রতি আকর্ষণবোধ। ভারতে জাগৃতির লক্ষণ দেখা দিবার পর ভারতের অতীত সম্বন্ধে সকলে সজাগ হইলেন। এই অতীত-প্রীতি রবীন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং বর্তমানের সমাজে তাহার অনুবর্তন করার প্রেরণাও জাগিয়াছিল।

যুগপ্রভাব

(৩) **রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল নিসর্গ-প্রীতি বা প্রকৃতির প্রভাব।** রবীন্দ্রনাথ ভাববাদীদের ন্যায় যেমন শিক্ষার আদর্শ নির্ধারণে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছিলেন, প্রকৃতিবাদীদের ন্যায় আবার শিক্ষাকে প্রকৃতি ও শিশুর উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। উভয় প্রকার মতবাদের সমন্বয় দ্বারা তিনি এক নূতন রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতির প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নিত্য রস আহরণ করিয়া রসাত্মক কাব্য রচনাই তাঁহার পেশা। তাই তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা প্রকৃতির এত প্রভাব লক্ষ্য করি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতি এক সজীব সত্তা রূপে বিরাজিত ছিল। এই সজীব সত্তা কখনও জীবনদেবতা, কখনও বিদেশিনী ইত্যাদি রূপে তাঁহাকে নিত্য নানা ভাবে আকৃষ্ট করিত, উদ্বোধিত করিত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃতি বা নিসর্গ মানব জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

এইখানে আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত তাঁহার মিল লক্ষ্য করি। আবার তিনি বিশ্বাস করিতেন, বর্তমানে নানা সঙ্কীর্ণ সমস্যায় খিন্ন, নানা সামাজিক ক্লেদ কলুষযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রাখিয়া যথার্থ ভাবে শিশু-জীবনকে বিকশিত করা যায় না। প্রকৃতির উন্মুক্ত আকাশের নীচে গাছপালা পশু-পাখী কীট-পতঙ্গাদির সহিত একাত্মতা স্থাপন করিরা মনকে উন্নত উদার শিক্ষার উপযোগী করা যায়। শিক্ষা-সমস্যা প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "তাহার সংগে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই।......গাছপালায়, স্বচ্ছ-আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।" "যে জল-স্থল-আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সংগে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া থাকি, মাতৃস্তন্যের মত তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি—তবেই সম্পূর্ণ মানুষ হইতে পারিব।" রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-প্রীতি তাঁহার শিক্ষাচিন্তাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি ইহা ভাবিতে ভালবাসিতেন যে শিশু যাহা শিক্ষা লাভ করে তাহার মধ্যে গুরুমুখনিঃসৃত বাণীর পরিমাণটাই সবচেয়ে কম। বরং নিত্য নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির সাহচর্য অধিকাংশ বিষয় শিশু শিখিয়া থাকে। শিক্ষা-সমস্যা প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"শিশুর জ্ঞান-শিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল।" তপোবনকে বর্তমান যুগেও তিনি আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ মনে করিতেন। "শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে।......বন আমাদের সজীব বাসস্থান·· ······এইরূপে তাহারা (ছাত্ররা) প্রকৃতির সংগে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে পারিবে।" রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-প্রীতির পশ্চাতে আমরা দুইটি কারণ লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন প্রণালী তথা পারিবারিক আবেষ্টনী। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার কবিসত্তা।

একথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত সচেতন থাকিলেও তাঁহাকে খানিকটা অন্তরীণ জীবন-যাপন করিতে হইত। একদিকে নিসর্গের মধ্যে নিত্য নানা আকর্ষণ, অন্য দিকে নিসর্গ-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তাহাকে উপভোগ-প্রচেষ্টা—এই উভয় কারণে তাঁহাকে কল্পনা-বিলাসী নিসর্গ-প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনে প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করেন প্রকৃতির অনুচ্চারিত উদাত্তবাণী তিনি যেন শুনিতে পাইতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বালক, তখন অনেকবার মহর্ষি তাঁহাকে নাগরিক কল-কোলাহলের সঙ্কীর্ণ জড়ত্ব হইতে প্রকৃতির অবাধ উৎসারিত মুক্তির মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন;—কখনও ডালহৌসী, কখনও ভুবনডাঙ্গা। ফলে প্রকৃতির অবাধ উদাত্ত প্রভাব তাঁহার পিতার মাধ্যমে অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ কবিচিত্তের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কবিদের কল্পনাবিলাস বা উদ্দীপনের নানা অবলম্বন থাকে,—রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনা এই নিসর্গ। ফলে তাঁহার সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যেই নিসর্গ-প্রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

(৪) **রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের অপর-বৈশিষ্ট্য হইল—বাহ্যিক আপাত-রম্য ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়া অন্তর-ঐশ্বর্যে ক্রমশঃ ঐশ্বর্যবান হওয়া।**

অন্তর ঐশ্বর্য

তাঁহার এই আদর্শ ঔপনিষদীয় ও নিসর্গপ্রীতির যুগ্ম-ফল বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহাই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ। ভারতে কখনও দৈহিক বল, বাহ্যিক চাকচিক্য, বেশভূষা, পাণ্ডিত্যাভিমান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করে নাই। তাহার পরিবর্তে চরিত্রবল, তপোবল, ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা ইত্যাদির সমাদর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ব মোহান্ধতা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অতীত ভারতের আদর্শ বর্তমানে অনুবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সরল অনাড়ম্বর সুপবিত্র জ্ঞান ও চরিত্রবলযুক্ত আদর্শ জীবন কাম্য ছিল। তাঁহার একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

"ভারতের হৃদয়সমুদ্র এত কাল—
করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ পানে যে বাণী বিশাল···
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে।"

অন্যত্র লিখিয়াছেন—"হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।"

আবার লিখিয়াছেন,—"কোরোনা কোরোনা লজ্জা
হে ভারতবাসী
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
.........স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় আর এক বৈশিষ্ট্য—স্বাদেশিকতার তীব্র প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে স্বদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন যেমন ইংরাজী শিক্ষাকে তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে নানা ভাবে খর্ব করিয়া ফেলিতে চাহিল, অপর দিকে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেশীয় গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। ফলে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শের পরিবর্তে ভারতীয় সনাতন সভ্যতার নিরিখে শিক্ষা সংগঠন করার আন্দোলন সুরু হইয়া গেল। এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকেও চঞ্চল করিয়া তোলে এবং শান্তিনিকেতন গড়িয়া উঠিতে থাকে।

স্বদেশী শিক্ষার প্রকাশ

প্রধানতঃ তিনটি রূপে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, **মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় সব কিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ না করা, তৃতীয়তঃ দেশীয় প্রথায় দেশীয় আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার বিস্তার করা**। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের মূল লক্ষ্য ছিল—সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের জন্য শিক্ষালাভ। জাতীয় বিদ্যালয় প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"এতদিন আমরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা লাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে।"

(ক) **মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান**ঃ—রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়েই ভাষা শিক্ষা করাটাকেই শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন না। শুধু তাহাই নহে, দৈনন্দিন জীবনের জীবন ধারণের তুচ্ছ, প্রয়োজন পূরণ করিবে যে শিক্ষা, সে শিক্ষাও খণ্ডিত, সঙ্কীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও আসল শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন না।

প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী ভাষা ও তাহার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রসঙ্গে তিনি বার বার বলিয়াছেন, একটা কঠিন ভাষা আয়ত্ত করিতে ছাত্রের যে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় তাহার পর সেই অর্ধ-আয়ত্ত ভাষার

মধ্য দিয়া সত্যকার জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি শিক্ষার-বাহন প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র আমরা চাই।............মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া............কবে তাঁদের সাধনা মাতৃ-ভাষায় গলিয়া পড়িয়া তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।" রবীন্দ্র-নাথের যে শিক্ষার আদর্শ কল্পনায় ছিল তাহা দেশের নাড়ীর সংগে যুক্ত, পল্লী প্রকৃতিতে সম্পৃক্ত; বোধের বিকাশ, মনুষ্যত্বের জাগরণ। কাজেই তিনি বার বার একথা বলিয়া গিয়াছেন যে এমন শিক্ষা তখুনি সম্ভব যখন মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহন হয়। অপর কোনো বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার বাহন হইলে ভাষা শিক্ষায় যেমন সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তেমনি শুধুমাত্র ভাল ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারার দোষেই মেধার স্ফূরণ ব্যাহত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেশীয় ভাষা অবহেলিত হওয়ার সাথে দেশীয় ভাবও অবহেলিত হয়। কারণ ভাষাই ভাবের বাহন। বিদেশীয় ভাষায় বিজাতীয় কায়দায় দেশীয় ভাব পরিবেশন করা যায় না।

(খ) বিদেশীয় সকল জিনিষকেই নির্বিচারে গ্রহণ না করিয়া বরং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আত্মীকরণের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শিক্ষাচিন্তার বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রায় সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সমগ্র সমাজের ভালমন্দ তাঁহার দার্শনিক মন লইয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই যে পাশ্চাত্য রীতি নীতি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে আমরা মত্ত ছিলাম, সমাজের উপর তাহার কুফল তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ফলে বিদেশীয় বস্তুমাত্রেই যে দেশীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন তিনি মনে করিতেন না। তাঁহার কল্পনায় একটি জিনিস সর্বদাই ভাসিত,—তাহা হইল প্রাচ্যের গৌরবোজ্জ্বল অন্তর্জীবন পাশ্চাত্যের বিপুল কর্মপ্রয়াসের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া। প্রাচ্যের ব্রাহ্মণ্য শক্তির সংগে পাশ্চাত্যের ক্ষাত্রশক্তির মিলন। মাঝখানে অতিমাত্রায় যে বৈশ্যবৃত্তি ইহাই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সারা পৃথিবী পর্যটন করিয়া কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

(গ) তিনি দেশীয় প্রথায় দেশীয় আদর্শে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। "জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য।" এই জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রগুলি যদি বিদেশ হইতে বাক্সবন্দী হইয়া আমদানী হইতে

থাকে তাহা হইলে সেই জ্ঞান লাভ করিয়া যে দেশ হইতে 'জ্ঞান' আমদানী হইয়াছে সেই দেশের সহিতই ঐক্য স্থাপিত হইবে। "বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সংগে ইউরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশী সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।" প্রকৃত পক্ষে ইংরাজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর ভারতের অগণিত অজ্ঞ জনসাধারণ অপেক্ষা সাগরপারে ইংলণ্ডের সংগে আত্মিক যোগ বেশী হইয়াছিল বলিয়াই ভারত এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দেশ বলিতে দেশের জল মাটি পাহাড় পর্বতের সাথে তাহার অগণিত মানুষকেও বুঝিতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ও বোধির বিকাশের মধ্য দিয়াই সমগ্র জাতির মানসলোকের সমুদ্ভাস সম্ভব, এবং মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে গেলে দেশীয় আদর্শ রীতি নীতিতেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

সেজন্য তাঁহার প্রবর্তিত শিক্ষাধারায় কলা-শিল্পের সন্নিবেশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় শিক্ষার সর্বশেষ আদর্শ বা লক্ষ্য হইল বোধির বিকাশ। যাহার মাধ্যম হইবে আনন্দ। এই আনন্দ লাভের পন্থা হইবে কলা-বিদ্যা। অবশ্য ইহা প্রকৃত পক্ষে ঔপনিষদীয় আদর্শ। 'আনন্দরূপমমৃতং' ইত্যাদি মন্ত্র ভারতে পুরাতন। শিক্ষাধারায় মধ্যে এই ধরণের আদর্শ আরোপের জন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী আখ্যা দিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা বাস্তবে ও লেখার মধ্য দিয়া যতই স্ফুট হইয়া উঠিতেছিল ততই নানা সমালোচনার সম্মুখীন হইতেছিল। কারণ সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র হইতে 'অকাজের কাজ' বা 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' বলিয়া অধিকাংশ কলা-বিদ্যাকে বাদ-দিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বৌদ্ধিক চেষ্টা, বিশেষতঃ জীবিকা অর্জনের যোগ্যতার শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বভারতীতে যখন ঐ বিষয়গুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইতে লাগিল তখন স্বভাবতই এমন ধারণা হইতে লাগিল যে এই শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকা অর্জনে যোগ্যতা জন্মিবে না। পরবর্তী কালে অবশ্য তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা সম্পূর্ণরূপে আবাসিক ব্যবস্থা হওয়ায় এবং ক্রমশঃ ব্যয়বহুল হইয়া যাওয়ায় তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠান দেশীয় জনজীবনের সহিত ক্রমশঃ সংযোগ-শূন্য হইয়া শম্বুক-বৃত্তি গ্রহণের চেষ্টা করে। বর্তমানেও অনেকেই এই শিক্ষাকে ব্যয়বহুল বলিয়া মনে করেন।

তৃতীয়তঃ, এমন ধারণা অনেকে করিতেন যে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম কলা-বিদ্যা চর্চার ফলে শীঘ্র ইহার বলিষ্ঠতা হারাইয়া যায় এবং সমগ্র শিক্ষাধারায় এমন এক নমনীয়তা সঞ্চারিত হয় যাহাতে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা শিথিল কবিধর্মী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশ্য এই অভিযোগ পরবর্তী কালে খণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেন জাতীয় ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই

রবীন্দ্রনাথ যে কালে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন ভারতে ইংরাজী শিক্ষাধারার পরিবর্তে ভারতীয়দের জন্য জাতীয় শিক্ষাধারা প্রবর্তনের উদ্যোগ চলিতেছিল। নানা জায়গায় নানা আদর্শে বিদ্যালয় সংগঠন শুরু হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া আপন স্বপ্নকে রূপ দিতেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাধারার কতকগুলি মৌলিক ত্রুটির জন্য ইহা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপ লাভ করিতে পারে নাই।

(১) রবীন্দ্রনাথ নাগরিক কোলাহলের বাহিরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নতা সমাজ গঠনের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা তাঁহার কবিধর্মী মন কর্তৃক প্রভাবিত ছিল বলিয়া তাহা আধুনিক যুগোপোযোগী ছিল না। কারণ পৃথিবীতে তখন প্রকৃতিবাদের বদলে ক্রমশঃ প্রয়োগবাদের প্রভাব বাড়িতেছিল। প্রয়োগবাদের ঢেউ ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং তৎকালীন পটভূমিকায় বিচার করিলে দেখা যায়, দীর্ঘকাল স্বাধীনতা-বঞ্চিত, ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ অথচ মানসিক জড়ত্বে আবৃত রাজনৈতিক চেতনা ও আর্থিক সংগতিহীন এক বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্লব আনয়ন করিয়া আত্মবলে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য যে বলিষ্ঠ নীতি ও ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারায় তাহা ছিল না। ফলে জাতির তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তার সহিত ইহা সংযোগ-শূন্য হইয়াছিল বলিয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

(২) দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল—আবাসিক ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় প্রথম হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থা আবাসিক হইবে,—ইহা সমগ্র জাতির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন অসম্ভব ছিল তেমনি অত্যধিক ব্যয়বহুল হইয়া পড়িত। কোনো জাতির সমগ্র শিক্ষাধারা আবাসিক হইতে পারে না, তাহা সম্ভব নয়। সেই জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে ইহা যথোপযুক্ত ছিল না।

(৩) তৃতীয়তঃ, অভাব ছিল সুনির্দিষ্ট স্তরপরম্পরায় শিক্ষাধারার বিন্যাসের। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইহার অভাব ছিল বলিয়া সুনির্দিষ্ট আকারে ইহা জাতির সামনে উপস্থাপিত হইতে পারে নাই।

(৪) চতুর্থতঃ, সমগ্র শিক্ষাধারা একপেশে হইয়া পড়িয়াছিল। কলা-বিদ্যার উপর অধিক গুরুত্বের ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্রমশঃ অবহেলিত হইয়া পড়িতেছিল। অথচ তখনকার দিনে তাহারই প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। ফলে ইহা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের সহায়ক হয় নাই। অবশ্য সে দোষ এখন খণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্তম দান

আধুনিক যুগের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বগ্রাসী। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি কলা-শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এমন কি আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্তম দান হইল, তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির মিলন সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে এক বিশ্বমানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। এত বড় শিক্ষাদর্শ আর কেউ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আদর্শ গণ্ডী হইতে শিক্ষাকে মুক্ত করিয়া তিনি ধর্মীয় বা অধ্যাত্ম চেতনার উর্ধ্বে স্থাপিত করিয়াছিলেন, আবার তাহার পদ্ধতি হিসাবে প্রকৃতিবাদকে আশ্রয় করিয়া এক নূতন ভাবাদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে ইহা এক অভিনব দর্শন।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দার্শনিক ও কবি মন একত্রিত হইয়া যে সচেতন আস্তিক্যবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এক দিকে প্রাচীন দর্শনের সহিত যোগরক্ষা করিতেছিল, আবার বোধির বিকাশের মধ্য দিয়া ব্যক্তি-জীবনের সার্থকতা লাভের প্রয়াস, তাহা তপস্যার মধ্য দিয়া নহে, জীবন-পরিসরে নানা অনুভব-অনুভূতির মধ্য দিয়া,—এই দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয় দ্বারা তিনি এক জীবন-চর্যা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হিন্দুস্তানী তালিমি সঙ্ঘ

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রামে (ওয়ার্ধা) হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সেবাগ্রাম ওয়ার্ধা রেল ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। সেবাগ্রামটির চারি দিকে অনেকগুলি (প্রায় ত্রিশটি) গ্রাম আছে।

সেবাগ্রামে স্থাপিত

প্রথম অবস্থায় তালিমি সঙ্ঘ আট বৎসরের একটি পুরোপুরি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্পর্কিত কর্মধারার নূতন বিজ্ঞপ্তির পর নঈ-তালিমের বিভিন্ন স্তরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা, পূর্ব-বুনিয়াদী, শিক্ষা ও উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়া কৃষি, পশুপালন, গ্রামীন ইনজিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত উচ্চ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এইখানে একটি সম্প্রসারণ বিভাগ আছে। এই সম্প্রসারণ বিভাগের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এই বিভাগের কাজ হইল প্রথমতঃ সেবাগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া ৭-৮ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে যতগুলি গ্রাম আছে, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সর্বোদয়ের ভিত্তিতে কাজ। দ্বিতীয়তঃ ১৯ বৎসর বা ততোধিক বয়সের ছাত্রছাত্রীকে ভূদান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম রচনার জন্য শিক্ষণ দান এবং তৃতীয়তঃ নঈ-তালিমের আদর্শ অনুযায়ী সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ দান।

তালিমি সঙ্ঘে শিক্ষা-ব্যবস্থা

উত্তর-বুনিয়াদী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রসারণ বিভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিয়া কাজ করিতে থাকে। ভারতের বাহিরেরও কিছু কিছু শিক্ষার্থী এইখানে আসিয়া অল্পকালীন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যান।

তালিমি সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সমবায়ের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী সমাজ গড়িয়া তোলা। এই সমাজ অন্ন, বস্ত্র ও আবাসের উৎপাদন শুধু উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন করিবে না, ঐ সব জিনিস উৎপাদন করিতে যাইয়া শিক্ষার প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হইবে। তাহা ছাড়া মানুষ যাহাতে জীবনটাকে সুন্দর ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে সেই দিকেও সঙ্ঘের দৃষ্টি আছে। সর্বোপরি এই সঙ্ঘ এমন একটি সমাজ রচনা করিবে যেখানে মানুষে মানুষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোনরূপ বিভেদ থাকিবে না এবং সকলের ধর্মই সমভাবে সম্মানিত হইবে। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বলা যায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা আসিয়া এই সঙ্ঘে সমবেত হইয়াছে। সকল স্তরের পুরুষ ও নারী, কর্মী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমভাবে কাজ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। নিজেদের সকল প্রয়োজন তাহারা মিটায়। স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন, তাহা সবাই এক সাথে করিয়া থাকে। বিনোদনের জন্যও তাহাদের সমাজের বাহিরে যাইতে হয় না, তাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া থাকে।

তালিমি সঙ্ঘের উদ্দেশ্য

এখন আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বুনিয়াদী শিক্ষা

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে প্রায় সকল প্রগতিশীল ভারতবাসীই শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কোথাও কোথাও যে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হইয়া গিয়াছিল তাহাও আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে যখন স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রবল উচ্ছ্বাস তখন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলিতেছিল, সে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা-গান্ধী। গান্ধীজী এক অভিনব উপায়ে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন—তাহা হইল সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

পূর্বাধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালীন গান্ধীজির দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠে ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার বিকাশ ঘটিতে থাকে। এই সময় তিনি রুশ সাহিত্যিক ও সমাজ-সেবক মহামতি টলষ্টয়ের প্রতি অনুরক্ত হন। টলষ্টয়ের লেখা—"The kingdom of God is within you" গ্রন্থখানি গান্ধীজিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। গান্ধীজি টলষ্টয়ের নামে 'টলষ্টয় ফার্ম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। টলষ্টয় শেষ জীবনে এক বৈপ্লবিক আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কাঠের কাজ বা অন্যান্য দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করিতে লাগিলেন। ফলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সুরু হইল। টলষ্টয়ের নিজের ধারণা ছিল—এই সময়ের রচনাগুলি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। যাহাই হউক, গান্ধীজি টলষ্টয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সকল কাজ সকলে মিলিয়া সম্পাদন করা। এই ফার্মে কৃষিকাজ, রন্ধন, কাপড় কাচা, মলমূত্র পরিষ্কার করা, জুতা মেরামত করা ইত্যাদি সকল কাজ সকলকে করিতে হইত। গান্ধীজি নিজে সকল কাজ স্বহস্তে করিতেন। এই ফার্ম হইতে 'Indian opinion' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। গান্ধীজি ইহার ছাপানোর কাজ, সম্পাদনার কাজ, ডাকে দেওয়ার কাজ সকলই স্বহস্তে করিতেন।

টলষ্টয় ফার্ম

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয়ে কৃষ্ণাঙ্গ বালক-বালিকারা মানুষের সম্মান পাইত না।

তাহার প্রতিবাদে সেখানকার ভারতবাসীরা তাহাদের পুত্রকন্যাদের শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয় হইতে সরাইয়া লইলেন। গান্ধীজিকে এই রকম বহু সংখ্যক ভারতীয় শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। কাজেই একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা, অপরদিকে ভারতীয় শিশুদের শিক্ষক—এই দ্বৈতভূমিকায় গান্ধীজিকে অবতীর্ণ হইতে হইল। এই সময় গান্ধীজির জীবনে কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। রাস্কিনের লেখা "Unto the last" নামক পুস্তক পড়িয়া তাঁহার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসিতে থাকে। সর্বোদয়ের ধারণা জন্মাইতে থাকে। 'ফিনিক্স আশ্রম' নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। তাহারও পরিচালক হইলেন গান্ধীজি। ভারতীয় শিশুদের শিক্ষার ভারও যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি আন্দোলনও আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল।

ফিনিক্স আশ্রম

শিশুদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে ও পড়াশুনার কাজ চালাইয়া যাইতে যাইতে তাঁহার কয়েকটি বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, শিশুরা কাজ করিতে আনন্দ পায়, কাজ না হইলে তাহারা থাকিতে পারে না। এই পরীক্ষা-সিদ্ধ ধারণা তাহাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তনে প্রণোদিত করিল। তিনি আরও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কাজ করার দরুণ যে পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটিতেছে তাহা নহে। উপরন্তু নূতন এক মূল্যবোধ গড়িয়া উঠিতেছে। শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহা অধিকতর স্থায়ী হইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষার জন্য যে ব্যয় তাহা বহন করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইতেছে।

গান্ধীজির কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা

কিছুকাল পর গান্ধীজির কর্মস্থান স্থানান্তরিত হয়। তিনি ভারতে চলিয়া আসেন ও অনতিকাল মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তিনি তিনটি সম্পদ আনিয়াছিলেন, (১) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস, (২) সর্বোদয় সমাজ সম্বন্ধে ধারণা, (৩) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা।

গান্ধীজি ভারতে আসিয়া সবরমতীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কাঠামো টলষ্টয় ফার্মের অনুরূপ ছিল। গান্ধীজির সাথে কিছুসংখ্যক কর্মীও ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন ভাবে গান্ধীজির আদর্শ কর্মে রূপায়িত করার চেষ্টা করিতেছিলেন।

সবরমতী আশ্রম

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল। ১৯৩৭ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-যুক্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া প্রদেশে প্রদেশে শাসন-ভার গ্রহণ করিল। গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। তাঁহার প্রেরণায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কয়েকটি গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অন্যতম। মাদ্রাজ প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আংশিক ভাবে উপরোক্ত কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে যাইয়া ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হইল। দেখা গেল মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের কর প্রাদেশিক সরকারের একটি বড় আয়। মাদকদ্রব্য বর্জন করিলে এই আয়ের পথ বন্ধ হয়, অধিকন্তু মাদক দ্রব্য বর্জন বাস্তবে কার্যকরী করিতে গেলে প্রচার ও নিরোধ ব্যবস্থায় প্রচুর ব্যয় করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের আয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি দেশরক্ষা খাতে যে মোটা ব্যয় তাহা সংকোচনের হাত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ছিল না। নূতন ট্যাক্স বসাইবার মত অর্থনৈতিক অবস্থাও জনসাধারণের ছিল না। অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসন দায়িত্বে যাহারা ছিলেন তাঁহারা গান্ধীজির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু মাদকদ্রব্য বিক্রয়জনিত কর হইতে যে বিপুল পরিমাণ আয় হয় তাহার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয়, তজ্জন্য মাদক-দ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার একই সাথে কার্যকরী না করিয়া আপাততঃ মাদকদ্রব্য বর্জন স্থগিত রাখা হউক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হউক। বলাই বাহুল্য, গান্ধীজির উক্ত প্রস্তাব মনঃপুত হইল না। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, যদি অবস্থা এইরূপই হয় যে অভিভাবকবর্গ মদ্যপ হইলে তবেই শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে, তবে বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষাই বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠন-মূলক কর্মপন্থা

কারণ মদ্যপ অভিভাবকদের মধ্যে পরিবর্তন না আনিয়া শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া দেশের অধিক কল্যাণ সাধিত হইবার আশা নাই। গান্ধীজি দেশের এইরূপ সংকটজনক অবস্থা মানিয়া লইলেন না, সমস্যার সমাধান হিসাবে তাঁহার নিজস্ব শিক্ষা সম্বন্ধীয় মত—বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। গান্ধীজি কিছু কাল পূর্ব হইতেই হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব

তাহার প্রতিবাদে সেখানকার ভারতবাসীরা তাহাদের পুত্রকন্যাদের শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয় হইতে সরাইয়া লইলেন। গান্ধীজিকে এই রকম বহু সংখ্যক ভারতীয় শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। কাজেই একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা, অপরদিকে ভারতীয় শিশুদের শিক্ষক—এই দ্বৈত ভূমিকায় গান্ধীজিকে অবতীর্ণ হইতে হইল। এই সময় গান্ধীজির জীবনে কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। রাস্কিনের লেখা "Unto the last" নামক পুস্তক পড়িয়া তাঁহার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসিতে থাকে। সর্বোদয়ের ধারণা জন্মাইতে থাকে। 'ফিনিক্স আশ্রম' নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। তাহারও পরিচালক হইলেন গান্ধীজি। ভারতীয় শিশুদের শিক্ষার ভারও যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি আন্দোলনও আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল।

ফিনিক্স আশ্রম

শিশুদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে ও পড়াশুনার কাজ চালাইয়া যাইতে যাইতে তাঁহার কয়েকটি বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, শিশুরা কাজ করিতে আনন্দ পায়, কাজ না হইলে তাহারা থাকিতে পারে না। এই পরীক্ষা-সিদ্ধ ধারণা তাহাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তনে প্রণোদিত করিল। তিনি আরও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কাজ করার দরুণ যে পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটিতেছে তাহা নহে। উপরন্তু নূতন এক মূল্যবোধ গড়িয়া উঠিতেছে। শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহা অধিকতর স্থায়ী হইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষার জন্য যে ব্যয় তাহা বহন করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইতেছে।

গান্ধীজির কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা

কিছুকাল পর গান্ধীজির কর্মস্থান স্থানান্তরিত হয়। তিনি ভারতে চলিয়া আসেন ও অনতিকাল মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তিনি তিনটি সম্পদ আনিয়াছিলেন, (১) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস, (২) সর্বোদয় সমাজ সম্বন্ধে ধারণা, (৩) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা।

গান্ধীজি ভারতে আসিয়া সবরমতীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কাঠামো টলষ্টয় ফার্মের অনুরূপ ছিল। গান্ধীজির সংগে কিছুসংখ্যক কর্মীও ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন ভাবে গান্ধীজির আদর্শ কর্মে রূপায়িত করার চেষ্টা করিতেছিলেন।

সবরমতী আশ্রম

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল। ১৯৩৭ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-যুক্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া প্রদেশে প্রদেশে শাসন-ভার গ্রহণ করিল। গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। তাঁহার প্রেরণায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কয়েকটি গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অন্যতম। মাদ্রাজ প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আংশিক ভাবে উপরোক্ত কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে যাইয়া ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হইল। দেখা গেল মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের কর প্রাদেশিক সরকারের একটি বড় আয়। মাদকদ্রব্য বর্জন করিলে এই আয়ের পথ বন্ধ হয়, অধিকন্তু মাদক দ্রব্য বর্জন বাস্তবে কার্যকরী করিতে গেলে প্রচার ও নিরোধ ব্যবস্থায় প্রচুর ব্যয় করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের আয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি দেশরক্ষা খাতে যে মোটা ব্যয় তাহা সংকোচনের হাত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ছিল না। নূতন ট্যাক্স বসাইবার মত অর্থনৈতিক অবস্থাও জনসাধারণের ছিল না। অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসন দায়িত্বে যাহারা ছিলেন তাঁহারা গান্ধীজির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু মাদকদ্রব্য বিক্রয়জনিত কর হইতে যে বিপুল পরিমাণ আয় হয় তাহার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয়, তজ্জন্য মাদক-দ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার একই সাথে কার্যকরী না করিয়া আপাততঃ মাদকদ্রব্য বর্জন স্থগিত রাখা হউক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হউক। বলাই বাহুল্য, গান্ধীজির উক্ত প্রস্তাব মনঃপূত হইল না। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, যদি অবস্থা এইরূপই হয় যে অভিভাবকবর্গ মদ্যপ হইলে তবেই শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে, তবে বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষাই বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠন-মূলক কর্মপন্থা

কারণ মদ্যপ অভিভাবকদের মধ্যে পরিবর্তন না আনিয়া শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া দেশের অধিক কল্যাণ সাধিত হইবার আশা নাই। গান্ধীজি দেশের এইরূপ সংকটজনক অবস্থা মানিয়া লইলেন না, সমস্যার সমাধান হিসাবে তাঁহার নিজস্ব শিক্ষা সম্বন্ধীয় মত—বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। গান্ধীজি কিছু কাল পূর্ব হইতেই হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব

পত্রিকায় দেশ ও সমাজকল্যাণ সম্বন্ধীয় তাঁহার চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতেছিল। হরিজন পত্রিকায় তিনি নূতন শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ করিলে দেশীয় শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। গান্ধীজি লিখিলেন—

"As a nation we are so backward in education that we cannot hope to fulfil our obligations to nation in this respect in a given time during this generation, if this programme is to depend on money. I have therefore made bold, even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education should be self-supporting, By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is no education. I would therefore begin the childs' education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the state takes over the manufacture.

I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education."—Harijan July, 31, 1937.

গান্ধীজীর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :—

১। শিশুকে কোনো উৎপাদনাত্মক কর্ম—বিশেষতঃ শিল্পকর্ম মাধ্যমে ভাল ভাবেই শিক্ষা দেওয়া যায়।

২। শিশুর কাজ হইতে যাহা আয় হয় তাহাতে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা যায়।

৩। ইহার দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেক বেশী সুষম ও পূর্ণতর হয়।

৪। সরকার যদি এইরূপ শিল্প ও উৎপাদনকেন্দ্রী বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা, উপযুক্ত শিক্ষক, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে মাদকদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ

ট্যাক্সের উপর নির্ভর না করিয়াও প্রাদেশিক সরকার ভারতের সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইতে সক্ষম হইবেন।

ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন দেশ। তাহার উপর অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত একটি পত্রিকায় শিক্ষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নহেন, এমন ব্যক্তির শিক্ষা সম্পর্কিত দুই একটি প্রবন্ধ লইয়া আলোড়ন না পড়িবারই কথা। কিন্তু গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধাররূপে তখন দেশের জনমানসে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন। কাজেই গান্ধীজীর পরিকল্পনা লইয়া নানারকম আলোচনা সুরু হইয়া গেল। এই আলোচনাগুলি দুই দলে বিভক্ত ছিল। এক দল শিক্ষাবিদ্ গান্ধীজীর পরিকল্পনার মধ্যে শিশুর শ্রম শোষণ করিয়া বিদ্যালয় চালানোর যুক্তির অবৈজ্ঞানিকতা নির্মমতা ও অবাস্তবতা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং এই পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর একদল শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা নূতন দিগ্‌দর্শন খুঁজিয়া পাইলেন।

অন্যান্য দেশে কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীতে অজানা ছিল না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মন্তেসরী, ফ্রয়েবেল, ডিউই প্রমুখ বহু মনীষী কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব না থাকায়—কর্মের আয়োজন ইত্যাদির জন্য কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য অনুভূত হওয়ায় এবং যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ মগ্ন থাকায় ব্যাপকভাবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন হয় নাই।

ভারতের বিশেষ সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি কর্মকেন্দ্রিকতার উপর উৎপাদনধর্মিতা আরোপ করা যায় তাহাতে শিক্ষার মাহাত্ম্য খর্ব হয় না, বরং ইহার শিক্ষাগত মূল্য অনেক বাড়িয়া যায়—এই মত অনেকে পোষণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই ভাবে গান্ধীজীর মত সমর্থন করিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। যথা—ডাঃ জাকীর হোসেন, আচার্য কৃপালনী, আর্যনায়কম ও আশা দেবী, নরেন্দ্রদেব ইত্যাদি।

যাহাই হউক, গান্ধীজী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট সমর্থন পাওয়ার পর তাঁহার পরিকল্পনাকে রূপদানে সচেষ্ট হইলেন। যাঁহারা সমর্থন

করিয়াছিলেন তাঁহাদের একত্র হইয়া এই পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। ওয়ার্ধার এই উদ্দেশে এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। গান্ধী-সমর্থক শিক্ষাবিদ্‌গণ তথায় সমাগত হইলেন। প্রতি প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরাও এই সম্মেলনে যোগ দিলেন। এই সমিতিতে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল—

ওয়ার্ধায় সম্মেলন

1. The present system of education does not meet the requirements of the country in any shape or form. English having been the medium of instruction in all the higher branches of learning, has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many. It has prevented knowlege from percolating to the masses...Absence of vocational training has made the educated class almost unfit for productive work and harmed them physically. Money spent on primary education is a waste of expenditure in as much as what little is taught is soon forgotten and has little or no value in terms of villages or cities.

2. The Course of Primary education should be extended at least to seven years and should inculcate the general knowledge gained up to the matriculation standard less English and plus a substantial vocation.

3. For the all-round development of boys and girls all training should, as far as possible, be given through a profit yielding vocation, In other words, vocation should serve a double purpose—to enable the pupil to pay for his tuition through the product of his labour and at the same time to develop the whole man or woman in him of her through the vocation learnt at school.

4. Higher education should be left to private enterprise and for meeting national requirements whether in the various industries, technical arts, belles letters or fine arts. The state universities should be purely examining bodies, self-supporting through the fees charged for examinations."

—Educational Reconstruction, 1950
Hindusthan Talimi Sangha.

এই অধিবেশনের সিদ্ধান্তটি পুরাপুরি উদ্ধৃত হইল এই কারণে যে, ইহার গুরুত্ব পরবর্তী কালে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগের শিক্ষা-সংস্কারে ভারতের প্রথম দেশীয় মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদ্‌দের স্বাধীনভাবে ব্যক্ত মত অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

অধিবেশনের প্রারম্ভিক কার্য শেষ হওয়ার পর গান্ধীজীর পরিকল্পনা দাখিল করা হইল। এই পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়। এই উপসমিতি একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ :—

(১) সাত বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র জাতির ভিত্তিতে প্রসার করা হইবে।

(২) ইহার মাধ্যম হইবে মাতৃ-ভাষা।

(৩) মহাত্মাজী পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সর্বতোভাবে সমর্থিত হইল।

(৪) এই সম্মেলন আশা করে যে উৎপাদনদ্বারা ক্রমশঃ শিক্ষকের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হইবে।

ইহার পর এই সম্মেলন ডাঃ জাকীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করে। জাকীর হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তাঁহাদের বিবরণ দাখিল করেন। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরা জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ খসড়া বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ঐ পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুস্থান তালিমী সঙ্ঘ (All India National Education Board) স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান কার্যালয় ওয়ার্ধার সন্নিকটে সেবাগ্রামে।

গান্ধীজীর পরিকল্পনা রূপদানে যাঁহারা প্রধান কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ জাকীর হোসেনের নাম বিখ্যাত। ডাঃ জাকীর হোসেন জামিয়া-মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাবিদ্‌রূপে বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত। জাকীর হোসেন বর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি। শ্রীযুক্ত আর্থার উইলিয়াম্‌স্ আর্যনায়কম ও তাঁহার সুযোগ্যা স্ত্রী আশাদেবী এই পরিকল্পনার রূপদানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দুস্তান তালিমী সঙ্ঘের যুগ্মসচিব। ইহারা শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন এবং তৎকালে শিক্ষাবিদ্ হিসাবে বিশেষ খ্যাত

ছিলেন। আচার্য কৃপালনী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ আচার্য নরেন্দ্রদেব এই পরিকল্পনার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই ভাবে তৎকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার সহিত যুক্ত থাকায় ইহার প্রতি সকলের আস্থা অর্জন করে। গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া ইহার তালিমী সঙ্ঘ কাজ সুরু করে।

জাকির হোসেন কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহার মর্ম সংক্ষেপে এইরূপ।—

জাকির হোসেন কমিটি রিপোর্ট

(১) একটি বুনিয়াদী শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলিবে। ইহার অর্থ এই নয় যে, শিল্পশিক্ষা ও বিষয়গুলি শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে। পরন্তু শিল্পকে মাধ্যম করিয়া শিক্ষাদান কার্য চলিবে। ডাঃ এস্, এন্. মুখার্জী এইরূপ তুলনা করিয়াছেন যে, শিল্পটি হইবে সূর্যের ন্যায় এবং তাহার চারি পাশে বিষয়গুলি আবর্তিত হইবে, কেন্দ্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে—যাহাতে শিক্ষকদের বেতনও শিল্প হইতে উঠিয়া আসে।

(৩) দৈহিক শ্রম আরোপ করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্য যে, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ শৈশব হইতেই জাগ্রত হইবে ও পরবর্তী জীবনে জীবিকা অর্জনে তাহা সহায়ক হইবে।

(৪) যে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইবে তাহা শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত যুক্ত হইবে।

(৫) ভবিষ্যতে যাহাতে সুনাগরিক হইয়া উঠিতে পারে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমগ্র শিক্ষাধারা পরিচালিত হইবে।

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম সুপারিশ করেন তাহা নিম্নরূপ :—

(১) সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপ্তিকাল হইবে ৭-১৪ বৎসর। ইহা সর্বতোভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে। তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষার যে পাঠ্যক্রম ছিল তাহা হইতে ইংরাজী বাদ দিয়া ও একটি শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হইবে। সমগ্র স্তরে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বিষয়সমূহ :—নিম্নলিখিত শিল্পসমূহের যে কোন একটি—

২। (ক) বস্ত্রবিদ্যা (খ) দারুশিল্প, (গ) ফল ও সব্জী চাষ (ঘ) কৃষিকাজ (ঙ) চর্মশিল্প (চ) শিক্ষা সম্ভাবনাযুক্ত যে কোন গ্রামীণ শিল্প।

৩। কাতাই-এর প্রাথমিক জ্ঞান।

৪। গণিত, সমাজ-বিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন, সংগীত, হিন্দুস্থানী ভাষা (উর্দু ও দেবনাগরী হরফে)

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম নাম দেওয়া হইয়াছিল বিদ্যামন্দির-পরিকল্পনা। কিন্তু মন্দির শব্দটিতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাইয়া উহা বর্জন করা হইল। জাতির ভিত্তি গঠিত হইবে এই অর্থসঙ্গতি রাখিয়া এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হইল বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা। ইহাকে পরে নঈ-তালিমও বলা হইত।

পূর্বে জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের মূল বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহা আরও বিস্তৃত আকারে আলোচনা করা হইল।

(১) এই শিক্ষা সর্বসাধারণের উপর আবশ্যিক ভাবে প্রবর্তিত হইবে।

(২) ৭-১৪ বৎসর বয়স্ক সকল শিশু এই শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

(৩) কোনো একটি পূর্ণ উৎপাদনাত্মক শিল্পকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) শিল্পটির সহিত সম্বন্ধিত আকারে বিভিন্ন বিষয় শিখানো হইবে।

(৫) শিল্পকাজ পরিচালনায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইবে যাহাতে উৎপাদনাত্মক দিকটি বিকশিত হয় এবং কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, হিসাববোধ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ হয়।

(৬) ঠিক ভাবে শিল্পকাজ পরিচালিত হইলে শিশুরা ঐ কার্যে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতে পারিবে ও শিশুদের বিকাশ সাধিত হইবে।

(৭) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিল্পকাজ ছাড়া সামুদায়িক জীবন (শিশু ও বিদ্যালয়ের যৌথ-জীবন), সমাজ, পরিবেশ প্রকৃতি এইগুলিকেও ব্যবহার করা হইবে।

(৮) যে শিল্প দিয়াই কাজ সুরু করা হউক উহার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি শিশুরা আয়ত্ত করিবে। শিল্পে কুশলতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। শিল্প নির্বাচনের সময় চাহিদা, কাঁচামালের যোগান ও শিক্ষা-সম্ভাবনার কথা বিবেচিত হইবে।

(৯) বিদ্যালয়ে শিশুদের যৌথ-জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ রচনা করিয়া তাহার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতাবোধ, পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্ব করা, নেতৃত্ব মানা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ব বোধ, সুরুচি ও শালীনতা বোধ, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণাবলী বুদ্ধিগত ও আচরণগত ভাবে শিখিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১০) বিদ্যালয়ের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান থাকিবে। বৃহত্তর সমাজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া বিদ্যালয় তাহা পরিহার করিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা করিবে। এই ভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের শুভকর পরিবর্তনের অগ্রদূত হইবে।

(১১) শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে সুশিক্ষকের উপর। উদ্যমশীল, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, জ্ঞানান্বেষী, শিশুমনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ, শিল্পকাজে দক্ষ শিক্ষক স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করিবেন। হিন্দুস্তান তালিমী সঙ্ঘের পাঠ্যক্রম ইহাতে সহায়তা করিবে।

একথা মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে, যেহেতু গান্ধীজীর কংগ্রেসের উপর প্রভূত প্রভাব ছিল তাই তিনি যে প্রস্তাব পেশ করিতেন তাহাই পাশ হইয়া যাইত। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রস্তাবের মূল উত্থাপক ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। তিনি যে অন্ধ কংগ্রেসী ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। আচার্য কৃপালনী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

যাহা হউক, জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা রূপদান করার কাজ সুরু হইয়া গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার ঐকান্তিক আগ্রহে বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পরিদর্শক, পরিচালকদের জন্য ট্রেনিংএর কাজ সুরু হইল। বিহার ও উত্তর প্রদেশে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা-প্রসারের কাজ সুরু হইল। আর বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে কিছু পরিবর্তিত আকারে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-প্রসারের কাজ সুরু হইল। কাশ্মীর এই সময় যদিও দেশীয় রাজ্য ছিল, কিন্তু কাশ্মীরের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকে। ওয়ার্ধায় এবং জামিয়া-মিলিয়াতে শিক্ষক-শিক্ষণ সুরু হইয়া যায় এবং পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিহারের চম্পারণ জেলায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষার

বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ

কাজ সুরু হইয়া যায়। আসামে ও বাংলায় কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুরু হয় নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাহত

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধাবস্থায় ভারতবর্ষের জনসাধারণকে নিজ মাতৃভূমি রক্ষায় অগ্রসর হইবার উপযোগী প্রেরণা দিবার মত শাসনকর্তৃত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে সকল প্রদেশে এক সাথে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। ঐ সব প্রদেশে ৯৩ ধারা অনুযায়ী গভর্ণরকর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। আমলাতান্ত্রিক শাসকবর্গ সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ করিলেন। কেবল মাত্র বিহারে ইহা চালু থাকিল। উড়িষ্যায় অনেক সরকারী কর্মচারী সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়া বেসরকারীভাবে পরীক্ষাকার্য চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও যুদ্ধ ইত্যাদি নানা গোলমালে সে প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইল।

সুতরাং একমাত্র বিহারের চম্পারণ এলাকা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যাহত হইল। তাই বলিয়া গান্ধীজী যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি এই বুনিয়াদী শিক্ষার উপর গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। ১৯৪২ আন্দোলনে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। কারামুক্তির পরই তিনি ঘোষণা করিলেন, "I have been thinking hard during the detention over the possibilities of Nai Talim until my mind became restive. We must not rest content with our present achievements. We must participate in the homes of the children. We must educate their parents. Basic Education must become literally education for life."

গান্ধীজির এই উক্তির সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পর্বের ইতিহাস শেষ হইল। নূতন করিয়া দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলন সুরু হইল।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও ভারত সরকার

ইতিমধ্যে ডক্টর জাকির হোসেনের রিপোর্ট বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি তৎকালীন বোম্বাই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করেন। এই

সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত হয়। এই সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক সৃজনাত্মক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন। খের কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হইল নিম্নরূপ।—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা সর্বপ্রথম গ্রামীণ পরিবেশে চালু করিতে হইবে।

(২) অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল হইবে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বালক-বালিকাদের জন্য, কিন্তু পাঁচ বৎসরের শিশুও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে।

(৩) পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ ১১ বৎসরের পর ছাত্রগণ ভিন্ন শিক্ষার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য প্রকার বিদ্যালয়ে যাইতে পারিবে।

(৪) শিক্ষার মাধ্যম হইবে শিক্ষার্থীদের মাতৃ-ভাষা।

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষায় বহিস্থ কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে অন্তস্থ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগের জন্য একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

খের কমিটির এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হয় এবং ঠিক পরবর্তী সময়েই বুনিয়াদী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার যোগাযোগ সাধনের জন্য পুনরায় একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন বি. জি. খের। কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন।—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষাকাল ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত। ৮ বৎসর হইলেও, ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে—প্রথম স্তর বা নিম্নস্তর প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচ বৎসর এবং দ্বিতীয় স্তর বা উচ্চস্তর হইতেছে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বৎসর।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা লাভের পর অন্য স্তরের শিক্ষায় যাইতে হইলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষালাভের পর যাইতে হইবে।

সার্জেণ্ট কমিটি ও বুনিয়াদী শিক্ষা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি দুইটি খের কমিটির সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং সুপারিশ প্রায়ই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা জন

সার্জেণ্টের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি খের কমিটীর সুপারিশসমূহ এবং বুনিয়াদি শিক্ষার সকল দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখেন। সার্জেণ্ট সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করেন।

শিক্ষার নূতন অধ্যায়

গান্ধীজির উক্তি বুনিয়াদী শিক্ষায় এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। ১৩ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল তাহার পরিসর আরও বর্ধিত করার চিন্তা আসিল। গান্ধীজি বলিলেন—"The education of every body at every stage of life."

বুনিয়াদী শিক্ষার নূতন অধ্যায়

ফলে ১৯৪৫ সালে জানুয়ারী মাসে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌দের লইয়া সেবাগ্রামে আবার সম্মেলন বসিল। এই সম্মেলন বুনিয়াদী শিক্ষা, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম রচনার উদ্দেশ্য লইয়া আহুত হইয়াছিল। গান্ধীজি এই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিলেন—"Our field is not merely the child of seven to fourteen years of age, the field of Nai Talim stretches from the hour of conception in the mother's womb to the hour of death." গান্ধীজির এই উক্তি বুনিয়াদী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইল। এই সম্মেলন বুনিয়াদী শিক্ষাকে জীবনের চারিটি স্তরের সহিত যুক্ত করিয়া চারটি ভাগে বিভক্ত করিল এবং এই চারিটি স্তরের পরিকল্পনা রচনা করার জন্য চারিটি উপসমিতি নিয়োগ করিল। এই স্তর চারিটি নিম্নরূপ :—

(১) বয়স্কদের শিক্ষা

(২) প্রাক্-বুনিয়াদী বা ছয় বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের শিক্ষা

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষা—৬ হইতে ১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষা

(৪) উত্তর-বুনিয়াদী বা কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

বয়স্কদের শিক্ষা :—প্রধানতঃ সুখী, স্বাস্থ্যশ্রী-সম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন ও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী জীবন-গঠনের জন্য বয়স্কদের জন্যও এই স্তর গঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা :—যে মুহূর্তে শিশু হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে আসার মত ক্ষমতা অর্জন করিল অমনি তাহার বিদ্যালয়ের নির্দেশে শিক্ষা সুরু হইয়া গেল।

শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া শিশুর কতকগুলি নূতন অভ্যাস আয়ত্ত হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা :—এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে।

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা :—১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্কের জন্য এই স্তর পরিকল্পিত হইয়াছিল।

এই স্তরের পরিকল্পনা-রচয়িতৃবর্গ নিম্নরূপ উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়াছিলেন।—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা যেমন কর্মকেন্দ্রিক, উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাও সেইরূপ কর্মকেন্দ্রিক হইবে।

(২) পাঠ্যক্রম স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে।

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার যেমন লক্ষ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ, উত্তর-বুনিয়াদী স্তরেও তাহাই উদ্দেশ্য হইবে।

(৪) ছাত্রের বিভিন্নমুখী আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৫) স্থানীয় ভাষাতেই শিক্ষা দান করিতে হইবে।

(৬) সাধারণতঃ এই শিক্ষা তিন হইতে চার বছরের হইবে।

(৭) ইহাও খানিকটা স্বাবলম্বী হইবে। ছাত্ররা যেন নিজের খরচ বহন করিতে সক্ষম হয়।

উপসমিতি পাঠ্যক্রম রচনার সময় ১৪ রকমের কাজ সুপারিশ করেন। উত্তর বুনিয়াদী স্তর সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের সম্পাদক বলিয়াছেন—"The post-basic school is a school village, a society of students' and teachers living together in residence, and its aim is therefore to provide by its own work the food and clothing needs of all its members, not to accumulate earnings on a money basis."—

বিনোবা ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে বলিয়াছেন 'for self-sufficiency," আর উত্তর-বুনিয়াদী স্তরকে বলিয়াছেন "through self-sufficiency."

উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রথমে মধ্য স্তরটি ছিল ৭ হইতে ১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষা। পরে পূর্ব ও উত্তর বুনিয়াদী ও বয়স্ক শিক্ষা যুক্ত হইয়া ইহাকে খানিকটা সুশৃঙ্খল করিয়া দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই ধারা যদি না থাকে তাহা

হইলে শিক্ষাধারা হিসাবে ইহা অসম্পূর্ণ থাকে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে 'গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়' উল্লিখিত হইল এবং ১৯৫১ সালে সপ্তম সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে 'উত্তম বুনিয়াদী' বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা চলিল। ইহার ফলে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হইল এবং যথাযথ পাঠ্যক্রম রচিত হইয়া গেল।

বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

বুনিয়াদী শিক্ষার ঐতিহাসিক অগ্রগতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়াছে। কি পরিস্থিতিতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এখন আমাদের জানা দরকার, বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে গান্ধীদর্শন কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে একটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। সেই লক্ষ্যটিই হইল দার্শনিক তত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগরূপই হইল শিক্ষা। এই দার্শনিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেশ গঠনের প্রচেষ্টা সুরু হয়। কাজেই দার্শনিকতত্ত্ব রাজনীতিতে প্রতিফলিত হইয়া যেমন শাসনতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি শিক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া শিক্ষার মাধ্যমে জাতি গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে চায়। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে এই দার্শনিক তত্ত্ব কাজ করিয়াছে।

গান্ধীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল—সত্যের উপলব্ধি। পন্থা ছিল—অহিংসা। তিনি সারা জীবন ধরিয়া সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, অহিংসার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

গান্ধীজীর এই মূল জীবনাদর্শ জাতীয় জীবনের এক এক ক্ষেত্রে এক এক রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহা দুর্জয় মনোবল-সম্পন্ন সত্যাগ্রহ ও অসহযোগরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে ইহা রামরাজ্য পরিকল্পনারূপে প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বধর্মীয় চিন্তার মিলন রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, সমাজ-সংস্কারে ইহা সেবার আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। গান্ধীজী জাতির সম্মুখে চৌদ্দ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করিয়াছিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার সেই কর্মসূচীর অন্যতম।

গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে অহিংসা ও সত্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; "উস্‌কা আধার সত্য ঔর অহিংসা হায়।" এই সত্য ও অহিংসা তিনি ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি

সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে গান্ধীজীর পরিকল্পনা ছিল—বিকেন্দ্রিত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, এক কথায় রামরাজ্য গঠন। এই সাম্যযুক্ত রামরাজ পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে বিরাট সমাজবিপ্লব ঘটাইতে হয়। গান্ধীজী বুনিয়াদীশিক্ষার মাধ্যমে এই বিপ্লব সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন,—"My plan as thus conceived is the spear-head of silent social revolution."

এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় সকলের যেখানে সম-অধিকার, সেখানে জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা থাকিতে পারে না। অথচ বর্তমানে জাতিভেদ-জনিত সঙ্কীর্ণতা অত্যন্ত প্রবল। গান্ধীজী শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতিভেদ-প্রথা ও কর্মগত বিভাগের জন্য সমাজের উঁচু নীচু মনোভাব অপসারণের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় সব থেকে নীচু কাজেও সকলকে অংশ গ্রহণ করানোর কথা তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল—সাফাই দিয়া শিক্ষা সুরু হইবে। "নঈ-তালিম সাফাইসে সুরু হোতি হ্যায়।"

রামরাজে শোষণহীনতার কথা বলা হইয়াছে। শোষণ সেখানেই সুরু হয় যেখানে এক পক্ষ উৎপাদন করে অপর পক্ষ অনুৎপাদক। অনুৎ-পাদক শ্রেণী বুদ্ধির চাতুর্যে উৎপাদক শ্রেণীকে শোষণ করে, ফলে এক পক্ষের হস্তে ধন সঞ্চিত হয়, ধনসঞ্চয় দ্বারাই সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয়। রামরাজে শোষণহীন ও বিকেন্দ্রিত অবস্থার কথা কল্পনা করা হইয়াছে। যে সমাজে প্রতিটি সভ্য উৎপাদনশীল, সেইখানে শোষণ বন্ধ হয় ও ধনের কেন্দ্রীকরণ রুদ্ধ হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বুনিয়াদী শিক্ষালাভ করিয়া শিশু সমাজে উৎপাদনশীল স্বাবলম্বী নাগরিক হইবে। উৎপাদনশীল স্বাবলম্বী নাগরিক হইয়া উঠিতে হইলে তাহাকে শিশুকাল হইতেই কোনো না কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। গান্ধীজী সেজন্য বুনিয়াদী

শিক্ষায় কর্ম সম্পাদন ও তাহাতে স্বাবলম্বী হইবার কথা বলিয়াছেন, "Self-Sufficiency is the acid test of its reality"

গান্ধীজির রামরাজে আর একটি লক্ষ্য ছিল—সকলের সমান অধিকার লাভ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকলে সমান মর্যাদা অর্জন করার জন্য পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন দরকার। গণতান্ত্রিক অভ্যাস শৈশব হইতেই আয়ত্ত করা বিধেয়। এই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন, স্বয়ংশাসিত বিদ্যালয় রচনা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছিল।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, গান্ধীজীর দার্শনিক চিন্তা যে আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার রাষ্ট্রনৈতিক রূপ রামরাজ। এই রামরাজ সার্থক করার উপায় হিসাবে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজির চিন্তাধারার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল, আত্মশুদ্ধি বা চিত্তের ঊর্ধ্বগতির জন্য সর্বধর্মীয় সমন্বয়সাধনকারী প্রার্থনা। গান্ধীজির প্রভাবের ফলে বুনিয়াদী শিক্ষায় ইহাও গৃহীত হইয়াছিল।

প্রার্থনা

অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি কোনো না কোনো আশ্রমের সহিত যুক্ত থাকিত। আশ্রমিকেরা প্রত্যহ প্রার্থনা করিতেন। এই ভাবে বিদ্যালয়েও প্রার্থনা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গান্ধীজীর ভাবধারার উত্তরসূরীরা মনে করিতেন, শ্রেণীহীন সমাজ রচনায়, পরস্পরের মধ্যে সহন-শীলতা বর্দ্ধনে ও পরস্পরকে ঠিকমত জানার ব্যাপারে এই প্রার্থনা অতিশয় উপযোগী হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

শিশুর যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন সে থাকে প্রাচীন যুগের বর্বর মানুষের মতই। তাহাকে নানা শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া সামাজিক শিশুতে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকারে? প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যতটা পুনরাবৃত্তি শিশুরা করিতে পারে, তাহার শিক্ষা তত বেশী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু শিশু চঞ্চল, সে কর্মপ্রবণ, সে নানারকম খেলাধূলা কাজ ইত্যাদি করিতে ভালবাসে। এই তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শিশুর

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোন রূপ মর্যাদা না দিয়া তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া পড়ান লেখান হইতেছে। ইহাই কি শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ হইবে? শিশু শারীরিক পরিশ্রম করিতে চায়। কেন সে তাহা করে? তাহার আত্মপ্রকাশের জন্যই সে নানারকম পরিশ্রমজনক কাজ করিয়া থাকে। কাজ ও খেলার মাধ্যমেই তাহার মস্তিষ্ক কোন কিছু গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। পুরাতন শিক্ষায় যাহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা শিশুদের খেলাধূলা আনন্দোচ্ছ্বাসকে মোটেই বরদাস্ত করেন না, এবং শিশুদের দাবাইয়া রাখেন এবং চঞ্চলতার জন্য শাস্তি পর্যন্ত দেন। কিন্তু তাহা অনুচিত। মনস্তত্ত্ব অনুসারে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে বালক-বালিকারা ১৪ বা ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাস্তব বা স্থূলকে অবলম্বন করিয়া তাড়াতাড়ি শিক্ষালাভ করিতে পারে। অবাস্তব ধারণা বা অবাস্তবকে অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। স্থূল জিনিসকে অবলম্বন করিয়া সে অনুমান করিতে পারে বা কোন কিছুর সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। অতএব তাহাকে স্থূলকে অবলম্বন করিয়াই শিখিতে হইবে, ইহাই হইয়াছে মনস্তত্ত্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

আমরা যদি প্রাচীন যুগের দিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে পর্যবেক্ষণ ও কর্মের মধ্য দিয়া। জীবনের প্রয়োজনেই মানুষকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। রাজা প্রজা, বড়লোক গরীব, সকলকেই স্বকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কাজ করিতে হইয়াছে।*

আমরা যদি পশ্চিমী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্‌দের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, তাঁহারা সকলেই পুস্তককেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বাস্তব এবং প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার বিরুদ্ধে বেকন, মণ্টেন, লক প্রমুখ দার্শনিকগণ বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ রুশো বলিয়াছেন, "Children are first restless and then curious." রুশো শিশুর এই চারিত্রিক ভিত্তির

* J. B. Kripalini in his Latest Fad says : "In hunting, fishing and agricultural civilisation, when there was no written, not to say printed word, whatever little knowledge there was, had to be painfully acquired through work and experience."

উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন। রুশোর পরে পেষ্টালজি, হার্বার্ট, ফ্রোয়েবেল, মন্টেসরি, ডিউই প্রমুখ শিক্ষাবিদ্, দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ সকলেই এই বিষয়ে একই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাস্তব কাজের মধ্য দিয়া জ্ঞান আহরণ করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির কোলে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া শিক্ষার কথা বলিয়াছেন।

গান্ধীজীও বুনিয়াদী শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ছাত্রগণ কর্মপ্রবণ, তাহাদের এই প্রবৃত্তির প্রকাশ হইবেই। এই প্রবৃত্তির প্রকাশ যদি শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের জীবনে কাজে লাগান যায় তাহা হইলে ছাত্র ও সমাজ উভয়ের মঙ্গল হইতে বাধ্য।

গঠনাত্মক কাজ করিতে ছাত্রগণ ভালও বাসে। নষ্ট করিবার এবং ভাঙ্গিবার ইচ্ছাও ছাত্রদের থাকে। এবং তাহার ফলে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। কিন্তু তাহারা যদি গঠনাত্মক কাজ করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তাহাদের নষ্ট করিবার বা ভাঙ্গিবার মনোবৃত্তির সংশোধক হিসাবে গঠনাত্মক মনোবৃত্তি কাজ করিয়া থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের আগ্রহ বেশী থাকে। চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষক ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দাবাইয়া রাখিয়া শিক্ষাদানে অগ্রসর হন, ফলে তাহাতে আনন্দ থাকে না। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলা হয় এবং প্রয়োজন বোধে স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিভিন্ন খাতে বহাইয়া আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ছাত্রগণ শিখিতে আনন্দ পায়, এবং মনোযোগও থাকে বেশী, অতএব বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণই শাস্ত্রসম্মত।

বুনিয়াদী শিক্ষার গুণাগুণ। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা সমালোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। এখনও দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা মাত্র রাখিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার সমগ্র ধারা গৃহীত না হওয়ায় এবং জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রচলিত শিক্ষাকে একত্র বাঁধিয়া এক সাথে চালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করায় খণ্ডিত আকারে সকল বৈশিষ্ট হারাইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির সামনে উপস্থাপিত হইয়াছে, ফলে যাঁহারা ইহার সমালোচনা করিতেছেন তাঁহাদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি হিসাবে মূল কতকগুলি অভিযোগ সাধারণতঃ তোলা হয়। উহার প্রথম অভিযোগ হইল শিশুর শ্রম শোষণ করিয়া বিদ্যালয় চালানো। প্রকৃতপক্ষে শিশুর শ্রম শোষিত হয় কিনা—এ বিষয়ে হাতে নাতে কোথাও পরীক্ষা হয় নাই। যে স্বাবলম্বনের কথা বলা হয়, ওয়ার্ধাতেও শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত স্বাবলম্বন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থে আমরা শোষণ কথাটি ব্যবহার করি তাহা কোথাও হয় নাই। অবশ্য বর্তমানে অনেক জাতীয় সরকারের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাবলম্বন কথাটি নূতন অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বনের অভ্যাস গঠনই ইহার লক্ষ্য। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষায় এই লক্ষ্যই গৃহীত হইয়াছে। কাজেই শিশুর শ্রম শোষণ এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অভিযোগ সাধারণতঃ উত্থাপিত হয় যে, ইহা বৌদ্ধিক বিকাশের গুরুত্বকে খর্ব করিয়া কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই অভিযোগ যাঁহারা করেন তাঁহারা হয়ত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারেন নাই। এরূপ অভিযোগ সাধারণতঃ শিক্ষা ও কর্মের পাশাপাশি অবস্থান হইতেই উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা-পরিচালনা করিলে সেখানে কর্ম বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করে না। সহায়ক হিসাবে অবস্থান করে। এই কর্ম আবার অনেকে মনে করেন, শুধুমাত্র শিল্পকাজ। কিন্তু ইহাও ভুল ধারণা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানা জাতীয় কর্ম গ্রহণ করা হয়। শিল্প-শিক্ষা তাহার মধ্যে একটি মাত্র। একথা কোথাও বলা হয় নাই যে শিশু শিল্পের মাধ্যমেই সমস্ত শিক্ষা লাভ করিবে। আবার একথাও বলা হয় নাই যে শিল্প ছাড়া অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে যাহা শেখা সংগত, তাহা বর্জন করিতে হইবে। কাজেই এবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার যে শিশু তিনটি ক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার জ্ঞান আহরণ করিবে—প্রথম প্রকৃতি পরিবেশ, দ্বিতীয় সমাজ পরিবেশ, তৃতীয় শিল্প। শিল্প উভয় প্রকার পরিবেশের সমন্বয়-সাধক হিসাবে কাজ করিবে। যদি এখন কোনো বিষয় উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ হইতে আয়ত্ত করা অসম্ভব হয় তাহা প্রচলিত মামুলি পদ্ধতি অনুযায়ী শিখিতে কোনো বাধা নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালনা খুবই কঠিন বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। ইহা আংশিক সত্য। কারণ এতকাল যে পদ্ধতি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শিক্ষক ছাত্র অধ্যাপনা অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন ঠিক-কাজ করিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় তাহা সম্ভব হয় না। শিক্ষক ও ছাত্রকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় এবং নিজেদের জীবন চর্চার মধ্য দিয়া তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হয়। গন্ধীজির চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষার ইহাই সর্বোত্তম পন্থা। শুধু গান্ধীজি কেন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষক ছাত্রের মিলিত প্রচেষ্টা ও জীবনে তাহা রূপায়ণই শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলে। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষার তাহা দোষ নহে।

অনেকে অভিযোগ করেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির পশ্চাৎগতির লক্ষণ। ইহাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা সমগ্রভাবে গৃহীত হয় নাই। তাই ইহার পূর্ণ রূপ আমাদের চোখের সামনে ভাসে না। দ্বিতীয়তঃ উত্তর-বুনিয়াদী ও উত্তম বুনিয়াদী স্তরের বিষয়বস্তু যদি গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাহা যুগের সহায়কই হইত। তাহাতে আধুনিক জ্ঞান আয়ত্তের বা আধুনিক যুগাদর্শ অনুযায়ী চলার কোনো বাধা ছিল তাহা দেখা যায় না।

সুতাকাটা সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ সকল মহল হইতে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজী যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন সেই যুগেই আমরা দাঁড়াইয়া আছি এমন নয়। আর যুগানুযায়ী সংস্কারও শিক্ষার প্রাণবত্তার পরিচায়ক। কাজেই যুগের প্রয়োজনে ইহা পরিত্যক্ত হইবার পক্ষে কোনো বাধা নাই।

পরিশেষে বলা যায়, গান্ধীজির পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তবতা ও বলিষ্ঠতা ছিল। যাঁহারা ইহার রূপদান করিয়াছিলেন তাঁহারা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত বিচার বিবেচনা করিয়াছিলেন। যদি সামগ্রিক রূপ বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে গৃহীত হইত তাহা হইলে ইহা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হইয়া উঠিত।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হইল। সুদীর্ঘ কালের ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই স্বাধীনতা লাভ হইল। এত কাল ধরিয়া সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায়। এখন আসিল দেশ গঠনের পালা। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করিল। সমগ্র জাতিকে দ্রুত আধুনিক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দিল। ভারত সরকার কতকগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রচেষ্টা সুরু করিলেন। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিলেন, "Education is the foundation of national reconstruction."

কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যে ১৯০ বছরের বৃটিশ শাসন তথা শিক্ষা ও সভ্যতা দেশে প্রচলিত ছিল তাহা দ্বারা ভারতের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীন জাতি হিসাবে যে যাত্রা আমাদের সুরু করিতে হইবে তাহা পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত সর্বক্ষেত্রে তাল মিলাইয়া। কাজেই জাতি হিসাবে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের স্থান কোথায় ছিল, সমগ্র ব্রিটিশ শিক্ষার কি ফলাফল আমাদের জাতীয় জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা বিচার করিয়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার প্রয়োজন।

ব্রিটিশ যুগের সঞ্চয়

১। ইহা সর্বজন-স্বীকার্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে ভারতের এমন এক সময় পরিচয় ঘটিল যে সময় ভারত জাতি হিসাবে পৃথিবীতে অপাঙ্‌ক্তেয়, সমাজ জীবন দূষিত, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা ও মানসিক জড়ত্বে জাতির জীবন চরম স্থাণুত্বে পর্যবসিত। পাশ্চাত্য ভাব-

ধারার সংস্পর্শে ভারতের মানসিক উজ্জীবন ঘটিল, জড়ত্ব অপসারিত হইল। জাতির জীবনে নব-জাগৃতি দেখা দিল। ভারত দ্রুত মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটাইয়া আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হইল। ভারতীয় জীবনে ব্রিটিশ শিক্ষার ইহাই সর্বোত্তম অবদান।

২। বিকাশ চেতনা সমাজের আধুনিকতার অপর লক্ষণ। পাশ্চাত্য জীবনের জঙ্গম শক্তি ও বিজ্ঞান চেতনা ভারতে প্রবিষ্ট হইল। পাশ্চাত্য মনীষীদের ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ও অতীত ভারতের অন্বেষণ ভারতীয়-দেরও উদ্বুদ্ধ করিল এবং অতীতের ঐতিহ্য-মণ্ডিত ভারত সম্বন্ধে ভারতবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাইল।

৩। ইহা অবশ্য সত্য কথা যে, শাসক-গোষ্ঠীর অনাহার ফলে দেশীয় ভাষা-সমূহ যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, তবুও একথাও অনস্বীকার্য যে নব-জাগৃতির যে প্রেরণা ভারতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাই জাতীয় ভাষাগুলির সমৃদ্ধি সাধনে ভারতীয়দের উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছিল।

৪। ভারতীয় সমাজ-জীবনে এই শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছিল সর্বাধিক। Humanism বা মানবিকতা বোধের অভাব ভারতীয় সমাজ-জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ-জীবনে এই মানবিকতাবাদের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কতকগুলি কুসংস্কার দ্রুত উঠিয়া যাইতে লাগিল, যথা—সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ ইত্যাদি। নারী-স্বাধীনতা ও শিক্ষা-আন্দোলন ব্যাপক হইল, নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পুরুষের সমপর্যায়ে আনা হইল।* অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি যে তীব্র আকারে বর্তমান ছিল, তাহা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইল।

৫। ইউরোপে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটিয়াছিল এবং যে ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভারতেও অনুসৃত হইতে লাগিল। আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিতে পুষ্ট চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসার ঘটিল, সংবাদপত্র,

* একথা অবশ্য স্বীকার্য যে প্রাচীনকালে নারী-স্বাধীনতা ও শিক্ষা অত্যন্ত ভাল থাকিলেও ইংরাজ আগমনের প্রাক্কালে যে অবস্থা ছিল তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ২টি বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদি নাম কাহিনীর ন্যায় ছিল। মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা বা সামাজিক মর্যাদা আদৌ ছিল না। মহিলারা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবেন—এ ধারণা বহুল প্রচলিত ছিল।

চলচ্চিত্র, বেতার ইত্যাদি নানা শিক্ষা ও প্রচার ও বিনোদন-মাধ্যম গড়িয়া উঠিল, জীবনযাপনের রীতি-প্রকৃতি বদলাইয়া গেল।

ব্রিটিশ যুগের অপচয়

১। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজ আমাদের দেশে শাসন চালাইলেও একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা পরিচালনা করে নাই। ফলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইংরাজ যে সব কার্য করিয়াছে, তাহা ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া করিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ফলে শিক্ষা বরাবর শাসনের প্রয়োজনে পরিচালিত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া না ওঠা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। অর্থাৎ দেশের জন-সাধারণের আশা-আকাঙ্খা সম্ভাব্যতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজেদের প্রয়োজনকে বড় দেখিয়া শিক্ষা-পরিচালনা করার ফলে শিক্ষা জোড়াতালি দেওয়া ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই যে প্রায় দুই শত বৎসরেও জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারিল না, ইহাই ভারতীয় জীবনের অন্যতম অপচয়।

২। ভারতকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমপর্যায়ে কি ভাবে উন্নীত করা যায়—এ বিষয়ে ইংরাজদের ধারণা ও সদিচ্ছার একান্ত অভাব ছিল। ভারতের যে বিপুল যুগসঞ্চিত সাধনা ও অন্তরের ঐশ্বর্য জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য, এ বিষয়ে ইংরাজের কোনো প্রকৃত ধারণা ছিল না। শাসক-সুলভ উচ্চমন্যতায় ইংরাজ অন্ধ হইয়াছিল। ইংরাজ মিশনারী খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া কোটি কোটি ভারতীয়কে উদ্ধার করিবার মহৎ বাসনা পোষণ করিত, কোম্পানীর প্রতিনিধি বণিকেরা বাণিজ্যের স্বর্ণক্ষেত্র ভারতকে কাঁচামালের যোগানদার ও তৈরী মালের খরিদ্দার হিসাবে দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, আর শাসককুল এই অসভ্য বর্বর তথাকথিত 'হিদেনদিগকে' তাঁহাদের সুশাসনে সুসভ্য করিবার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। এই তিন প্রকার মনোভাব যুক্তভাবে ইংরাজ শাসনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইত। ফলে ভারতের যে আত্মিক সুর, যে চিরায়ত ঐতিহ্য যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভারত দ্রুত গড়িয়া উঠিতে পারিত—তাহা ধরা পড়ে নাই। আর তাহারই ফলে ইংরাজী শিক্ষাধারায়

মধ্য দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমন্বয় সাধিত হইতে পারে নাই। একটি অপরটিকে ধ্বংস করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছে।

৩। ইহাও অনস্বীকার্য যে, যে এলোমেলো পরিকল্পনা ক্রমশঃ ভারতের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছিল, তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই হয় নাই। ইংল্যাণ্ডেও তখন নানা পরীক্ষার ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিতেছিল। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে যাহা সুফল ফলাইবে বলিয়া মনে করা হইতেছিল তাহা যে ভারতের মাটিতেও একই ফল দিবে, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? এক দেশের জীবনচর্যার সহিত অন্য দেশের জীবনচর্যার কলম করিয়া সভ্যতা গড়িয়া তোলা যায় না। সভ্যতা দেশের মাটিতেই উদ্ভূত হয়। যাঁহারা ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনার নিয়ামক ছিলেন তাঁহারা সকলেই কিপলিং-পন্থী ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন "East is East and West is West; and the twain shall never meet." ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে আত্মিক ব্যবধান তাহা থাকিয়াই গিয়াছিল।

এই ব্যবধান থাকিয়া যাইবার ফলে মহত্তর কোনো উদ্দেশ্য লইয়া ভারতে শিক্ষাসংগঠন সম্ভব হয় নাই। সমগ্র ইংরাজ শাসনকালে সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা পরিচালনা করা হইয়াছিল, যাহা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ভারসাম্যহীন, মহৎ সর্বব্যাপক উদ্দেশ্যহীনতা দ্বারা খণ্ডিত এবং অহমিকা-প্রসূত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী দ্বারা লাঞ্ছিত। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতবাসীর বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারে নাই।

৪। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই যুগের শিক্ষাধারা যেমন ছিল দুর্বল, তেমনি দুর্বল ছিল সংগঠন ও প্রশাসনিক দিকেও। প্রয়োগের দিকে ইহা ছিল আরও ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র শাসনকালে ইহা তিনটি লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। দেশীয় প্রথাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া ১৯০০ সালে নানান দেশীয় প্রথা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইংল্যাণ্ডে যেমন যেমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছিল, ভারতেও তাহার প্রবর্তন ঘটিতে লাগিল। 'downward filteration' এই পদ্ধতি শিক্ষাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করিল। যে পরিচালন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল তাহা ভারতের অনুকূল নয়। এই ভাবে ভুল লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পরিচালনার দ্বারা যে শিক্ষা দুই শত বৎসর ধরিয়া পরিচালিত হইল তাহা ভারতকে সামাজিক অর্থনৈতিক বা

রাজনৈতিক কোন দিকেই উন্নত করিয়া তুলিল না। ব্যর্থ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিফলন সমাজে দেখা দিল। জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের চাহিদা মিটিল না। বহু প্রকার ব্যবহারিক বিদ্যায় ভারতকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল। এমন কি সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা করার মতই লোকের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল। ইংরাজ সরকারও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শিক্ষাবিভাগকে অন্যান্য বিভাগের সমপর্যায়ে স্থাপন করেন নাই। শিক্ষাকে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে স্থাপন করা, ইহার জন্য ব্যয়কুণ্ঠা, বৃত্তিগত নিম্নমান বজায় রাখা ইত্যাদি কারণে শিক্ষিত বুদ্ধিমান উদ্যমশীল ব্যক্তিদের শিক্ষাবিভাগে যোগদানের কোনো আকর্ষণ রহিল না। অভিজ্ঞ চিন্তাশীল ভারতীয়রা পদে পদে অনভিজ্ঞ তরুণ সিভিলিয়ানদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।* তাহার উপর অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের অসহযোগিতা শিক্ষাবিভাগকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া চরম উপেক্ষা ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া এই বিভাগ পরিচালিত হইতে লাগিল—যাহার ফলে চরম অদক্ষতা, প্রেরণাহীনতা এই বিভাগে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৫। এইরূপ ডামাডোল অবস্থার মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া এলোমেলো ভাবে শিক্ষাদপ্তর পরিচালনা সুরু হইল। অবশ্য পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা করিয়া কাজ সুরু করা ও শেষ করার রেওয়াজ বিংশ শতাব্দী হইতেই সুরু হইয়াছে। উনবিংশ শতকে ইহা অপরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সার্জেন্ট রিপোর্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিকল্পনা করা হয় নাই। শাসক-গোষ্ঠী এই বিষয়ে এক দিকে যেমন ছিলেন উদাসীন, অপর দিকে কেহ কেহ বিরূপ মনোভাবও প্রদর্শন করিতেন। ইংরাজের তৎকালীন জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে ভারত কোনো দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা কেন গৃহীত হয় নাই তাহা অনুধাবন করা যাইবে। যে ব্যবসায়িক মনোভাব লইয়া ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল, তাহা শাসনকার্যে সর্বত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। হাতে হাতে যে লাভ পাওয়া যায় তাহারই জন্য সকলে ব্যাকুল ছিল। অধিকাংশ গভর্নর স্বল্প সময়ের জন্য ভারতে অবস্থান করিতে আসিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্যকালেই ফল লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। অতীত বা ভবিষ্যৎ লইয়া

* দৃষ্টান্ত: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিভাগ হইতে বিদায়।

মাথা ঘামাইবার সময় তাঁহাদের থাকিত না। ইহার উপর আর একটি বিষয় প্রশাসন ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রতি গভর্নরই এ দেশে আসিয়া পূর্বসূরী কি করিয়াছেন বা করিতে চাহিয়াছেন তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি নিজে কি করিতে চাহেন তাহাতেই মনোনিবেশ করিতেন। ফলে এক একজন কর্তা বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বকাজ সবই বিলুপ্ত হইত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরণের বছর বছর কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। গেলেও তাহার কোনো সুফল পাওয়া যায় না। শিক্ষাকে খুব ধীর গতিতে বর্ধিত চারা গাছের সহিত তুলনা করিয়া একথা বলা হয় যে, ইহার ফল লাভ করিতে হইলে দীর্ঘকাল ইহার পরিচর্যা করিয়া ইহাকে বর্ধিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে এক একটি পরিকল্পনা পাঁচ হইতে দশ বৎসরের বেশী জীবিত থাকিতে পারিত না। এই বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থার কুফল ভারতীয় জনজীবনে দেখা দিল। উচ্ছৃঙ্খল, শিক্ষাবঞ্চিত, বিকৃতরুচি বিপুল জনগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, তাহারা শহরাঞ্চল পূর্ণ করিয়া তুলিল, অপরদিকে বৃত্তিচ্যুত, মনের দিক হইতে অপরিচিত, পরনির্ভর গ্রামসমাজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া পড়িল। ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে শিক্ষাক্ষেত্রে কি বিপুল সমস্যার বোঝা লইয়া কাজ সুরু করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করিতে পারি।

(১) প্রশাসন ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীন উত্তরাধিকার লইয়া ভারত স্বাধীনতার উত্তর কালের শিক্ষার কাজ সুরু করিল।

(২) প্রায় ৩৫ কোটি জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৩ জন সাক্ষর এমন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি লইয়া স্বাধীন ভারতে কার্যারম্ভ হইল।

(৩) বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যানুভূতি ভারতের চিরন্তন ধর্ম, তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া শতধা-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর হিংসার দ্বন্দ্বে জর্জরিত বিপুল জনগোষ্ঠী লইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সুরু হইল।

(৪) দেশীয় ভাষাগুলি উপেক্ষিত, উচ্চতর শিক্ষার বাহন হইয়া ওঠার অনুপযুক্ত, দেশীয় শিল্পবাণিজ্য বিধ্বস্ত, জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভগ্ন, এমন ভারত লইয়া স্বাধীনতা-উত্তর কালে যাত্রা সুরু হইল।

এইরূপ অবস্থাতেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করিলেন—"Education is the basis of national reconstruction."

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্যার রূপান্তর

(ক) রাজনৈতিক

(১) পরাধীন ভারতে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির শিক্ষাধারা সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ইংরাজ শাসনাধীনে যে অংশ ছিল সেখানে ইংরেজশাসক যেমনই হউক শিক্ষার খানিকটা ব্যবস্থা করিয়াছিল। দেশীয় রাজাগুলি আপন আপন সামর্থ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য ভারতের পক্ষে যোগদান করিল। ফলে আয়তনে যেমন সীমা অনেক বাড়িয়া গেল, তেমনি সর্বভারতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দেশীয় রাজা এবং অন্যান্য অংশের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতাবিধান ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল।

(২) দেশীয় রাজ্যগুলি মোটামুটি ইংরাজ শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল / কিন্তু পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে বা গোয়া দমন দিউ ইত্যাদি অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় শাসনে থাকায় সেখানে শাসক-গোষ্ঠীর দেশের শিক্ষাধারা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইগুলি স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল। একই ভাবে এখানকার শিক্ষাধারার পরিবর্তন করিয়া তাহাকে ভারতীয় করণের চেষ্টা সুরু হইল।

(৩) স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হইল, তাহাতে বলা হইল, "We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens,

JUSTICE, social, economic and political,

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship,

EQUALITY of Status and opportunity, and to promote among them all,

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and unity of the nation."

সংবিধানে এই দায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ার সংগে সংগে জাতীয় সরকার এক বিরাট সমস্যার ভার গ্রহণ করিলেন। রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি সার্থক করিয়া তোলার অর্থই হইল শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন। গণতন্ত্র সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে ভারতীয় জনসাধারণকে সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় ও স্বাধীনতাকে পূর্ণ ভাবে সার্থক করিতে হইলে চাই শিক্ষিত সুযোগ্য নাগরিক। তাহার অর্থই হইল, দেশের সমস্ত জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা। জাতীয় নীতিকে সংবিধানে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল সত্য, কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়াই তাহাকে সার্থক করিয়া তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষার মধ্যদিয়া রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য তিনটি মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়; যথা—গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের অভ্যাস, সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্পোৎপাদন।

(৪) শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য প্রসারিত করিয়া দিবার দায়িত্বও জাতীয় সরকার গ্রহণ করেন। ফলে শিক্ষাকে নূতন রূপে সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিল।

(৫) ভারতকে সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন। জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে কারিগরী বিদ্যার দ্রুত প্রসার ও শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো দ্রুত পরিবর্তন করার প্রায়োজন দেখা দিল।

(৬) স্বাধীন দেশে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষা মাধ্যম হিসাবে থাকা দরকার। ভারত যে রাষ্ট্রীয় ভাষা গ্রহণ করিল তাহা ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে আংশিক অপূর্ণ। তাহাকে গড়িয়া তোলরও প্রয়োজন দেখা দিল।

(৭) সংবিধান সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সমাজগত ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সামাজিক অগ্রগতি বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে আর এক গুরু দায়িত্ব বাড়িয়া গেল।

(৮) গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয় সরকার অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন, শোষণহীন সমাজ রচনা, ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করায় দ্রুত ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার প্রয়োজন হইল এবং গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইল।

(৯) স্বাধীন সরকার মাদক দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করিল, অথচ আবগারী বিভাগের বিরাট পরিমাণ আয়ের অংশ দ্বারা শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত হইত। কাজেই একদিকে আবগারী আয় বন্ধ অপর দিকে শিক্ষার দ্রুত প্রসার, এই উভয় কর্তব্য সরকারকে দৃঢ় হস্তে গ্রহণ করিতে হইল।

এই ভাবে ইংরাজ আমলে যে সব দায়দায়িত্ব সরকারের ছিল না, তাহা বর্তমান সরকারের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ফলে শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই আমূল সংশোধন করা ও তাহা স্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া তোলার প্রয়োজন দেখা গেল।

শিক্ষার পুনর্গঠন

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ভাবে পুনর্গঠন করা যায় তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য ইংরাজ আমলেও মাঝে মাঝে কমিশন নিয়োগ করা হইত; স্বাধীন ভারত সরকারও দেশী বিদেশী বহু শিক্ষাবিদ্‌দের লইয়া শিক্ষাপরীক্ষা ও ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশের জন্য নানা কমিশন নিয়োগ করিতে সুরু করিলেন। অপর দিকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কোনো গুরুতর পরিবর্তন করা হয় নাই। এই তিন বছর মোটামুটি সার্জেন্ট্ স্কীম্ ও বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তার সুরু হইল। সার্জেন্ট্ স্কীম্ ছিল সরকারী পর্যায়ে নিয়োজিত কমিটির রিপোর্ট। আর বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর প্রেরণায় বেসরকারী বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কর্তৃক গান্ধীজীর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। গান্ধীজীর পরিকল্পনা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হইলেও প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির ক্ষমতাচ্যুতির ফলে কার্য সুরু করিয়া স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

সার্জেন্ট স্কীম্ ১৯৪৪ সালে রচিত হয়, কিন্তু যুদ্ধ ইত্যাদি নানা কারণে তাহাও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ খৃঃ এই চারি বছর রাজ্যে রাজ্যে সার্জেন্ট স্কীম অনুযায়ী অল্প স্বল্প কাজ সুরু করাইলেন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে (৬—১৪ বছর পর্যন্ত) বুনিয়াদী শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং তাহার রূপায়ণের কাজ সুরু হইল।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান রচিত হওয়ার পর স্বাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ইত্যাদি সংস্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল এবং তদনুযায়ী সমগ্র দেশের উন্নতি-কল্পে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হইল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতির উন্নয়নের জন্য সকল প্রকার সমস্যা এক যোগে সমাধান করার চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং উন্নয়ন কি পর্যায়ে উঠিবে তাহার নির্দিষ্ট সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

ইহার ফলে শিক্ষা আর বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা হিসাবে না থাকিয়া জাতির অন্যান্য সকল প্রকার সমস্যার সহিত যুক্ত হইল।

সরকার বহু কমিশন নিয়োগ করিয়া শিক্ষা সংগঠনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে সব কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

(১) **কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ**:—জানুয়ারী, ১৯৪৮। ইহা প্রকৃত পক্ষে নিয়োজিত কোনো কমিশন নয়। এই বোর্ড দীর্ঘকাল আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বোর্ডের চতুর্দশ অধিবেশনের সুপারিশগুলি স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই অধিবেশনের সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তী কালে নানা কমিশন গঠিত হয়।

(২) **তারাচাঁদ কমিটি**:—পূর্বোক্ত অধিবেশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য ডাঃ তারাচাঁদকে সভাপতি করিয়া এই কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ তারাচাঁদ ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা-উপদেষ্টা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই কমিটির রিপোর্ট শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড পর্যালোচনা করেন। তারাচাঁদ কমিটির সুপারিশের ইঙ্গিতে অনুযায়ী শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগের সুপারিশ করেন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন বা রাধাকৃষ্ণান কমিশন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষার মান, সংগঠন ইত্যাদি বিষয় লইয়া অনুসন্ধান করেন ও সুপারিশ করেন।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন বা মুদালিয়ার-কমিশন।—কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য বহু মূল্যবান সুপারিশ করেন।

(৫) খের কমিটি—১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার ও লোকালবোর্ডগুলির ভূমিকা নির্ধারণের জন্য বিহার সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটি গঠন করেন।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৫৩—রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটি সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যোগ ও সমতা সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। এই কমিটির হাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৩৭ কোটি টাকায় একটি তহবিল দিয়াছেন। গবেষণা, উন্নতমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা, আন্তর্বিশ্ব-বিদ্যালয় মান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য এই স্থায়ী কমিশন সচেষ্ট আছেন।

(৭) শ্রীমালী কমিশন—রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের উদ্দেশ্যে পন্থা নিরূপণের জন্য শ্রীমালী কমিশন গঠিত হয়। শ্রীমালী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (Rural Institutes) গড়িয়া উঠে।

(৮) দেশমুখ কমিশন (শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ কমিশন)—১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া কি উপায়ে বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায়, এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্গাবাঈ দেশমুখের সভা-নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে National Council for Education of Women গঠিত হয়।

(৯) বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার পর **রামচন্দ্র কমিটি**।—প্রধান প্রধান এই সব কমিশন কমিটি ছাড়াও ছোট-

খাট বহু কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কি কেন্দ্রে, কি প্রদেশে, সর্বত্র বহু কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই সব কমিটিগুলির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আবার কতকগুলি কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব কমিটি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বহুবিধ সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার যে সর্বতোভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো বাধার জন্য হয়ত অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। তবুও একথা বলা যায়, সরকার আন্তরিক ভাবে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য যে চেষ্টা করা উচিত তাহা করিয়া যাইতেছেন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় (Ministry of Education)

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের এক্তিয়ার হইল, কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ, অন্যান্য রাজ্যসমূহকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ আটটি উপবিভাগে বিভক্ত। যথা—

১। প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা
২। মাধ্যমিক শিক্ষা
৩। হিন্দী
৪। সমাজ-শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ
৫। উচ্চতর শিক্ষা ও ইউনেস্কো সহযোগিতায় শিক্ষা
৬। শারীর শিক্ষা ও বিনোদন
৭। বৃত্তি
৮। প্রশাসন

এই আটটি উপবিভাগ যথাসম্ভব পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের এই আটটি উপবিভাগকে সহায়তা করার জন্য কতকগুলি স্থায়ী কমিটি ও উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নরূপ :—

১। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education, সংক্ষেপে C.A.B.E.)

২। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (U.G.C.)

৩। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদ (All India Council for Secondary Education)

৪। কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা-পরিষদ (All India Council for Elementary Education)

৫। কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ বোর্ড (Central Social Welfare Board)

৬। হিন্দী শিক্ষাধিকার (Directorate of Hindi)

৭। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ (Central Board of Sanskrit)

৮। দৃশ্যশ্রাব্য শিক্ষা বোর্ড (National Board of Audio-visual Education)

৯। কেন্দ্রীয় স্ত্রীশিক্ষা-পরিষদ (National Council for women's Education)

১০। কেন্দ্রীয় পল্লী-উচ্চশিক্ষা-পরিষদ (National Council for Rural Higher Education).

পরিষদ এই দশটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগকে পরামর্শ দান করেন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের অর্থে পরিচালিত হয়।

এই ভাবে শিক্ষাদপ্তর পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তাহা স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে করা হইয়াছে। সর্বদিক হইতে যাহাতে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয় তাহার জন্য এইরূপ প্রশাসনিক পুনর্গঠন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়

শিক্ষামন্ত্রী

|

শিক্ষা-উপদেষ্টা

বিভাগ	উপদেষ্টা পর্ষৎসমূহ	প্রশাসন পরিধি
প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা	কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Education)	কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল-সমূহ
মাধ্যমিক শিক্ষা	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (University Grant Commission)	ব্যুরো অব এডুকেশন — বৈদেশিক শিক্ষা
উচ্চতর শিক্ষা ও ইউনেস্কো	নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্থা (All India Council of Secondary Education)	কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন
হিন্দী	নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সংস্থা (All India Council of Elementary Education)	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আলিগড়, বেনারস, দিল্লী ও বিশ্বভারতী
সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ	কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সমিতি (Central Social Welfare Board)	পাবলিক স্কুলসমূহ
শরীর-শিক্ষা ও বিনোদন	কেন্দ্রীয় সংস্কৃত সমিতি (Central Board of Sanskrit)	
বৃত্তি	ইত্যাদি	কয়েকটি জাতীয় গবেষণা সংস্থা ও শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি
প্রশাসন		

রাজ্যসমূহ

কেন্দ্রে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইলেও প্রদেশে প্রদেশে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন হয় নাই। প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। বরং নূতন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অধিক পরিমাণে রাখার চেষ্টা হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হইতে মুক্ত করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ গঠন করা হইয়াছে, ইহাও প্রায় স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষাকে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য জেলায় জেলায় জেলা-স্কুলবোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই জেলা-স্কুলবোর্ডগুলিও স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠান। পূর্বে জেলা বোর্ডের হাতে শিক্ষা-সংক্রান্ত যে ক্ষমতা ছিল তাহা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশানের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে।

রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারের বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। সরকারী পর্যায়ে ডিভিশনাল ইন্‌স্পেক্টারের পদগুলি উঠাইয়া দিয়া এক এক পর্যায়ের জন্য প্রধান পরিদর্শক নিয়োগ করা হইয়াছে। সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বৈত-শাসন বজায় রাখা হইয়াছে। একদিকে শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক সমাজ-শিক্ষা পরিচালনা করা হইতেছে, অপর দিকে উন্নয়ন বিভাগও সমাজ শিক্ষা-প্রসারে অগ্রণী।

রাজ্য-সরকারগুলি একটি বিষয়ে খুবই মনোযোগ দান করিয়াছেন, তাহা হইল অবর বিদ্যালয়-পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াইয়া পরিদর্শনের এলাকা ক্রমশঃ ছোট করিয়া আনা। বর্তমানে একজন অবর-বিদ্যালয়-পরিদর্শকের অধীনে ৫০টি করিয়া বিদ্যালয় রাখার চেষ্টা চলিতেছে।

কেন্দ্রে ও প্রদেশে শিক্ষাদপ্তর ছাড়াও কেন্দ্রে আর একটি সমান্তরাল দপ্তর আছে। এই দপ্তর হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তর। এই বিভাগ অতি অল্প দিন গঠিত (১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে) হইলেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এই দপ্তরও শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কাজ করিয়া থাকে। এই দপ্তর বোম্বে, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কানপুর এই চারটি শাখা অফিসের মাধ্যমে সর্বত্র কাজ-

বর্ম পরিচালনা করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মধারা নিম্নরূপ।

(১) কৃষ্টিমূলক কাজকর্ম করা, মান উন্নত করা, বিদেশে ভারতীয় কৃষ্টির প্রসারের চেষ্টা করা।

(২) বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা। নানাবিধ সমীক্ষা পরিচালনা করা ইত্যাদি।

(৩) কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সাধন।

সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর মূল দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) সংস্কৃতি দপ্তর

ভারতের জনগণের মনে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করার জন্য এবং বিদেশে ভারতীয় ঐতিহ্য ও কলা প্রসারের উদ্দেশ্যে National Culture Trust গঠিত হয়।

এই Trust কতকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহাদের কর্মধারা রূপায়ণের চেষ্টা করেন। যথা—

(১) **ললিতকলা একাডেমী** :—ইহা গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানে প্রধানতঃ চিত্রন, অংকন ও ভাস্কর্যের চর্চা হয়। প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার করিয়া এই একাডেমী অংক ও শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাহা ছাড়া বিদেশীয় কলা ও শিল্প চর্চারও নানা প্রদর্শনী এই একাডেমীর পক্ষ হইতে আয়োজিত হয়।

(২) **সংগীত-নাটক একাডেমী** :—এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা, নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকেন।

(৩) **সাহিত্য একাডেমী** :—ভারতীয় সাহিত্যের মান উন্নয়ন, সাহিত্যে নানাজাতীয় গবেষণা, জাতীয় সংহতি বিধায়ক নানা চেষ্টা এই প্রতিষ্ঠান করেন। সাহিত্য একাডেমী নানা জাতীয় ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং ভাল সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত National Book Trust গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সস্তায় ভাল বই ছাপানো, ভাল ভাল প্রাচীন বই ছাপানোর কাজ ট্রাষ্ট করেন।

ইহা ছাড়াও বিদেশে ভারতীয় ঐতিহ্য, দর্শন, সাহিত্য, নৃত্য, নাট্য, সংগীত ইত্যাদি প্রচারের জন্য নানা জাতীয় ছোট ছোট শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলির কোনটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধানে, কোনটি প্রচার-দপ্তরের তত্ত্বাবধানে কাজ পরিচালনা করে। এগুলিও পরোক্ষে শিক্ষার প্রসারে নিযুক্ত রহিয়াছে।

(খ) বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর

ইহা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অপর মূল অংশ। দেশে বিজ্ঞান-চেতনা আনয়ন, অধিকমাত্রায় সমাজ-জীবনে বৈজ্ঞানিক অবদান-সমূহের ব্যবহার, গবেষণার ক্রমোন্নতির জন্য এই বিভাগ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হয়।

এই বিভাগের কর্মধারা নিম্নোক্ত ভাবে বিভক্ত।

(১) **বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদ** (Council of Scientific and Industrial Research)। রাজ্য পর্যায়ে এই সব পরিষদ স্থাপন করা হইয়াছে। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে নানাজাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় গবেষণাগারের সংখ্যা বর্তমানে ২১টি। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে যাদবপুরে Central Glass and Ceramic Research Institute, কলিকাতায় Indian Institute for Biochemistry and Experimental Medicine এবং Birla Industrial and Technological Museum, দুর্গাপুরে Central Mechanical Engineering Research Institute অবস্থিত। ইহা ছাড়া এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে ২১টি বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রামের লোকের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধি পায় এই উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞান-মন্দিরগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

(২) **আণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় গবেষণা।**

সারা ভারতে নানাজাতীয় ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা, সমীক্ষা, আণবিক শক্তি সম্বন্ধে নানাজাতীয় গবেষণা ইত্যাদি কাজ এই বিভাগ নিষ্পন্ন করেন। ইহা ছাড়া প্রতি বিভাগেই নানাজাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়। যেমন :—(ক) সেচ বিভাগের অধীনে জলশক্তি, নদী-সম্পর্কিত নানা ধরণের

গবেষণা চলিতেছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১১টি বড় বড় গবেষণা-কেন্দ্র ও রাজ্যে ছোট ছোট বহু গবেষণা-কেন্দ্রে নানা কাজ চলিতেছে।

(খ) যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিমান নির্মাণ সংক্রান্ত গবেষণা চলিতেছে।

(গ) বনবিভাগের অধীনে দেরাদুনের বনসংক্রান্ত গবেষণাগার প্রসিদ্ধ।

(ঘ) আকাশবাণী কর্তৃক নয়াদিল্লীতে বেতার বার্তা সংক্রান্ত নানাজাতীয় গবেষণা পরিচালিত হয়।

(ঙ) রেলবিভাগ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ লোনাভলা ও চিত্তরঞ্জনে রেলসংক্রান্ত নানা গবেষণা পরিচালিত হয়।

(চ) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন পথ পূর্ত সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা কাজ চলিতেছে।

(ছ) শিল্প বিভাগের অধীনে সকল পণ্য দ্রব্যের মান উন্নয়নের জন্য নানা জাতীয় গবেষণা কাজ চলে।

সরকারী পরিচালনা ছাড়াও, সরকারী সাহায্যপুষ্ট ও বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রখ্যাত কতকগুলি গবেষণাগার রহিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা ও সমাজ জীবনে ইহাদের অবদান কম নহে। ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, মাইক্রো-বায়োলজি, জুলজি ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার **বোস ইনষ্টিটিউটের** (আচার্য জগদীশ বসু প্রতিষ্ঠিত) নাম বিখ্যাত।

লক্ষ্ণৌএর **বীরবল সাহানি ইনষ্টিটিউট** বিখ্যাত গবেষণা-কেন্দ্র। কলিকাতার **ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্স** (ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত) পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

বাঙ্গালোরের **ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স** ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির পরিচালনায় কৃষি ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও নানা জাতীয় গবেষণা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাত্মক উন্নতি ঘটাইবার জন্য বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এইবার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে কিরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে শিক্ষার ধারা

পরিকল্পিত ও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কর্মপন্থা গৃহীত হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সার্জেন্ট প্ল্যান ও গান্ধীজির পরিকল্পনা অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষার সংস্কার সাধনের প্রয়াস চলিয়াছে। সমগ্র ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করিয়া কেন্দ্র ও প্রাদেশিক রাজ্যগুলির যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাহার রূপায়ণ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আগে দেখা যায় নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বলিতে গেলে একরূপ স্বাধীন ভাবেই আপন আপন প্রদেশে যেমন পারিতেছিলেন তেমনি সংস্কার সাধন করিতেছিলেন। প্রদেশে প্রদেশে এই ব্যাপারে মিল অপেক্ষা অমিলই ছিল বেশী। কেন্দ্রীয় যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিত কংগ্রেস। সকল প্রদেশেই কংগ্রেসের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বজায় ছিল। বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনে দেশ পরিচালনার একটা সাধারণ নীতি পরিগৃহীত হইত। সেইটুকুই মাত্র সংযোগ হইয়া থাকিত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্র হিসাবে মৌলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যেমন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অভিব্যক্ত হইল তেমনি কতকগুলি ব্যাপারে Directive Principles এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রকাশিত হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এইরূপ খানিকটা কর্মসূচী স্থিরীকৃত হইল। এই সময়েই জাতির জীবনের সমস্যাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না রাখিয়া একত্র গ্রথিত করিয়া তাহা সমাধানের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকৃত পক্ষে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরু হইল।

১ সাক্ষরতা বিধান

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সাক্ষর ব্যক্তির যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ।

সমগ্র ভারত :—পুরুষ :—শতকরা ২৪.৮৭ জন

মহিলা :—৭.৮৭। একত্রে ১৬.৬১ জন।

পশ্চিমবঙ্গ :— পুরুষ :—শতকরা—৩৪.২৩ জন

মহিলা :—১২.২১। একত্রে ২৪.০২ জন।

ঐ সময় ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার ছিল কেরালায়। পুরুষ শতকরা—৫০·৩৭, মহিলা শতকরা ৩১·৬৫, একত্রে ৪০·৮৮জন।

আর সর্বনিম্ন হার ছিল—হিমাচল প্রদেশে। পুরুষ শতকরা ১২·৫৯, মহিলা শতকরা ২·৩৭, একত্রে ৭·৭১ জন।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের শিক্ষিতের হার—২৩·৭

এই সময়ে সর্বাধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার ছিল দিল্লীতে শতকরা ৫২·৭, কেরালায় শিক্ষিতের হার ছিল ৪৬·৮, এবং সর্বনিম্ন শিক্ষিতের হার ছিল নেফায় ৭·২

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মহিলাদের শিক্ষার হার অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় একত্রে গড় করা কম হইয়া গিয়াছে। সাক্ষরতা বিধানের জন্য যুগ্মভাবে প্রয়াস করা হয়—দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও সমাজ শিক্ষার মধ্য দিয়া বয়স্কদের সাক্ষর করিয়া তোলা। [এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা পরে করিব।]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জন-সংখ্যার মধ্যে ১৪—১৭ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৮·৪ ভাগ বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব হয়। এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে ১৯৬০ সাল মধ্যেই ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে। তাহাতে একদিক দিয়া নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা কমিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার শতকরা ১৯·২ ভাগ বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব হয় এবং ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ২২·৫ জনকে বিদ্যালয়ে আনা যাইবে এরূপ লক্ষ্য স্থির হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সাক্ষরতা বিধান ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য স্বাধীনতার পূর্বে কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দেও ভারতের শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২ জন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তাহা দাঁড়ায় শতকরা ১৬·৬১ জনে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ইহা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২৩·৭ (পুরুষ শতকরা ৩৯·৯, মহিলা শতকরা ১২·০ জন)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষা

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার চলিতেছিল তাহা তো থাকিলই। উপরন্তু অতি দ্রুত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঘটাইবার পরিকল্পনা লওয়া হইল। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বাতিল হইয়া যাওয়ার সংগে সংগে বিহার ছাড়া সমস্ত প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা বিলুপ্ত হয়। স্বাধীনতার পরই গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে। এখনও পর্যন্ত বুনিয়াদী ও প্রচলিত শিক্ষা উভয় ধারাই সমান্তরাল ভাবে চলিতেছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। খানিকটা বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া চলিতে হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পর সংবিধান রচিত ও গৃহীত হওয়ার পর সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হইল। সামনে কয়েকটি লক্ষ্য নির্ধারিত হইল। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সংবিধানে বলা হইল, "The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years."

এদিকে আমরা কিছু অতীতে ফিরিয়া যাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার কথা আলোচনা করিব। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে নিখিল-ভারত শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিবেশনে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারগণকে আমন্ত্রণ জানান। সেই অধিবেশনে সার্জেন্ট পরিকল্পনার

সুপারিশ অনুযায়ী আট বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ৪০ বৎসরে উহা কার্যকরী করার প্রস্তাব কেহই গ্রহণ করেন না। অধিবেশনের সভ্যগণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের একটি সুপারিশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বুনিয়াদী শিক্ষা আবশ্যিকরণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, সেই অর্থ কোন কোন সূত্র পাওয়া যাইবে সেই সম্বন্ধে একটি অর্থকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। বি. জি. খেরের নেতৃত্বে সেই অর্থকরী সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি মনে করেন যে, সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনা, অর্থাৎ ১৬ বৎসরের মধ্যেই প্রবর্তিত হইতে পারিবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ বৎসরের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীগণকে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার আওতায় আনা হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ বৎসরের বয়স সীমার মধ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে যে শিথিলতা দেখান হইয়াছিল, সেই শিথিলতা আর দেখান হইবে না। সকল ছাত্রছাত্রীকেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে ১১ হইতে ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইবে। পরের তিন বৎসরের মধ্যে ঐ বয়স সীমার সমগ্র ছাত্রছাত্রী বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আসিবে।

অর্থ-সংগ্রহ বিষয়ে খের কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন।

(১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবেন আর রাজ্যসরকার রাজস্বের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার ব্যয় হিসাবে ধরিবেন।

(২) শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ খরচ করিবেন, রাজ্য-সরকার এবং শতকরা ৩০ ভাগ খরচ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

(৩) শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় রাজ্যসরকারের অনুমোদিত সকল দান আয়কর হইতে রেহাই পাইবে।

(৪) রাজ্য-সরকারগুলিকে এই সমিতি ওয়ার্ধা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদন-ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে বলেন। ঐ সমস্ত স্থানে শিক্ষাকাজ হইতে অর্থের আয় হইয়াছে, তাহা দ্বারা

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আংশিক খরচের সঙ্কুলান হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যগুলি ছাত্রদের শিক্ষাগত আগ্রহকে বজায় রাখিয়া অনুরূপ আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

খের কমিটির সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি গ্রহণ করিলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারে খুব সামান্যই অগ্রগতি দেখা যায়। তাহার কারণ অর্থের অভাব।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হইল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হইল এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিরূপ অগ্রগতি ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত সংখ্যাতত্ত্বে বুঝা যাইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কাল ধরা হইয়াছে। তদনুযায়ী ইহাকে দুইটি স্তরে ভাগ করা হয়। ১১ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তর, ১৪ বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের শতকরা ৫৩ ভাগ এবং বালিকাদের শতকরা ১৭ ভাগ বিদ্যালয়ে আসিত। একত্রে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। শতকরা ৬৫ ভাগ বালক-বালিকার লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না।

১৪ বৎসর পর্যন্ত বালকদের শতকরা ১৫ ভাগ এবং বালিকাদের শতকরা ৩ ভাগ বিদ্যালয়ে পড়িত। একত্রে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৯ ভাগ। শতকরা ৯১ ভাগ বালক-বালিকার পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ এই সময়ে দেশবিভাগ, তজ্জনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ইত্যাদি নানা কারণ সত্ত্বেও কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছিল।

১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শতকরা ৫৯.৮ জন বালক ও ২৪.৬ জন বালিকা, একত্রে শতকরা ৪২ জনেক বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ছিল ৩৫%।

১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শতকরা ২০.৭ জন বালক এবং ৪.৫ জন বালিকা একত্রে শতকরা ১২.৭ জনকে বিদ্যালয়ে আনা গিয়াছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল ৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সূচনা

সুখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রাষ্ট্রনায়ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তীব্রভাবেই অনুভূত হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের সংবিধানে ইহার সাক্ষর দেখিতে পাই। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন করা হইবে এবং আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করার চেষ্টা হইবে। বর্তমান অগ্রগতি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ঐ আশা ছিল খুবই উচ্চাশা। তথাপি উহা হইলে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রনায়কগণ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে খুবই অবহিত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগটিও নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তাই রাষ্ট্রনায়কগণের ঐ উচ্চাশা পূর্ণ হয় নাই—তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে সকল ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের অগ্রগতি গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহার প্রমাণ দেখা যায়। অবশ্য সংবিধান প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষমতা বন্টনের ব্যাপারে শিক্ষাটি রাজ্য-সরকারগুলির আয়ত্তাধীন বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অবশ্য তথাপ কেন্দ্র শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে অনেকটা প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারেন বিশেষ করিয়া আর্থিক সাহায্য বন্টন মাধ্যমে। এইভাবে প্রভাব সৃষ্টি ব্যতীতও একই রাজনীতিক দল কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারে শাসনাধীন থাকায় ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির সমতা রক্ষিত হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনে সকল রাজ্যই আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন।

১৯৪৭ হইতে ১৯৫৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে সংখ্যাসংক্রান্ত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই আগ্রহের কিছুটা পরিচয় মিলিবে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির মোট বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ১৪০১২১টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১,০০০,৯৬৪ জন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বিদ্যালয়-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২১৫,৩২০টি ও মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৭,৯৮৫,০৭৪ জন। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৫৪% এবং ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৬৩% অবশ্য দেশবিভাগ-জনিত কারণে বাস্তত্যাগী আগমন-জনিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় বৃদ্ধিও ইহার একটি কারণ।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকরা যে পরিমাণ শিশু বিদ্যালয়ে গিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদান করা হইল। ইহাতে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির কিছুটা পরিচয় মিলিবে।

অন্ধ্র—৬৮·৬% আসাম ৫৯·৪% বিহার ৩৫·৯% বোম্বাই ৮৭% জম্বু ও কাশ্মীর ২২·৮ কেরল ৯৯·৮ মধ্যপ্রদেশ ৫১·৭% মাদ্রাজ ৬৮·৫% মহীশূর ৫৯·২% উড়িষ্যা ৩০·৯% পাঞ্জাব ৫৯·২% রাজস্থান ২২·৬% উত্তর প্রদেশ ৩৩·৫% পশ্চিমবঙ্গ ৮৭%। এই বৎসর সমগ্র ভারতের হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বয়সের শতকরা ৫৩%। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণের দিক হইতে ঐ সময়ে বেশ কিছুটা অগ্রগতি দেখা দিয়াছে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে যেখানে ২২৪টি সহর ও ১০,০১০ গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ১,০৯৩টি সহর ও ৩৭,২৭৬টি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ঐ বৎসরে ঐ অঞ্চলগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,০৬৭,৪১২ জন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে ভারতের মোট সহর-সংখ্যা ৩০১৬টি ও গ্রামসংখ্যা ৩৫৪,০৮৯টি। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে সহরের এক-তৃতীয়াংশেও এক-নবমাংশের কিছু বেশী গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই অগ্রগতি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের গঠনতন্ত্রে দশ বৎসরে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের যে আশা করা হইয়াছিল তাহার খুব কম অংশই পূর্ণ হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাল বৃদ্ধি

সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতিও আশা করিয়াছিলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে ৬—১১ বৎসর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে এবং পরের ছয় বৎসরের মধ্যে ১১—১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক হইবে। কিন্তু নানাকারণে ইহা হইয়া উঠে নাই। টাকা খরচ করিলেই শিক্ষা হয় না, এবং শিক্ষা জোর করিয়াও হয় না। ইহা স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে শতকরা ৩০ জন ছাত্রছাত্রীও বিদ্যালয়ে আসিত কিনা সন্দেহ। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঠিক আগে শতকরা ৪২ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়াছে শতকরা ৫৩ জন। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ছাত্রছাত্রীদের শতকরা সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৬০ জন। অতএব সংখ্যা লইয়া ৬—১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে নামা যায় না। যখন ৬—১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা গেল না, তখন ১১—১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ৬—১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা সংখ্যা দাঁড়াইবে আশা করা যায় ৮০ জন। ঐ সংখ্যাকে লইয়া আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ সুরু করা যায়। এই কারণেই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে. এল. শ্রীমালী ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি (All India Council of Elementary Education) উদ্বোধন কালে দুঃখের সঙ্গে বলেন যে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা যথাসময়ে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হইবে। পরিকল্পনা কমিশন ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬—১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সীমারেখা স্থির করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের সংখ্যা এই বয়সের সমগ্র ছাত্রছাত্রীসমাজের মাত্র শতকরা ২৩ জন। প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক নয় এবং অপচয় ও স্থিতাবস্থাও

আশঙ্কাজনক, সেইখানে এই সংখ্যার চেয়ে আর কি বেশী আশা করা যায় ? তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে এবং পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে ১১-১৪ বয়সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা আবশ্যিক করা যাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

আপাততঃ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু উহার সঙ্গে অনেক সমস্যার উদ্ভব হইবে। আমরা সেইগুলি একে একে আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্যা

১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র ভারতের সংখ্যাতত্ত্ব হইতে দেখা যাইবে যে মোট ২৭৮১৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ২৩.৩টি সরকার দ্বারা, শতকরা ৪৭.৯টি বিদ্যালয় জেলা বোর্ড দ্বারা শতকরা ৩.২টি বিদ্যালয় মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা শতকরা ২৪'২টি বিদ্যালয় অন্য ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বেসরকারী সংস্থাদ্বারা ও শতকরা ১.৪টি বিদ্যালয় পুরাপুরি বেসরকারী সংস্থাধীনে পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু জেলা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিও প্রধানতঃ সরকারী অর্থ সাহায্যের দ্বারাই চলিয়াছে। উক্ত বৎসরে ৫৩,৭২৭২০৬৬ টাকা বিদ্যালয়গুলি বাবদ খরচ হইয়াছে ও তাহার শতকরা ৭৩.৬ ভাগ সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে। জেলা বোর্ড তহবিল হইতে আসিয়াছে ১১.৬% মিউনিসিপ্যালিটি ফাণ্ড হইতে আসিয়াছে ৮.৪ ভাগ, ছাত্র দত্ত বেতন হইতে ৩.৩% দান ও অন্যান্য সূত্র হইতে আসিয়াছে যথাক্রমে ১.২% ও ১.৯% অর্থাৎ সরকার ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ আসিয়াছে খুবই কম। সরকারী ও বোর্ড স্কুলগুলি এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাভুক্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। প্রতি ছাত্রের জন্য বার্ষিক গড়পড়তা

মাথাপিছু ব্যয় হইয়াছিল ২৩'৪ টাকা। উহা সর্বোচ্চ ছিল বোম্বাই রাজ্যে ; মাথাপিছু ৩০'১ টাকা ও সর্বনিম্ন ছিল আসামে, মাথাপিছু ১৩'৯ টাকা। বিত্থালয়ে অর্থ সাহায্য প্রদান ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। এক থোকে সাহায্য দান প্রথা :—সরকার কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ এক থোকে অর্থ সাহায্য এই প্রথার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যপ্রদেশে এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে।

২। শতকরা ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য :—ইহাতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট শতকরা পরিমাণ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থার হাতে দিয়াছেন। অবশ্য এই শতকরা পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। বিহার, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে এই প্রথা অনুসৃত হয়।

৩। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থাগুলির মোট আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করা। এক্ষেত্রে খরচের অবশিষ্ট অংশ সরকারকেই বহন করিতে হইয়াছে। বোম্বাইএ জেলাবোর্ডগুলির ক্ষেত্রে এই প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল। বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যে প্রথম প্রথার স্থলে শেষোক্ত প্রথাটিই গ্রহণ করা হইতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান ব্যাপারে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি সাহায্য দিয়াছেন কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থা মাধ্যমে ঐ সাহায্য দিয়াছেন। মাদ্রাজ রাজ্যে শিক্ষকের বেতনের ভিত্তিতে ঐ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বোম্বাই রাজ্যে উহা দেওয়া হইয়াছে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য, বিহারে উহা দেওয়া হইয়াছে শিক্ষকগণের নির্ধারিত অর্থসাহায্য হিসাবে। কিন্তু এই সাহায্য সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণে কম এবং এই জন্য শিক্ষকগণ ঐ সব বিত্থালয়ে স্বল্প বেতনে কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিত্থালয় পরিচালন ব্যবস্থাপনার উপরোক্ত ধরণ বিত্থালয়ের সংখ্যা ও গুণগত বিভাগে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন না রাখিয়া স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থার পরিচালনাধীনে রাখিলে বিত্থালয়গুলি সুপরিচালিত হয় না বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। কারণ ঐ সংস্থাগুলির প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতি সাধনের প্রতি বিশেষ গরজ নাই। নির্বাচনে

পরাজয়ের ভয়ে তাহারা প্রয়োজন মত ট্যাক্স বসাইতে ভয় পান। অনেক ক্ষেত্রে কোনও অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তিত হইলেও তাহারা আইনটিকে যথাযথ প্রয়োগ করেন না—উহা কাগজে-কলমে থাকিয়া যায়। অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টিতে সরকারকে ১৯৫৫—৫৬ খৃষ্টাব্দে অনেকটা উদ্যোগী হইতে দেখা গিয়াছে। ছাত্র ভর্তি না করার জন্য ঐ বৎসরে প্রায় ৪০ হাজার ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র না পাঠানোর জন্য প্রায় ৫৭ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয় ও ২০ হাজারের বেশী টাকা জরিমানা আদায় হয়। ঐ বিষয়ে তদারকীর জন্য সরকার ৯৮১ জন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু যে অঞ্চলের জন্য এই কর্মচারীগণ নিযুক্ত তাহার আয়তনের তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থার সভ্যগণ আইনকে ঠিকমত প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক নহেন—কারণ তাহা হইলে তাহাদের জনপ্রিয়তা কমিবে বলিয়া তাহারা আশঙ্কা করেন। ঐ সংক্রান্ত আইন গুলিও ত্রুটিযুক্ত তাই গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিগণ সহজে অব্যাহতি লাভ করেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থার পরিচালনায় বিদ্যালয়গুলির গুণগত বিকাশও নানাভাবে ব্যাহত হইতেছে। তাহারা শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে শিক্ষকের গুণগত যোগ্যতা অপেক্ষা দল-তোষণনীতি অনুসরণ করেন। বিদ্যালয় নির্বাচন ব্যাপারেও তাহারা সুবিচার করেন না। অনেক সময় নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলেই অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও অন্য অঞ্চলে তুলনায় বিদ্যালয় সংখ্যা থাকে খুব কম। বিদ্যালয়-গৃহ ও শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যাপারেও তাহাদের উদাসীনতা ও অব্যবস্থা সমান ভাবেই লক্ষণীয়।

বর্তমান পরিচালনার আর একটি ত্রুটি হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শকের অভাব। বিদ্যালয়-সংখ্যার তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা খুবই কম। তাহাদিগকে কাগজপত্রের কাজেই অনেক সময় ব্যয় করিতে হয়—বিদ্যালয় দেখার সময় তাহাদের খুবই কম। তাহাদের নির্দেশসমূহও পালিত হয় না। শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ হাত নাই। বর্তমানে স্বায়ত্ত-শাসনসংস্থাগুলি সরকারে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদ্বারা অধিকৃত হওয়ায় সরকারী পরিদর্শকগণ তাহাদের বিরূপতাকে ভয় করেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি রাখে এমন শিক্ষকের ছোট ত্রুটি বিষয়ে নীরব থাকেন। এই ভাবে বর্তমান

ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন-সংস্থাগুলির পরিচালনাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ কি সংখ্যাগত দিকে কি গুণগত দিকে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি প্রদর্শনে ব্যর্থ হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার দায়দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রের। কিন্তু বিষয়টি রাজ্য-সরকারের অধীনে। রাজ্য সরকার আবার ইহা স্বায়ত্বশাসন-সংস্থা অথবা স্কুল বোর্ডের হাতে দিয়াছেন। স্কুল বোর্ডগুলি বৃটিশ যুগের আবহাওয়ায় গঠিত বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখযোগ্য ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা আইন এখনো পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে চলিতেছে। এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার মধ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন আজিও ঘটে নাই। অর্থ-নৈতিক দিক হইতে স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থা অথবা স্কুলবোর্ডগুলি দুর্বল। অপর পক্ষে সরকার আজিও বৃটিশ স্কুলের মতই সমগ্র শিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ হইতে মাত্র ৩০% প্রাথমিক শিক্ষাখাতে খরচ করিতেছেন। দেখা যাইবে যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ হইয়াছে ৮ কোটী টাকা, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৯ কোটী টাকা এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩½ কোটী টাকা। এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে খরচের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ঐ সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু টাকার মূল্য খুব বেশী মাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ আশানুরূপ বিবেচনা করা যায় না। উচ্চশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সার্বজনীন, এই জন্য শিক্ষাখাতে মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের আরো বেশী পরিমাণ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল। রাষ্ট্রকর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দায় সরাসরি গ্রহণ করিলে এই ভাবে ব্যবস্থাগত ও অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত হইতে হইত না। এই জন্য এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

অতঃপর আমরা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ক অসুবিধার কথা বিবেচনা করিব।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ক অসুবিধা

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রধানতঃ লেখাপড়া ও প্রাথমিক গণিত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন

করার ব্যবস্থা থাকিলেও বিষয়গুলির উপলব্ধি সম্বন্ধে কোনও প্রচেষ্টার ইঙ্গিত ও সুযোগ তাহাতে ছিল না। এই ভাবে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত পুস্তক-ঘেষা। ব্যবহারিক জীবনের বিকাশের দিকে কোনও দৃষ্টি তাহাতে ছিলনা। উহাতে গ্রামীন জীবনযাত্রার প্রতি অবহেলা তো ছিলই, এমন কি সাধারণ নাগরিকতা-বোধ জাগ্রত হয় এমন কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা উহার অন্তর্গত ছিল না। এই জন্য যে সমস্ত লোক বাস্তব জীবনে লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না তাহারা শিশুকে এই লেখাপড়া শিখানোর জন্য পাঠশালায় প্রেরণের কোনও তাগিদ অনুভব করিত না।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে কর্মকেন্দ্রী ও জীবনাশ্রিত শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হওয়ায় ইহারও মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের এই ত্রুটি বিদূরীত হইবে বিধায় সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সংশোধিত আকারে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু সার্জেন্ট কমিটির পরিকল্পনা অনুসারে কার্য হইলে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রবর্তন করিতে ৪০ বৎসর সময় লাগিত ; কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা উক্ত পরিকল্পনা-উল্লেখিত অগ্রগতি সফল করে নাই। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা কালে আশা করিয়াছিলেন যে, এই শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার-জনিত আর্থিক অসুবিধা দূর হইবে। কিন্তু বর্তমান বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য উহার সঙ্গত কারণ আছে। ভাল শিক্ষার জন্য উপযোগী বিদ্যালয়-গৃহ ও তাহার পরিবেশ এবং শিক্ষার সরঞ্জাম প্রয়োজন। শিশুদের উপযোগী শিক্ষকের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কোনও প্রগতি-ধর্মী শিক্ষার প্রবর্তন সম্ভব নহে। এইগুলি শুধু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নহে, সময়সাপেক্ষও বটে। তাই অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করার আশা দেখা যায় না। এই জন্য অনেক স্থলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা-কাজ ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সব কাজকর্ম শিক্ষার সহায়করূপে গণ্য করা হইয়াছে, সেইরূপ কাজকর্ম কিছু কিছু প্রবর্তন দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য-ক্রমকে কিছুটা জীবনাশ্রয়ী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গে প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হইতেছে। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয় কর্মাশ্রিত হওয়ায় যে পাঠ্যক্রম সহজ-গ্রাহ্য, তাহা পুস্তককেন্দ্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে

পারে না। এই জন্য পাঠ্যক্রম পরিবর্তন যথেষ্ট নহে। পাঠদান-পদ্ধতির পরিবর্তন না করিতে পারিলে শিক্ষা জীবনাশ্রয়ী হইবে না—বরং উহার জন্য আরো অধিক পরিমাণে মুখস্থ বিদ্যার চাপই পড়িবে। এইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার বিস্তার সাধন একান্ত প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করায় অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নত হইবে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে নানা বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে। আমরা পৃথক ভাবে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পরীক্ষা ও শিশুর শিক্ষাগত অগ্রগতি-বিধায়ক ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে শিশুদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা সাহায্য করে প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে—(ক) শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষাবিষয়ে তাগিদ সৃষ্টি করে। (খ) শিক্ষককে শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতি সাধনে ও শিক্ষাদান কার্যে অধিকতর আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। (গ) অভিভাবকগণকে শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান-সহায়ক উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে সচেতন করিয়া তোলে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে হইলে পরীক্ষা-পদ্ধতিকেও তদুপযোগী করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে সমগ্র শিক্ষাজগতেই যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত তাহা অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত, প্রাথমিক ক্ষেত্রে এই ত্রুটির পরিমাণ আরও বেশী।

বর্তমানে শিক্ষা বলিতে পুস্তককেন্দ্রী শিক্ষা বুঝায় ও পরীক্ষা-পদ্ধতি বলিতে কতকগুলি প্রশ্নের লিখিত উত্তর বুঝায়; প্রশ্নগুলি এমন ভাবে করা হয় যে পুস্তক হইতে মুখস্থ উত্তর লিখিয়া তাহার পূর্ণ মান পাওয়া যায়, অন্য ভাবে পাওয়া যায় না। এই জন্য শিক্ষা বলিতে এখন পাঠ্য পুস্তক হইতে অথবা প্রশ্নোত্তরিকা প্রভৃতি হইতে কতকগুলি মন্তব্য প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করাই বোঝায়। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় এই পদ্ধতি সর্বত্রই অনুসৃত হয় এবং শিক্ষকগণ উহার ধারা নিম্নতর শ্রেণীতেও চালাইয়া থাকেন। ফলে সুকুমারমতি শিশুগুলি অর্থ না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া পড়া তৈয়ার করে, শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। গণিতের সমস্যাগুলিও তাহারা যান্ত্রিক ভাবে করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাদের বোধশক্তি কল্পনাশক্তি প্রভৃতি গুণ যাহা গণিত শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহা অবিকশিতই থাকিয়া যায়।

অপচয় ও স্থিতাবস্থা

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম সমস্যা নিম্নতর শ্রেণীগুলিতে ছাত্রদের অকৃতকার্যতা হেতু একটি শ্রেণীতে একাধিক বৎসর আবদ্ধ থাকা। ইহাকে বদ্ধাবস্থা বা Stagnation বলা হয়। ইহার পরিমাণ কিরূপ ভয়াবহ তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্ব হইতে বোঝা যাইবে। সংখ্যাতত্ত্বগুলি ২০ বৎসর পুর্বের হইলেও উহাতে যে অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে, বর্তমানেও তাহার খুব বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণের শতকরা পরিমাণ ছিল :—১ম শ্রেণীতে ৪৮·০২%, ২য় শ্রেণীতে ৬৯·০৯% তৃতীয় শ্রেণীতে ৬৫·৪৫% ৪র্থ শ্রেণীতে ৬৭·৩০% এবং ৫ম শ্রেণীতে ৫৯·৫৭%। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে ঐ পরিমাণ দাঁড়ায় ১ম শ্রেণীতে ৫১·৮৩% ২য় শ্রেণীতে ৬৮·৯১% ৩য় শ্রেণীতে ৬৮·৮৭% ৪র্থ শ্রেণীতে ৭০·১৭% ও ৫ম শ্রেণীতে ৬৫·৭০%

বর্তমানে ১ম শ্রেণীতে অকৃতকার্যতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে (ক) ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত বৃদ্ধি এবং (খ) শিক্ষাবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পরিবারের শিশুসংখ্যা বৃদ্ধিকে আংশিক দায়ী করা যায় সত্য, কিন্তু মূলকারণ থাকিয়া যায় পাঠদান-পদ্ধতির অনুন্নত মান ও পরীক্ষা গ্রহণ-পদ্ধতির ক্রটিতে। পরীক্ষা-পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন পরীক্ষা দ্বারা শিশুর অকৃতকার্যতাই শুধু নির্ধারণ করা হইবে না, তাহার ঠিক কোন বিষয়ে অসুবিধা ঘটিতেছে তাহাও বাহির করা হইবে এবং সেই অসুবিধা দূরীকরণে তাহাকে সাহায্য প্রদান করা হইবে। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষায় ঐরূপ ব্যবস্থা নাই। পাশ ফেল নির্ধারণ করাই বর্তমান পরীক্ষার উদ্দেশ্য। ঠিক কোনখানে ক্রটি তাহা শিক্ষার্থী অথবা অভিভাবককে বলিয়া দেওয়ার চেষ্টাও দেখা যায় না—কারণ তাহা নির্ণীতই হয় না—সুতরাং বিদ্যালয়ে তাহার সংশোধন প্রচেষ্টা অবান্তর প্রশ্ন। বৎসরের শেষে পরীক্ষা করা হয়, কাজেই ক্রটি সংশোধনের সময় ও সুযোগ আর থাকে না। পরীক্ষার অপর ক্রটি শিশুদের বোধশক্তি, সৃজনশক্তি প্রভৃতি পরীক্ষার পরিবর্তে তাহার মুখস্থ শক্তির পরীক্ষাই ইহার মাধ্যমে গৃহীত হয়। এই ভাবে ইহা শিক্ষাকে নিরানন্দকর ও অকেজো করিয়া তোলে।

পাঠ্যক্রমের ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা কালে দেখিয়াছি যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল জীবন হইতে বিচ্যুত—শুধু লেখাপড়া ও গণিতের উপরই জোর দেওয়া হইত। পরে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সংযুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি হেতু তাহা একান্তই মুখস্থ করার ব্যবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। যদিও আধুনিক পাঠ্যক্রমে নানা শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বলা হইতেছে এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অথবা বুনিয়াদী অভিমুখী উন্নত ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐ ধরণের কাজকর্মের কিছু কিছু আয়োজন রাখা হইতেছে, কিন্তু পরীক্ষাপদ্ধতি—বিশেষতঃ প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন না হওয়ায় ঐ বিদ্যালয়গুলিতেও পাঠ্যপুস্তক-সর্বস্বতার প্রতিই ঝোঁক দেখানো হইতেছে এবং অভিভাবক তাহাই চাহিতেছেন। কোনও বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিশুশিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহিলে অভিভাবক-গণের অনুকূল সমর্থনের পরিবর্তে প্রচণ্ড বাধারই সম্মুখীন হইতেছেন ও শেষ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারায় ফিরিয়া আসিতেছেন। এই জন্য পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-বিষয়ক প্রচেষ্টার অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ভাল শিক্ষাদান-পদ্ধতি, ভাল পরীক্ষা-পদ্ধতি, উন্নত পাঠ্যক্রম, শিক্ষার অপচয় নিবারণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপকতা এইগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। একটি রাখিয়া অপরটির সমাধান সম্ভব নহে। পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি না করিলে শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতি সম্ভব নয়। অপর পক্ষে পাঠ্যক্রমে কতকগুলি সু-অভিজ্ঞতা ও সু-অভ্যাস গঠনের কথা উল্লিখিত হইলেই বিদ্যালয়ে সেইগুলি গুরুত্ব সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে না যদি পরীক্ষণীয় বিষয় ও পরীক্ষার ধরণ একই থাকে। যদি বিদ্যালয়কে শুধু মুখস্থবিদ্যার ক্ষেত্র করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহা শিশুকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না এবং অকৃতকার্যতার পরিমাণ কমিবে না। আর পুথিগত শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে না এমন অভিভাবক তাহাদের সন্তানগণকে ঐরূপ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আগ্রহ অনুভব করিবে না। তাহা ছাড়া মনে করে, তাহাদের সন্তানগণকে নানারূপ কায়িক শ্রম করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে—নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে পড়িয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইবে

সুতরাং শৈশবের মূল্যবান সময় শুধু অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুখস্থ করিয়া নষ্ট করার পরিবর্তে শৈশবে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ঘটিবে এমন কাজকর্ম শেখান ভালো। লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন অবশ্যই সার্বজনীন এবং তাহার মূল্য কোনও ক্রমে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার প্রতি উক্ত শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতিকূলতা একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। সুতরাং যদিও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো—অল্প বয়সের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আসিতে বাধ্য করা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে অবশ্য করণীয়, কিন্তু ঠিক তেমনিই করণীয় হইবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন, পরীক্ষা-পদ্ধতির ও পাঠদান-পদ্ধতির উন্নতি সাধন, পাঠ্যক্রমের সংশোধন প্রভৃতি। আর এই সব উন্নতি নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থা ও পরিদর্শন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি সমস্যা হইতেছে উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মজীবনের সহিত ইহার সঙ্গতি বিধান ও বিভিন্ন ছাত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিভাবকগণকে যোগ্য উপদেশাদি প্রদান। আমরা এইবার শেষ বিষয়টি আলোচনা করিব।

প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার সহিত সঙ্গতি সাধন বিষয়ক সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষা হিসাবে সংগঠিত করিতে হইলে উহার যে দুইটি দিককে সমান গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে তাহার একটি হইতেছে (১) ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার সোপান হিসাবে সংগঠিত করা এবং অপরটি হইতেছে (২) ইহাকে একটি সম্পূর্ণ একক হিসাবে সংগঠিত করা। অনেক সময় এই দুইটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না—তখন ইহা স্বভাবতঃই ত্রুটিপূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রথমতঃ ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম সোপান হিসাবে সংগঠিত করিতে হইলে (ক) বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে 3R অর্থাৎ লেখা, পড়া ও গণিত-এর জ্ঞান পাইবার ভাল ব্যবস্থা করাইতে হইবে। (খ) শিশুর বিভিন্ন সৃজনপ্রবণতা যেন বিকাশ পায় তাহার সুযোগ ইহাতে রাখিতে হইবে। কারণ ঐরূপ সুপ্ত গুণগুলি চর্চা ও স্ফুরণের সুযোগ শৈশবে না দিলে সেগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (গ) শিশুদের বিভিন্ন ধরণের কর্মগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া কোন্ শিশু ভবিষ্যতে কোন্ ধারার শিক্ষা লইয়া সার্থকতা

অর্জন করিবে তাহার নির্ধারণ-ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে ও সেই দিকে বিকাশের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। (ঘ) শিশুদের সমস্যা সমাধান ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যবস্থিত করিতে হইবে। নতুবা শিশুরা ভবিষ্যতে যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পথে যাইতে চাহে তবে শৈশবের অভ্যাস না থাকায় তাহাদের ঐ গুণগুলির অভাব দেখা দিবে এবং তাহারা পূর্ণ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইবে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে শুধু উচ্চ শিক্ষার সোপান হিসাবে দেখিলে চলিবে না। অনেক শিশুই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পরই শিক্ষা-জীবন হইতে বিদায় লইবে—তাই তাহারা যেন সভ্য সমাজের এক জন উপযুক্ত নাগরিকের উপযোগী বিভিন্নমুখী বিকাশের অধিকারী হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রাথমিক ব্যবস্থাই প্রাথমিক শিক্ষায় রাখিতে হইবে। এই জন্য কাজ-কর্মের প্রতি আগ্রহ, বুদ্ধি-যুক্ত ভাবে কর্ম-সম্পাদন, নানা প্রশ্নের সমাধান বাহির করার শিক্ষা, গণতন্ত্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনের শিক্ষা, সংস্কৃতিগত শিক্ষা, নাগরিকতার বিকাশ, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন প্রভৃতিও প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত। বর্তমানে জীবন অনেক জটিল হওয়ায় উহাকে একটা বাঁধা-ধরা ছকে ফেলা যায় না এবং মাত্র ৪।৫ বৎসরের মধ্যে শিশুকে সমগ্র জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করাও আজ অসম্ভব। তার পরিবর্তে ঐ সময়ে শিশুর জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা কি ভাবে আহরণ করা যায় তাহার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। দুঃখের বিষয় মাত্র ১১ বৎসরের শিশুর পক্ষে এই শিক্ষা লাভ করিবার উপযোগী ব্যক্তিত্ব আশা করা যায় না। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে ৮ বৎসর ব্যাপী Elementary Education-এর কথা বর্তমানে বলা হইতেছে। যাহা হউক প্রাথমিক শিক্ষা নিছক উচ্চ শিক্ষার প্রথম সোপান নহে, ইহা জীবনকে ঠিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা এবং এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে জীবন-ভিত্তিক করার কথা এত গুরুত্বের সহিত সকল দেশেই নির্ধারিত হইতেছে। আমরা অবশ্য এই বিষয়টি সম্বন্ধে পাঠ্যক্রমের সমস্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শিশুকে বৌদ্ধিক-জ্ঞান, সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ প্রভৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনের সহিত সঙ্গতি স্থাপনের ও বাস্তব সমস্যাসমূহের সমাধানের শিক্ষাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদান করা উচিত হইবে। এই দিকগুলির সামঞ্জস্য বুনিয়াদী

শিক্ষার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই উহাকে প্রগতিধর্মী শিক্ষা-ব্যবস্থা বলিয়া স্বাগত জানানো হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রগতিশীল দিকগুলি যত শীঘ্র সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে আনিতে হইবে, তবেই এই সমস্যার সমাধান ঘটিবে। আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনাকালে এই সমস্যাগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করিব। এখানে একটি প্রসঙ্গের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষার পর বর্তমানে দুই ধরণের বিদ্যালয় রহিয়াছে— একটি হইতেছে সাধারণ বিদ্যালয়, অপরটি কর্ম-ভিত্তিক উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। এইরূপ মনে করা হইয়াছে, যে সকল শিশু কর্ম-ভিত্তিক প্রাথমিক অথবা নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিবে ও তাহার পর যাহারা বেশী বৌদ্ধিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করিবে তাহারা সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং যাহারা হস্ত-সম্পাদ্য কাজ-কর্মের প্রতি বেশী প্রবণতা প্রদর্শন করিবে তাহারা উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইবে। অবশ্য ইহাও মনে করা হইয়াছে যে প্রাথমিক স্তরের বিচারে ঐ নির্বাচন ত্রুটিমুক্ত হইবে না—সেই জন্য উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পরেও পুনঃ নির্বাচনের সুযোগ রাখা হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা ভাল যে, অনেক শিক্ষাবিদ্ মাত্র ১১ বৎসর বয়সে এই ব্যবস্থা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। তাহারা মনে করেন, প্রথম ৮ বৎসর একই ধরণের কর্ম ও জীবন-ভিত্তিক শিক্ষায় সকল শিশুকেই রাখা উচিত এবং তারপরে প্রবণতা ও যোগ্যতা বিচারপূর্বক মাত্র তাহার ভিত্তিতেই—অর্থাৎ অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্য ও সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রভাবমুক্ত হইয়াই শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারণ করা উচিত।

কিন্তু যদি শুধু বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার মত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা গৃহীত ফলাফলের ভিত্তিতে শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে গেলে উহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রথম হইতেই শিশুর জীবন-যাপন ও কাজকর্মের ভাল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা উচিত এবং নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষণ—মনোবৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সমীক্ষা-পদ্ধতিসমূহ প্রাথমিক স্তর হইতে প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে ঐরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ঐরূপ কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। উভয় স্তরেই এই কাজকে আরো নিখুঁত ও ব্যাপক করিতে হইবে। এই জন্য এদেশের উপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Tests) বাহির করিতে হইবে

এবং শিক্ষকগণকে ঐরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রহণের কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে। শুধু বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ধরণের কাজ-কর্মের ব্যবস্থা রাখিয়া দৈনন্দিন শিশু-পর্যবেক্ষণ দ্বারা শিশুর বিভিন্ন কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ ও উহা সম্পাদনায় কুশলতা নির্ধারণ দ্বারা শিশুর প্রবণতা ও কুশলতা কোন দিকে তাহা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ভাবেই নির্ধারণ সম্ভব। সুতরাং ঠিকমত ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে এই সমস্যা অনেকখানি সহজ হইয়া যাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার সমস্যা

অতঃপর আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার সাধন বিষয়ক সমস্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা গিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে সংবিধান কার্যকরী হইবার ১০ বৎসরের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আশা করা যায়। কিন্তু এই আশা সাফল্য লাভ করে নাই। সেই হেতু ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সর্বভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক কাউন্সিল (All India Council of Elementary Education (AICEE) প্রতিষ্ঠিত হয় ও ঐ কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হিসাবে রাখা হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার-সাধন জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক অসুবিধা দূরীকরণে সাহায্য প্রদান এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠদান সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধান, পাঠ্য ও সহায়ক পুস্তকাদি রচনা, সমীক্ষা পরিচালনা ও বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াই পরিচালনা প্রভৃতিতে রাজ্যসমূহকে সাহায্য প্রদান। ঐ কাউন্সিলে প্রতি রাজ্য হইতে ১ জন করিয়া ও কেন্দ্রীয় বুনিয়াদী উপদেষ্টা সমিতি (CABE) হইতে উক্ত সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত এক জন প্রতিনিধি, সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এক জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়দের মধ্য হইতে মনোনীত এক জন প্রতিনিধি এবং বুনিয়াদী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষকদিগের মধ্য হইতে দুই জন প্রতিনিধি সভ্য হিসাবে থাকিবেন। মোট সভ্য সংখ্যা ২৩ জন হইবেন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা হইবেন ঐ পরিষদের চেয়ারম্যান। কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা শাখার প্রধান হইবেন

উহার সম্পাদক। যাহারা পদাধিকারবলে নির্বাচিত হইবেন তাহাদের পরিবর্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং নির্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তিগণ প্রতি দুই বৎসর পর পর পুনঃনির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন। এই কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্কগণের প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা সম্ভব হইবে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান অগ্রগতি হইতে বিচার করিলে এই আশা ফলবতী হইবে কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। ১১ হইতে ১৪ বৎসরের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বর্তমানে যাহা রহিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা ৩০ দাঁড়াইবে। কিছু সংখ্যককে পুনরায় শিক্ষা চালাইবার সুযোগ দিবার পরিকল্পনা দ্বারা ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্বক ৪০% দাঁড় করানো যাইবে মনে করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা ৬৫% ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা এক শত দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে। এই ভাবে আশা করা হইয়াছে যে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের সকল শিশুকে ৮ বৎসর ব্যাপী এলিমেণ্টারী শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হইবে।

ব্যবস্থাপনা

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে অনেকগুলি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন হইবে। প্রধানতঃ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে বাধাসমূহ রহিয়াছে তাহার অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে স্থানীয় সংস্থার অব্যবস্থা বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির এক অধিবেশনে স্থানীয় সংস্থার প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে উহার কি সম্পর্ক সেই প্রশ্নের আলোচনা করা হয়। তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি শ্রী বি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি অনুসন্ধানের জন্য। তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষার ভার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থার হাতে রাখার যৌক্তিকতা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। এই কমিটি যদিও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাটিকে সমর্থন করেন, কিন্তু এই কার্যে রাজ্য সরকারের সমধিক দায়িত্ব বিষয়েও

তাঁহারা অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁহারা রাজ্য সরকারকে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি যথাযথ পালনের প্রতি অবহিত করেন।

(১) রাজ্য সরকার ঐ রাজ্যের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করিয়া দিবেন। (২) তাঁহারা ঐ রাজ্যের জন্য সর্বনিম্ন মান বাঁধিয়া দিবেন। (৩) কোন স্থানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রযুক্ত হইলে তাহাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সরকারী শাসন-যন্ত্রকে সক্রিয় থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের ক্ষমতা থাকিবে ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার।

(৪) রাজ্য সরকার ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন।

কমিটি এই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ত-শাসন-সংস্থাগুলিকে অধিকতর জন-সংযোগ, অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতা ও আলোচনা সভা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতিকে জনপ্রিয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কমিটি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি, বোঝাবুঝি ও সহযোগিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা

ইহা সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা, কারণ ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজিও অনগ্রসর দেশ বলিয়া বিবেচিত। তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা দূরীভূত না হইলে অন্য কোনও দিকে অনগ্রসরতা দূর হইবে না। এইজন্য এই দিকে অর্থবিদ্‌দের প্রতি সরকারী দৃষ্টি পড়িয়াছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৬ হইতে ১১ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করিতে হইলে ৩০০ কোটি টাকা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ ইহাও ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এই বাবদ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিবেন। এই ভাবে আশা করা গিয়াছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থসাহায্য পাইয়া রাজ্যগুলি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে খুব বেশী যত্নবান হইবেন এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের উদ্দীষ্ট মানে পৌছানো সম্ভব হইবে। কিন্তু ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মনে হইতেছে এই আশা পূরণ সম্ভব

হইবে না। ইহার দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ক্রমাগত মূল্যমান বৃদ্ধি হেতু পরিকল্পনায় কৃত অর্থ দ্বারা যে কাজ হইবে মনে করা গিয়াছিল তাহা সম্ভব হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও ভবিষ্যৎ আক্রমণ সম্ভাবনায় জন্য দেশরক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যয়বৃদ্ধি হেতু অন্য সকল বিভাগের ন্যায় শিক্ষা-বিভাগেও ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অসুবিধা

ভারত গ্রামপ্রধান এবং গ্রামগুলিতে শতকরা ৮৫ জন লোক বাস করে। যে সমস্ত গ্রামে ৫০০ হইতে বেশী সংখ্যক লোক বাস করে, সেইখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে লোকসংখ্যা ২০০ এরও কম। অর্থাৎ সেইখানে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত। ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যদি ২।৩টি গ্রামের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা হইলে অপর দিক হইতে বিরাট অসুবিধা। গ্রামগুলি দূরে দূরে অবস্থিত। যে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিদ্যালয়ে গমন করা সুবিধাজনক, কিন্তু দূর গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসিয়া পাঠ গ্রহণ সকল সময়ে সম্ভব হইয়া উঠে না। এই রূপ পরস্পর দূরে অবস্থিত ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন একটি বিরাট সমস্যা। এইগুলিতে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান কি ভাবে হইবে তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতের অর্থবল কম, না হইলে ক্ষুদ্র বিদ্যালয় হইলেও প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত ছিল।

গ্রামে লোক সংখ্যা

দূরত্ব

ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর এক রকমের অসুবিধা দেখা যায়। তাহা হইল ভারতের অরণ্যাঞ্চল। ভারতের অরণ্যাঞ্চলের আয়তন ২৮০,১৫৯ মাইল, অর্থাৎ ভারতের সমগ্র আয়তনের শতকরা ২২'১১ অংশ। গ্রামগুলির কাছে রহিয়াছে অরণ্যাঞ্চল। অরণ্যাঞ্চল থাকার ফলে গ্রামগুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, এবং জীবন-যাত্রাও সেইখানে কঠোর। তাহা ছাড়া ঐ গ্রামগুলিকে গ্রাম আখ্যা নাও দেওয়া যাইতে পারে, উহাদিগকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলিলেও

অরণ্যাঞ্চলের নিকটস্থ গ্রাম

অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের অসুবিধা আছে। শিশু হইতে বড় সকলেই জীবিকা অর্জনের জন্য কঠোর শ্রম করিতে সেইখানে ব্যস্ত, পড়িবে কে? পক্ষান্তরে সেই সমস্ত স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঐ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করা এবং ঠিকমত পরিচালনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে এইরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নামে মাত্র ভর্তি হইয়াছে, তাহারা কদাচ সেইখানে পাঠ গ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত অল্প, শিক্ষকগণও বন-প্রান্তের এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না। পক্ষান্তরে স্থানীয় শিক্ষকগণ ঠিকমত কাজ করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিবার লোকের অভাব। কোনও পরিদর্শক যদি যানবাহনাদির কষ্ট স্বীকার করিয়াও অরণ্য প্রান্তের সেই সব প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি দেখেন বিদ্যালয় পরিচালন-ব্যবস্থার শিথিলতা।

পরিদর্শন

প্রাকৃতিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করিতে গেলে জলবায়ুর কথা উত্থাপন করিতে হয়। আমাদের দেশের জলবায়ু শিক্ষা-গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। জলবায়ুর প্রভাবে নানা রকম ব্যাধি যথা ম্যালেরিয়া পীতজ্বর, কালাজ্বর প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে দেখা যাইয়া থাকে। ইহার ফলে সেই সমস্ত স্থানের প্রাথমিক শিক্ষা অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে না। শিক্ষকগণও ঐ সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না। চাকুরীর খাতিরে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে যাইতে হইলেও, কিছুদিন চাকুরী করার পর তাঁহারা অন্যত্র সরিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তাহা ছাড়া ব্যাধির আধিক্যে ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত পড়াশুনা করিতে পারে না।

জলবায়ু ও নানা রকম ব্যাধি

সামাজিক অন্তরায়

আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিক হইতে সামাজিক অন্তরায়-গুলিও কম নহে। আমাদের ভারতীয় সমাজে যে উচ্চ-নীচ ভেদ বর্তমান, তাহা এক দিনে অবলুপ্ত হইবে না। অথচ শিক্ষার ফলে এই প্রভেদসমূহের বিলোপ-সাধন করাই হইতেছে আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু একদল স্বার্থান্বেষী লোক আছেন যাঁহারা এই

উচ্চনীচ-ভেদ

প্রভেদের বিলোপ সাধন করিতে চান না। তাঁহারা মনে করেন যে, নীচ সম্প্রদায়ের লোক উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের সেবা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আবার উচ্চ-সম্প্রদায়ের লোকদের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে একসাথে পড়িবে কি করিয়া? যে মনোবৃত্তির ফলে উচ্চ-সম্প্রদায়ের লোকেরা নীচু-সম্প্রদায়ের লোকদের উচ্চ আসনে বসিতে পর্যন্ত দিত না, সেই মনোভাবের বহুল পরিবর্তন হইলেও, একেবারে চলিয়া যায় নাই। অতএব এই ভেদবুদ্ধি যেখানে রহিয়াছে, সেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ ব্যাহত হইবে, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই।

বহু ভাষা ও বহু জাতি

ভারতে বহু ভাষা ও বহু জাতি। হিন্দুরা এই দেশে সংখ্যায় প্রধান হইলেও তাহাদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দুদের এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বেশী হয় না। তাহা ছাড়া হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ও আছে। সকল সম্প্রদায়ের মত ও পথ এক নহে বলিয়া একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে অর্থাৎ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে এক যোগে তাহারা চলিতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হউক এই প্রস্তাবও অনেক লোক গ্রহণ করিতে চায় না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রদায় ছাড়াও ধনী, উচ্চ চাকুরিয়া, বণিক ইত্যাদি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা পদমর্যাদায় বড় হইয়া গরীবদের সাথে একত্র হইয়া শিক্ষানুসরণ করিতে চান না।

নারীসমাজের অনগ্রসরতা

নারীসমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর। ছাত্রগণের তুলনায় মাত্র কিছু সংখ্যক ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে। গৃহকর্মের কাজ ও দাম্পত্য জীবন-যাপন করা ছাড়া যে মেয়েদের জীবনে আরও কাজ আছে তাহা অনেক অভিভাবকই ভুলিয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও অভিভাবকগণ স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। অল্প কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়াও অনেক বালিকা পড়া ছাড়িয়া দেয়। এই জন্যই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় খুব বেশী।

অস্পৃশ্য সমাজ

অস্পৃশ্য সমাজের তথা নীচু সম্প্রদায়ের লোকদের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা দরিদ্র এবং সমাজের নিতান্ত কৃপায়ই জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের শিক্ষার দাবী এতদিন অবহেলিতই ছিল, আজও তাহাদের শিক্ষা হইতে অবস্থার যে খুব বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। গান্ধীজী

অবশ্য হরিজনদের অস্পৃশ্যতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ এখনও বহু কালের সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

আদিবাসীদের শিক্ষা

ভারতে অনেক আদিবাসী আছে, তাহারা বেশীর ভাগই পার্বত্য জাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলে তাহারা বাস করে। তাহারাও দরিদ্র এবং তাহারা এমনই ভাষায় কথা বলে, যাহার না আছে বর্ণমালা না আছে সাহিত্য। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতে আদিবাসীর সংখ্যা হইতেছে ২৯,৮০৩,৪৭০। ইহাদের শিক্ষা-সমস্যা অত্যন্ত জটিল, কারণ বর্ণলিপি ভালভাবে তৈয়ারী না হইলে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা দেওয়াই অসুবিধাজনক। তাহাদের শিক্ষা-সমস্যাই ভারতীয় শিক্ষাবিদ্দের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে। অবশ্য সুখের বিষয় পার্বত্য ও আদিবাসীরা ধীরে ধীরে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দিকে খুব সামান্য সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় তাহাদের জন্য ছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আদিবাসীদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভিল সেবামণ্ডল এবং সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি ইত্যাদি সেবা প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের শিক্ষা-বিস্তারে বিস্তর সাহায্য করিতেছেন। যতই এই সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কোন কোন সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। ইহাও সার্বজনীন শিক্ষার পরিপন্থী। কারণ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অতএব এইরূপ রাষ্ট্র ভারতীয় কৃষ্টির বিরোধী।

রাজনৈতিক অসুবিধা

রাজনৈতিক দল

ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি রহিয়াছে। এই দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় আসীন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের সময় হইতেই কংগ্রেস শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়া আছে এবং সেই অবস্থা এখনও চলিতেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মতবাদসমূহ লইয়া এমনই ভেদাভেদে ব্যস্ত যে তাঁহারা আবশ্যকীয় প্রাথমিক শিক্ষার মত জনকল্যাণ মূলক কাজে

নিজেদের ব্যাপৃত রাখিতে পারিতেছেন না। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাজে সকলেরই সাহায্য প্রার্থনীয়, কিন্তু বিভিন্ন দলগুলি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার দরুণ প্রাথমিক শিক্ষার কোনও অগ্রসর হইতেছে না। এদিকে কংগ্রেস সরকার দেশের লোকের কিছু কিছু সমর্থন পাইয়াও পুরো-পুরি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

কংগ্রেস সরকারের কাছে ভারতীর অন্যান্য জরুরি সমস্যা বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করায় আবশ্যিক শিক্ষা কিছুটা অবহেলিত হইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে দেশ-বিভাগ, বাস্তুহারাদের সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, পাকিস্তানী ও চৈনিক সমস্যা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লইয়া রাষ্ট্রনায়কগণ এমনই বিব্রত আছেন যে, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। অন্য দিকে লোকসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

ছিল ৩০ কোটি, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৩৬ কোটিতে এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৪ কোটিতে। জন্মহার বৃদ্ধি, মৃত্যুহার কম এবং পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু এবং পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। পরিকল্পনা-কমিশনগুলি লোকসংখ্যার অনুপাতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতে পারিতেছে না। ফলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যরেখারও পরিবর্তন করিতে হইয়াছে।

এদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর্কের কোন স্থান নাই। তাই তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়া যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যাইতে পারে, যথা শিল্প-প্রসারণ, খাদ্য-সমস্যা ইত্যাদি, সেই সমস্ত বিষয় লইয়া সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত আছেন। এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের কাছে মত-বিরোধের বিষয় না হওয়ায় সরকারও বিরোধ সম্পর্কিত বিষয়-লইয়াই বিরোধী পক্ষগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে খুব মাতিয়া আছেন, ফলে প্রাথমিক শিক্ষাও অবহেলিত হইতেছে। বর্তমান সময়ে কংগ্রেস দল অর্থাৎ ক্ষমতাসীন

রাজনৈতিক দলের উচিত অন্যান্য বিতর্কমূলক বিষয়কে স্থগিত রাখিয়া আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তনের অগ্রাধিকার দেওয়া।

সাংস্কৃতিক বাধা

সাংস্কৃতিক দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন সাংস্কৃতিক দিক হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

উপভাষা

প্রথমতঃ আমাদের দেশে অগণিত ভাষা এবং উপভাষা রহিয়াছে। এমন কতকগুলি উপভাষা আছে, যাহাদের কোন বর্ণলিপি নাই। এই উপভাষাগুলির বিলোপ সাধন করা হইবে, না ইহাদের বর্ণলিপি তৈয়ারী করিয়া উন্নতি-সাধন করা হইবে তাহা নিয়া অনেক আলোচনা ও তর্ক হইয়া গিয়াছে, এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নাই। ফলে ঐ উপভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর হইয়া আছে। ঐ উপভাষা ছাড়া নিকটস্থ অঞ্চলের অন্য ভাষার সাহায্যে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ সব বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাগ্রহণ অসুবিধা

যে সমস্ত অনুমোদিত ভাষা রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। ফলে শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের অনেক দ্বিভাষী অঞ্চল আছে। সেইখানে যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, তাহারা মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে উর্দু ভাষা-ভাষী লোক বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিতেছে। তাহাদের জন্য পৃথকভাবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দিতে যাইয়া কর্তৃপক্ষ অসুবিধা বোধ করেন, পক্ষান্তরে উর্দু যাহাদের মাতৃ-ভাষা তাহারাও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিশেষ সুবিধা লাভ করে না। দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানদেরও শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে হয়। এই অসুবিধার জন্যও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে।

বয়স্ক নিরক্ষর

সাংস্কৃতিক দিক হইতে আর একটি বিষয়ও বিচার্য। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার এক বিরাট অংশ নিরক্ষর। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারী অনুযায়ী সাক্ষরের শতকরা সংখ্যা ছিল ২৩'৭, নিরক্ষরের সংখ্যা ভারতবর্ষে খুবই বেশী। বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে, যদিও বয়স্ক শিক্ষার চেষ্টা ভারতের বিংশ-শতাব্দীর

দ্বিতীয় দশক হইতেই চলিতেছে। শিক্ষাবিদ্‌দের মতে বয়স্ক শিক্ষার হার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি পিতামাতা-অভিভাবক সাক্ষর হয় তাহা হইলে তাঁহারা শিক্ষার জন্য আগ্রহ বোধ করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় যে, যেসব দেশে সাক্ষরের হার শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী, সেই সমস্ত দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব বেশী সমস্যা নয়, কারণ অভিভাবকেরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই আগ্রহ করিয়া শিশু-সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে সে বিষয়ে অসুবিধা আছে। যেখানে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যধিক, সেখানে নিরক্ষর বয়স্কেরা শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না, এবং সন্তানদের বিদ্যালয়েও প্রেরণ করে না। এই দিক হইতেও সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনে অসুবিধা রহিয়াছে।

আর্থিক বাধা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বাধা হইল আর্থিক বাধা। ভারত অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক-করণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনাতে আবশ্যিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ধার্য হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা। কিন্তু তখন ভারত-বর্ষের লোকসংখ্যা এত ছিল না, এবং দ্রব্যমূল্যও কম ছিল।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

বর্তমানে লোকসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পটভূমিকায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে ৮০০ কোটি টাকা। ৮০০ কোটি টাকা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইলে দেখা যাইবে দেশের সমস্ত রাজস্ব ঐ বাবদই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অতএব সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন অর্থের দিক হইতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ডক্টর শ্রীমালীর দাবী

সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা যে প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকার সেই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অতএব ইহার প্রবর্তনের জন্য দৃঢ় পাদক্ষেপ প্রয়োজন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে, এল, শ্রীমালী লোকসভাতে বলেন, যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের

পরিবর্তিত লক্ষ্য-রেখা ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবস্থা করিতে হইলে ৩০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দাবী গৃহীত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীমালীর এই দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে রাজ্যসরকারগুলিও সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অগ্রণী হইয়া আসিবেন, এবং বাজেটে উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক-করণের জন্য যত উৎস আছে, সব উৎসগুলিকেই অর্থের জন্য পরিক্রমা করিয়া দেখিতে হইবে। শিক্ষাকর বসাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভারও বহন করা যাইতে পারে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় সংস্থা কোন কোন স্থানে শিক্ষাকর বসাইতে রাজী হয় না, এবং শিক্ষা-কর বসাইলেও, উহা আদায় করিবার ব্যাপারে তৎপর নয়। কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-কর বসাইতে হইবে এবং যথোপযুক্ত আদায়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে ইহাতে বাধার সৃষ্টি করিলে চলিবে না।

আর একটি বিষয়ে এইখানে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকই অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করিতেছেন। সরকারের খরচে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, শিক্ষকও নিযুক্ত হইল। কিন্তু অভিভাবক ছেলেমেয়েকে সারাদিনের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইতে রাজী হন না। তাহার কারণ ছেলেমেয়েদের গৃহস্থালীর কাজ ও চাষবাসের কাজ বা অন্য কোন শিল্প কাজে অভিভাবকে সাহায্য করিতে হয়। আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ লোকের আয় গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত নয়, অতএব তাহাকে সমগ্র পরিবারের সহযোগিতায় কাজ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। অতএব এমতাবস্থায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে কি করিয়া? যদি দেশের লোকের আয়-ব্যয়ের তুলনায় বেশী হইত। তাহা হইলে সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে জোর করা যাইত।

অভিভাবক ও পিতামাতার দারিদ্র্যজনিত বাধা

ভারতে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের দারিদ্র্য সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃতিক অসুবিধা, সামাজিক অসুবিধা, কৃষ্টি-সম্পর্কিত অসুবিধা, রাজনৈতিক অসুবিধা,

দরিদ্র অভিভাবক

সকলই বাধা সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে অভিভাবকের দারিদ্র্য। সামাজিক অসুবিধা শীর্ষে ও অর্থনৈতিক অসুবিধা শীর্ষে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন একথা সবই সত্য, কিন্তু পড়িবে কাহারা? অভিভাবকগণ অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। ৬।৭ বৎসরের ছেলেমেয়েরা গৃহকাজ এবং জীবিকা অর্জনের কাজে অভিভাবকগণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় অভিভাবকগণ কি ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন? অভিভাবকেরা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন দুইটি সর্তে। প্রথমতঃ যদি সরকার অভিভাবকগণকে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত অর্থের অনুরূপ সাহায্য দান করেন। ইহা কখনও সম্ভব নয়। প্রথমতঃ এই সাহায্য দান কতটা হইবে তাহা স্থির করা হইবে কি করিয়া? আর সরকার যেখানে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনই আর্থিক অসুবিধার জন্য করিতে পারিতেছেন না, সেইখানে অভিভাবকগণকে সাহায্য দান করিবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাইবেন কোথা হইতে? আর একটি সর্তে অভিভাবকগণ ছাত্রছাত্রীগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। এই সর্তটি হইল যদি ছাত্রছাত্রীর যথাযথরূপে পরিবারকে সাহায্য করিয়াও বিদ্যালয়ে পাঠ অনুসরণ করিতে পারে। তাহা কি ভাবে হইতে পারে?

৬।৭ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের জীবিকা-অর্জনে সাহায্য

একমাত্র আংশিক সময়ের (পার্ট টাইম) শিক্ষার প্রবর্তন করা হইলেই অভিভাবকগণের আর ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আপত্তি থাকিবে না। প্রতিদিন সকালে ৭—৩০ মিনিট হইতে ১০—৩০ মিনিট ও বিকালে ২—৩০ মিনিট হইতে ৫—৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা যে কোন বেলায় নিজেদের কাজকর্মের সুবিধা-অসুবিধা দেখিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। অনেকে করেন, ৩ ঘণ্টা কাল শিক্ষা উপযুক্ত নয়। কিন্তু যদি পাঠ্যক্রম ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আংশিক সময়ে শিক্ষা দানের জন্য ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে হয়ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও হইবে এবং তাহারা নিয়মিত ভাবে অভিভাবককে উপার্জন করিয়া সাহায্যও করিতে পারিবে। বলা

পার্ট টাইম শিক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের উপার্জন ও শিক্ষা গ্রহণ

বাহুল্য, নিয়মিত ভাবে গৃহকর্মেও তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া যাহারা আংশিক সময়ে পাঠ গ্রহণ করিবে, তাহারা মাত্র তিন ঘন্টার জন্য শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু একেবারে শিক্ষা গ্রহণ না করার পরিবর্তে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা অনেক ভাল। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখন, পঠন, অঙ্ক শিক্ষার জন্য ৩ ঘণ্টা সময় মোটেই কম নয়। অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষা, যাহা ভারতে শিক্ষার গৃহীত আদর্শ, তাহা অনুসরণ করিতে গেলে ঐ তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে না। কিন্তু যেখানে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন, সেখানে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাগ্রহণ মন্দের ভাল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যেখানে অভিভাবকগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অসুবিধা বোধ করিতেছেন, সেইখানে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী যদি আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মঙ্গল।

আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা অপর একটি দিক হইতে গ্রহণ-যোগ্য। আমাদের দেশে যখন সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে আর্থিক দিক হইতে অসুবিধা আছে, তখন এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলে অর্থের দিক হইতেও সাশ্রয় হইবে। প্রত্যেক শিক্ষককে ছয় ঘণ্টার জন্য সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করিতে হয়। সেই মোট সময়কে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তাহা হইলে কোন অসুবিধা নাই, বরং সুবিধাই আছে। কারণ শিক্ষকগণ এক নাগাড়ে পড়াইতে গিয়া একটু ক্লান্তিবোধ করিয়া থাকেন, দুই বারে পড়াইলে তাঁহারা আর কাজে কোনরূপ অবসাদ বোধ করিবেন না। এদিকে যদি পাঠক্রমকে তিন ঘণ্টার উপযোগী করিয়া সাজান যায়, তাহা হইলে একটি বিদ্যালয়ে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসিয়া সমবেত হইবে। তাহা হইলে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার খরচ হইতে মোট অর্থ বরাদ্দের অর্ধেক টাকা বা তাহার চেয়ে কিছু বেশী। ইহাতে অর্থনৈতিক সমস্যারও কিছুটা নিরসন হইবে। আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদান-রীতি তাহা হইলে বিভিন্ন দিক হইতেই ভাল। কিন্তু গোঁড়া শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন। তাঁহারা মনে

আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার অপর একটি দিক—আর্থিক সুবিধা

করেন যে অন্ততঃ পক্ষে ৫ ঘণ্টা-কালীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষা জীবনের জন্য শিক্ষা ও জীবনের মধ্য দিয়া শিক্ষা, অতএব এত অল্প সময়ে শিক্ষা জীবনে দানা বাঁধিয়া উঠিবে না। একথা স্বীকার করিয়া লইলেও অন্য দিকেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সেইগুলি হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহকার্যে ও অভিভাবকদের জীবিকা অর্জনে অংশ গ্রহণের সমস্যা।

এই ব্যবস্থার বিরোধিতা

আংশিক শিক্ষাদানের সমস্যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, অনেক দেশে ইহা ভাল ভাবেই প্রবর্তিত হইয়াছে। সমাজ ও প্রয়োজন এই দুই দিক হইতেই ইহার প্রচলন দেশের স্বার্থের অনুকূল হইয়াছে। মিশর এবং সিংহল এই দুই দেশেই দিনে দুই বার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। ডেনমার্ক হইতেছে আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশ। সেইখানেও একই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ডেনমার্কে শিশুদের বিদ্যালয়গুলি হইতেছে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদানের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে বৎসরে ৪১ সপ্তাহের কাজ হইয়া থাকে। প্রতি গ্রামীন বিদ্যালয়ে সপ্তাহে প্রতি শ্রেণীতে অন্ততঃ পক্ষে ১৮ ঘণ্টা পড়ানর ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া সপ্তাহে এই ১৮ ঘণ্টা সময়ের কাজ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করে, আবার কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা এক দিন অন্তর এক দিন ৬ ঘণ্টা পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিভিন্ন দেশে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা

আমাদের দেশেও আমরা আংশিক সময়ে শিক্ষাদান রীতির প্রবর্তন করিয়া দেখিতে পারি। কৃষিজীবী এবং শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য সময়ের সুবিধা দেখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা করা যাইতে পারে। তাহাতে যেমন তাহাদের শিক্ষার সুযোগ হইবে, যেমন হইবে অর্থনৈতিক সাশ্রয়।

বিদ্যালয়-গৃহ সমস্যা

আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহসমস্যা অত্যন্ত শোচনীয়। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ের গৃহ নাই। কোন কোন স্থানে আছে মাটির

উপর কয়েকটি খুঁটির উপর দাঁড়াইয়া আছে টিনের, খড়ের বা টালির চাল। ঘরের চারি দিকে কোন বেড়ার ব্যবস্থা নাই, দরজা-জানালাও নাই। অবস্থা খুবই শোচনীয়। কোন কোন বিদ্যালয়-গৃহ থাকিলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়-গৃহে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্থান সঙ্কুলান হইতে চায় না। তাহা ছাড়া কোন কোন স্থানে বিদ্যালয় নামে মাত্র আছে, কোন রকম বিদ্যালয়-গৃহ নাই। বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহ বসিয়া থাকে কাহারও বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বা কাহারও বাড়ীর বৈঠকখানায়। ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বিদ্যালয়-গৃহসমস্যা অতি শোচনীয়।

বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়-গৃহ

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইবে। ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা তখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, তখন এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান মোটেই হইবে না। বর্তমানে ইহা একটি বিরাট সমস্যা। কিন্তু বিদ্যালয়-গৃহের সমস্যার জন্য সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইতে দেওয়াও উচিত নয়। কবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মিত হইবে, কবে সেই বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ আসিয়া মজুদ হইবে, তাহার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন আটকাইয়া থাকিতে পারে না। গৃহসমস্যা বর্তমান অবস্থায় কোন সমস্যাই নয়। বিদ্যালয়ের কাজ মন্দির মসজিদ ধর্মশালা এবং সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থানে চলিতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ইহা নূতন কথা নয়। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে আমাদের এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল,—মন্দির, মসজিদ, ধর্মশালা, বৃক্ষতল ইত্যাদি স্থানেই শিক্ষার কাজ চলিত। আমাদের দেশে যদি মুক্ত-অঙ্গন (open air) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা হইলে বিদ্যালয়-গৃহের স্থান সঙ্কুলানের কোন প্রশ্নই আর উঠে না। শিক্ষা-জগৎ মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অতএব মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয় সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বর্তমানেও আমাদের কোন কোন স্থানে মুক্ত-অঙ্গনে অধ্যাপনা বা শিক্ষকতা করার রীতি আছে। শান্তিনিকেতনে বা ওয়ার্ধায় মুক্ত-অঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা আজও রহিয়াছে। মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় শিক্ষাদানের উপকারিতা হইল এই যে, ছাত্রছাত্রীরা

বিদ্যালয়গৃহ ও বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা

মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু ইহার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হইল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৃষ্টি হইলে আর শিক্ষকতা করা সেখানে চলে না, কিংবা অত্যধিক গরম বাতাস চলিতে থাকিলে সেখানেও শিক্ষার কাজ ব্যাহত হয়। প্রথম অসুবিধা প্রধানতঃ দেখা যায় আসাম, পশ্চিমবাংলা প্রভৃতি স্থানে, এবং দ্বিতীয় অসুবিধা প্রধানতঃ দেখা যায় বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে।

মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ের অসুবিধা

মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রধান অসুবিধা হইল যে বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়া না থাকিলে বেশী ছাত্র একসাথে পড়ান যায় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হইলে উহা মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ করা হইয়া উঠে না, উহার জন্য প্রয়োজন হয় ল্যাবরেটরি। গ্রন্থাগার স্থাপন করা মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ে আরও অসুবিধা। অতএব দেখা যাইতেছে, মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়-গৃহ থাকাও একান্ত আবশ্যক। ঝড়, বৃষ্টি বাদল, প্রখর রৌদ্র এবং গরম বায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্থায়ী বিদ্যালয়-গৃহ যেমন দরকার, তেমনি দরকার বিজ্ঞান-কোণ, মিউজিয়ম, গ্রন্থাগার, স্থায়ী প্রজেক্ট ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য স্থান।

শিক্ষা-সংগঠনগত অসুবিধা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার উন্নতিমূলক কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে ব্যাহত হইয়াছে। সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও যদি পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইবে। এ যাবৎ যাহা হইয়াছে তাহা ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রসারের দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর হইয়াছে। এই বিদ্যালয় বণ্টন ঠিকভাবে হয় নাই। কোন কোন জায়গায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের নামগন্ধও নাই। তাহা ছাড়া যে সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা হয় নাই। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা খুবই কম, যদিও আশে পাশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই বেশী। বিদ্যালয়ে ঐসব ছাত্রছাত্রীদের আনার প্রচেষ্টা একেবারেই হয় নাই। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন কালেও যদি ঐ প্রকার শিথিলতা দেখা

যায়, তাহা হইলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন-প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে আরও একটি অসুবিধা দেখা যাইতেছে বর্তমানে পরিদর্শক-বিদ্যালয় অনুপাত ১:১০০। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দিকে ঐ অনুপাত ১:৫০ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। কিন্তু তাহা যদি না হয় তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহার কারণ পরিদর্শকেরা যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে অপচয় ও স্থিতাবস্থা পূর্বে ছিল তাহাই থাকিয়া যাইবে।

শিক্ষক সমস্যা

সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইলে শিক্ষক নিয়োগের সমস্যার সম্মুখীন আমাদিগকে হইতে হইবে। ইহা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। সরকারী নির্দেশমতে দেখা যায় যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ২৮ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কার্যে নিযুক্ত আছেন।

কিছুকাল পূর্বে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদিগকে চাকুরী দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। ঐ পরিকল্পনায় ৮০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৮ হাজার সমাজ-কর্মী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিযুক্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন ঐ বেকার যুবক-যুবতী-দিগকে পুনরায় সাহায্য দান করিবার উদ্দেশ্যে পরে আরও ৪০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য যত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করার প্রয়োজন, তত সংখ্যক শিক্ষক মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, তখন সমগ্র ভারতে ৭ লক্ষ বেকার ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনেল পরীক্ষায় পাশ যুবক-যুবতী আছেন। তাহাদের সকলকেই যদি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কার্যে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কিছু সুবিধা হইবে। কিন্তু পুরোপুরি ৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাই যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলেও শিক্ষক-সমস্যার সমাধান হইবে না। অতএব

অন্য দিকেও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। আমরা প্রথমেই শিক্ষকের গুণগত পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি করিব না। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই গ্রামে কাজ করিবেন। তাঁহাদের গুণগত পারদর্শিতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিলে গ্রামদেশে যাইয়া কাজ করিবার মত লোক পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? সাধারণ শিক্ষিত লোকও আজ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য, উচ্চ-শিক্ষিত লোক গ্রামে থাকিয়া কাজ করিবার জন্য বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিবে না। অতএব শিক্ষক-শিক্ষিকা মনোয়ন করিবার সময় গুণগত পারদর্শিতার উপর যেমন গুরুত্ব দিতে হইবে, তেমনই গুরুত্ব দিতে হইবে যে শিক্ষক-শিক্ষিকাপদের প্রার্থীরা যেন পরিশ্রমী হয়, এবং সেবামূলক কর্মে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া যে অঞ্চলে শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, সেই অঞ্চল হইতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করিলেই ভাল হয়। নিম্নতম সাধারণ গুণগত পারদর্শিতাসহ উৎসাহী আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষিকাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত। কারণ তাঁহারা নিজ নিজ অঞ্চলেই থাকিবেন। খুব বিশেষ প্রলোভন না পাইলে তাঁহারা দূরে যাইতে চাহিবেন না। পক্ষান্তরে দূর দেশের বেশী শিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে নিয়া যাইবার অসুবিধা হইতেছে এই যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐ সমস্ত অঞ্চলের সাথে নাড়ীর যোগ নাই এবং সুযোগ বুঝিলেই তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। ইহা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা সমস্যার আর একটি দিকে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা পাইতেছি না। তবে কি ইহার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে? না, তাহা হইবে না। উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের অন্য পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গতি কিছুতেই রুদ্ধ করা হইবে না। আমরা আংশিক সময়ের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা আলোচনা করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে অবলম্বন করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতি

শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য ছাত্রছাত্রীর অনুপাত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তাহাতেও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম হইবে। ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৩৩ জন শিশুকে পড়াইতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যদি আরও বেশী সংখ্যক শিশুকে পড়াইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে খুব যে বেশী অসুবিধা হইবে তাহা মনে হয় না। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৬০ জন শিশুকে পাঠদান করিতে হইত, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৮০ জন শিশুকে পড়াইতে হইত, ইটালীতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতি শিশুসংখ্যা ছিল ৮০ জন। অতএব দেখা যাইতেছে পশ্চিমী দেশগুলিতেও আমাদের ভারতের অনুপাত হইতে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত বেশী ছিল। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা যে দেশেই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই দেশেই শিক্ষক-শিক্ষিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, কাজেই কম শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়া বেশী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে যে ছাত্রছাত্রীদের খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছ, এমন মনে হয় না। পরবর্তী কালেও যে পশ্চিমী দেশগুলিতে শিক্ষক-শিশু অনুপাতের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা মনে হয় না। এমত অবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যদি ৩৩ বৃদ্ধি করিয়া ৫০এ আনা যায় তাহা হইলে কোন ক্ষতিই নাই। ইহাতে সুবিধা হইবে যে সমগ্র সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হইবে না। পরবর্তী কালে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া গেলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কমান যাইতে পারিবে।

যে ব্যবস্থার কথা এইখানে উল্লেখ করা গেল, সেই ব্যবস্থা শহরাঞ্চলেই বেশী প্রয়োজন। শহরাঞ্চলেই বিদ্যালয়ে শিশু-সংখ্যা বেশী এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে শাখাও আছে। অতএব শাখার শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রতি শাখাতে যেন ৫০ জনের মত শিশু থাকে।
যত
মোটেই পা ত ৫০ জন শিক্ষার্থীকে লইয়া যে বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে, সেখানে
তখন সমগ্র ভা ক্ষিকার সংখ্যা এক। শিশুসংখ্যা ৮৫ হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকার
পাশ যুবক-যুবতী ? কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয়ই একজন শিক্ষকের বিদ্যালয়।
শিক্ষার কার্যে নিয়ো অনুপাত বৃদ্ধি করিলে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন কম
প্রবর্তনের কিছু সুবি শিক্ষিকার অভাবের দরুণ প্রাথমিক শিক্ষা রুদ্ধ হইয়া
যদি পাওয়া যায়, তাহা তাহা আর থাকিবে না।

একজন শিক্ষকের বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রূপ বিদ্যালয় না থাকার কথা সুপারিশ করিলেও দেখা যায় ঐ জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই বেশী। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কি ভাবে হইবে তাহার পরিচয় আমরা পরে দিব। কিন্তু প্রতিটি পঞ্চম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে ২জন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা আবশ্যক। তাহাতে এক জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ২।৩টি শ্রেণীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়। এক শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষককেই সাংগঠনিক কাজ-সহ পাঁচটি শ্রেণীতে পড়াইতে হয়।

এইখানে একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বেশীর ভাগ শিক্ষণ-বিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিয়াই আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাজ পরিচালনা করিতে হইবে, যদি আমাদের পরিকল্পনা মত আমরা কাজে অগ্রসর হই, অর্থাৎ বেকার ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পাশ ৭ লক্ষ মেয়ে-পুরুষকে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার কাজে গ্রহণ করি কিংবা যদি স্থানীয় উৎসাহী, উদ্যোগী এবং উপযুক্ত গুণগত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে এমন মেয়ে-পুরুষ আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করি। শিক্ষকতা করা একটি কলা, অতএব শিক্ষণ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ না করিলে শিক্ষাদান-কার্য সাফল্যমণ্ডিত হয় না। তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষাকার্যে লিপ্ত সমস্ত শিক্ষকেই আমাদের শিক্ষণ দান করিতে হয়। কিন্তু তাহা এক অসম্ভব কাজ। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন, কিন্তু ঐ সংখ্যার মধ্যে ১৯৫৬—৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪৪২,১৪৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ২৬৭,৯৯২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। বর্তমানের সংখ্যার মধ্যেই বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা যেখানে শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন, সেই খানে নূতন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কিরূপে শিক্ষণ লাভে সুযোগ পাইবেন? কিন্তু কত দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষণ লাভ করিবেন, তাহার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। তাহা হইলে উপায় কি? শিক্ষকগণ শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত হইবার পর কর্মে থাকাকালীন স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষণ (In Service Traninig) গ্রহণ করিতে পারেন। যেখানে নন-ম্যাট্রিকদের জন্য ২ বৎসরের ট্রেনিং দিবার সুপারিশ আছে, সেখানে কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্বল্প সময়ের জন্য In Service Training দিলে কি কাজ চলিবে? কাজ সাময়িকভাবে চলিবে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে

পুনরায় পুরোপুরি ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাও খুবই সময়-সাপেক্ষ। পরের তালিকা দেখিলেই শিক্ষক-শিক্ষণের অবস্থাটি পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯৪৯—১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য)

শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান		১৯৪৯-৫০	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৮-৬০
ট্রেনিং স্কুল অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বলিত।		৭২০	৮৬০	৯৭৪
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	পুরুষ	৫০,০৬৬	৫৬,২৮৮	৬৪,৭০৮
	মেয়ে	১৬,৯৮০	২৭,৭৫৮	২৪,৬৭১

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে প্রতি বৎসর প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতেছেন, অবশ্য ইহার মধ্যে নার্সারি শিক্ষণ-বিভাগের ছাত্রীরাও আছে। যে হারে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ গ্রহণ চলিতেছে, সেই হারে যদি শিক্ষণের হার বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে প্রায় পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষণ দান করা সম্ভব হইবে।

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্যা

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে প্রবর্তিত হইবে বলিয়া নূতন সময়রেখা স্থির হইয়াছে। ঐ সময় প্রায় সমাগত। এই অবস্থায় আমাদিগকে কি করিতে হইবে তাহা আমাদের আশু চিন্তা করা কর্তব্য।

প্রথম অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদা জানিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যে কোন কোন স্থানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা পূর্বেই প্রবর্তন হইয়াছে এবং বাদ-বাকী কোন কোন জায়গায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে তাহা বাহির করিতে হইবে।

নির্দিষ্ট কোন কোন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, সেই রাজ্যের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে অসুবিধা কি, কত ছাত্রছাত্রী আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসিবে, তাহা হিসাব করিয়া বাহির করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি কি কি প্রয়োজন তাহাও বাহির করিতে হইবে এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে সর্বোপরি কত টাকা খরচ হইবে তাহাও হিসাব করিয়া বাহির করিতে হইবে। এইরূপ হিসাব-নিকাশ করিলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজও সহজ হইয়া আসিবে। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ও হিসাব-নিকাশের কাজ কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকারগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সকল প্রকার হিসাব দাখিল করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রীয় ব্যয়-বরাদ্দের কথা জানাইয়া দিয়াছেন এবং রাজ্যসরকারগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সারা ভারতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে। সারা ভারত এই মহৎ কার্যে উদ্যোগী হইয়াছে, এই কথা জন-সাধারণের কাছে অভিযান রূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই সারা ভারতের লোক এই মহৎ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া আসিবে। ইংলণ্ড, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রথম অবস্থায় ছাত্রভর্তি এবং পরে কিছু দিনের মধ্যে সমগ্র ছাত্রছাত্রীর সমাজের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনিবার হিসাব হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা ঐ সব দেশে আবশ্যিক করণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার-কার্য চলে। আমাদের দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডক্টর বেণীপ্রসাদ বলেন যে, শিক্ষা-ব্যবস্থা তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন উহা খুব তাড়াতাড়ি সার্বজনীনতার দিকে লইয়া যাওয়া হয়। খুব ধীরে ধীরে উহার প্রক্রিয়া চলিলে শিক্ষা-বিস্তার ভাল ভাবে হইবে না।

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য চাই বহু কাল পূর্বের (অর্থাৎ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বের) প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইনসমূহ পরিবর্তন করা। তখনকার দিনের আইন বর্তমান যুগোপযোগী নয়। ঐ আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে

যে সমস্ত অসুবিধা দেখা গিয়াছে সেই সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইনের সেই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য সমস্ত রাজ্যগুলির শিক্ষা-বিভাগের সাথে আলোচনা করিবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইনগুলি এক ধাচে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনকালে মানবিকতা-সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত করার ব্যাপারে যে সব কর্মচারী (Attendance officer) নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ভাবধারা আনিবেন। এই কর্মচারীবৃন্দের কাজ হইল ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। যে সব অভিভাবক সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন না, তাহাদিগকে শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করাইয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ে আনিতে হইবে। অন্যান্য দেশে এই শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দকে পুলিশী কর্তব্য করিতে হয়, এবং তাঁহারাও বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক অভিভাবকদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিতে কিংবা জরিমানা আদায় করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু আমাদের দেশে এই জাতীয় কর্মচারীবৃন্দ হইবেন সমাজসেবী; তাঁহারা পুলিশী মনোভাব প্রদর্শন না করিয়া অভিভাবকের সাথে সমবেদনা-মূলক ও সহযোগিতামূলক ব্যবহার করিয়া শিক্ষার সাহায্য করিবেন।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দের কাজও প্রণিধান-যোগ্য। কোনও স্থানের শিক্ষামূলক নূতন প্রচেষ্টার মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের কর্মপ্রণালীর ধারার মধ্যে ঐ নূতন প্রচেষ্টার সাফল্য যুক্ত রহিয়াছে। যদি শিক্ষাসম্পর্কিত কর্মপ্রণালী কোন স্থানে অনুসৃত হইতে হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের ধনী, নির্ধন ও সাধারণ লোকের সহযোগিতা পাওয়া প্রয়োজন। এই কারণে প্রশাসনিক কর্মচারিগণ সকল শ্রেণীর লোককে নূতন কর্মপ্রণালীর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা জানাইয়া দিবেন। ফলে সকলেই আগ্রহের সঙ্গে সরকারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-বিভাগের প্রশাসনিক কর্মচারীর কর্মপন্থার উপরই পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্য নির্ভর করিতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, অনেক স্থানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের দাম্ভিক মনোভাব শিক্ষা-বিস্তারের কাজে বাধা সৃষ্টি

করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ মনোভাব দেখা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের গৃহীত শিক্ষাদর্শ হইলেও প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী বুনিয়াদী শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না। তাঁহাদের এই মনোবৃত্তি জনসাধারণের উপরও প্রতিফলিত হয়, ফলে শিক্ষা-বিস্তারও ব্যাহত হয়। এই কারণেই প্রয়োজন শিক্ষা-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের উদার ও যথার্থ মনোভাব।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন শুধু সরকারের কাজ নয়, ইহা জনসাধাণেরও কাজ। জনসাধারণও এই কাজে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। স্থানীয় সহযোগিতা না পাইলে শিক্ষার বিস্তার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিবিড়তম সম্পর্ক বিদ্যমান। বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করে, পক্ষান্তরে সমাজও বিদ্যালয়কে শিক্ষা বিকীরণে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। এই দ্বিমুখী সহযোগিতা ব্রিটিশ শাসন আমলে খুব বেশী দেখা না গেলেও বর্তমান কালে ভারতের স্বাধীনোত্তর যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। দেশ আমাদের, দেশের উন্নতি আমাদের উন্নতি, এতএব এইরূপ সহযোগিতাবোধ বৃদ্ধি পাইয়া দেশকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। একটি সরকারী বিবৃতি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, দেশের অনেক অংশে সাধারণ মানুষ গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি, অর্থ, শারীরিক শ্রম ইত্যাদি অকুণ্ঠচিত্তে দান করিয়াছে। একটি জেলাতে স্থানীয় লোকেরা ৬০০টি বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া এমন সব অঞ্চলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, যে সমস্ত স্থানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে একটি বিদ্যালয়ও ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আদিবাসী অঞ্চলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে একটি বিদ্যালয়ও ছিল না। কিন্তু ঐ অঞ্চলের লোকদের আগ্রহে এবং স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্যে সরকার সেই অঞ্চলে ১৯০০ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

একথা বলা যায় যে, যে সমাজ সত্যিকারের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, সেই সমাজ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ করে না। শিক্ষার ফলে সমাজেরই সকল লোক উপকৃত হইবে, এই আদর্শ যদি সমাজের লোকের সম্মুখে থাকে, তবে সমাজ শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্ব রকমে চেষ্টিত হইবে। সমাজের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ

করিবার এক শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সমগ্র সমাজকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা। বিদ্যালয়ে সন্ধ্যার সময়ে যদি বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ঐ গ্রাম্য-সমাজ শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে। তাহার কারণ ভারতের গ্রামগুলিতে বহু সংখ্যক বয়স্কদের নিরক্ষরতার সমস্যা রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রাক্কালে গ্রাম্য-সমাজকে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করিয়া তাহা হইতে খুবই ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম্য-সমাজ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের গ্রাম্য-সমাজকে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতে পারিলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সমস্যা

সহরাঞ্চলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে বিশেষ অসুবিধা নাই। সহরাঞ্চলে বিদ্যালয়-গৃহ পাইতে কষ্ট পাইতে হয় না, শিশুদের সংখ্যা কত হইবে তাহা অনুমান করিয়া সহরাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব নাই, কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহরাঞ্চলে থাকিতে পছন্দও করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষও শিক্ষার উপযুক্ত মূল্য দিয়া থাকে, অতএব সহরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দিক হইতে কোনও রূপ অসুবিধা নাই। এইখানে বিশেষ প্রয়োজন হইল attendance officer বা যাহারা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করেন এইরূপ কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং সহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচী প্রণয়ন করা।

পক্ষান্তরে শিল্পাঞ্চলেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের চাপ দিতে হইবে। দেশীয় আইন অনুসারে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সন্তানদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া আছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংলগ্ন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকিবে, গ্রন্থাগার, পাঠ্যপুস্তক এবং সাধারণ শিল্পোপকরণাদি থাকিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাসগৃহসমূহেও সর্বনিম্ন মানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকিবে।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক সমস্যাপূর্ণ ব্যাপার। ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ইহা একটি

নৈরাশ্যজনক চিত্র। ভারতের প্রায় শতকরা ৬৫টি গ্রামের লোকসংখ্যা ৫০০ এর নীচে। যে গ্রামে ৫০০ জনের নীচে লোক বাস করে, সেইখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার যৌক্তিকতা কি? অথচ সকল শিশুকেই শিক্ষার সুবিধা সরকারকে দিতে হইবে। অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে খুব ভালভাবে জরিপ করিয়া দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এই-জাতীয় স্বল্প-লোকসংখ্যক গ্রামগুলির দূরত্ব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত গ্রামগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। স্থানীয় প্রয়োজন এবং আশেপাশের গ্রামের দূরত্ব বিবেচনা করিয়াই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

গ্রাম্য অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ গ্রামের অধিবাসীদের আনুকূল্যে বিদ্যালয়ের জন্য জমি পাওয়া গেলেও, জমিতে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার এক সমস্যা দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পৌনঃপৌনিক খরচ চালানই মুশ্‌কিল, বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য এক থোকে টাকার সংস্থান করা স্থানীয় সংস্থার পক্ষে অসুবিধাজনক। তাহার পর শিক্ষোপকরণের অসুবিধা। গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা খুবই সামান্য হইতে পারে। তাহার দ্বারা শিক্ষা-পরিচালনা করা কষ্টকর। অন্য দিকে দরিদ্র অভি-ভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চান না তাহাদের অর্থ নৈতিক অসুবিধার জন্য। তাহাদের সন্তানগণ পিতামাতা ও অভিভাবককে অর্থ-উপার্জনে সাহায্য করিয়া থাকে, এই জন্য অভিভাবকগণ তাহাদের সন্তানগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইতে দিতে চান না। কিন্তু অভিভাবকদের এই সহানুভূতির অভাবকে প্রকৃত সহানুভূতিতে পরিণত করা যায় যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আংশিক সময়ের (part-time) শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, আর তাহাদের শিক্ষাক্রমকে জীবনানুগ করা যায়। পক্ষান্তরে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার হইলেও অভিভাবকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আর বৈরিভাব থাকিবে না।

অভিভাবকদের মন হইতে যদি এইরূপে বৈরিভাব দূর হয়, তাহা হইলে অভিভাবকগণই অগ্রণী হইয়া আসিয়া বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া

দিবে। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম সংগঠনের সহায়ক শক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ পৈত্রিক কাজ করিতেই প্রেরণা দান করে না, উহা ছাত্রছাত্রীদিগকে সুনাগরিক তৈয়ারী করিতে প্রয়াস পায়। গ্রাম সংগঠনের কাজের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সংযুক্ত করিতে হইলে সমগ্র গ্রাম্য সমাজকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধু ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক উন্নতির দিকেই লক্ষ্য রাখিবে না, ইহা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে যেখানে নূতন জীবন-প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। শ্রী সায়েদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবনের শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, যদি শিক্ষা-ব্যবস্থা বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাজকে কখনও আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। অতএব গ্রাম্য-বিদ্যালয় সংগঠন করিবার প্রাক্কালে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ এমন ভাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করিবেন যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা ও তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ বিদ্যালয় হইতে প্রকৃত শিক্ষার মালমশলা সংগ্রহ করিতে পারে।

গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী ও অদিবাসীদের স্থানীয় সংস্থাগুলির অর্থ-সম্পদ অল্প। এই কারণে উহাদের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা যুক্ত করা উচিত নয়। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ আছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্যসরকারেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যদি ইহা সত্বেও স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে রাজ্যসরকারকে প্রাথমিক শিক্ষাবাবদ নানাভাবে সংগৃহীত অর্থ স্থানীয় সংস্থাকে অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর হইবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে একটি অন্তরায় হইতেছে ভারতের সামাজিক অবস্থা। ভারতে দারিদ্র্য অত্যধিক। অভিভাবকগণ দারিদ্র্যজনিত অসুবিধার জন্য তাহাদের সন্তানগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চান না, তাহার কারণ সন্তানগণ অভিভাবকদিগকে

সংসার পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। সরকার যদি অভিভাবকদের অসুবিধা না করিয়া তাহাদের সন্তানদের জন্য আংশিক সময়ের (part-time) জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অভিভাবকগণ দরিদ্র হইয়াও তাহাদের সন্তানদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অন্যথা করিবে না। অভিভাবকগণকে বুঝাইতে হইবে যে, শিক্ষার কালে তাহাদের সন্তানদের অবস্থার উন্নতি হইবে। ইহা অভিভাবকদের পক্ষে কম আকর্ষণ নয়।

পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজে অসংখ্য সম্প্রদায় থাকার দরুণ ভারতীয় সমাজ বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে, চারি দিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বিশেষভাবে অসুবিধাজনক। এইরূপ অবস্থা থাকিয়া গেলে দেশের সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হইবে না। এই কথা যদি প্রাথমিক শিক্ষার দেশব্যাপী অভিযানে পরিষ্কাররূপে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দলাদলি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হইবে। সামাজিক বিভেদ দূরীকরণের জন্য আইন প্রণয়নও করা যাইতে পারে। সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন কালে শিক্ষা সম্পর্কে প্রচার অতীব বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে, তাহা হইলে সাক্ষর বয়স্কগণ প্রাথমিক শিক্ষার সুফল বুঝিতে পারিয়া সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

আর এক ধরণের অসুবিধা আছে, তাহা হইল প্রাকৃতিক অসুবিধা। প্রাকৃতিক অসুবিধা সহজে দূর করা যায় না। কিন্তু অরণ্যাঞ্চলের সন্নিহিত বসতিগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে অসুবিধা আছে, তাহা দূর করা যাইতে পারে। ছাত্রছাত্রী কম হইলেও এক মাইল দূরবর্তী স্থানসমূহে যদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐসব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হইবে না। যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন এই সম্পর্কে হইবে, তাহা কোনও প্রকারে যোগার করিতেই হইবে। শিক্ষার ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরণের করিতে হইবে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তি বা ধর্মীয় ভিত্তিতে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ই স্থাপিত হইতে পারিবে না। আমাদের ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, অতএব ঐ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করার পক্ষে ভারত বিরোধী। আমাদের দেশের সমস্ত লোকই নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধের প্রশ্রয় দিবে না এবং তাহাদের মধ্যে আচার-আচরণে কোনও রূপ বৈপরীত্য থাকিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহারা সকলেই একত্র হইয়া বৃহত্তর স্বার্থের জন্য উদ্যোগী হইবেন। এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদেরও পৃথক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা যদি এমন বেশী থাকে যে একটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে এবং ছাত্রদের সংখ্যার দিক হইতে একটি পৃথক বিদ্যালয় চলিতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন চলিতে পারে। অন্য কোন কারণেই মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা চলিবে না।

এক-শিক্ষক-বিদ্যালয়ের সমস্যা

ভারতে এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা খুব বেশী। ভারতের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় এক-শিক্ষকযুক্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতে প্রায় ৭০ হাজার এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ঐ সংখ্যক এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। ইহার কারণ প্রথমতঃ আমাদের ভারতে প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রামে লোকসংখ্যা ৫০০ এর নীচে। যদিও এই সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন লোকসংখ্যার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা হইলেও এতগুলি গ্রাম বিদ্যালয়হীন থাকিয়া যাইবে তাহাও উচিত নয়। এক মাইল দূরত্বের মধ্যে দুইটি গ্রামের মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অনেক সময় হয় না, কারণ গ্রামগুলির মধ্যে দূরত্ব অনেক স্থলে বেশী। এই জন্য ছোট ছোট বিভিন্ন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা এতই কম যে সেইখানে এক জনের বেশী শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে এই যে, শহরাঞ্চল হইতে দূরবর্তী গ্রামসমূহে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না, তাহার ফলেও অনেক বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবিহীন বা এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয় থাকিয়া যায়।

এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়কে যেহেতু একেবারে পাল্টান যাইবে না, সেই হেতু এই বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ দান ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষার্থীরা যাহাতে কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই সমস্ত এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়কে নানাভাবে উন্নীত করিতে হইবে।

এই সমস্ত এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে যাঁহারা কাজ করিবেন তাঁহাদিগের সেবামূলক মনোভাব, নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা, উদ্ভাবনশীলতা, সমাজের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব, বুদ্ধিগত প্রেরণা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অধিকারী হইতে হইবে। তিনি প্রয়োজন বোধে বিদ্যালয়-পরিদর্শকের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করিবেন। তাঁহাকে এক সাথে পাঁচটি শ্রেণীতে পাঠ দান করিতে হইবে। কি ভাবে তিনি শ্রেণীগুলিকে একত্র করিবেন এবং কি ভাবে তিনি এক শ্রেণীতে কাজ দিয়া, অপর শ্রেণীকে লিখিতে দিয়া, অন্য শ্রেণীতে অঙ্ক কষিতে দিয়া, এক শ্রেণীতে পড়িতে বলিয়া এবং অপর শ্রেণীতে পাঠ দান করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ সুসম্পন্ন করিবেন তাহা তিনি জানিয়া লইবেন। যদি শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষণপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে একা বিদ্যালয় পরিচালনার কৌশল কিছুটা আয়ত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আর তিনি যদি উহা শিক্ষণপ্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে In service training অর্থাৎ চাকুরী করিতে করিতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বা আলোচনাচক্রে যোগদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে একযোগে কি ভাবে শিক্ষা দান করিতে হয় জানিয়া লইবেন। কাজটি অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এইরূপ এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থানে খুব কম নয়। জনবিরল অঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবেন সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে বাধা বহু। এই বাধাগুলির অপসারণ করিবার যেমন প্রয়োগ পদ্ধতিতে হইবে, তেমনই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে

নানারূপ গবেষণাও করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা-দপ্তর এবং বিভিন্ন উচ্চ স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সুষ্ঠু কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে। এইগুলি সম্পর্কে গবেষণা করিতে যাইয়া অন্যান্য সমস্যার উদ্ভব হইবে, তখন সেগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলিতে পারিবে।

বর্তমানে এই বিষয়গুলির উপর গবেষণা চলিতে পারে—সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্যা, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদির পাঠ্যক্রমে পরিবর্তিত করিবার সমস্যা, বহু শ্রেণীতে এক সময়ে পাঠদান সমস্যা, অপচয় ও স্থিতাবস্থার সমস্যা, আংশিক সময়ের জন্য পাঠদান সমস্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সময় নিরূপণের সমস্যা, নিরক্ষর বয়স্ক এবং তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি মনোভাব সমস্যা ইত্যাদি।

এই সমস্যাগুলির উপর গবেষণা চলিলে এমন সব সুফল পাওয়া যাইতে পারে, যাহা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিবে।

অন্যান্য অসুবিধা

অন্যান্য অসুবিধা বলিতে কোথাও শিক্ষকের অসুবিধা, কোথাও গৃহ-সংক্রান্ত অসুবিধা, কোথাও জনসংযোগজনিত অসুবিধা প্রধান বাধা রূপে দেখা দিতেছে। এই জন্য কোন্ অসুবিধাটির সর্বাপেক্ষা আগে সমাধান হওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান গ্রহণ ব্যবস্থার প্রবর্তন। ঐ সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে স্থানীয় অসুবিধাগুলি নির্ণয় করিতে হইবে ও উহার সুষ্ঠু সমাধান বাহির করিতে হইবে। ঐ অসুবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইবে জনসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি অনুরুক্তির সৃষ্টি। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই হীন যে তাহাদের শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে তাহাদিগকে অনেক দুঃখকষ্ট বরণ করিতেই হইবে। যদি প্রাথমিক শিক্ষার জরুরী প্রয়োজন তাহারা বুঝিতে পারেন, তবেই তাহারা ইহা করিতে পারেন, নতুবা নহে। এই জন্য এই শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে

তাহাদিগকে সচেতন করিয়া দিতে হইবে। এই জন্য স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ-সাধন প্রয়োজন হইবে। শুধু বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব হইবে না—কারণ কোনও আইনই প্রকৃত অনিচ্ছুক অভিভাবককে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবে না। অপর পক্ষে যে সব অভিভাবক অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তি করিতে সক্ষম হইতেছে না, তাহাদের ঐ সব অক্ষমতার কারণগুলি যতটা সম্ভব দূর করিতে হইবে। এই জন্য বিদ্যালয়ে দরিদ্র শিশুদের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা, তাহাদের জন্য জামা কাপড়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষক-সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইবে গ্রামাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ের গৃহ ও শিক্ষোপকরণ নাই বলিলেই চলে। তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক-সংখ্যাও কম থাকে, কারণ গ্রামে বাস করার অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। গ্রামের শিক্ষকগণকে কিছু বেশী সুবিধা দিয়া গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও অধিকতর উন্নত ও আকর্ষণীয় করা প্রয়োজন। আমরা ইহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি। বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে আইনটি প্রচলিত আছে তাহা ত্রুটিমুক্ত নহে। ইহার সাহায্যে কোনও অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর। ইহাকে আরো সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা আইনটি শুধু কাগজ-পত্রেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অত্যন্ত পুস্তক-ঘেঁষা ও বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এবং পাঠদান-পদ্ধতিও নিরানন্দকর এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির পক্ষে অনুপযোগী। এই দিক দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক বেশী প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকেই ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃত রূপ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কয় বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তর করণের কাজ যেরূপ শম্বুকগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা হইতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে অদূর ভবিষ্যতে সার্বজনীন করার আশা করা যায় না। এই শ্লথ গতির জন্য যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দায়ী সেইগুলি

অপসৃত হইলে তবেই প্রাথমিক শিক্ষার ঐ অভীষ্ট সংস্কার সম্ভব হইবে—নতুবা নহে। আমরা এখানে ঐ চেষ্টাগুলির আলোচনা করিব।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমালোচনা

প্রথম চেষ্টা হইতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের এই শিক্ষার প্রতি সমালোচনার মনোভাব। গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন। গান্ধীজী কুটির-শিল্প-সমন্বিত ভারতের কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকে উক্ত কুটির-শিল্প-সমন্বিত ভারতের উপযোগী শিক্ষা হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছেন এবং যেহেতু ভারত কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পসৃষ্টির পথে যাইতে চাহে, সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা তাহার পক্ষে গ্রহণীয় নহে, এইরূপ তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ গ্রহণ করা হইয়াছে। শিশু ভবিষ্যতে ঐরূপ শিল্প-কাজের মধ্য দিয়া জীবিকা অর্জন করিবে এই উদ্দেশ্যে নহে। ঐ কাজ তাহাদিগকে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার সুযোগ দিবে এবং এই ভাবে তাহারা বাস্তব কাজ-কর্ম ও জীবন-যাপনের মধ্য দিয়া পূর্ণতর শিক্ষা লাভ করিবে এই উদ্দেশ্যে। শুধু শিল্পকাজই নহে, তাহারা জীবনের প্রয়োজনীয় ও নানা সৃজনশীলতার অভিব্যক্তিমূলক কাজ-কর্ম ও অভিজ্ঞতা সহকারে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের সুযোগ লাভ করিবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার আধুনিকতম ব্যবস্থা এই শিক্ষাকে নিছক কুটির-শিল্পসহায়ক শিক্ষা হিসাবে মনে করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব মনে করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো অনেকেরই দেখি ভ্রান্তি দূর হয় নাই। এইজন্য অধিকতর প্রচারের প্রয়োজন আছে।

অর্থ নৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় ত্রুটী অর্থনৈতিক। যে কোনও নূতন শিক্ষা প্রবর্তন করিতে গেলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উপযুক্ত অর্থ-ই সংকুলান করা যাইতেছে না। তাই অর্থের অভাব-জনিত বাধা হেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিতকরণের কার্য দ্রুত হইতেছে না।

শিক্ষাপোকরণের অভাব

তৃতীয় ত্রুটী উপযুক্ত শিক্ষাপোকরণাদির অভাব। অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষাদানের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকাদি ও শিক্ষা-দানের সহায়ক উপকরণাদির স্বল্পতা রহিয়াছে এবং সেইগুলির

অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা ভালভাবে শিক্ষা লাভ করিতেছে না। এই জন্য জনসাধারণ এই শিক্ষার যথার্থ উৎকর্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে ফুটিয়া দেখিতেছে না ও তাহার জন্য অনুপ্রাণিত হইতেছে না। জন-সমর্থন ব্যতীত নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি রূপায়িত হইতে পারে না। সেই অনেক বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইলেও কাজে পুস্তককেন্দ্রী প্রাথমিক শিক্ষাদি সেখানে প্রচলিত রহিয়াছে।

উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাব

পঞ্চম বাধা উপযুক্ত পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনার অভাব। সুপরিদর্শন ও উপদেশাদির ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণ গুণসম্পন্ন ও মাত্র এক বৎসরের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কোনও নূতন শিক্ষণ-ব্যবস্থাকে রূপ দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু পরিদর্শনের সংখ্যা বিদ্যালয়-সংখ্যার তুলনায় কম এবং তাঁহাদের যোগ্যতাও সংক্ষেপে আশানুরূপ নহে। অনেক সময় বিদ্যালয়-পরিচালকগণও নূতন শিক্ষাকে ঠিকমত বুঝিতে সক্ষম নহেন ও সেই জন্য তাহারা উপযুক্ত ভাবে বিদ্যালয় পরিচালন করিতে সক্ষম হন না। ইহাতে বিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিকমত প্রচলিত হয় না।

ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন

বর্তমানে ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির কাজকর্মকে বুনিয়াদী শিক্ষা অভিমুখী করার জন্য বিশেষ সংযোগকারী অফিসার নিযুক্ত করিতেছেন—ইহাতে কিছুটা সুফল প্রত্যাশা করা যায়।

সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদীকরণ

অপর পক্ষে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কিছু কিছু কর্মকেন্দ্রী অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ও গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া উহাকে বুনিয়াদী শিক্ষা অভিমুখীকরণের প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে সাধারণ প্রলোভন বিদ্যালয়ের আলোচনা-চক্র সংগঠনের মাধ্যমে। ইহাতে সাধারণ বিদ্যালয়ের সহিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পার্থক্য কিছুটা কমিয়া আসিবে, জনসাধারণ এই নূতন শিক্ষার প্রতি অধিকতর অবহিত হইবে ও আকর্ষণ বোধ করিবেন। তাহা হইলে অধিকতর সমর্থন পাওয়া সম্ভব হইবে ও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হইবে।

অপর পক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠদান-পদ্ধতি ও পুস্তকাদির উন্নতি সাধনের জন্য অনেকগুলি গবেষণা-সংস্থা গজিয়া উঠিয়াছে। আশা করা যায়, ক্রমেই পাঠদান-সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি এই ভাবে ধীরে ধীরে দূরীভূত হইবে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষাতেও কিছু কিছু কর্মাশ্রয়ী ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিতেছে। ইহার ফলে প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মাশ্রয়ী ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক চাহিদা ও মূল্যবোধ বাড়িবে আশা করা যায়। ঐরূপ বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণও আরো সহজে বুনিয়াদী শিক্ষার চিন্তাধারা বুঝিতে পরিবে এবং এই জন্য শিক্ষকের শিক্ষণান্তিক মান ক্রমশঃ উন্নত হইবে।

তথাপি বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষায় পরিণত করিতে বেশ কিছু সময় লাগিবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। শুধু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অভীষ্ট পূরণ হইবে না—উহার গুণগত উৎকর্ষতার প্রয়োজন সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে যদি সার্বজনীন ৮ বৎসর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হয় তবে আমাদের এই অভীষ্ট পূরণে আরো ১০।১৫ বৎসর বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকগুলি অপসরণ প্রসঙ্গ।

ভারতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে যে সব অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এই অন্তরায়গুলিকে কি ভাবে অপসারণ করা যায়, তাহাই এই স্থানে বিচার্য। আমরা প্রাথমিক-শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত আছি, এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যৌক্তিকতাও বুঝি। এই অবস্থায় যাত্রাপথে যদি কোন প্রতিবন্ধকও আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রতিবন্ধক আমরা দূর করিবই, এই মনোবৃত্তি লইয়া যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহা হইলে সকল বাধাই ধীরে ধীরে আমাদের পথ হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে অন্তরায়গুলি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের একত্র করিয়া মাত্র কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। সেই মূল অন্তরায়গুলি দূর করা গেলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত হইবে। মূল অন্তরায়গুলি হইল—অর্থ, ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা ও দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক অসুবিধা।

আমরা একে একে এই বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিব। শিক্ষা-বিস্তারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা আমাদের কর্তব্য, অতএব অর্থও আমাদের পাইতে হইবে। শিক্ষাখাতে আমাদের রাজস্ব হইতে প্রচুর টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করিতে হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ৬—১১ বৎসরের জন্য প্রবর্তন করিতে হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের জন্য শিক্ষাখাতে ৪০৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ২০৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য। কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে বাৎসরিক অর্থের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থেরও বেশী ব্যয় হইবে। কিন্তু টাকা কোথায়? টাকা আমাদের চাই-ই। জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ এই অবস্থার প্রথমতঃ সংশোধন করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় রাজস্বের মোটে শতকরা ১ ভাগ অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু খের কমিটির সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির সমর্থন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব হইতে শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবেন শতকরা ১০ টাকা। অপর পক্ষে রাজ্য সরকার রাজস্ব হইতে খরচ করিবে শতকরা ২০ ভাগ টাকা। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য-সরকার রাজস্বের শতকরা ১৫ ভাগের বেশী টাকা খরচ করিতেছেন না। অতএব যত অর্থ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার খাতে আসা উচিত, তাহা সবই উপযুক্ত ভাবে ব্যয়-বরাদ্দ হইতে হইবে। রাজ্যসরকারের শিক্ষা খাতে যে অর্থ ব্যয় করিবার কথা, সেই অর্থ শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যয় হয় না, ব্যয় হয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক, প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ইত্যাদির জন্য। সমস্ত রাজস্বের যদি তিন-চতুর্থাংশ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় না হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে, এই কথা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা করিতে হইবে। অর্থের এই দুইটি মূল উৎস ব্যতীত স্থানীয় সংস্থাসমূহ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কি হারে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাও এতদিন স্থির করা হয় নাই। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ব্যয় পরিকল্পনা করিতে হইবে।

অন্য দিকে স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা কি তাহা সাধকভাবে স্থির করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি

(১৯৪৭—১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও কেন্দ্রীয় সরকার নূতন উদ্দীপনা লইয়া পরিকল্পিত উপায়ে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয় ১৯৪৫—৪৬ খৃষ্টাব্দে, যখন কংগ্রেস পুনরায় প্রদেশসমূহে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আগমন করেন।

গান্ধীজী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বলিলেন, "I have been thinking hard during the detention over the possibilities of Nai Talim until my mind became restive·········we must participate in the homes of the children; We must educate their parents. Basic education must become literally education for life."

বুনিয়াদী শিক্ষা-জীবনের জন্য শিক্ষা গান্ধীজীর এই কথাটি বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ে একটি নূতন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ে সমগ্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণের জন্য সেবাগ্রামে এক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরগুলি নির্ধারিত হয়।

ইহার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গান্ধীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মিগণ পুনরায় মিলিত হইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ করেন।

গান্ধীজীর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা সকলকে বিচলিত করিয়াছিল।

বিক্রমে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন

বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকর্তারা মনে করেন যে শিক্ষাক্ষেত্রেও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ভাবাবেগ দ্বারা বিক্রমের সভা প্রভাবান্বিত হয়। সভার সভ্যগণ প্রথম যে সুপারিশটি করেন তাহা গান্ধীজীর কথারই পুনরাবৃত্তি।

প্রথম সিদ্ধান্ত হইল—শিক্ষার পরিমণ্ডলে সত্য ও অহিংসা সঞ্চারিত করিয়া তাহার মধ্যে শিশুকে লালন করা। অবশ্য গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-চিন্তার পশ্চাতে যে দার্শনিকতা ছিল তাহাতে মূলকথা—সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠন।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইল—শিক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমাজ পরিবেশকে শিক্ষার অনুবন্ধরূপে ব্যবহার। ইহা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি প্রথম সিদ্ধান্তেরই মত "To teach the true tone of country and human sympathy and to eliminate communal prejudice." বলা বাহুল্য যে, গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত মূল চিন্তাধারায় যে সমাজচিত্র কল্পিত হইয়াছিল তাহা প্রকৃতই প্রেম, মৈত্রী, সাম্য ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বিক্রমে মিলিত বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীরা এই বিষয়ে নূতন কিছু বলেন নাই।

শিক্ষাকর্মীরা **চতুর্থ সিদ্ধান্তে** বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষার কথা গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, তাহাই সুবিন্যাস করিবার সুপারিশ করেন।

এই সব সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের পর স্বভাবতঃ বুনিয়াদী শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। গান্ধীজী নঈ-তালিমে বুনিয়াদী শিক্ষার যে সব বিভিন্ন স্তরের কথা বলিয়াছিলেন, সেই অনুসারে কাজ হইতে থাকে। সে সব স্তর সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
আর্থার ই. মর্গ্যান

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক লইয়া বহু আলোচনা চলিতে থাকে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের **রাধাকৃষ্ণান কমিশন** (বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন) গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা পুনর্গঠনে নূতন ধারার সূত্রপাত করিলেন। এই পরিকল্পনা বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ উচ্চতম পর্যায়ের রূপ সম্বন্ধে আভাস দিল। এই সময়েই সেবাগ্রাম হইতে আর্থার ই. মর্গ্যান গ্রামীন ভারতের উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন। মিঃ মর্গ্যান আমেরিকার টেনেসি ভ্যালিজ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভ্য ছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে **জাতীয় শিক্ষা** (Basic National Education) হিসাবে গ্রহণ করায় উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ইহার কাঠামো তৈয়ারী করিবার

প্রয়োজন দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে ও আর্থার মর্গ্যানের পুস্তিকা এ ব্যাপারে পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করে।

ফলে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো তৈরী করার জন্য একটি সাবকমিটি নিয়োগ করা হয়। 'উত্তর বুনিয়াদী' বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ণের জন্য সেবাগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক কাজ শুরু করা হয়।

ইতিপূর্বে আর্থার মর্গ্যান গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর আর্থার ই. মর্গ্যান বলেন যে, ভারতের লোকেরা শতকরা ৮৫ ভাগ গ্রামে বাস করে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণ যাইয়া সমবেত হয় গ্রাম হইতে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া গ্রামে ফেরৎ পাঠায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য আসে গ্রাম হইতে, কিন্তু এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন সাহায্যই গ্রামে যাইয়া পৌঁছায় না। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশী প্যাটার্নে রচিত এবং এবং স্বদেশভিত্তিক নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাস পরিক্রমা করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার অভ্যাস ও বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে শহরগুলি গ্রামগুলিকে নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামকে তাহার পরিবর্তে কিছু দেয় নাই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা গিয়াছে। যদি একটি ছাত্র গ্রাম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসে, তবে একটি ছাত্রও পাঠ সমাপন করিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামের জন্য অকেজো করিয়া দেয়।

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামের সমাজ

আমাদের দেশে গ্রামের বর্তমান অবস্থা কি? গ্রামগুলির পটভূমিকা সুন্দর, কিন্তু বেশীর ভাগ গ্রামে মাটির ঘর, অপরিচ্ছন্ন মেঝে, ভগ্ন দেওয়াল, দরজা, জানালার বালাই নাই, উন্মুক্ত নালা। গ্রামে দারিদ্র্য, তাহার উপর

নানা রকম রোগ। দরিদ্র গ্রামবাসীদের শোষণ করিবার জন্য আছে মহাজন ও গ্রামের কতিপয় বর্ধিষ্ণু লোক। গ্রামের শতকরা ১০জন লোকের কম সাক্ষর। তাহা ছাড়া গ্রামের যাহা গড়পড়তা উৎপাদন, তাহা অন্যান্য দেশের পড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় ১০ ভাগের এক ভাগ।

বর্তমান ভারতে গ্রামের তুলনায় একটি আদর্শ গ্রাম কিরূপ হইবে তাহার ছবি একদা আমরা অঙ্কন করিয়া দেখিতে পারি।

গ্রাম হইবে সমৃদ্ধি-পুর্ণ। প্রাচীন কালের পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে উৎপাদন চলিবে না। বর্তমান যান্ত্রিক পদ্ধতির সবটুকু সুবিধাই কৃষিকাজে প্রয়োগ করিতে হইবে। গ্রামের লোকেরা শুধু কৃষিকাজই করিবে না, বহু প্রকারের উৎপাদনে তাহারা অংশ গ্রহণ করিবে। গ্রামে চলাচলের জন্য ভাল রাস্তাঘাট তৈয়ারী করিতে হইবে এবং পরিবহন-ব্যবস্থাও সুষ্ঠু হইবে। পানীয় জলের ব্যবস্থাও উত্তমরূপে সংঘটিত হইবে। শুধু তাহাই নয়, ময়লা জল নিষ্কাশন-ব্যবস্থাও উত্তম হইবে। পানীয় জল ও ময়লা জল নিষ্কাশন-ব্যবস্থা যদি ভাল হয়, তাহা হইলে গ্রামে কলেরা, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগুলি আর গ্রাম্য-জীবনকে পর্যুদস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু গ্রামের এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ও অর্থনৈতিক উন্নতি আনয়ন করিতে গেলে, সাথে সাথে সভ্যতা, কৃষ্টি, ও গ্রাম্য লোকদের চরিত্রেরও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত ও নৈতিক শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে, তবেই ঐরূপ গ্রাম্য জীবন লাভ করার সুফল পাইতে পারা যাইবে।

আর্থার মর্গ্যান আরও বলেন যে, ভারতের গ্রামগুলি উপযুক্ত স্তরে না উঠিবার কারণ গ্রাম্য লোকদের বুদ্ধির অভাব, কাঁচামালের অভাব বা বিদেশী শক্তির কুক্ষিগত হইয়া থাকা নয়, উহার কারণ হইতেছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ভাবের অভাব। যদি গ্রামীন শিক্ষা প্রাথমিক স্তর হইতে মহাবিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত গ্রামীন প্রয়োজনেই লাগে, তাহা হইলেই তাহার ফলে আমরা আদর্শ গ্রাম্য জীবন লাভ করিতে পারিব।

নানা কারণে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে গ্রামীন ব্যবস্থার উন্নতি হয় সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় সদরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে, গ্রামের দিকে দৃষ্টি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিত্তি বিজাতীয় দৃষ্টি, দেশীয় দৃষ্টির উপর উহা স্থাপিত নয়। আদর্শ বিশ্ব-

বিদ্যালয় হইতে গেলে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি ও সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, সেইরূপ নিজের দেশের ঐতিহ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিগ্রী দানের দিকেই লক্ষ্য, ছাত্রদের মধ্যে কর্মে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিতে সক্ষম হইতেছে না। হাতে কলমে কাজ করিবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। পুস্তকভিত্তিক শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনুসরণ করিয়া থাকে।

গ্রামগুলিকে উন্নত করার ব্যবস্থা

আমরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ করিতে পারি, তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। গ্রাম হইতে মানুষ শহরে যায় কেন? মানুষ যায় জীবিকা-সন্ধান ও আধুনিক জীবনের সুখ-সুবিধার সন্ধানের জন্য। যদি গ্রামগুলিকে শহরে পরিণত করিয়া গ্রামগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সুন্দর জীবন-যাপনের উপযোগী করিয়া তোলা যায়, তবে আর মানুষ শহরমুখী হইবে না। শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা ঐ লক্ষ্যবস্তুতে পৌছিতে পারি। নিম্নস্তরের ও উচ্চস্তরের শিক্ষা এই উভয় শিক্ষার ব্যবস্থা যদি গ্রামে থাকে, তবে আর মানুষ সহরে যাইবে কেন? ছাত্রছাত্রী সর্বস্তরে যে শিক্ষা গ্রামে পাইবে, সেই শিক্ষাই নিয়োজিত হইবে গ্রামের কল্যাণে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে গ্রাম সমৃদ্ধ হইবে, বাসোপযোগী হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই মর্গ্যান রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের পরিকল্পনাটি বিশদ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনাতে গ্রামীন শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা, তাহার পরের তিন বৎসর উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা, পরবর্তী তিন বৎসর কলেজীয় শিক্ষা এবং তাহার পরের দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়

গ্রামীন উচ্চ-শিক্ষার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে বিভিন্ন স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রামের নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কি নীতিতে চলিয়া থাকে তাহা আমরা জানি। আমরা এইখানে দেখিব কি ভাবে গ্রামীন উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ভারতীয় গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধপূর্ণ করিতে পারিবে। উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইবে আবাসিক। ঐরূপ একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৫০ হইলে ঐ বিদ্যালয়ে ৪০ একর জমি থাকিবে। দশ পনের একর জমি বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ,

ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ, ইত্যাদির জন্য আলাদা করিয়া রাখিলেও বাকী জমি কৃষি, শিল্প, কারখানা, গোচারণ ভূমি ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। বিদ্যালয় অঞ্চলটি একটি আধুনিক গ্রামের আদর্শে রচনা করিতে হইবে। এই রচনা কার্যে ছাত্রগণ শিক্ষকবৃন্দের উপদেশ মত কাজ করিবে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই কাজ করিবেন।

বিদ্যালয়ের জীবন হইবে একটি উৎকৃষ্ট গ্রামে জীবন-যাপনের আদর্শ। তবে তাহার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকিবে। বিদ্যালয়-জীবনের অধিক সময় ব্যয়িত হইবে পঠনে এবং বাকী অর্ধেক সময় ব্যয়িত হইবে কৃষিতে, দারুশিল্পে, আসবাবপত্র তৈয়ারীতে, গৃহ-নির্মাণে, বয়নে, সাফাইতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে। বর্তমান যুগের কারখানার উৎপাদন সম্বন্ধেও ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিবে। জিনিষ বিক্রয়ের জন্য তাহারা উৎপাদনও করিবে।

উত্তর-বুনিয়াদীর পরের স্তর গ্রামীন কলেজ। গ্রামীন কলেজ বা মহাবিদ্যালয় গ্রামকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবে। গ্রামগুলিতে যদি অনেক উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং ঐখান হইতে যদি বহু ছাত্র পাঠ শেষ করিয়া বাহির হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আরও উচ্চ শিক্ষার স্তরে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। তাহাদের শিক্ষা যে উত্তর-বুনিয়াদী স্তরে শেষ হইবে এমন নহে। উত্তর-বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী ইত্যাদি বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন, গ্রামীন শিল্প-কারখানা ইত্যাদির জন্য পরিচালক প্রয়োজন, নানারকম কারিগরী কাজ করিবার জন্য দক্ষ শিল্পী প্রয়োজন—এই সব পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? গ্রামীন কলেজ বা মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই ছাত্রগণ গ্রামের নানা কাজ করিবার জন্য গড়িয়া উঠিবে। যেমন উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করে, সেইরূপ গ্রামীন কলেজগুলি উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিবে। ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব বিষয়ে আরও বেশী জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহারা ঔৎসুক্য মিটাইতে পারিবে ঐ কলেজগুলিতে। কলেজের পাঠ্যক্রম হইবে ভারতের গ্রামের সমস্ত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া। উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মত গ্রামীন কলেজের ছাত্রগণও অর্ধেক সময়ে পঠনে ব্যয় করিবে, আর বাকী অর্ধেক সময় ব্যয় করিবে নানাবিধ ব্যবহারমূলক কাজে।

গ্রামীন শিক্ষার উন্নতির জন্য এক স্তরের শিক্ষার পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যেমন উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য কলেজীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ কলেজীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের কলেজগুলিতে আড়াই হাজারের বেশী ছাত্র থাকিত না। প্রত্যেক কলেজে তিন শতের অনধিক ছাত্র থাকিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমান মর্যাদা দেওয়া হইবে। কতকগুলি মূল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, আর তাহা ছাড়া গ্রামগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইবে। মূল বিষয়গুলি হইবে, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, দেহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান, শিল্প বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে যন্ত্রসমূহের উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। ছোট ছোট শিল্প-প্রচেষ্টাগুলি কি করিয়া কাঁচামাল কিনিবে, বিক্রয় করিবে, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা করিবে, ব্যবসা পরিচালনা করিবে, টাকা পয়সার হিসাব করিবে ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কৃষি-বিদ্যার ক্ষেত্রে ছাত্রগণ উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধে শিখিবে। শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও উপার্জনের ব্যবস্থা যদি গ্রামেই করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে গ্রাম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন (Dr. Radha Krishnan Commission) প্রকাশিত হইবার পর সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়। একটি উচ্চশিক্ষা সমিতি গঠিত হয় এবং ঐ সমিতি সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা করেন। ঐ সমিতি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সাতটি ফার্মের ব্যবস্থা করেন—যথা কৃষি ও উদ্যান বণ্টন বিদ্যা (Agriculture and Horticulture), পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন (Animal Husbandry and Dairying), গ্রামীন যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা (Rural Engineering), গ্রামীন শিল্প (Rural Industries), গ্রামীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Rural Health and Nutrition), গ্রামীন শিল্প-বিজ্ঞান (Rural Technology) এবং গ্রামীন শিক্ষা (Rural Education).

গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রাম গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১৮ জন ছাত্র লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করে। ছাত্রগণের মধ্যে বেশী সংখ্যক ছাত্র কৃষি এবং পশু-পালন সম্বন্ধীয় শিক্ষা-গ্রহণ করিতে থাকে। মাত্র অল্প কয়েক জন ছাত্রই গ্রামীন যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা বা গ্রামীন স্বাস্থ্য বিষয়টিকে গ্রহণ করিয়াছিল। কিছু দিন কাজ চলে। তারপর আচার্য বিনোবা ভাবে যখন ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন, তখন ঐ সকল ছাত্রগণও ভূদান যজ্ঞে নিজেদের নিয়োজিত করে। আচার্য বিনোবা ভাবের এই কাজটিকে একটি ভ্রাম্যমান্ গ্রামীন বিদ্যালয়ের কাজ বলিয়া অভিহিত করা যায়। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই ক্ষেত্রে প্রতিদিন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রগণ লাভ করিয়াছে।

গান্ধী-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা-চক্র

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধী-দর্শন সম্পর্কে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র বসে। এই আলোচনা-চক্রে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা যোগদান করেন। এই আলোচনা-চক্রের উদ্দেশ্য ছিল গান্ধী-দর্শন ও তাহার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন তাহারই পরিপ্রেক্ষিত হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর সমস্যা সমাধান। গান্ধী-দর্শন ও চিন্তাধারা আলোচনা করিতে গিয়া গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তাও আলোচিত হয়। আমরা শুধু সেই অংশ এইখানে আলোচনা করিব। এই আলোচনা-চক্রের সভাপতি ছিলেন ইংলণ্ডের লর্ড জন বয়েড ওর। তিনি বিলাতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি ছাড়া আমেরিকা, ইরান, মিশর, ফ্রান্স, ব্রেজিল, জার্মানী জাপান ও ইটালীর বিখ্যাত শিক্ষাবিদেরাও ছিলেন। তাহা ছাড়া ভারতের শিক্ষাবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্রাও ছিলেন।

এই আলোচনা-চক্রে আলোচনা প্রসঙ্গে মিশর দেশের শিক্ষাবিদ্ ডক্টর হেকাল বলেন যে, গান্ধীজী পরিকল্পিত কর্মের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সুন্দরভাবে চলিতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ঐরূপ শিক্ষা হইতে পারে না বলিয়াই তিনি মত প্রকাশ করেন। এই কথার উত্তরে ডক্টর জাকির হোসেন (বর্তমানে ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি) বলেন যে, শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক কাজের

মধ্য দিয়াই শিক্ষা সম্ভব এবং কাজ উৎপাদনমূলক হইতে হইলে তাহার কিছু সামাজিক মূল্যও থাকবে। ডক্টর হোসেন বলেন যে, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহারা শিক্ষার সঙ্গে একার্থবোধক নয়। তাহাদের দ্বারা শিক্ষার পরিমাপও করা যায় না। তিনি বলেন যে জ্ঞানের মধ্যেও দুই প্রকারের জ্ঞান আছে। এক রকম জ্ঞানের কথা হইল অন্যে কষ্ট করিয়া জ্ঞান আহরণ করে এবং সেই জ্ঞান আমরা খবর হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে আর এক রকমের জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান আমরা অভিজ্ঞতা হইতে অর্জন করিয়া থাকি। নৈপুণ্যও দুই প্রকারের একটি হইতেছে—একটি যান্ত্রিক, অপরকে দেখিয়া পরিশ্রম করিয়া সেই নৈপুণ্য অর্জন করা। আর এক রকম নৈপুণ্য হইতেছে অযান্ত্রিক এবং উহা স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত। প্রথম প্রকারের জ্ঞান ও নৈপুণ্য বাহির হইতে সংগ্রহ করা, কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের জ্ঞান ও নৈপুণ্য অভ্যন্তরের পরিবর্তন দ্বারা প্রাপ্ত। এই দ্বিতীয় অবস্থাই হইতেছে আসল শিক্ষা, প্রথম অবস্থাটি নয়।

উৎপাদন সম্পর্কে অভিমত

ডক্টর হোসেন বলেন, শিক্ষা সম্মত উৎপাদনমূলক কাজ কি তাহা আমাদিগকে যথার্থভাবে জানিতে হইবে। শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক কাজ হস্তের কিংবা মানসিক কাজ দুই-ই হইতে পারে। এমন অনেক হাতের কাজ এবং মানসিক কাজ আছে যাহা শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক কাজ নয়। শিক্ষা-সম্মত উৎপাদনমূলক কাজ হইতেছে সেই সকল হাতের কাজ বা মানসিক কাজ যাহা নূতন চিন্তাধারার স্থষ্টি করে, কিংবা স্বীকৃত তথ্যসমূহকে নূতন ভাবে যোগাযোগ করিয়া নূতন তথ্যের স্থষ্টি করে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানসিক জীবনে উচ্চতর ঐক্যের বিধান করা অথবা শক্তির উন্নততর বিকাশ সাধন করা। শিশুদের ক্রীড়া-মূলক কর্ম হইতে ইহার সাথে পার্থক্য এইখানে। উৎপাদনমূলক কাজ যে মানসিক কাজ তাহা উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সেই কারণে ইহা এক উদ্দেশ্য হইতে আর এক উদ্দেশ্যে চালিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণের মধ্যে মানুষ তাহার নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে; সে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে এবং নিজের মধ্যে অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, সচেতনতা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। ইহা সকলই অন্তর্নিহিত চেষ্টার ফলে সংগঠিত হয়, বাহিরের কোন প্রচেষ্টার ফলেই ইহা লাভ হয় না।

যে উদ্দেশ্যসমূহের কথা বলা হইল, তাহাদের সত্বর লাভ করিতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন, একটি হইতেছে বহুল পরিমাণে মামুলি জ্ঞান এবং অপরটি হইতেছে যান্ত্রিক নৈপুণ্য। যাহারা অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিপক্ক বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহারাও ইহার হাত হইতে রেহাই পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, গতানুগতিক ধারায় জ্ঞান লাভ এবং যান্ত্রিক উপায়ে নৈপুণ্য অর্জনেরও শিক্ষাক্ষেত্রে সীমিত স্থান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, যখন অভিজ্ঞতামূলক সৃজনাত্মক কাজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মধ্যে ফাঁক থাকে, সেই ফাঁক পূরণ করিবার সময়। অতএব উৎপাদনমূলক মানসিক কাজকে সর্বদা মামুলি জ্ঞান ও যান্ত্রিক নৈপুণ্য দ্বারা পরিপোষন করা দরকার। কিন্তু এই মনোবৃত্তির উন্নয়ন অন্য ভাবে করিতে হইবে। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে কর্মসম্ভূত যে জ্ঞান অর্জন করে তাহা অনেক সময় স্বার্থপরতাদুষ্ট। সে শুধু নিজের জন্যই কাজ করে এবং শিক্ষালাভও করে। এইখানে জ্ঞান কিন্তু সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত হয় না। যে দার্শনিক বা শিল্পী তাঁহার চিন্তা বা মানসিক সম্পদের দ্বারা সমষ্টির কল্যাণসাধন করিতে পারে না, সেই দার্শনিক বা শিল্পীর জ্ঞান লাভের সার্থকতা কি? অতএব উৎপাদনমূলক মানসিক কর্ম, তাহা কলা কিংবা বিজ্ঞান কিংবা কুশলতা অর্জণ যে সংক্রান্তই হউক না কেন, তাহা মানবের কল্যাণসাধনের কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে, যদি ব্যক্তিকে পূর্ণ মানব হইতে হয়।

মানসিক উন্নতির জন্য যদি উৎপাদনমূলক কাজ নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক বৃদ্ধির জন্য অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা একান্তভাবেই প্রয়োজন। সমাজের মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের উপযুক্ততা থাকিতে পারে। এই ভাবে যদি উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের ব্যবহার হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের সমস্ত প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই জাতীয় উৎপাদনমূলক কর্মপ্রবাহ বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইবে। শুধু বুনিয়াদী বিদ্যালয় নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই কাজ অত্যন্ত শক্ত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু যদি ভারত অগ্রসর হইয়া

যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এই কাজটুকু করিতেই হইবে। গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রামীন শিশুদের জন্যই এই বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে এই ভাবধারার উন্নতি বিধান করেন এবং সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রেই ইহা প্রযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

দিল্লীর এই আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে গান্ধীজী সম্পর্কিত বহু বিষয়ে আলোচিত হইলেও, শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা খুবই কম হয়।

আলোচনা-চক্রের শেষ দিনে লর্ড বয়েড ওর বলেন, "Now, how can Gandhian ideas be applied? We realise it is very difficult, we realise it was not within our function to give special recommendations to be carried out. That was the job of the politicians of all countries, but we thought that we could consider these principles and state the general principles whereby they could be used to gradually lessen the tensions and make possible the universal application of Gandhiji' principles. Now, first and foremost we took education, because it is the people of the world who will ultimately decide. We all agreed that there may be great learning and little education, there may be great technical skill but little culture. We thought that education should be a process to bring out the best in the individuals, to give them full light, to make individuals free from hatred and free from fear. These are thee two main lessons of Gandhiji's teachings, for one of the most striking things about Gandhiji was his enoromous courage; it was as great as his love. I will not however enlarge upon it and simply say that education, that is, fundametal education, in all countries must be directed along these new lines."

রামচন্দ্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মুল্যায়ন কমিটি

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভারতে স্থাপিত হয়, তাহা প্রায় সকলই পাঁচটি শ্রেণী-যুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়, অর্থাৎ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Education) পরিষ্কার ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। সমিতি বলেন যে, যে কোন শিক্ষাদান-প্রণালীকে বুনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা যায় না, যদি না উহাতে সাঙ্গীকৃত শিক্ষা ও নিম্ন এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে এবং যদি না সেখানে শিক্ষামূলক ও উৎপাদনমূলক শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপারে যদি আমরা এই নিম্নতম সর্ত মানিয়া চলি তাহা হইলে প্রকৃত বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের দেশে খুব কমই প্রচলিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

ইহার ফলে দেশের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হইয়া গিয়াছিল যে বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীবাদ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার জন্যও বটে, আবার বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকতর সুসংগঠনের জন্যও বটে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে একটি মূল্যায়ন কমিটি (Assessment Committee on Basic Education) শ্রী জি, রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে গঠিত করেন।

এই কমিটি পাঁচটি পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে কি ভাবে চলিতেছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ প্রাদেশিক সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ে, দ্বিতীয়তঃ প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ মহলে, তৃতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যায়ে, চতুর্থতঃ বিদ্যালয় পর্যায়ে এবং পঞ্চমতঃ জনসাধারণের স্তরে কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার সমস্যা পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

এই কমিটি তাঁহাদের সমীক্ষা পরিচালনা সময়ে নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ক) **সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ে:** বুনিয়াদী শিক্ষা কি এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা? প্রাথমিক পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা একমাত্র শিক্ষা হইয়া উঠিবে এমন কোন সরকারী নীতি আছে কিনা? বুনিয়াদী শিক্ষা রূপায়নের জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে তাহা কি ভাবে কার্যকরী হইতেছে তাহা দেখা।

(খ) **প্রশাসনিক পর্যায়ে :** শিক্ষা-বিভাগের কর্মীদের বুনিয়াদী শিক্ষা রূপায়নে কি ভাবে কাজে লাগান হইতেছে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা আছে কিনা তাহা জানা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণদান করা ছাড়া প্রশাসনিক কর্মচারী এবং পরিদর্শকদের জন্য শিক্ষণ দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা তাহাও কমিটি জানিতে চেষ্টা করেন।

(গ) **শিক্ষণ পর্যায়ে :** এই কমিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন যে শিক্ষকেরা শিক্ষণ সমাপনান্তে শিল্প দক্ষতা অর্জন করিয়াছে কিনা এবং শিল্পকাজ পরিচালনায় যথাযোগ্য দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ অনুবন্ধ প্রণালী এবং ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষকদের যোগ্যতা জন্মিয়াছে কিনা।

(ঘ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী শিক্ষার সর্তগুলি ন্যূনতম-ভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহাও কমিটি দেখেন।

(ঙ) জনসাধারণের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা আছে কিনা। বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণে জনসাধারণের আগ্রহ আছে কিনা এবং জনসাধারণের আগ্রহ সঞ্চারের জন্য কি পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাও এই কামটি লক্ষ্য করেন।

কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার সকল দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা মোটেই সুবিধার নয় বলিয়া মনে করেন। কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার বাধা প্রাপ্ত হইতেছে শিক্ষা বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য। কমিটি বলেন, "Officials of the Education Department specially at the higher level, who control the administration, personnel, policies and finances of the small Basic Education factors are often, though not always, persons who have no understanding, faith or training in Basic Education. This creates the very undesirable situation of non Basic personnel misdirecting the Basic factor"* অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারতের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দের বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাস নাই।

*Report of the Assessment Committee on Basic Education, Ministry of Education, Government of India 1956, Page 21.

রামচন্দ্রন্ কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষা মূল্যায়ন কমিটি প্রথম পর্যায়ে বোম্বাই, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজ রাজ্য পরিদর্শন করেন এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা অনুসারে একটি অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। তার পরের পর্যায়ে কমিটি দিল্লী, পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, সেবাগ্রাম ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন। শেষ পর্যায়ে কমিটি উত্তর প্রদেশ, বিহার ও আসাম পরিদর্শন করেন।

কমিটি ভারতের সমস্ত রাজ্যসমূহ পরিদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। তাহার কারণ সময়ের অভাব। সে যাহা হউক কমিটি বেশীর ভাগ রাজ্যের বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরিশেষে বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :—

রামচন্দ্রন কমিটির সুপারিশ

১। **কেন্দ্রীয় সরকার :**—(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক ইহাকে স্বীকৃতি দান এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইহাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎপাদনের স্থান যেন কোনো ক্রমেই লঘু না করা হয়।

(খ) জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক সমস্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবদের বৈঠক আহ্বান করা দরকার। তাহাতে সর্ববাদীসম্মতভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে যাহাতে নির্দিষ্ট সময় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ শেষ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

(গ) এই বৈঠকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়ন এবং সমগ্র শিক্ষাধারায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্থান কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করা দরকার।

(ঘ) কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করেন যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-অধিকর্তাদের বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা দরকার এবং শিক্ষা-অধিকর্তাদের অবদানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সংগঠিত ও উন্নত করিয়া তোলা প্রয়োজন।

(ঙ) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে মধ্যে সম্মেলন হওয়া দরকার।

(চ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষাবিষয়ক প্রচারের উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

(ছ) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধে গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষাগবেষণাগার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

(জ) বুনিয়াদী শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(ঝ) বুনিয়াদী শিক্ষক ও ছাত্রদের কর্মের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকাশন বিভাগ গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন।

(ঞ) গ্রাম সংগঠনের জন্য অন্যান্য যে সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে, তাহাদের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলার চেষ্টা করা উচিত।

(ট) গৃহ নির্মাণ বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যয় হ্রাস ও সরলীকরণ প্রয়োজন।

(ঠ) স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সহিত যোগাযোগ স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।

(ড) বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন কালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষাকে যথাযোগ্য মর্যাদার ভিত্তিতে স্থাপন করা একান্ত কর্তব্য।

(ঢ) বর্তমানে প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন খাতে যত ব্যয় হইবে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে।

(ণ) কিছুকাল পর পর মূল্যায়ন কমিটি নিয়োগ প্রয়োজন।

২। **রাজ্য সরকার—(ক)** রাজ্য সরকারের কর্তব্য হইবে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তর-করণ ব্যাপারে অবিলম্বে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা এবং প্রাচীন শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা।

(খ) বিহার ও আসাম রাজ্যের ন্যায় শিক্ষাদপ্তরকে সাহায্য করার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন।

(গ) আত্যন্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কিছু কিছু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজকর্ম প্রবর্তন করা দরকার।

(ঘ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) রাজ্যের বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্প্রসারণের দায়িত্ব বহন করিবার জন্য এক জন সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন।

(চ) রাজ্য সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(ছ) বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রকাশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠনের কাজে উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

(জ) বুনিয়াদী শিক্ষা যাহাতে খণ্ডিত আকারে চলিতে না পারে তাহার জন্য সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(ঝ) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষকের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের উন্নয়ন সাধন একান্ত কর্তব্য।

৩। **বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ**—এ কথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যখন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় নাই। অথচ শিক্ষক-শিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্বয় সাধন, শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদিতে বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট কাজ করিতে পারিত। সেজন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরীপ্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যোগাযোগ করা দরকার।

তাহা ছাড়া উত্তর-বুনিয়াদী স্তর অতিক্রম করিয়া ছাত্ররা যাহাতে কলেজে ভর্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

৪। **প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশসমূহ**—শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনে যাঁহারা কর্মরত তাঁহাদের আন্তরিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্য অনুধাবন করা দরকার। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নত হইয়া উঠিতে পারে।

বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শকবৃন্দ সর্বতোভাবে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত হইবেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হইবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা এক বৈপ্লবিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, ইহাকে সহজে আয়ত্ত করা শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই কারণে পরিদর্শকবৃন্দ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভুল-ত্রুটিই শুধু লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদিগকে সর্বদা সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

শিক্ষা-বিভাগে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইলে বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে। বিকেন্দ্রীত অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরে বার বার পরিদর্শনের ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তা লাভের কথাও বলা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলা হয়। লিখিত পরীক্ষার চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারাবাহিক উন্নতির পরিমাপের উপর কমিটি বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের নিয়মকানুন শিথিল করা, ইত্যাদি বিষয়েও সুপারিশ করা হয়।

ইহা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদন,ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সমন্বয় সাধনের পন্থা নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়েও নানা সুপারিশ করা হয়।

৫। **শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ**—কমিটি সুপারিশ করেন যে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিল্প-শিক্ষার মানের আরও উন্নতি সাধন, সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে আরও দক্ষতা অর্জন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। খণ্ডিত আকারে কোন শিল্প-শিক্ষা পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষাদানের জন্য শিল্পশিক্ষায় দক্ষ শিক্ষাদাতাকে নিয়োগ করা যাইতে পারে যদিও তাহার পুস্তকানুগ পারদর্শিতা নাও থাকে। এইরূপ দক্ষ শিল্পী নিয়োগ করা হইলে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককেরও তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলির সাথে যাহাতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলির গভীর সংযোগ থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিভিন্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এত দিনে বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক হইতে বহু গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্র রচিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্য সৃষ্টিকে বিশেষ করিয়া উৎসাহ দিতে হইবে। এই রচনাগুলিকে বাছিয়া উহাদিগকে বুনিয়াদী শিক্ষার পুস্তক হিসাবে প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে রাজ্যের পর্যায়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ যাহাতে পুস্তক প্রণয়নে গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে—সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রতিটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া শিক্ষা-বিস্তারে সহায়ক হইয়া উঠিবে এইরূপ সুপারিশও করা হয়।

৬। **বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে সুপারিশ**—কমিটি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ্য করেন যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আছে, কিন্তু অন্যান্য কোন সুযোগ-সুবিধা নাই, আবার কোথাও কোথাও কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আছে, কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কমিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংগঠনে কয়েকটি ন্যূনতম সর্ত আরোপ করেন।—

(ক) অষ্টম-বর্ষব্যাপী সামগ্রিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অথবা যদি শুধু নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকে, তবে সেই বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকিতে হইবে, যাহাতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীগণ উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

(খ) যথোপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল, সরঞ্জাম ইত্যাদির সরবরাহ ও ব্যবহার।

(গ) অষ্টম শ্রেণীযুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য জল সরবরাহের সুবিধা-যুক্ত কম পক্ষে তিন একর জমি প্রয়োজন।

(ঘ) অধিকাংশ বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক গ্রহণ।

(ঙ) সামুদায়িক জীবন-যাত্রা পরিচালনা এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের কর্মাদি পরিচালনা।

(চ) পূর্ণ শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, খণ্ডিত শিল্প-শিক্ষা কোনও ক্রমেই হইবে না। নিয়মানুগ শিল্প-শিক্ষা দান চলিবে। উৎপাদনের লক্ষ্য শিক্ষা-বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(ছ) অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য চলিবে। অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান শুধু শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই হইবে না, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেও কেন্দ্র করিয়া অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

(জ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত কাজের ব্যবস্থা থাকিবে।

(ঝ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সর্বধর্মীয় প্রার্থনার ব্যবস্থা থাকিবে।

(ঞ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি ভাল পাঠাগার থাকিবে।

(ট) আনন্দ অনুষ্ঠানের ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা থাকিবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইবে অভ্যন্তরস্থ (internal) এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ধারাবাহিক উন্নতির হিসাব রক্ষা করিতে হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। পুস্তকানুগ শিক্ষার চাইতে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন ও স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও বেশী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা চলিতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রামে ও শহরে প্রবর্তনের কথাও এই কমিটি বলেন। অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক এলিমেন্টারী (Elementary) বিদ্যালয়ের জন্য একই পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে, একথাও কমিটি বলেন।

৭। **জনসংযোগ সম্বন্ধে সুপারিশ**—একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের মতামতে যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হইল—সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কাজেই এখন হইতেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাহাদের সাহায্য কাজে লাগানো, জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো ইত্যাদির ব্যবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমেই করিতে হইবে। আর এই কারণেই দ্রুত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দরকার।

রামচন্দ্রন কমিটির অন্যান্য মন্তব্য

রামচন্দ্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশগুলি ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে মন্তব্য করেন। কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা-সংলগ্ন অঞ্চলে (Compact area) বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার-সাধন এত দিন করার প্রচেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু কমিটি মনে করেন যে এইরূপ সংলগ্ন অঞ্চলদ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঠিকমত হইতে পারিবে না। বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার সংলগ্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই সংলগ্ন অঞ্চল দ্বারা বিভিন্ন স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য ছোট ছোট অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযুক্ত প্রসার হয় নাই। অঞ্চলের বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে তাহাদের প্রভাব নিকটস্থ বিদ্যালয়গুলিতে বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহা ছাড়া অবুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কমিটি অন্ধ্র, আসাম, পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি স্থানেও একই চিত্র দেখিয়াছেন।

কমিটির অন্যান্য মন্তব্য

কমিটি মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজ্য-সরকার হইতে স্পষ্ট পূর্ণ নির্দেশ থাকিবে। এই নির্দেশগুলিতে অবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী আদর্শে রূপান্তরিত-করণের নীতি সংযোজিত থাকিবে এবং কত দিনের মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইতে পারিবে, তাহারও সময় নির্ধারিত থাকিবে। তাহা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার যোগাযোগ কি ভাবে করিতে থাকিবে, তাহারও স্পষ্ট নির্দেশ থাকিবে। এইরূপ সরকারের স্পষ্ট নির্দেশের ফলেই শিক্ষা-বিভাগগুলি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারিবে। কাজ চলিবে দুই ভাবে। প্রথমতঃ প্রতি বৎসর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধিত করিয়া শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা আর দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি তাড়াতাড়ি প্রবেশ করাইয়া উহার রূপান্তর করণ। অবশ্য অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হইতে পারিবে না, তাহার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

কমিটি এইরূপ মন্তব্য করিবার সময় কি ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কি কি বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য দ্বারা রূপান্তরিত করা যায় তাহার নীতি নির্ধারণও করিয়াছেন। যত দিন পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যালয়গুলির জন্য না পাওয়া যায়, তত দিন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের পথে নিম্নলিখিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করান যাইতে পারে।

(১) সাফাই, বাগানের কাজ ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করান যাইতে পারে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র নীতি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মভার গ্রহণ করিবে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের নির্দেশে কাজ করিবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক নীতি পালিত হইবে। সকল ছাত্রছাত্রী যাহাতে বিদ্যালয়ের কর্মে সহযোগিতা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) শিক্ষকের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণ কৃষ্টিমূলক কাজ করিবে। ফলে তাহাদের মানসিক অবসাদ দূর হইবে, তাহারা নিজেদের কাজ হইতেই আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। তাহাদের সামাজিক বুদ্ধিও বৃদ্ধি পাইবে।

(৪) প্রয়োজনীয় শিল্পকাজের প্রবর্তন করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। ছাত্রছাত্রীদের কর্মক্ষমতাই যে শুধু বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, তাহারা কোন কিছু উৎপাদন করিবে, আনন্দও লাভ করিবে।

(৫) বিদ্যালয়ে সম্প্রসারণের কাজও করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই স্থানে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা নাই। কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ব্যতিরেকে উহা করা সম্ভবপর নয়। বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া গেলে ঐ সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে পূর্ণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যাইতে পারিবে।

কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি দিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে মন্তব্য করেন। কমিটি বলেন যে, কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা লক্ষ্য করিয়া এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যা নানারূপ ভাবে হইয়াছে এবং এক ব্যাখ্যার সাথে অন্য ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ নাই।

কমিটি পশ্চিম বাংলা ও উত্তর প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনাত্মক দিকটিকে শিশু মনস্তত্ত্বসম্মত এবং কার্যকরী করিয়া বিশ্বাস করিতে চান না, তাঁহারা উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে একটি কাল্পনিক বিভেদ-রেখা দেখিতে পান। মূল্যায়ন কমিটি বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়। মূল্যায়ন কমিটি এই ধারণা নিরসনের জন্য সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন।

(১) বিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে **অর্থনৈতিক মূল্য** আছে এইরূপ কাজও থাকিবে এবং এমন কোন কাজও আছে যাহার **অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণ করা যায় না**। বিদ্যালয়ের শিল্পকাজ, কায়িক পরিশ্রমজাত কাজ, কতকগুলি সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ, ইহাদের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। অপর পক্ষে সঙ্গীত, সাহিত্য-সৃষ্টি, অভিনয়, ছবি আঁকা, এবং কতকগুলি সমাজ-সেবামূলক কাজের কোন অর্থনৈতিক মূল্য নাই। কমিটি বলেন যে, বয়সভেদে উভয় প্রকার কাজই চলিতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ নাই। উদ্দেশ্য হইতেছে সামগ্রিক শিক্ষা, ব্যক্তিত্বের উন্মেষ, দক্ষতা অর্জন, শিক্ষার গভীরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(২) কমিটি বলেন যে, **উৎপাদনাত্মক কাজে,** উহাকে সুন্দর ভাবে করা, পরিকল্পনার মধ্য দিয়া করা, অপচয় নিবারণ করা, যৌথভাবে কাজ করিবার অভ্যাস সৃষ্টি করা ইত্যাদির মধ্যে ছাত্রছাত্রী কতকগুলি সামাজিক গুণ লাভ করিতেছে এবং কারিগরী দক্ষতাও অর্জন করিতেছে। যদি উহা পরিকল্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা যে কোন শিক্ষানীতি-বিরুদ্ধ হইবে, বুনিয়াদী শিক্ষা নীতি-বিরুদ্ধ ত হইবেই। কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় রচনাত্মক কাজের যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং বহু স্থানে রচনাত্মক কাজ এবং উৎপাদনাত্মক কাজ উভয় উভয়ের পরিপূরক।

(৩) কমিটি বলেন যে সমগ্র ভারতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-প্রবর্তন করার প্রসঙ্গে **শিল্পকার্য সম্পর্কে** অনেকগুলি **ব্যবস্থা** করিতে হয়, যথা,—শিল্পযন্ত্রাদি ক্রয়, কাঁচামাল ক্রয় ও সরবরাহ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ও শিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে হয়। পাঠ্যসূচীতে ইহাদের

সময়ও দিতে হইবে। এই বিপুল সময় ও অর্থব্যয় সঙ্গত হইবে যদি শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করে, যথা হাতে কলমে শিক্ষা, কর্মে দক্ষতা অর্জন এবং কর্মযুক্ত জ্ঞান লাভ। সুপরিকল্পিত কাজে ছাত্রছাত্রীরা কর্মে দক্ষতা লাভ করিবার কালে যে জিনিষ উৎপাদন করিবে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থমূল্য থাকিবে। কমিটি বলেন যে, ছাত্রছাত্রীদের দিয়া জোর করাইয়া উৎপাদন করা অবশ্য শিক্ষানীতি বিরোধী। কিন্তু সুপরিকল্পিত কাজের মধ্য দিয়া কিছু উৎপাদন হওয়াও স্বাভাবিক ও শিক্ষণ অনুকূল।* কোন বয়সের ছাত্রছাত্রী কতটা উৎপাদন করিতে পারিবে, তাহার গড় (norm) সুপরিকল্পিত কাজে আপনিই বাহির হইয়া আসিবে। কমিটি ভারত সরকারের রচিত the Concept of Basic Education এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মের মাধ্যমে কৃষিকাজ হইতে বিদ্যালয়ের জলখাবার এবং বস্ত্র-বিস্তার ক্ষেত্র হইতে শিশুদের পরিচ্ছদের চাহিদা মিটান যাইতে পারে। ভারতের মত জনবহুল দরিদ্র দেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া এবং অভুক্তভাবে বিদ্যালয়ে আসে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্পকাজ যদি ভারতের অগনিত ছাত্রছাত্রীদের মূল চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহা হইলে অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। শেষ কালে পুনরায় বলা যায় যে সুপরিকল্পিত কাজের মধ্য দিয়াই এই সমস্ত সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে পারা যায়।[১]

*Marx says in his 'Capital':

"By strictly regulating the worker's time in accordance with his age and taking other precautionery measure for the purpose of Protecting children, the early union of productive work with teaching is a mighty instrument for the transformation of the present society."

১ Report of Assessment Committee on Basic Educatione Page 40-41.

"The effective teaching of a Basic craft, thus, becomes an essential part of education at this stage, as productive work done und r proper conditions not only makes the acquisation of much related knowledge more concrete and realistic but also adds a powerful contribution to the development of personality and character and instils respect and love for all socially useful work. It is also to be clearly understood that the sale of all products of craftwork will

(৪) কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে যদি উৎপাদনাত্মক কাজ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার সাথে সাথে সমবায়-পদ্ধতিতে শিক্ষাও বাদ পড়িতে থাকিবে। তাহা হইলে বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে যাহা থাকিবে, তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রহসন মাত্র।

বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ

[ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Concept of Basic Education নামক পুস্তিকা অবলম্বনে]

ভূমিকা

দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়নে ভারত সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কার্যপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতীদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির মূল নীতি কি এবং স্থানীয় প্রয়োজনের তাগিদে কোন বিষয়ে যতটুকু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক তাহা বুনিয়াদী শিক্ষককে নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে স্থির করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদের স্থায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি প্রকাশিত এই বিবরণী বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলির উপর আলোক সম্পাত করিবে এবং জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে। আমি আশা করি আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এমন ভাবে পরিকল্পনা করিবেন যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠিত হয় এবং তাঁহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।—এ. কে. আজাদ।

'বুনিয়াদী শিক্ষা' কথাটির অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন,—কখনও কখনও বিভিন্নভাবে বিকৃত অর্থও করিয়াছেন। কারণ-স্বরূপ বলা চলে যে, এই পদ্ধতি সর্বাধুনিক এবং যাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্ব এখনও শেষ হয় নাই।

meet some part of the expenditure incurred on running the school or that the products will be used by the school children for getting a midday meal or a school uniform or help to provide some of the school furniture and equipment.

সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কার করিয়া বলার প্রয়োজন আছে।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা সমিতির (জাকির হোসেন কমিটির) রিপোর্টে বুনিয়াদী শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে তাহাই বোঝায়। একথা যথার্থ যে, এই রিপোর্টে বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠন সেই অনুসারেই হইবে। সকলের জন্য আট বৎসরের শিক্ষা আবশ্যিক এবং মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে এখন আর কেউ দ্বিমত নন। এই সর্বজন গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনরালোচনা অবান্তর। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী এই দুইটিকে লইয়াই বুনিয়াদী শিক্ষা-ইহাদের কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অন্য বক্তব্য নিম্নে লিখিত হইল।

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে গান্ধীজী বুঝিয়েছেন, **সারা জীবন-ব্যাপী একটি শিক্ষা-পদ্ধতি**—তাঁহার মতে বুনিয়াদী শিক্ষা সারা জীবনের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা। তাঁহার মতে ইহার লক্ষ্য হইল একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একটি অহিংস সমাজ প্রবর্তন করা এবং ঠিক এই উদ্দেশ্যেই সমাজের দিক হইতে যাহা কল্যাণকর হইবে যাহা উৎপাদনক ও সৃজনাত্মক হইবে এবং সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পক্ষে যাহা গ্রহণযোগ্য হইবে সেইরূপ কাজকেই এই শিক্ষা-কেন্দ্রে স্থাপন করা হইয়াছে।

(২) এই জন্যই এই শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, **শিক্ষার্থী যাহাতে একটি মূল শিল্প ভালভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে**—তাহা দেখা; ইহা দ্বারা যদি শিক্ষার্থী শিল্পকাজটি ভালভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে তবে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরোও অন্যান্য জিনিষ শিক্ষাও সম্ভব হইতে পারে। এদিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই ধরণের শিক্ষা প্রচলিত যে কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে বাস্তব ও স্বাভাবিক। ইহার ফলে সমাজের পক্ষে যে সমস্ত কাজ কল্যাণকর তাহার প্রতি শিশুর মনে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মে এবং ধীরে ধীরে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ইহার মধ্য দিয়াই গঠিত হইয়া ওঠে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা শিল্পকাজ শিখিয়া যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিবে সেগুলি বিক্রী করিয়া

অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে যেন বিদ্যালয় পরিচালনার আংশিক ব্যয়-নির্বাহ হয় অথবা উৎপন্ন সামগ্রী ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে খাবার বা বিদ্যালয়ের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা ইহা হইতে যেন বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম ক্রয় করা যাইতে পারে।

(৩) তবে এই শিক্ষাব্যবস্থায় **শিল্পকাজকে কি স্থান দেওয়া** যাইতে পারে, ইহাতে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কেবল মাত্র শিশুর আত্মিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহার উৎপাদন-দক্ষতাও বৃদ্ধি পায় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থী যে শিল্পকাজ শিখিবে যাহাতে ইহাকে তাহারা ভবিষ্যতে কাজে লাগাইতে পারে, এবং ইহার মধ্য দিয়া তাহারা সমস্ত কিছু শিখিতে পারে, সেদিকেও ভাল ভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। এত দিন এদিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। শিশু যদি শিল্পকাজে দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, তবে তাহার ভিতর তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হইতে পারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শিক্ষার তুলনায় যাহাতে শিল্পের উৎপাদনের উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপিত না হয়। তবে উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ছাত্রছাত্রীরা যদি ভাল ভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করিতে পারে, তবে তাহাদের অনেক মূল্যবান্ অভ্যাস ও মনোভাব গঠিত হইবে এবং তাহাদের সামনে একটি সুন্দর ও মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার মধ্য দিয়াই তাহারা লক্ষ্য স্থির করিয়া সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়া একাগ্রতার সাথে সম্পূর্ণ কাজটি করিতে শিখিবে। যদিও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা অনেক সময় সম্ভব হয় না, তবে এটুকু বলা যায় যে, শিক্ষক মহাশয় অর্থনৈতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে গিয়া যেন কখনই শিল্পের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ব্যাহত করা না হয়। রাজ্য-সরকার যদি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নিম্নতম উৎপাদন নির্ধারণ করিতে চান, তবে সেটাকে উচিত কাজ বলেই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(৪) এই স্তরে প্রশ্ন জাগে যে, **কোন্ শিল্পকে আমরা নির্বাচন করিব?** কি নীতি আমরা এখানে মানিয়া চলিব?—ইহার উত্তরে এ কথাই বলা

যাইতে পারে যে, এই নির্বাচনের সময় আমরা যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কাজ করি এবং সব দিকেই ভালভাবে দৃষ্টিপাত করি। আমরা সেই শিল্পকেই বাছিয়া লইব যাহার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ উন্নততর জ্ঞান ও কর্মনৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবে। আবার শিল্পটি যেন বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলিতে পারে, সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। যাঁহারা মনে করেন যে সুতো কাটিলেই বিদ্যালয়টিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা মোটেই স্পষ্ট নয়।

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে যে-কোনও ভাল পদ্ধতির মতো কাজ, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। তাই দেখা যায়, **বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্প এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে পাঠক্রমের সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়।** এইগুলি সম্বন্ধে শিশুর একটী স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে—কাজেই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিক্ষক ইহাদের মধ্য দিয়া যে কোনও বিষয় শিখাইতে পারেন। শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতার অভাবের দরুণ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনেক সময় ইহা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক সময় আবার দেখা যায় যে, পাঠক্রমে এমন বিষয় রহিয়াছে যাহা এই তিনটির কোনো একটিকে অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে শেখানো সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থা খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, এই ধরণের বিষয়গুলি যদি ভাল ভাল বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে শেখানো হয়, সেই ভাবেই শেখানো যায়, তবেই আর কোনো অসুবিধা থাকে না। আমাদের পক্ষে কোনো ক্রমেই পাঠ্য বিষয়কে জোর করিয়া পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা চলিবে না।

৬। একথা কখনই মনে করা সঙ্গত নয় যে, যেহেতু বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প ও উৎপাদনাত্মক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, সেই হেতু বোধ হয় এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় **পুস্তক পাঠকে অপ্রয়োজনীয়** বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এই ধারণা করিলে কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি অবিচারই করা হইবে। কেননা সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনাত্মক কাজকে পরিচালনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিলে শিশুদের

এক দিকে যেমন অনেক জিনিষ শেখানো যায়, তেমনি অপর দিকে তাহাদের জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুপরিকল্পিত জ্ঞান ও আনন্দের খোরাক বইয়ের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এই উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাল ভাল বিদ্যালয়ের মত একটি ভাল গ্রন্থাগার রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

(৭) একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই **বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন** করা যায়। এই শিক্ষা এমন শিক্ষা যাহা শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ করিয়া তোলে। ইহার জন্য অবশ্য দুটি মাত্র কাজ করিতে হবে। প্রথমতঃ বিদ্যালয়কে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজের মধ্য দিয়া; দ্বিতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে বিভিন্ন ধরণের বইয়ের কাজ ও সমাজ-সেবামূলক কাজ করিতে উৎসাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন এই শিক্ষাব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একটি গতিশীল সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাবলম্বন, সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার ও শ্রমের মর্যাদাবোধ জাগরিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

(৮) বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু **গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা**—এই কথা আর **বলা চলে না**। দ্বিবিধ কারণে শহরাঞ্চলে ইহার আশু প্রবর্তন বিধেয়। প্রথমতঃ শহরাঞ্চলেও ইহার উপযোগিতা কম নয়। দ্বিতীয়তঃ 'পল্লী অঞ্চলের জন্য নিম্নস্তরের শিক্ষা হইল বুনিয়াদী শিক্ষা'—এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য। ইহার জন্য শহরের বিদ্যালয়ের উপযোগী শিল্প নির্বাচন বিষয়ে, এমন কি ইহার পাঠ্যক্রম বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার সাধারণ আদর্শ ও পদ্ধতি একই থাকিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি

রামচন্দ্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ-সমূহ গৃহীত হয় এবং সেই অনুসারে ভারতে কাজও শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে দিল্লীতে বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র (National Institution of Basic Education) ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা-কার্যে উৎসাহ দান, বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টি, বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতিমূলক তথ্য সরবরাহ এবং শিল্প ও কলা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত অল্প-কালীন শিক্ষণ ও আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত আলোচনা-চক্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশাসনিক কর্মচারীগণও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

National Institute of Basic Education

National Institute of Basic Education এর কাজ হইল সর্ব-ভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য ও পরামর্শ দান। এই প্রতিষ্ঠান দিল্লী অঞ্চলের বুনিয়াদী শিক্ষার জরীপ করিয়াছেন এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক পুস্তিকাও রচনা করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা কাজে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ অগ্রগতির সূচনা করিয়াছেন।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষার সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন ও পরামর্শ দিতেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় A Handbook for the Teachers of Basic Schools নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকদ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষাতে শিক্ষাব্রতীরা অশেষ লাভবান হইয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকল্পে আজ ছয়-সাত বৎসর যাবৎ প্রত্যেক রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা-সপ্তাহ পালিত হইতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা-সপ্তাহে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং জন-সাধারণকে বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই উপলক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহে আলোচনা, শিল্প-প্রদর্শনী এবং বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদীকরণের কাজ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে।

পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ভারতে কিরূপ ভাবে হইতেছে তাহা জানিতে পারা যাইবে।*

* Mr. Nurullah & Nayek এর A Students' History of Education in India হইতে গৃহীত।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৩৩,৩৭৯	৪২,৯৭১	১,০১,৭১০	১,৫৪,২৪১
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুপাতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শতকরা হিসাব	১১.৯	১৫.৪	২৯.৪	৩৬.৮
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৩৫১	৪,৮৪২	১১,৯৪০	১৬,৬৮৩
শতকরা হিসাব	২৫.৮	২২.৩	৩১.৪	২৯.৮
প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা হিসাব	১৩.১	১৭.২	২৩.৩	—
বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয়	১১৪	৫২০	৭১৫	১,৪২৪
শতকরা হিসাব	১৫.০	৫৬.০	৭০.০	১০০.০

বুনিয়াদী শিক্ষা একটি গতিপ্রধান বিষয় এবং ইহা প্রবর্তনের কাল হইতে বর্তমান পর্যন্ত ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার অগ্রগতিকে বাধা দিবার মত কোন শক্তি আর নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা হইল জীবনের জন্য শিক্ষা এবং জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা। ইহা অহিংস ও শোষণহীন সমাজ স্থাপনে উদ্যোগী। ইহা উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক সমাজের উপযোগী শিল্পকর্মকে অবলম্বন করিয়া রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কিছুটা পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং শিল্পকাজের জন্য যে কাঁচা মালের খরচ হয়, তাহা শিল্পকাজ হইতে মিটিয়া যাইতে পারে, ইহা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইতেছে। বিদ্যালয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক ইত্যাদির খরচ উঠিয়া আসিলে ভাল হয়—এই বিষয়ে অবশ্য গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা
প্রথম পরিচ্ছেদ
মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষে ইংরাজী-প্রধান মাধ্যমিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথমে ইহার প্রবর্তক ছিলেন খৃষ্টীয় প্রচারক-সংঘসমূহ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক স্থির করা হয় যে এদেশীয়গণের শিক্ষা ও আচার-আচরণকে শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা প্রয়োজন। ঐ সময়ে লর্ড মেকলে তাঁহার বিখ্যাত অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে উন্নত ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থা স্থিতিশীল করা সম্ভব এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিংক তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার-সংক্রান্ত আইন রচিত হয়। রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ এদেশীয় মনীষিগণ এই নীতির সমর্থক হওয়ায় ভারতে ইংরাজী শিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষালাভ দ্বারা সরকারী চাকুরির প্রবেশাধিকার লাভ করা সহজ হওয়াই ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ এইরূপ ঘোষণা করেন যে, অতঃপর সরকারী কার্যে নিযুক্তির জন্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। ইহার ফলে ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় সরকারী চাকুরী লাভ। এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দিক-গুলি গৌণ হইয়া পড়ে। **আজিও মাধ্যমিক শিক্ষার এই প্রারম্ভিক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।**

আঠারো বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পর উহার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি কর্তৃপক্ষ অবহিত হন ও তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একটি ডেস্‌প্যাচ প্রচারিত হয়—উহা উডের ডেস্‌প্যাচ

নামে পরিচিত। এই ডেচপ্যাচে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে অনেকগুলি পরিকল্পনার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল; যথা—সরকারী শিক্ষা-অধিকারের প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। উডের ডেসপ্যাচে সঙ্গতভাবেই সাধারণের জীবনের মান উন্নত করার উপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন বিষয়ে সরকারকে বেশী অবহিত হইতে বলা হইয়াছিল এবং এই জন্য অধিক অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাবও ছিল। এই ডেসপ্যাচ অনুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষার উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে; এমন কি এই প্রভাব প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেও পড়ে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখা হইতে থাকে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃ-ভাষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকেই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য করিয়া তোলা হয়। এই অবস্থা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ঐ সময়ে একটি শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত হয়; তাহা হাণ্টার-কমিশন নামে খ্যাত। ঐ কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু অধিকাংশ ছাত্র মাধ্যমিক স্তরেই তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করে, সেই হেতু এই শিক্ষাস্তরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতির স্তর হিসাবে না দেখিয়া ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে সংগঠিত করা উচিত। কমিশন এই মত ব্যক্ত করেন যে, সরকারের নিজ পরিচালনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন হইতে নিবৃত্ত হইয়া "গ্রাণ্ট-ইন-এইড" ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করা সঙ্গত। তৎপরিবর্তে সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত। মাধ্যমিক শিক্ষায় অধিকতর বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করিয়া এই স্তরে বৌদ্ধিক ও বৃত্তিমূলক এই উভয়বিধ ধারার শিক্ষা-ব্যবস্থার সংযোজন এই কমিশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত। কমিশনের "গ্রাণ্ট-ইন্-এইড" পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছিল, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় নাই।

উডের ডেসপ্যাচ

হাণ্টার কমিশন

১৯০২ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা বিচারের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে। এই কমিশনের সুপারিশে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের একটি

অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বিধি-বিধান অনুসারে চলার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের বাধ্যবাধকতায় আনা হয়। ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণে আসে। ইহার ফলে কয়েকটি প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাণসহ বিদ্যালয়-ত্যাগকালীন সার্টিফিকেট দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাদের ঐ সার্টিফিকেট দেখিয়া যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগকারীগণ চাকুরীতে ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষায় ভর্তি করিবেন, এইরূপে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহা সকল স্থানে সমভাবে প্রযুক্ত হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ একটি কমিশন গঠিত হয়। উহার চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার-এর নাম অনুসারে উহা স্যাডলার-কমিশন নামে খ্যাত। যদিও ইহা শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কমিশন, কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তগুলি ছিল অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ এবং ঐগুলি অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও সাদরে বিবেচিত ও অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; যথা:—

স্যাডলার কমিশন

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সীমারেখা প্রবেশিকা পরীক্ষায় না হইয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় হওয়া উচিত।

(২) উপরোক্ত কারণে সরকার কর্তৃক পৃথক ভাবে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহ স্থাপন করা উচিত এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ভাবে ঐরূপ কলেজ স্থাপন করা উচিত।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতার পরীক্ষা হিসাবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকেই বিবেচনা করা উচিত।

(৪) ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থাপনাদি মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের অধীনে আনা এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড-এ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, উক্ত বিদ্যালয়সমূহ ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের প্রতিনিধি থাকা উচিত।

উপরোক্ত ধরণের অভিমত এই কমিশনই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। দেখা যাইবে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার অনেকখানি প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের শাখা হিসাবে (হার্টগ কমিটি) এদেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। উহা হার্টগ কমিটি নামে খ্যাত। ঐ কমিটির অভিমতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়-গুলির প্রভাব তখনও অতিরিক্ত বর্তমান ছিল কমিটি বিভিন্নমুখ বিকাশ-ব্যবস্থাসংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্ব প্রদান করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গমনেচ্ছু ছাত্রদিগকে প্রস্তুত হইবার সুযোগ দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবর্তনের উপদেশ প্রদান করেন। কমিটি শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়ন দ্বারা উন্নত ধরণের শিক্ষক-দিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার উপদেশ প্রদান করেন। কমিটির মতে শিক্ষকগণের বেতন ছিল খুবই কম।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সরকার কর্তৃক ঐ প্রদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু নির্ধারণার্থ **সপ্রু কমিটি** গঠিত হয়। কমিটি মনে করেন, বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি ও তজ্জনিত নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূলে রহিয়াছে শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার সাফল্য অর্জন করিয়া ডিগ্রী লাভকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রতিকার হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত সুসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা রূপে সংগঠিত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য, কারিগরী সংস্থা প্রভৃতিতে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে। কমিটির প্রধান প্রধান অভিমতগুলি হইতেছে :

সপ্রু কমিটি

(১) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন পাঠ্যসূচী হইবে,- উহাদের মধ্যে একটি হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি।

(২) ইণ্টারমিডিয়েট স্তরটির বিলোপ করিয়া তৎস্থানে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে ১ বৎসর বাড়াইতে হইবে। এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বিধি-বিধান অনুসারে চলার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের বাধ্যবাধকতায় আনা হয়। ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণে আসে। ইহার ফলে কয়েকটি প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাণসহ বিদ্যালয়-ত্যাগকালীন সার্টিফিকেট দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাদের ঐ সার্টিফিকেট দেখিয়া যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগকারীগণ চাকুরীতে ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষায় ভর্তি করিবেন, এইরূপে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহা সকল স্থানে সমভাবে প্রযুক্ত হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ একটি কমিশন গঠিত হয়। উহার চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার-এর নাম অনুসারে উহা স্যাডলার-কমিশন নামে খ্যাত। যদিও ইহা শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কমিশন, কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তগুলি ছিল অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ এবং ঐগুলি অন্যান্য অনেক বিশ্ব-বিদ্যালয়েও সাদরে বিবেচিত ও অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; যথা:—

স্যাডলার কমিশন

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সীমারেখা প্রবেশিকা পরীক্ষায় না হইয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় হওয়া উচিত।

(২) উপরোক্ত কারণে সরকার কর্তৃক পৃথক ভাবে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহ স্থাপন করা উচিত এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ভাবে ঐরূপ কলেজ স্থাপন করা উচিত।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতার পরীক্ষা হিসাবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকেই বিবেচনা করা উচিত।

(৪) ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থাপনাদি মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের অধীনে আনা এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড-এ সরকার, বিশ্ব-বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের প্রতিনিধি থাকা উচিত।

উপরোক্ত ধরণের অভিমত এই কমিশনই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। দেখা যাইবে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার অনেকখানি প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের শাখা হিসাবে (হার্টগ কমিটি) এদেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। উহা হার্টগ কমিটি নামে খ্যাত। ঐ কমিটির অভিমতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়-গুলির প্রভাব তখনও অতিরিক্ত বর্তমান ছিল কমিটি বিভিন্নমুখ বিকাশ-ব্যবস্থাসংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্ব প্রদান করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গমনেচ্ছু ছাত্রদিগকে প্রস্তুত হইবার সুযোগ দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবর্তনের উপদেশ প্রদান করেন। কমিটি শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়ন দ্বারা উন্নত ধরণের শিক্ষক-দিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার উপদেশ প্রদান করেন। কমিটির মতে শিক্ষকগণের বেতন ছিল খুবই কম।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সরকার কর্তৃক ঐ প্রদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু নির্ধারণার্থ **সপ্রু কমিটি** গঠিত হয়। কমিটি মনে করেন, বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি ও তজ্জনিত নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূলে রহিয়াছে শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার সাফল্য অর্জন করিয়া ডিগ্রী লাভকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রতিকার হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত সুসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা রূপে সংগঠিত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য, কারিগরী সংস্থা প্রভৃতিতে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে। কমিটির প্রধান প্রধান অভিমতগুলি হইতেছে :

সপ্রু কমিটি

(১) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন পাঠ্যসূচী হইবে, উহাদের মধ্যে একটি হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি।

(২) ইন্টারমিডিয়েট স্তরটির বিলোপ করিয়া তৎস্থানে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে ১ বৎসর বাড়াইতে হইবে। এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের

পূর্ববর্তী স্তর হইবে মোট ১১ বৎসর। তাহার মধ্যে ৫ বৎসর হইবে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর। অবশিষ্ট ৬ বৎসর হইবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। প্রথম ৩ বৎসর নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর। এই স্তরে সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রকে একই রকম শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় ৩ বৎসর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর রূপে গণ্য হইবে ও এই স্তরে বিভিন্ন রকম বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটের ১ বৎসর এই স্তরভুক্ত হইবে।

উড ও এবট্‌স্‌ রিপোর্ট

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে উড ও এবট্ নামক দুই জন শিক্ষাবিদ্‌কে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে—বিশেষ করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে তৎকালীন সরকার আহ্বান করেন। তাঁহাদের মতামত এবট্-উড রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই কমিটির নিকট দুইটি প্রধান প্রশ্ন ছিল :—

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হইবে কিনা এবং হইলে তাহা কি ভাবে কতখানি প্রদত্ত হইবে?

(২) কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় রহিয়াছে, সেইগুলির সংস্কার-সাধন দ্বারা ঐ সব শিক্ষা সম্ভব হইবে কিনা অথবা ঐ জন্য নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে? যদি নূতন ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়, তবে উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক ইহার কোন্ স্তর হইতে শিক্ষার্থীকে ঐ বিদ্যালয়ে আনিতে হইবে এবং কি ভাবে তাহাদিগের উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির সহিত সঙ্গতি স্থাপিত হইবে।

কমিটি সাধারণ বিদ্যালয়ের সহিত সমান্তরাল ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের উপদেশ প্রদান করেন। এই কমিটির অভিমত অনুযায়ী এ দেশে "পলিটেকনিক্যাল" বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরী, বাণিজ্যিক ও কৃষি বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়।

সার্জেন্ট পরিকল্পনা

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটি যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করেন। তৎকালীন ভারত-সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টের নাম অনুসারে

ইহা সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে ৬ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১১ বৎসরের পর বিভিন্ন ধরণের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে, যেন সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন শিশু স্বীয় যোগ্যতা ও রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তিতে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। এই রিপোর্ট অনুসারে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল হইবে ১১ বৎসর বয়ঃক্রমের পর ৬ বৎসর এবং উহা দুই ধরণের হইবে —(ক) সাধারণ (খ) বৃত্তি-মূলক। উভয় ধরণের বিদ্যালয়েই সাধারণ সর্বতোমুখী বিকাশের ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বুদ্ধিমূলক শিক্ষা দেওয়া হইবে, দ্বিতীয়োক্ত বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে নানা বৃত্তিতে গমনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানের জন্য সরকারকে একটি কমিটী নিযুক্ত করিতে উপদেশ প্রদান করেন ও ঐ প্রস্তাব ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে গৃহীত হয়। তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা ডাঃ তারাচাঁদের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। ঐ কমিটি যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি, মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের সহায়করূপে সংগঠিত করার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা (Multipurpose Schools)। দ্বিতীয়টি হইতেছে সর্বভারতীয় স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান ও উপদেশাদি প্রদান জন্য একটি বৃহত্তর মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা। দ্বিতীয়োক্ত অভিমতের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকার পরে **মুদালিয়র কমিশন** গঠন করেন (১৯৫২)।

তারাচাঁদ কমিটি

১৯৪৮ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ঘোষিত হয় ও ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ইহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইহা **রাধাকৃষ্ণান কমিশন** নামে খ্যাত।

রাধাকৃষ্ণান কমিশন

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই জন্য উপরোক্ত কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন। ঐ কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাটি আমাদের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বলতম সংযোগ এবং উহার গুরুত্ব সরকার ও জনসাধারণ ঠিক ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলা যায় না। কমিশন মনে করেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে যোগ্যতা সূচিত হয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী নহে। এই জন্য ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা বিবেচনা করা উচিত এবং তদনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বর্ধিত করা উচিত।

মুদালিয়র কমিশন

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে যে মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন ডাঃ তারাচাঁদ কমিটির অভিমত অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। যেহেতু এই কমিশন বর্তমান কালের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান-কার্য চালাইয়া ও সর্বভারতের বিভিন্ন স্থানের মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া একটি আধুনিকতম পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে, সুতরাং আমরা ঐ রিপোর্ট হইতে আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার গতি-প্রকৃতি ও সমস্যা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারি। এখানে ঐ কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সারা ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়-সমূহের ধরণ

কমিশন সারা ভারতে যে সমস্ত ধরণের বিদ্যালয় দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তর। বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরণের শিশু-বিদ্যালয় খুব অল্পসংখ্যক আছে। এই ধরণের বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও আনন্দের মধ্য দিয়া সুঅভ্যাস গঠন ও শেখার আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

কয়েকটি মিশন ও বিশেষ ব্যক্তি বা সঙ্ঘের প্রেরণায় পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয় প্রশংসার যোগ্য। সাধারণতঃ ৩ হইতে ৪ বৎসর বয়সে ভর্তি করা হয় ও ৭ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিশু-শিক্ষা লাভ করে।

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা - বিভিন্ন রাজ্যে ৬ বা ৭ বৎসর হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত এই ৪ বা ৫ বৎসর ইহার শিক্ষাকাল। অনেক রাজ্যে ৫ বৎসর ব্যাপী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু হইয়াছে, কিন্তু ইহার সংখ্যা খুবই কম।

উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় (Higher Elementary School)—কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক স্তরের পরও আরো ৩ বৎসর মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বাদ দিয়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার এইরূপ বিদ্যালয় আছে। কিন্তু ইহার সংখ্যা আরো কমিতেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—ইহার দুইটি স্তর রহিয়াছে। নিম্নস্তরের বিদ্যালয়গুলিতে ৩ বৎসর অথবা ৪ বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিও ইহার অন্তর্গত। উচ্চ স্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল তিন অথবা (যেখানে নিম্নস্তরের স্থিতিকাল ৪ বৎসর) দুই বৎসর।

উচ্চতর শিক্ষা:—অধিকাংশ রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১০ বৎসর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোর্সের শিক্ষাকাল ৪ বৎসর। দিল্লীতে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১ বৎসরের বেশী ও ডিগ্রীকোর্সের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর।

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ—উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সেকেণ্ডারী ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আছে। অন্য রাজ্যের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি ইউনিভার্সিটি-পরিচালিত।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা—স্থাপত্য বিদ্যা, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা, কৃষি শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের অধীন কলেজসমূহ রহিয়াছে।

কারিগরী শিক্ষা—ট্রেড স্কুল, শিল্প-বিদ্যালয়, কৃষি-শিক্ষালয়, পলিটেকনিক প্রভৃতি নামে বিভিন্ন বিদ্যালয় আছে ও সাধারণতঃ ১১ বৎসর বয়সের পর এগুলিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়।

পলিটেকনিকসমূহ—অনেক রাজ্যে পলিটেকনিক স্কুলসমূহ মারফৎ বিভিন্নকাল ব্যাপী শিক্ষা দিয়া শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়।

বর্তমানে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন-মুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে ও উহার মারফৎ সাধারণ শিক্ষার সহিত, কৃষি, শিল্প, কারিগরী, কেরাণী-বৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি

এই কমিশন সারা ভারতে ভ্রমণ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতীর অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন ও বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ পাইয়াছেন তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতির সংখ্যা অনেক, তাহার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল।

বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি

পাঠ্যক্রমের ত্রুটি। এই শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তথ্য সংগ্রহ ও লিখিতে পড়িতে পারার মত কয়েকটি মাত্র নিপুণতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। চিন্তাশীলতা প্রকাশ ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশও গৌণ হইয়াছে এবং জীবন-সহায়ক নানা কাজ-কর্মের শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ মোটেই গুরুত্ব পায় নাই। পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর পক্ষে মোটেই আকর্ষণীয় নহে। অত্যন্ত বেশী এবং অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে পীড়িত করিতেছে।

পাঠদান-পদ্ধতি, বিদ্যালয়-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ক ত্রুটি। বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে আকর্ষণীয় নহে। শিক্ষাক্রম-পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত—ইহা প্রাণহীন ও বিরক্তিকর। শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার সুযোগ নাই। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতার তৃপ্তি ও বিকাশের কোনও সুযোগ ইহাতে নাই।

শিক্ষক-সংক্রান্ত ত্রুটি। শিক্ষকগণের শিক্ষাগত ও মানসিক মান অনুন্নত। তাহারা সন্তুষ্ট ও আগ্রহশীল কর্মী নহেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এই বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, বাধ্য হইয়া করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। তাঁহাদের আর্থিক মান ও সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত কম,

এই জন্য তাঁহারা হীনমন্যতায় ভুগিতেছেন—যাহা তাঁহাদের কার্যে উৎসাহ লাভের পরিপন্থী। ইঁহারা যে ভাল শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিবেন তাহার বাধাও অবশ্য অনেক রহিয়াছে। প্রথমতঃ পাঠ্যক্রমের চাপ এত বেশী যে নূতন কিছু করিবার সাহস ও অবসর সঞ্চয় করাই কঠিন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক পিছু ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় কোনও আকর্ষণীয় পদ্ধতির প্রয়োগ সাধন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

পরীক্ষা-সংক্রান্ত ত্রুটি। পাঠ্যক্রমের গুরুভারের সহিত পরীক্ষার ভীতি যুক্ত হইয়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের নিকট শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভ একটি নীরস বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে চিন্তাশীলতা, সৃজনশীলতা প্রভৃতি গুণের শিক্ষা-প্রচেষ্টার তিরোভাব ঘটিয়াছে—পরীক্ষায় ভাল করাই সমগ্র শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ পরীক্ষার অত্যধিক গুরুত্বই পরীক্ষার বিষয় নহে এমন সমস্ত বিষয়গুলিকে গৌণ করিয়াছে। বিদ্যালয়ে ঐ সব পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বা পাঠ্যক্রম-অনুপূরক বিষয়গুলি নামে-মাত্র থাকে—উহাতে কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। খেলাধূলা, সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজ প্রভৃতি নামে-মাত্র থাকে—শিক্ষার্থীর দেহমনের বিকাশের সহায়করূপে নহে। কমিশনের মতে এই ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা আরো অনেক বড় করা যায়। এই ত্রুটিগুলির নিরসন জন্য কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ইতিপূর্বে ইহার আংশিক সংশোধন-প্রচেষ্টাসমূহ দ্বারা সামগ্রিক ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভবান্ হয় নাই। তাই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আধুনিক যুগোপযোগী দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

যদিও শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা অনেক শিক্ষা-সংক্রান্ত পুস্তকেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি এই কমিশন মনে করিয়াছেন যে, বর্তমান ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব পটভূমিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তাহার সুনির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন আছে এবং কমিশন বাস্তব অবস্থার সহিত সঙ্গতিযুক্ত এইরূপ একটি লক্ষ্য

নির্ধারণে প্রয়াসী হইয়াছেন। কমিশন এই লক্ষ্যকে অপরিবর্তনীয় মনে করেন না, তবুও আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে ইহার সম্যক পরিবর্তন ঘটিবে না। কমিশন মনে করেন যে, ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসীদের অভ্যাস, চারিত্রিক প্রবণতা ও গুণাবলী এমন হওয়া উচিত যেন তাহারা নানা বিরূপ ও বিভেদ-সৃষ্টিকারী প্রভাব অতিক্রম করিয়া উদার জাতীয়তাবোধের ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইতে এবং গণতান্ত্রিকতার দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ বর্তমানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুরবস্থাগ্রস্ত দেশ—ইহার অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ইহার অধিবাসীদের উৎপাদন-ক্ষমতার উন্নতি ঘটাইয়া জীবন ধারণের মান উন্নয়ন করার যোগ্যতা প্রদান করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ দীর্ঘ দিনের দারিদ্র্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা-হেতু দেশের সাংস্কৃতিক মান আজ নিম্নগামী হইয়াছে—সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থারও তাই প্রয়োজন রহিয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীগণের গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সৃজনশীল নাগরিকের উপযোগী চরিত্র গঠন করা, তাহাদের বাস্তব কাজ-কর্মের ও বৃত্তি অর্জনের কুশলতা বৃদ্ধি করা এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বারা সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির মানোন্নয়ন সম্ভব করিয়া তোলা ইহাই হইবে—বর্তমান শিক্ষার—বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

গণতান্ত্রিক দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ

শিক্ষার্থীকে গণতন্ত্রের উপযোগী নাগরিকরূপে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার কার্যকারিতা বিষয় বলিতে গিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির পক্ষে চিন্তা করিবার ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে না—পরন্তু গণতন্ত্রে প্রতি ব্যক্তির চিন্তা করার ও কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে এবং উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত না হইলে ব্যক্তি ঐ দায়িত্ব প্রতিপালনে সক্ষম হয় না। যে কোনও জটিল সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি নিজে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারিলে সেই ব্যক্তি গণতন্ত্রের ভারস্বরূপ। কারণ গণতন্ত্রের মূল কথাই হইতেছে অধিকাংশের সক্রিয় বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপন। এই জন্য গণতন্ত্রের যোগ্য নাগরিক

গণতন্ত্রের উপযোগী নাগরিক

হইতে হইলে সুস্পষ্ট চিন্তাধারা এবং নূতন ধ্যান-ধারণার সম্যক উপলব্ধির ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন ইহাই সুশিক্ষিতের সর্বপ্রথম লক্ষণ এবং বিদ্যালয়ে ইহার চর্চা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। যে জনসাধারণের চিন্তার স্বচ্ছতা নাই এবং মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য করিতে পারে না, বর্তমান প্রচার-যন্ত্রের প্রভাবে তাহারা সহজেই বিপথ-চালিত হইবে ও গণতন্ত্রের বিপদ ঘটাইবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর চিন্তাক্ষমতা ও সত্য বিচার-ক্ষমতা গণতন্ত্রের পক্ষে পরিহার্য। শুধু তাহাই নহে, অধিকাংশের মতামত দ্বারা গণতন্ত্র পরিচালিত হয়। এই জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিকগণকে গতানুগতিক প্রথা ও ধারণা এবং অন্ধ বিশ্বাসের মোহ ছিন্ন করিয়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইতে হইবে, তবেই দেশের প্রগতি সম্ভব হইবে।

চিন্তার ক্ষেত্রেও যেমন, বাচনিক ও লিখিত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রেও তাহার পক্ষে সেইরূপ প্রাঞ্জলতা প্রয়োজন। কারণ ইহার সাহায্যেই সর্বোত্তম জনমত গঠিত হইয়া দেশকে প্রগতিমুখী করার সুযোগ ঘটে।

প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও উপযোগিতার প্রতি বিশ্বাসই গণতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক বিকাশ ঘটে, তাহার উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শিক্ষাকে সংকীর্ণ খাত হইতে মুক্তি দিয়া যাহাতে ইহা শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখী বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে ও তাহাকে সমাজের মধ্যে পূর্ণতর ভাবে বাঁচিতে সাহায্য করিতে পারে, এমন শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ একা থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহার নিজের সুবিকাশ এবং সমাজের কল্যাণ এই উভয়ের জন্যই সমাজের সকলের সহিত শান্তিতে বাস করা, অন্যান্যের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে মান্য করা ও সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজের সকলের সহিত সৌহার্দ্য, সঙ্গতি ও সমৃদ্ধির সহিত বাস করিতে শেখায় না, তাহা শিক্ষা নামের যোগ্য নহে। ইহার জন্য শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতাবোধ, সমাজবোধ ও সহনশীলতার বিকাশ প্রয়োজন।

শৃঙ্খলাবোধ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ—ইহার অভাবে কোনও যৌথকর্ম সম্পাদন হইতে পারে না এবং নেতৃত্ব-দানের ক্ষমতা বিকশিত

হইতে পারে না। বর্তমানে শৃঙ্খলা-বোধের অভাব দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রতিকার বিষয়ে কমিশন পরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু শৃঙ্খলা-বোধ শূন্য স্থানে বিকশিত হয় না, ইহার বিকাশ ঘটে স্বেচ্ছায় সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসম্পাদিত যৌথ কাজকর্মের মধ্য দিয়া।

শৃঙ্খলাবোধ

শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহযোগিতামূলক যৌথ কর্মের মাধ্যমে ইহা অর্জন করিতে পারে, তাহার সুযোগ বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। সামাজিক ন্যায়-বিচারবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সমস্ত শোষণ ও অবিচার সমাজকে কলুষিত করিয়াছে, তাহা বিদূরণের মহৎ আদর্শে ব্রতী হইয়া বর্তমান অসাম্য দূর করিয়া নির্যাতিতের মুক্তির প্রেরণায় তাহারা ঐসব কার্যে ব্রতী হইবে। ইহার দ্বারা তাহারা শৈশবে ও কৈশোরে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ সৃষ্টির অধিকারী হইবে এবং সহযোগিতা শৃঙ্খলাবোধ কর্মক্ষমতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইবে। সর্বশেষে, সহনশীলতা রূপ মহৎ গুণ এইরূপ যৌথ কর্মের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে এই গুণটি অপরিহার্য।

সহযোগিতামূলক যৌথ-কর্ম ও উচ্চ আদর্শ

অপরের বিশ্বাস, ধারণা ও মতামতকে দাবাইয়া দিয়া এক পথে চালিত করিলে হয়ত কাজের গতি দ্রুত বাড়ে, কিন্তু তাহা সংকীর্ণ নিকৃষ্ট অর্থে—কারণ ইহা দ্বারা মানুষের স্বতঃস্ফূর্তি ব্যাহত হয়। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে সহনশীলতা ও উদারতা একান্ত প্রয়োজন—কারণ এখানে অনেক জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাস। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতি ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করা—শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিদ্যালয়গুলিতে যে বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের ছাত্র আসে, তাহাদিগকে মিলিয়া মিশিয়া একটি বন্ধুত্বের সমাজ-পরিবেশ গঠন করিয়া এই শিক্ষা ভাল ভাবেই দেওয়া সম্ভব।

সহনশীলতা ও উদারতা

প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে "প্রকৃত" শব্দটি মাত্র একটি বিশেষণ নহে, ইহার "বিশেষ" গুরুত্ব রহিয়াছে। শিক্ষার মধ্য দিয়া নিজ দেশের প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ অবশ্য জাগ্রত করিতে হইবে। কিন্তু ঐ

প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা

দেশাত্মবোধ যেন অন্ধ জাতীয়তার জন্ম না দেয় তাহা দেখিতে হইবে। শিক্ষার্থীগণ নিজ দেশের ঐতিহ্য ও মহত্ত্ব যেমন জানিবে, তাহার সাথে সাথে তাহার দুর্বলতা কুসংস্কার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে এবং উহার সংস্কার বা পরিবর্তনের প্রতি যত্নশীল হইবে। **দেশের মহত্ত্বের প্রতি অবধান, দেশের দুর্বলতার প্রতি অবধান এবং দেশের আরো অগ্রগতির জন্য ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতার নিরসন প্রচেষ্টা**—এই তিনটি ধারার সংমিশ্রণেই প্রকৃত দেশপ্রেমিকতার বিকাশ ঘটিবে। সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানাদি কার্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এইরূপ জ্ঞানের অনুপ্রেরণা লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ইহাকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করিয়া তোলার জন্য "সমাজ-বিদ্যা" শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশন আরো অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে নিছক জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট নহে—"আন্তর্জাতিকতা-বোধ" অর্থাৎ "এক পৃথিবীর আমরা অধিবাসী" এই বোধ জাগ্রত করা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ভাব বৃদ্ধির উপযোগী শিক্ষা বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেক বিদ্যালয়ে চলিতেছে এবং কমিশন উহার প্রতি অবহিত হইবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিকতা-বোধ

ইহার পর কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বৃত্তি অর্জনের কুশলতা বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা করিয়াছেন। কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং কোনও প্রয়োজনীয় কাজকে হীন মনে না করা একটি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। কাজের উৎকর্ষতা দ্বারাই ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতিগত আমরা সমৃদ্ধ হইতে পারি—এই বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজের গুণগত মান ও তৎপরতা বৃদ্ধিও মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষার্থী যাহাতে তাহাদের সম্পাদ্য কাজগুলিকে নিখুঁত করিতে ও হাতের কাজকে সুসম্পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং ত্রুটিপূর্ণ অযোগ্য কাজকে বাতিল করিয়া কাজের গুণগত মান উন্নত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অতীতে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত বেশী পুঁথিঘেঁষা ও তাত্ত্বিক ধরণের। তাহার পরিবর্তন করিয়া, এখন বিদ্যালয়ে শিল্প ও উৎপাদনাত্মক কাজকর্মগুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হইবে। এই জন্য কমিশন

বৃত্তির কুশলতা

মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিকে বিভিন্নমুখী করিয়া তাহাতে কৃষি, কারিগরী শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারাসমূহের সংযোজনের সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন আশা করেন, ইহার দ্বারা যুবকবৃন্দের বিভিন্ন কাজের প্রতি মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি ঘটিবে এবং তাহারা নিজেদের ও জাতির সৃজনী শক্তির ও জীবনের মান উন্নত করিতে সক্ষম হইবে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

অতঃপর কমিশন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ দ্বারা কমিশন কতকগুলি সৃজনধর্মী প্রবণতার বিকাশ বুঝাইয়াছেন। যাহারা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। শিক্ষার্থীর এইগুলির প্রতি অনুপ্রেরণা তাহার অবসরকে আনন্দময় ও সৃজন-ধর্মী করিয়া তুলিবে। এইগুলি হইতেছে সঙ্গীত, চিত্রকলা, শিল্প, নৃত্য প্রভৃতি এবং নানা উৎকৃষ্ট বিকাশধর্মী Hobby বা ঝোঁক। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত এই সব সৃজনধর্মী দিকগুলি পূরণের ব্যবস্থা নাই। কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষায় ইহার ব্যবস্থা রাখা উচিত—ইহা দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্ফুরণের সুযোগ ঘটিবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় সংস্কৃতি পূর্ণতর হইবার সুযোগ পাইবে।

অতঃপর কমিশন নেতৃত্বের বিকাশকে মাধ্যমিক শিক্ষার একান্ত গুরুত্ব-পূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কমিশন দেখাইয়াছেন যে, শিক্ষার তিনটি স্তরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বারা উচ্চ স্তরের জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে সকল মানুষের সহযোগিতা একটি সর্ত এবং সেই জন্য সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্য হইতেই নেতৃত্ব আসার প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমাদের দেশের মত গণতন্ত্রে অনেক অংশ শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই লাভ করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে সাধারণ কর্ম-প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব প্রদান করিবেন এইরূপ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়। কিন্তু নেতৃত্ব করার জন্য কতকটা আত্ম-প্রত্যয় প্রয়োজন ও তাহার জন্য কিছুটা উচ্চ স্তরের জ্ঞান প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা ইহা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত উপযুক্ত দৃষ্টি ও চেতনা-সম্পন্ন জননেতা সৃষ্টি করা। অবশ্য কমিশন নেতৃত্ব বলিতে

নেতৃত্বের বিকাশ

রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুঝাইতেছেন না—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ কর্মে নির্দেশনার যোগ্যতা বুঝাইতেছেন। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস, উপযুক্ত কর্ম-উদ্যম এবং জনসংযোগের প্রবণতা প্রদান করে না। তাহারা ঘটনার নীরব দর্শক ও অসহায় মান্যকারী হইয়া উঠে। তৎপরিবর্তে সাহসী প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি-সম্পন্ন ও প্রত্যয়শীল কর্ম-প্রবণ নাগরিকরূপে তাহারা যেন গড়িয়া উঠে—ইহাও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশসমূহ

কমিশন ইতিপূর্বে ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক ও অন্যান্য বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে, সকল রাজ্যে ব্যবস্থা সমান নহে। কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণে ঐ বৈচিত্র্য বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং একটা মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা বলিতে গিয়া তবেই ধীরে ধীরে কমিশনের নির্দেশিত পরিবর্তন সাধিত করিতে হইবে—নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বিপর্যয় দেখা দিবে।

অতঃপর কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাল সম্বন্ধে নিম্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কমিশন মনে করেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিমাত্র নহে, পরন্তু ইহা একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিক্ষাও বটে। এই শিক্ষা-অন্তে শিক্ষার্থী যেন জীবনে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে থাকা দরকার। শিক্ষার্থী কোন্ বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ও তাহা সমাপ্ত করিবে তাহা বিবেচনা করার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। ইহা সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে ইহা ১১ বৎসরে সুরু হইবে ও

মাধ্যমিক শিক্ষার কাল

১৭ বৎসরে সমাপ্ত হইবে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রমের বিষয়সমূহ ভালভাবে গ্রহণের সুযোগ দিতে হইলে এবং তাহার সহিত তাহার উপযুক্ত পরিমাণ বোধ-শক্তি বিচারশক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে হইলে ৭ বৎসর শিক্ষাকাল প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ইহা বার বার বলিয়াছেন যে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকালে শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত অগ্রগতি উভয়ই অপর্যাপ্ত। সুতরাং যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী অথবা যাহারা চাকুরী ও অন্যান্য জীবনে প্রবেশার্থী—এই উভয়বিধ শিক্ষার্থীর পক্ষেই শিক্ষাকালের এই বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিভিন্নমুখী করিলে উপযুক্ত তৎপরতা ও সুসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যও ইহার প্রয়োজন। এই সব কারণে কমিশন মনে করেন যে, উচ্চ বুনিয়াদী অথবা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পরেও অন্ততঃ ৪ বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষাকাল হওয়া উচিত। কমিশন ইহাও বিবেচনা করেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত মোট কালকে বর্ধিত করা সমীচীন নহে—কারণ তাহা শিক্ষা-ব্যবস্থাপকগণের ও ছাত্রদের উভয়ের পক্ষে অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিবে। এই সব বিবেচনায় কমিশন ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকালের বিলুপ্তি ঘটাইয়া তাহার একটি বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষাকালে যুক্ত করিতে ও একটি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী শিক্ষাকালে যুক্ত করিয়া ঐ কালকে মোট ৩ বৎসর করিতে সুপারিশ করেন। প্রসঙ্গতঃ কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাদের এই সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের অনুরূপ।

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১১ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর নির্ধারিত করার ব্যাপারে কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন যে, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার কাল ৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসর। সুতরাং ইহাতে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাকালের সহিত মাধ্যমিক শিক্ষাকালের দ্বিত্ব ঘটিবে—অর্থাৎ ১১ বৎসরের কমিটি উভয়ের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং ১১ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর সময়টি মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বলায় অনেকে মনে করিতে পারে যে ইহার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাকালের সংকোচন ঘটানো হইতেছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ জাকীর হোসেন কমিটী ও সেন্ট্রাল এডভাইসারী বোর্ড এই উভয় সংস্থার রিপোর্টেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সমধর্মী মনে করা হয় নাই—

ইহাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশরূপেও দেখা হইয়াছে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা পুরাপুরি মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের আওতাতেই পড়ে এবং কমিশনও উহাকে সেই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত করিয়াছেন। যাহাতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সহিত কোনও রূপ দ্বন্দ্ব না ঘটে, তজ্জন্যই কমিশন উচ্চ বুনিয়াদী, মধ্য ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সাধারণ কাঠামো ও মান এক রকম রাখার কথা বলিয়াছেন। বর্তমানে পরিপূর্ণ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় কম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বহির্গত ছাত্ররা মধ্য অথবা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। ঐগুলি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ। এই জন্য কমিশন উক্ত মধ্য ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ধরিয়া লইয়া তাহাদের সংস্কার ও উন্নতি-সাধনের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষার কতকগুলি ভাল দিক যত শীঘ্র সম্ভব ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পাইতে পারে। পরিপূর্ণ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা-যুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অবশ্য তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

উপরোক্ত অভিমতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কমিশন ৪ বৎসর প্রাথমিক অথবা ৫ বৎসর নিম্ন বুনিয়াদীর পরবর্তী শিক্ষা স্তর হিসাবে (১) মধ্য অথবা নিম্ন মাধ্যমিক অথবা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর এবং (২) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ৪ বৎসর সুপারিশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, এই স্তরগুলির মধ্যে যেন সঙ্গতি বজায় থাকে—একটি স্তর হইতে অপর স্তরে প্রবেশকালে শিক্ষার্থী হঠাৎ কোনও পরিবর্তনের সম্মুখীন না হয় তাহা দেখিতে হইবে। কমিশন আরো বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী ভবিষ্যতে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের শিক্ষা সার্বজনীন হইবে, সেই হেতু এই ৮ বৎসরের শিক্ষাকালের মধ্যে যেন পরিপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হয় তাহা দেখা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের পথে মধ্যবর্তীকালীন অবস্থা। কমিশন দেখিয়াছেন যে, বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে একটি অধিক শ্রেণীভুক্ত ও বিভিন্ন-মুখী শিক্ষাক্রমযুক্ত বিদ্যালয়রূপে সংগঠিত করা সহজ নহে। ইহার

জন্য অধিকসংখ্যক শ্রেণী-ঘরযুক্ত ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে ও সকল রাজ্য তাহা দ্রুত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। এই জন্য কমিশন মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রচলিত ও নূতন ধরণের শিক্ষার একত্র প্রচলন অনুমোদন করিয়াছেন। কমিশন প্রচলিত বিদ্যালয়-গুলিতে পাঠ সমাপ্তির পর এক বৎসরকাল বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির সুপারিশ করিয়াছেন।

ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ভবিষ্যৎ। কমিশনের মতে ইণ্টার-মিডিয়েট মহাবিদ্যালয়গুলি সুবিধামত চারি বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা ও ৩ বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা এই উভয়বিধ ব্যবস্থার সংযোজন করিতে পারেন। যেগুলিতে মাত্র দুই বৎসরের ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহারা শিক্ষাকাল ৩ বৎসর করিয়া ডিগ্রী শিক্ষার কলেজে পরিণত হইতে পারে। যদি কোনও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সহিত উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকে, তবে ঐ কলেজের শেষের শ্রেণীটি উঠাইয়া দিয়া উহা বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ভাবে উহাকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা যায়। ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী শ্রেণীযুক্ত কলেজগুলিতে শেষ তিন বৎসরের শ্রেণীকে ডিগ্রী শিক্ষার শ্রেণীতে ও প্রথম বৎসরের শ্রেণীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানেচ্ছু প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারেন। যেহেতু দীর্ঘকাল-প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এই উভয়বিধ শিক্ষাই পাশাপাশি থাকিবে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-ইচ্ছুক প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের ঐরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে। ঐ শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে ইংরাজী শিক্ষায়, নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষার্জনের শিক্ষায় এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গমের উপযোগী শিক্ষায় এবং বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের সক্রিয়তা বোধগম্য হয় এমন শিক্ষায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এইরূপ প্রয়োজন আছে।

কমিশন অবগত হইয়াছেন যে, তাহাদের পর্যালোচনার পূর্বেই অনেক রাজ্যে একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে ও উহার ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অধিকতর সুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, ইহা ৪ বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা অর্জিত শিক্ষণের সুফল। এইরূপ শিক্ষণ শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধিক পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করে।

তিন বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা

কমিশনের মতে বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স থাকায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হয়। তা ছাড়া দুইটি পৃথক কোর্সের মধ্যে সংহতি স্থাপনও কিছুটা অসুবিধা ঘটায় এবং শিক্ষার্থীকেও নূতন ভাবে কোর্সের সহিত অভিযোজন করিতে অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই জন্য একটানা তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স অনেক সুবিধাজনক হইবে ও ইহাতে অধিকতর সফল শিক্ষা প্রদান করা যাইবে।

অতঃপর কমিশন বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে কি ভাবে এই নূতন পরিকল্পনার আওতায় আনা যাইবে, তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ইহার সম্বন্ধে কমিশন তাহার পূর্বের আলোচনার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল উচ্চ বিদ্যালয়কে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করা যাইবে না। যেগুলির পক্ষে শ্রেণী বাড়াইয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে সংগঠিত করা সময়সাপেক্ষ সেইগুলিতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলির সংস্কার-সাধন করিতে হইবে।—(ক) শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাক্রম বিষয়—ইহার বিষয় কমিশন পরে আলোচনা করিয়াছেন। (খ) শিক্ষাসহায়ক যন্ত্রপাতি পরীক্ষাগার ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা। (গ) উন্নত মানের শিক্ষক নিয়োগ। (ঘ) শিক্ষাক্রম পরিপূরক বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রবর্তন। (ঙ) যতদূর সম্ভব বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন। যে বিদ্যালয়গুলিকে এক বৎসরের পাঠ্যসময় বাড়াইয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে পরিবর্তিত করা হইবে, সেইগুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন তাহারা উক্ত ধরণের বিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হয়। এই জন্য ঐরূপ বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি-দানের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভালভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে :—(ক) উপযুক্ত গৃহ-সংস্থান আছে কিনা? (খ) উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম আছে কিনা? (গ) শিক্ষকের উপযুক্ত যোগ্যতাবলী আছে কিনা? (ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের হার ও স্কেল ঠিক আছে কিনা? (ঙ) কমিটি অথবা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিনা? শেষোক্ত বিষয়ে কমিশন স্থানান্তরে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়াছেন।

ডিগ্রী কলেজ। এই সম্বন্ধে কমিশন দেখিয়াছেন যে, অনেক রাজ্যে ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কোর্স একটি কলেজে শিক্ষাদান করা হয়। কমিশন বলেন, এই কলেজগুলিতে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স ও এক বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণদের ডিগ্রী কোর্সের জন্য প্রস্তুতিমূলক কোর্স প্রবর্তন করা হইবে। যে রাজ্যে দুই বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের পৃথক কলেজ আছে, সেখানে উহাকে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের জন্য একটি শ্রেণী বাড়াইতে হইবে।

বৃত্তিমূলক কলেজসমূহ। বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণই ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কৃষি, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতির কলেজে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। এইরূপ অভিমত পাওয়া যায় যে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণ ঐ সব কোর্সে যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান ও উপযোগিতার অধিকারী হয় না। এই জন্য কমিশনের মতে, (১) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণগণ অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণের পর এক বৎসর প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্তকারীগণ এই সব কোর্সে প্রবেশের জন্য আর এক বৎসর বিভিন্ন কোর্সের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা লইবার পর তবে ঐ সব কোর্সে পড়া শুরু করিতে পারিবে। এই বিশেষ কোর্স ঐ বিভিন্ন ধরণের কলেজের নিজ নিজ পরিচালনাধীনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহারা উহার ব্যবস্থা করিতে যদি অক্ষম হন, তবে যে সব ডিগ্রী কলেজে উহার সুযোগ আছে তাহাতেও ঐরূপ কোর্স প্রবর্তন করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে বিশেষ শিক্ষার উপযোগী ধারা যাহারা অনুসরণ করিবে, তাহাদের পক্ষে এই পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শিক্ষাদানের সময়সংক্ষেপ সম্ভব কিনা তাহা ঐরূপ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ দেখিবেন, ইহাই কমিশনের অভিমত।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কারিগরী ও অন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে কমিশন ইহাও বলিয়াছেন যে, অনেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর কয়েক বৎসরের জন্য কারিগরী ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভে আগ্রহী হইতে পারে, এবং তাদের জন্য পলিটেকনিক অথবা টেকনিক্যাল শিক্ষালয় (ইনষ্টিটিউশন) খোলার ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে। ইহার শিক্ষাকাল দুই বা ততোধিক বৎসরের হইবে। যাহারা উচ্চতর

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবে তাহারা ঐ শিক্ষাকালে যে বিশেষ বৃত্তি শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা ঐ কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের শ্রেণীতে সরাসরি ভর্তি হইতে পারিবে এবং সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথম বর্ষের শ্রেণীতে ভর্তি হইবে। এইরূপ পলিটেকনিক বা টেকনিক্যাল স্কুল ছাড়াও অবশ্য অনেকে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় বিভিন্ন টেকনিক্যাল বৃত্তিতে প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে।

বিভিন্ন ধারার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কমিশন বারবার যুক্তি প্রদর্শন-পূর্বক দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও আগ্রহ কদাচ একটি মাত্র বাঁধাধরা পথে বিকশিত হইতে পারে না। জাতির কল্যাণের জন্যও বিভিন্ন প্রকারের কর্মক্ষমতার বিকাশ প্রয়োজন। সংবিধান অনুসারে সকলেই ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিবে—ঐ শিক্ষা যদি একটি সংকীর্ণ পথেই চলে, তবে জাতির বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। এই জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্নমুখী বিকাশ-ধারার সমান স্থযোগ থাকা উচিত। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে যাহারা শিল্প কারিগরী অথবা ঐরূপ সম্পাদ্য কর্ম-শিক্ষার পথে অথবা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ের পথে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানসিক বিষয়গুলির মধ্যে প্রয়োজন হইবে না। সকলের জন্যই মূল কতকগুলি মানসিক বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া প্রত্যেকের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী অন্য কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় হইতে ইচ্ছামত পছন্দ করিবার স্থযোগ দিতে হইবে—যেন সাধারণ শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক স্তরেই তাহারা ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত জীবনের পথে অগ্রসর হইবার সহায়ক শিক্ষাও আহরণ করিতে পারে। এই শিক্ষাও তাহার পক্ষে মানসিক শিক্ষার সহায়ক হইবে—কারণ ঐরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়াই তাহারা জীবনের নীতি ও রীতিকে সম্যক আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাই ঐগুলি নিছক বৃত্তিমূলক শিক্ষাই নহে, ইহা তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সহায়কও বটে। এইরূপ বিভিন্নমুখী শিক্ষা সম্ভব মত ক্ষেত্রে একই বিদ্যালয়ে রাখা ভাল—কারণ ইহার দ্বারা কোনও একটি

শিক্ষাধারা অপর শিক্ষাধারা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট এইরূপ ধারণা নিবারিত হইবে এবং একে অপরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য গণতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা পরস্পরের সম্পর্ক নির্ধারিত হইবার সুযোগ পাইবে। দ্বিতীয়তঃ একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধারা (stream) থাকিলে কোনও ছাত্র যদি নিজ ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী ধারা নির্বাচনে ভুল করে তবে সহজেই তাহার সংশোধন করিতে পারিবে। কমিশন অবশ্য ইহার দ্বারা একটি বা দুইটি ধারাযুক্ত বিদ্যালয়কে নিরুৎসাহ করিতেছেন না—যেখানে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত, সেখানের চাহিদা অনুযায়ীই বিদ্যালয়ের ধারাগুলি নির্ধারিত হইবে, ইহাই কমিশনের অভিমত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে খুব গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫জন কৃষিজীবী—সুতরাং এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ ভাবে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করা উচিত বলিয়া কমিশন মনে করেন। বর্তমানে খুব কম বিদ্যালয়েই কৃষিকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে রাখা হইয়াছে এবং যেখানে আছে সেখানেও তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়—বাস্তবধর্মী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা খুবই কম আছে। তাহার পরিবর্তে কৃষিকে আনন্দদায়ক কাজ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে ও ইহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম হইয়া উঠে, এই ভাবে এই কাজ শিক্ষাদান করিতে হইবে। কমিশন মনে করেন যে, গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা-যুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকা উচিত অথবা বহুমুখী বিদ্যালয়-গুলিতে কৃষি-শিক্ষার বিশেষ ধারা (stream) থাকা উচিত। কমিশন মনে করেন যে, কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার সহিত বাগানের কাজ (Horti-culture) এবং পশু-পক্ষী পালনের কাজ যুক্ত হওয়া উচিত—কারণ শুধু কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোক বারো মাস কাজ না পাওয়ায় ঐ কাজগুলিও কৃষি-কার্যের আনুষঙ্গিক কাজরূপে গণ্য এবং উহাদের সহিত কৃষিকার্যের নিকট সম্বন্ধ। ইহা ছাড়াও কমিশন কোনও কুটির-শিল্প অথবা বিদ্যুৎ-চালিত হস্ত-শিল্প শিক্ষাও এই শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কারিগরী শিক্ষা

সাধারণ ভাবে কারিগরী শিক্ষার আলোচনা পূর্বে হইলেও কমিশন এই বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব

কারিগরী শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া অনেকে আশা করেন যে এদেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটিবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু কোনও দেশে কি পরিমাণ খনিজ সম্পদ আছে তাহার ওপর সেই দেশের শিল্পোন্নতি ততটা নির্ভর করে না যতটা করে সেই দেশের জনসাধারণের উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও কর্মোদ্যমের উপর। জাপান, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে খনিজ সম্পদ অপ্রচুর, কিন্তু সেই দেশের জনগণের চমৎকার কর্মক্ষমতার গুণে ঐ দেশগুলি শিল্প-সম্পদে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকার শিল্প-সম্পদ শুধু সেই দেশের খনিজ-সম্পদের ফল নহে, তাহাদের কর্মোদ্যম বিকাশকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার নিকটই উহা অধিকতর ঋণী। সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার পেটেণ্ট লওয়া হয়, যেখানে আমাদের দেশে লওয়া হয় মাত্র কয়েক শত।

শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে তাহার বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া উহাকে সমাজ-কল্যাণে নিযুক্ত করিতে উদ্বুদ্ধ করা। যদি আমাদের দেশের জনগণকে নিজেদের সামর্থ্য ও প্রচেষ্টাকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে আমরা পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত নিজেদের দেশকে কখনও সমপর্যায়ে তুলিতে পারিব না। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গে ইহা বলা চলে যে, প্রত্যেকে পরিকল্পনা করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রেই কারিগরী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগিতা রহিয়াছে। ইহা অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে নিজের প্রেরণায় ও শ্রমে কিছু উৎপাদন করিবার আনন্দ এবং মস্তিষ্ক ও হস্তের সুসম বিকাশ প্রদান করে।

কারিগরী শিক্ষার মূলগত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, অতীতেও অল্পবয়স্কগণ কারিগরী শিক্ষার কিছু কিছু সুযোগ লাভ করিয়াছে। তাহারা অভিভাবক অথবা কুশলী শিল্পীর অধীনে নানা শিল্প-কাজ করিয়াছে—যথা, ঘর মেরামত করা, মাঠে কাজ করা, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি। সুতরাং কারিগরী শিক্ষাও একটি স্বাভাবিক শিক্ষাধারা। ইহার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাগুলি চিনিতে ও বিকাশ ঘটাইতে পায় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বৃত্তিটি নির্বাচন করিতে পারে। এমন কি যাহারা কারিগরী কাজকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিবে না, তাহারাও ইহার মধ্যে আত্ম-তৃপ্তি ও পরবর্তী জীবনের উৎকৃষ্ট হবির (Hobby) সন্ধান পায়। ইহাতে লোকে সাধারণ ভাবে হস্তকুশলতার প্রতি যথোচিত অবহিত হয়, হাতের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। ভাল ভাবে কর্ম সম্পাদনার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাবোধ ও চেতনা বৃদ্ধি করে। অনেকে মিলিয়া কাজ করার মধ্য দিয়া প্রকৃত সহযোগিতা গড়িয়া উঠে। এই গুণগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, শুধু ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্য প্রস্তুতি হিসাবেই নহে, সাধারণ ভাবেই সকল শিক্ষার্থী কিছু পরিমাণে উৎপাদনাত্মক কর্মে হাতের ব্যবহার করিতে শিখিবে ইহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই জন্যই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরেই কিছু কিছু শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে চাহিয়াছেন।

কারিগরী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

অতঃপর কমিশন সংবিধান-নির্ধারিত ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে অবহিত করাইয়া উহার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষার উপযোগিতার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। সকলের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিলে শিক্ষাকেও এমন ভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন যেন সকল রকম ব্যক্তি নিজ নিজ প্রবণতা, ক্ষমতা ও কুশলতা অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পায়। ইহার পরিবর্তে যদি শিক্ষাকে একটি সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ রাখা হয়, তবে অনেক তরুণ শিক্ষাকে তাহার পক্ষে একটা নিরর্থক জবরদস্তি মনে করিবে ও সমগ্র দেশের পক্ষেও তাহা একটা অপব্যয় মাত্র হইবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষা

অতঃপর কমিশন শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত কারিগরী শিক্ষার সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক আলোক সম্পাত করিয়াছেন। ইহার প্রসার দ্বারা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর জ্ঞান-সম্পন্ন ও কুশলী কর্মী পাইবে, সুতরাং শিল্পগুলির বিকাশে উহা সহায়ক হইবে।

শিল্প-ব্যবস্থা ও কারিগরী শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে কমিশন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের হাণ্টার কমিশনের কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। বর্তমান কমিশনের ৭০ বৎসর আগেই উক্ত কমিশন বলিয়াছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টির ত্রুটি উল্লেখ করিয়া শিক্ষাকে এইভাবে মাত্র একমুখী না রাখিয়া তাহার মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোজন প্রয়োজন এবং যে রাষ্ট্র শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার লইয়াছেন তাহার কর্তব্য হইবে বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী সৃষ্টির ব্যবস্থা শিক্ষার মধ্যে রাখা। কিন্তু ৭০ বৎসর পূর্বে ঐ কমিশন উপরোক্ত অভিমত প্রদান করিলেও এই বিষয়ে বিশেষ কিছু অগ্রগতি ঘটে নাই। এই অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে কমিশন নিম্নলিখিতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

কারিগরী শিক্ষা ও হাণ্টার কমিশন

(১) আধুনিকতম কাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য-সরকারগুলির পক্ষ হইতে কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা।

অনগ্রসরতার কারণ

(২) কারিগরী শিক্ষাদানের উপযোগী সুশিক্ষক সৃষ্টির জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থার অভাব। এই শিক্ষকগণের পক্ষে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মানের সহিত কারিগরী শিক্ষার প্রয়োগশীল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৩) রাজ্য শিক্ষা-অধিকারগুলিতে কারিগরী শিক্ষার উপদেষ্টার অভাব— যাঁহারা জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও সুবিচারের সহিত একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা গঠন করিতে পারেন।

(৪) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতার অভাব। কতকগুলি বিদ্যালয় আছে শিক্ষা-অধিকারের অধীনে, আবার কতকগুলি আছে শ্রম-অধিকারের নিয়ন্ত্রণে, কতকগুলি আছে শিক্ষা-অধিকারের নিয়ন্ত্রণে।

(৫) অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য অনেক ভাল পরিকল্পনাও ব্যাহত হয়। যে কোনও কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত

যোগ্যতার একটি সর্বনিম্ন মান অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাহার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম, শিক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ।

উপরের অসুবিধাগুলি বিচার করিলে রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার বিস্তার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অতি সত্বর কয়েকটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিয়া ভাল কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম-সহযোগিতায় বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক ধরণের অথবা মাত্র কারিগরী শিক্ষার মডেল স্কুলসমূহ স্থাপন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া ঐরূপ শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের জন্য সহযোগিতার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন পরে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত সৈন্যবিভাগের লোকের জন্য যে পলিটেক্নিক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তাহাকে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে কাজে লাগানো যায়। কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন অন্যত্র আলোচনা করিয়াছেন।

কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ

কমিশন চারিটি ভিন্ন পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন :—

(১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের চারি শ্রেণীতে কারিগরী শিক্ষা।

বিভিন্ন ধরণের কারিগরী শিক্ষা

(২) যে সমস্ত শিক্ষার্থী অনুপযুক্ততা অথবা অর্থ-নৈতিক অসুবিধা হেতু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে অক্ষম, তাহাদের বৃত্তি শিক্ষা।

(৩) যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে কোনও পলিটেক্নিক অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা লইতে চাহে; তাহাদের ব্যবস্থা।

(৪) যাহারা উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কোনওটি অবলম্বনপূর্বক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য স্বল্প সময়ে বৈকালিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পছন্দমত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উন্নতিলাভের সুযোগ দান।

পূর্ব-বর্ণিত চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষার মধ্যে প্রথম প্রকারের শিক্ষা কোনও টেকনিক্যাল স্কুল অথবা বহুমুখী মাধ্যমিক স্কুলে হইতে পারে। ইহাতে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার সহিত (১) প্রয়োগ গণিত ও জ্যামিতিক 'অঙ্কনবিদ্যা', (২) কারখানার কলা-কৌশল সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান, (৩) যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কারিগরী সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির মূলে যে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ও প্রক্রিয়াসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা জন্মানো। এই শিক্ষার উপযোগী ছাত্র নির্বাচনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত নির্বাচন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ও মাধ্যমিক শিক্ষার মতই কোর্সের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা রাখিতে কমিশন উপদেশ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা কোনও শিল্প-বিদ্যালয়ে (school of Industry) অথবা ট্রেড্ বিদ্যালয়ে (যেখানে যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির কোনও ট্রেড শিক্ষা দেওয়া হয়) সেখানে প্রদত্ত হইবে ও উহার কোর্স হইবে ২ বৎসর। কোর্সের শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কোনও টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রদত্ত হইবে। ইহার শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর ও শিক্ষার শেষে ডিপ্লোমা প্রদত্ত হইবে।

চতুর্থ পর্যায়ের শিক্ষার জন্যই অধিক সংখ্যকের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে এবং বর্তমানে উহার কোনও ব্যবস্থা নাই। যদি ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তবে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ঐরূপ শিক্ষার সুযোগ সম্ভব হইবে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি বর্তমান প্রবল ঝোঁক অনেক কমিবে।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কমিশন বিশেষ ধরণের কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। বড় বড় সহরগুলিতে এই ধরণের কেন্দ্রীয় ইন্ষ্টিটিউট স্থাপন করিলে কয়েকটি বহুমুখী বিদ্যালয়ের সহিত তাহার সংযোগ স্থাপনপূর্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল অনুসরণকারীদের টেকনিক্যাল শিক্ষা এখানে দেওয়া যাইতে

পারে। পরে যখন ঐসব বহুমুখী বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল শিক্ষাদান ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে, তখন ঐ কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটেই পূর্ববর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কর্মরত শিক্ষার্থীদের উচ্চ কারিকরী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে।

শিল্পসমূহে নিযুক্ত নিপুণ কর্মীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে, এইরূপ কর্মী-শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হইতেছে ঐরূপ শিল্প-সংস্থাগুলি।

শিক্ষানবীশদের শিক্ষা

কারিগরী বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ ঐ সব শিল্প-সংস্থার উপযোগী কর্মীদের শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে, তাহারা শিল্প-সংস্থার শিক্ষানবীশ-কর্মী হিসাবে ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। এই জন্য টেকনিক্যাল স্কুলের শিক্ষার সহিত শিল্প-সংস্থার শিক্ষানবিশী শিক্ষার সংযোগেই প্রকৃত বৃত্তিশিক্ষার কাঠামো রচনা করিতে পারে। ইহার জন্য ১৪ বৎসরের পরে বিভিন্ন শিল্পের জন্য কয়েক বৎসরব্যাপী সুপরিকল্পিত শিক্ষানবিশী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সময়ে ঐ স্তরে শিক্ষানবিশগণ যেন টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সংযোগ রাখিয়া তাহাদের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে তাঁহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

এই ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে কোনও শিল্প-সংস্থাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার নিকটে টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল শাখাসমূহ গঠন করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীগণ টেকনিক্যাল-শিক্ষা ও শিক্ষানবিশী-শিক্ষা একত্রে সমাপ্ত করিবে এবং শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যধিক ভীড় কমিয়া যাইবে।

শিক্ষানবিশী শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। অনেক দেশেই শিল্প-সংস্থা-সমূহে শিক্ষানবিশী শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক। শিল্প-সংস্থাসমূহও এইরূপ শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থার সার্থকতা বুঝেন, কারণ ইহার মারফৎ তাহারা উপযুক্ত কর্মী সহজে লাভ করেন। এদেশের শিল্প-সংস্থাগুলিও এইরূপ ব্যবস্থার অনুকূল মত পোষণ করেন। সুতরাং এদেশেও শিল্প সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অনুরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশ গ্রহণের ব্যবস্থা-সম্বলিত আইন করা উচিত। ঐরূপ শিল্প-সংস্থাসমূহের ও কারিগরী বিদ্যালয়-

সমূহের মিলিত উদ্যোগেই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করা সম্ভব হইবে।

অর্থ সংস্থানের জন্য কমিশন "কারিগরী শিক্ষা-করের" প্রবর্তনের সুপারিশও করিয়াছেন। টেকনিক্যাল শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ সংকুলান প্রসঙ্গে কমিশন দেখাইয়াছেন যে, বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলি অকুশলী কর্মীদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় উহার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। টেকনিক্যাল শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে, তাহার অনেক গুণ অর্থ ঐরূপ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ফলে সাশ্রয় হইবে।

বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, ঐ সংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ডের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল টেকনিক্যাল হাইস্কুল ও জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে সেইগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন না, ঐ কাউন্সিল শুধু উচ্চ বিদ্যালয়ের পরবর্তী পর্যায়ের টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সহিত সংযুক্ত। ফলে উপরি-লিখিত বিভিন্ন ধরণের টেকনিক্যাল স্কুলগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোনও সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমানে ঐগুলিকেও কাউন্সিলের আওতায় আনা প্রয়োজন। কমিশন এই প্রসঙ্গে উক্ত অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অধীনে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা-সংক্রান্ত যে ছয়টি বোর্ড আছে, তাহাদের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টেকনিক্যাল শিক্ষার সহিত শিল্প-সংস্থাগুলির সহযোগিতাও একান্ত প্রয়োজন। কমিশন এই ব্যাপারে অধুনা-স্থাপিত আঞ্চলিক কমিটিগুলির এই ব্যাপারে উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া সমগ্র ভারতে ঐরূপ চারিটি আঞ্চলিক কমিটি স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। ঐরূপ আঞ্চলিক কমিটিতে অঞ্চলভুক্ত রাজ্যসমূহের শিক্ষা, শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, রেলপথ ও শ্রম বিভাগ—এই সকল বিভাগের প্রতিনিধি থাকিবে এবং আঞ্চলিক কমিটিভুক্ত অঞ্চলের কারিগরী ও শিক্ষানবিশী শিক্ষার পরিকল্পনাসহ সকল স্তরের কারিগরী শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করিবেন, কমিশন এই প্রস্তাব দিয়াছেন।

অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রকার টেকনিক্যাল বিদ্যালয় ছাড়াও এমন কতকগুলি বিদ্যালয় রহিয়াছে যাহারা ১১ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্কগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের আলোচনার বিষয়ভুক্ত বিবেচনায় কমিশন ঐগুলি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিত হইল।

পাবলিক স্কুল। কমিশন ভারতের পাবলিক স্কুল কনফারেন্স কর্তৃক স্বীকৃত ১৪টি পাবলিক স্কুল এবং ঐগুলি ব্যতীত পাবলিক স্কুলের পদ্ধতিতে পরিচালিত আরও কতকগুলি স্কুলের কথা বলিয়াছেন। ইহারা ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত পাবলিক স্কুলের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে। ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুল সম্বন্ধে আমরা জানি যে, ঐগুলির "পাবলিক" নামটি অত্যন্ত বিভ্রান্তি-কর, কারণ ঐগুলিতে ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানগণকে ভর্তি করা হয় এবং ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষিতগণ উচ্চ চাকুরীসমূহ লাভ করেন বেশী। কমিশনের নিকট এক দল এদেশে ঐরূপ বিদ্যালয় রাখার সার্থকতা, বিষয়ে যেমন তীব্র বিরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আর একদল উহার পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছেন। বিরোধীগণ মনে করেন যে, এইরূপ বিদ্যালয় গণতন্ত্রের সহিত সঙ্গতিহীন এবং এই বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষা-প্রাপ্তগণ সঙ্কীর্ণমনা বৃথাদম্ভকারী সাধারণ সমাজের প্রতি উন্নাসিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজের অনুপযোগী হইয়া উঠে। অপর দল মনে করেন যে, ইহারা সমাজের উচ্চপদগুলির উপযোগী নেতৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে। স্যার জন সার্জেন্ট মনে করেন যে, ইহার ছাত্রগণ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন একরোখা ও অনুদার হয় বটে, কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্বদান-ক্ষমতার অধিকারী ও দায়িত্ব-সম্পন্ন হয় এবং এই জন্য এইগুলির উপযোগিতা আছে। কমিশন মনে করেন যে, ঐরূপ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস নেতৃত্ব-ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের বিকাশের যথেষ্ট ব্যবস্থা

রহিয়াছে—অবশ্য ঐগুলিকে এই ধরণের বিদ্যালয়ের একচেটিয়া মনে করার কারণ নাই। অন্যান্য বিদ্যালয়েও ঐরূপ সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং তাহা যত দিন না পারা যাইবে ঐগুলি উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ বিদ্যালয়গুলিতেও যাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হয় এবং হস্তসম্পাদ্য কার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় ও স্বাতন্ত্র্যবোধ কমিয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়গুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং কেবল ধনীরা উহার সুযোগ পায়। সুতরাং ঐগুলির জন্য সরকারী ব্যয় কমাইয়া ৫ বৎসরের মধ্যে তাহা বন্ধ করিবার প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। তৎপরিবর্তে কিছু কিছু দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে ঐ বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ দিবার জন্য ভাতার ব্যবস্থা সরকার রাখিবেন, ইহাই কমিশনের অভিমত।

আবাসিক বিদ্যালয়। শিক্ষার আদর্শ হিসাবে শিক্ষার্থী গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয় এই তিনের সংস্পর্শে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবে ইহাই সঙ্গত। কিন্তু বর্তমানে অনেক অভিভাবক গৃহ-পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম নহেন এবং অনেক অভিভাবক বদলীর চাকুরী করেন বলিয়া একটি বিদ্যালয়ে স্থায়ী ভাবে সন্তানের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে অসুবিধায় পড়েন। এই জন্য আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজন রহিয়াছে। বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সকল পল্লীতে সম্ভব হইবে না। সুতরাং পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষার্থীকে রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষাক্রম নির্বাচনের সুযোগ দিতে গেলে এইরূপ আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বাড়িবে। তাই কমিশন এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে, এইরূপ বিদ্যালয়ের বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষকও যাহাতে ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের জীবনকে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করেন, তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আবাসিক দিবা বিদ্যালয়

কমিশন এই ধরণের বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। এই ধরণের বিদ্যালয় সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় না। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ সকালে ৮টায় আসিয়া সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থাকিবে, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন আহার ও বৈকালিক জলযোগ করিবে, লাইব্রেরী, খেলাধূলা ও অন্যান্য শিক্ষাক্রম-সহযোগী কাজকর্মে অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ পাইবে। অনেক

অভিভাবক ছাত্রদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের উপযোগী পরিবেশ প্রদানে সক্ষম নহেন, সুতরাং ইহা সেই সমস্যার অনেকখানি সমাধান করিবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংযোগ বাড়াইবে। খাদ্য সরবরাহ বিনামূল্যে সম্ভব না হইলেও কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে স্বল্প-ব্যয়ী খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা মারফৎ করা অসম্ভব হইবে না। কমিশনের মতে শিল্পাঞ্চলে যেখানে অধিকাংশ অভিভাবক খুব অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ পরিবেশে বাস করেন, তথায় এইরূপ বিদ্যালয় খুবই উপযোগী।

অনগ্রসরশীলদের জন্য বিদ্যালয়

কিছু সংখ্যক এমন শিক্ষার্থী থাকে, দেহের ও মনের বিকাশের দিকে যাহারা পিছিয়ে পড়ে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহারা ঠিকমত বিকশিত হইতে পারে না। প্রত্যেক রাজ্যে ঐরূপ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন বলিয়া কমিশন মনে করেন।

অন্ধ ও কালা-বোবাদের এবং রুগ্নদের জন্য বিদ্যালয়

এদেশের কয়েকটি অন্ধ বিদ্যালয় দেখিয়া কমিশন সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও অন্ধদিগকে সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, ঝুড়ি বোনা, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, সঙ্গীত প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। কমিশন আরো অধিক সংখ্যক ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন এবং ভারত সরকার যে সর্বভারতীয় ব্রেইলী সংকেতমালা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহার পোষকতা করিয়াছেন। কালা-বোবাদের শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় খোলার কথাও কমিশন বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ক্ষয়-রোগগ্রস্ত ও অনুরূপ রোগে আক্রান্ত বালক-বালিকাদের জন্য উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে শিক্ষা দিবার উপযোগী বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের কথা কমিশন বলিয়াছেন।

অবিচ্ছিন্ন অনুক্রমে শিক্ষার শ্রেণীসমূহ প্রবর্তন (Continuation Classes)

যদিও আমাদের সংবিধানে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, তথাপি এখনো এদেশে ঐ বয়স পর্যন্ত শিশুদের সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বেশী সময় লাগিবে। এখন মাত্র ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনই আশা করা যায়। কিন্তু ১১ হইতে ১৪

বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যদি কোনও রূপ বিদ্যালয়ের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহাদের ঐ প্রাথমিক শিক্ষাও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইবে। তাহা ছাড়া ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স বিকাশের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ—ঐ সময়ে কোনও বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই জন্য কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া যাহারা আর কোনও বিদ্যালয়ে পড়িতে সুযোগ পাইতেছে না, তাহাদের জন্য ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ-কর্মের পরে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টার শিক্ষা-ব্যবস্থা রাখার কথা কমিশন বলিয়াছেন এবং ঐরূপ স্বল্প সময়ের শ্রেণীর উপযোগী একটি পাঠ্যক্রম রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশনের এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা

কমিশন তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনায় ইতিপূর্বে কোথাও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কারণ কমিশনের মতে বর্তমানে এদেশে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান হারে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করিতেছেন—ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা, বাণিজ্য, অঙ্কন শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান, সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা বেশ ভালভাবেই নিজ-দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমাদের সংবিধানেও জাতি ধর্ম বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে চাকুরী-ক্ষেত্রে সমান অধিকার ঘোষণা করিয়াছেন, শুধু স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য অসুবিধা দূরীকরণের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। এই জন্য কমিশন স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা ও সমস্যা বিষয়েই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

কমিশন স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষভাবে নিযুক্ত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের অভিমত শুনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একদল মেয়েদের চাকুরী ক্ষেত্রে নিয়োগ পছন্দ করেন না—তাঁদের মতে স্ত্রীলোকের যথার্থ স্থান গৃহে। অপর দল সমাজের সকল স্থানেই মেয়েদের যোগ্য স্থানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উভয় দলই মনে করেন যে, মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সংযোগ এবং জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে মেয়েদের পক্ষে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষার উপযোগিতা কমিশন স্বীকার করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের সহিত

গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি শিখিবার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে কমিশন অভিমত পোষণ করিয়াছেন। উহাদ্বারা শিক্ষিত স্ত্রীলোক সামাজিক কর্তব্যের সহিত গার্হস্থ্য কর্তব্যের সমন্বয় করিতে সক্ষম হইবে। কমিশন স্ত্রীশিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন, উহা হইতেছে সহশিক্ষা। শৈশবের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সহশিক্ষা চলিতে পারে, ইহা সকলে মানিয়া লইলেও অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে। কমিশন এই বিষয়ে নিষেধ বা সমর্থন না করিলেও মনে করেন যে, সমাজের মনোভাবের ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী হইলে ইহা প্রবর্তন ঠিক হইবে না। অপর পক্ষে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সাপেক্ষ হইবে এবং ইহার ফলে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। কারণ এখনও অনেক রাজ্যে পুরুষের শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়, স্ত্রী-শিক্ষায় তাহা দেখা যায় না। কমিশন ইহার বিরোধী অভিমত প্রকাশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি সমভাবাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, যেখানে সম্ভব হইবে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিবে, কিন্তু অভিভাবকদের স্বীকৃতি থাকিলে সহশিক্ষা বা মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বাধা থাকিবে না। ঐরূপ সহশিক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলিতে কিছু সংখ্যক শিক্ষক যেন মহিলা হন এবং শিক্ষার্থিনী ও শিক্ষিকাদের জন্য যেন বিশ্রামাগার, শৌচাগার, খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রভৃতি পৃথক থাকে। এখানে যাহাতে বালিকাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সঙ্গীত, অঙ্কন ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং বালিকাদের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও সহযোগী কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকে তাহা দেখিতে হইবে, ইহাও কমিশনের অভিমত। যেখানে অল্পসংখ্যক মাত্র ছাত্রী ভর্তি হইবে সেখানেও অন্ততঃ এক জন শিক্ষিকা ও একজন মহিলা পরিচারিকা নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রীগণ কোনও রূপ অসুবিধা বোধ না করে। ঐরূপ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতেও মহিলা থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাষা শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষায় ভাষা শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারটিকে অনেকেই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিতেছেন। এই জন্য কমিশন এই বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন দেখিয়াছেন, বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার **৫টি ভাষা** শিক্ষার মধ্যে আলোচনা চলিতেছে—(১) **মাতৃভাষা** (২) **আঞ্চলিক ভাষা** (৩) **রাষ্ট্রভাষা বা কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা** (৪) **ইংরাজী** (৫) **সংস্কৃত আরবি পার্শী** প্রভৃতি **প্রাচীন ভাষা**। অনেক রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলে ১ম ও ২য় এবং কয়েকটি অঞ্চলে ১ম, ২য়, ৩য় একই ভাষা হওয়ায় উহা কোনও কোনও স্থলে ৪টি বা ৩টিতে মিলিত হইয়াছে। হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষারূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখানে ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও অদূর ভবিষ্যতে তাহার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ভিন্ন মত দেখা যায়। অনেকে ইহাকে বিশ্বভাষা হিসাবে দেখেন ও তাঁহাদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী ভাষা আবশ্যিক রাখিয়া উহার উন্নত মান বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে আবার ইহাকে আবশ্যিক ভাষারূপে রাখিবার বিপক্ষে। এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি কমিশন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংবিধানে আরো ১৫ বৎসর ইংরাজী ভাষাকে কেন্দ্রীয় ও আন্তঃরাজ্য-ভাষা এবং সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে ঐ কাল বৃদ্ধি করা হইবে বলা হইয়াছে। রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক ভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া অনেকেই ইহাকে আবশ্যিক ভাষারূপে শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। এখন অনেক রাজ্যে উহাকে আবশ্যিক করা হয় নাই এবং পরীক্ষার বিষয়রূপেও অনেক রাজ্যে উহা গৃহীত হয় নাই।

মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা লইয়া কমিশন আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন স্বীকার করেন যে, **মাতৃভাষাই** শিক্ষার বিশেষতঃ মাধ্যমিক **শিক্ষার বাহন** হওয়া উচিত। এই জন্য যাহাদের মাতৃ-ভাষা আঞ্চলিক ভাষা হইতে পৃথক, তেমন ছাত্রদের জন্য (যদি তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক হয়) বিদ্যালয়ে পৃথক ব্যবস্থা রাখা ও পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সঙ্গত বলিয়া কমিশন মনে করেন।

ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন দেখিয়াছেন যে, এখানে বিভিন্ন মত প্রচলিত। কমিশন মনে করেন, এক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা বিধেয়। মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখা ও আঞ্চলিক ও রাষ্ট্র ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান থাকা কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী বৃহত্তর জগতের উচ্চতর জ্ঞান আহরণের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের অধিক সুযোগ লাভ করে। অনেকে বলেন যে, সকলের জন্য ইহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কাহার জন্য ইহার প্রয়োজন হইবে তাহা মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্ধারণ করা যায় না। **প্রাচীন ভাষা**গুলির চর্চাও প্রয়োজন—যাহারা এই দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে ও যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরেই এই ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করা উচিত।

কমিশন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি বিদেশের ব্যবস্থাবলী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ সব দেশেও মাধ্যমিক স্তরে একাধিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

কমিশন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আহূত হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্মেলন দুইটিতে ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষা বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে কমিশন **ভাষা শিক্ষা বিষয়ে** নিম্ন **সিদ্ধান্ত** দিয়াছেন:—

(১) **মাতৃভাষাকে** অথবা **আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম** রূপে গ্রহণ করা হইবে—যেখানের আঞ্চলিক ভাষা ও মাতৃ-ভাষা ভিন্ন সেখানে সম্ভবমত ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে নতুবা আঞ্চলিক ভাষাকে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রেও মাতৃ-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতেই ইংরাজী ও হিন্দি এই দুইটি ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ও জুনিয়ার বেসিক স্তরের শেষেই এইগুলি সুরু করিতে হইবে। একই বৎসরে দুইটি ভাষা শিক্ষা সুরু না করিয়া পর পর বৎসর সুরু করা ভাল। যে অঞ্চলগুলিতে হিন্দী মাতৃ-ভাষা নহে, সেখানে এই ভাষার মোটামুটি ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে। সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রের জন্য ইংরাজীতেও মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া হইবে। যাহারা বিশেষ আগ্রহী তাহাদের জন্য পৃথক বিষয় হিসাবে অধিকতর জ্ঞানলাভের সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃ-ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্ততঃ আর একটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) ভাষা শিক্ষার বিশেষতঃ ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ও শিক্ষকগণের ঐ ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া কমিশন মনে করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

কমিশন তাঁহাদের অনুসন্ধান কালে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে যে সমলোচনাগুলির সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাকে নিম্ন কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা যায়।—

(১) বর্তমান পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ ধারণা-প্রসূত।

(২) ইহা পুস্তক-কেন্দ্রী এবং তত্ত্ব-সর্বস্ব।

(৩) ইহাতে উৎকৃষ্ট ও অর্থদ্যোতক বিষয়বস্তুর অভাব আছে, অপর পক্ষে ইহা অত্যন্ত গুরু-ভারযুক্ত।

(৪) ইহাদ্বারা বিকাশোন্মুখ কিশোরের বিভিন্নমুখী ক্ষমতা ও চাহিদার পূরণ হয় না।

(৫) ইহা অত্যন্ত পরীক্ষা-ভারগ্রস্ত।

(৬) ইহাতে কারিগরী ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ফলে শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করার স্থযোগ পায় না।

অতঃপর রিপোর্টে উক্ত ধারাগুলির দফাওয়ারী আলোচন করা হইয়াছে।

(১) **পাঠ্যক্রমের সংকীর্ণতা।** কমিশনের অভিমত এই যে ইহার কোনও উদ্দেশ্য নাই তাহা বলা চলে না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ—কলেজে প্রবেশের যোগ্যতা প্রদান করাই সেই উদ্দেশ্য। বর্তমান পর্যন্ত সেই ধারাই চলিয়া আসিতেছে যদিও ইতিমধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা নামটি পাল্টাইয়াছে এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ যোগ্যতা পরীক্ষা নাম হইয়াছে। যাহারা ঐ পরীক্ষা দেয় তাহারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আশা পোষণ করে। পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভের পর যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না, অর্থনৈতিক কারণেই তাহা করে না। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম দ্বারাই প্রভাবিত হয়। যে সব বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়ক নয়, সেই সব বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিলেও তাহাদের জনপ্রিয়তায় অভাব দেখা যায়। ইহার জন্য মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সহিত সঙ্গতি রাখার প্রয়াস দেখা যায়। ইহার আর একটি কারণ সরকারী কাজের যোগ্যতা নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান। কমিশন স্থানান্তরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পাঠ্যক্রমের সংকীর্ণতা

(২) এই শিক্ষা অত্যন্ত বেশী **পুস্তকাশ্রয়ী** এবং কমিশনের মতে উপরে লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বই ইহার প্রধান কারণ। স্বভাবতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বেশী তাত্ত্বিক ও পুস্তকাশ্রয়ী হইবে। মাত্র ৫০ বৎসর হইল বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কিছু কিছু প্রয়োগধর্মী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, তথাপি ঐ শিক্ষায় পুস্তকাশ্রয়ী ও তাত্ত্বিক জ্ঞানই প্রধান হইয়া আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা ভিন্ন রূপ হওয়া উচিত, কারণ এই বয়সে শিক্ষার্থী ঐরূপ তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের উপযোগী মানসিক ক্ষমতা অর্জন করে না।

পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষার উপর গুরুত্ব

অনেক শিক্ষার্থী তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের উপযোগী মানসিক বৃত্তির অধিকারী না হইতে পারে, সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও না লইতে পারে। যাহারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ নিছক তাত্ত্বিক জ্ঞান বিশেষ সহায়ক হইবে না। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার এই দিকটি বিবেচিত হইয়াছে এবং সেখানে শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখী বিকাশ-প্রবণতার পরিবেশরূপে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচিত হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা ও শিক্ষাকে বাস্তব জীবনাশ্রিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর পক্ষে **অত্যন্ত গুরুভার** হইয়া পড়িয়াছে, এই সমালোচনা সঙ্গত বিবেচিত হয়। উহাকে আরো ভারাক্রান্ত করিলে ভাল অপেক্ষা মন্দই হইবে। সুতরাং পাঠ্যক্রমে নূতন নূতন বিষয় ও বিষয়বস্তু সংযোগ করার পরিবর্তে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে উহার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(৩) কমিশন এই জন্য ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি পরস্পর সম্বন্ধিত বিষয়কে 'সমাজ-বিদ্যা' এবং পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে 'সাধারণ বিজ্ঞান' এইভাবে বিষয়ের সংখ্যা কমাইয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানকে অপেক্ষাকৃত জীবন-সম্পর্কযুক্ত করিয়া তোলার কথা বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাৎপর্যহীন অসংখ্য জ্ঞান দিবার পরিবর্তে অধিক তাৎপর্যযুক্ত জ্ঞানকে ভাল ভাবে উপলব্ধি করার প্রতি গুরুত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশনের মতে পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ-সৃষ্টি ও জ্ঞানলাভের কৌশল আয়ত্ত করার দিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জীবনের জন্য সব প্রয়োজনীয় জ্ঞান পরিবেশন করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ মনোভাবদ্বারা পরিচালিত হইলে পাঠ্যক্রম অযথা ভারাক্রান্ত ও শিশুদের প্রকৃত বোধক্ষমতা ও জ্ঞানাগ্রহ বিকাশের প্রতিকূল হইবে। এই জন্য কমিশনের মতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের হাতে পাঠ্যক্রম রচনার ভার দেওয়ার পরিবর্তে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই পাঠ্যক্রম রচনা হওয়া ভাল। কারণ তাহারা শিশুর জ্ঞানাগ্রহ ও বোধশক্তির উপর অধিকতর অবহিত হইতে পারিবেন। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠ্যক্রম রচনার জন্য সমীক্ষা

পাঠ্যক্রম অযথা ভারাক্রান্ত

গ্রহণ ও ফলাফল পর্যালোচনা করা ও উহার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের ক্রমোন্নতি সাধনের কথা বলিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বুরো বা বোর্ড স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। জ্ঞানলাভের সময় সমগ্র জীবন। সুতরাং মাত্র শিক্ষাকালেই সব কিছু জ্ঞান গলাধঃকরণ করাইতে হইবে, এই মনোভাব দ্বারা শিক্ষাক্রমকে অহেতুক গুরুভার ও বিরক্তিজনক করিয়া তোলার প্রয়োজন নাই, ইহাই কমিশনের অভিমত। যদি আনন্দের সঙ্গে ও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির দ্বারা সামান্য জ্ঞানও তাহারা লাভ করে, তাহা জীবনের সহিত সঙ্গতিহীন ও অনুপলব্ধ অনেক এলোমেলো জ্ঞান অপেক্ষা অনেক ভাল। কারণ প্রথমটি দ্বারা তাহাদের যথার্থ জ্ঞানাগ্রহ সৃষ্টি হইবে, দ্বিতীয়টি তাহাদের জ্ঞানাগ্রহকে খর্বই করিবে। শিক্ষাক্রম রচনায় এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

(৪) বর্তমান শিক্ষার ক্রম সম্বন্ধে আর একটি সঙ্গত সমালোচনা এই যে, ইহাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্ফূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই**। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষায় ইহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত ঝোঁকের অভাব

পূর্বে মনে করা হইত, ১১ বৎসর বয়সে এইরূপ ব্যক্তিগত ঝোঁক ঠিকমত বিকশিত হয়—এখন তৎপরিবর্তে ঐ বয়সকে ১৩ বৎসর মনে করা হয়। যাহা হউক, বিদ্যালয়ে নানা ধরণের শিক্ষা-কার্য থাকিলে তবেই শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁকটি ঠিকমত চিনিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই ভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করিবে। অন্যান্য দেশে এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠিত করা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও মডার্ণ স্কুল এই ভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতার সুযোগ দিতেছে মনে করা হয়, যদিও ঐ ব্যবস্থা ত্রুটিহীন নহে। যাহা হউক, মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রমের সহিত কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার পোষক পাঠ্যক্রমেও থাকা উচিত।

(৫) বর্তমান পাঠ্যক্রমের আর একটি ত্রুটি ইহাতে **পরীক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক** মাত্রায় বেশী। কমিশন অন্যত্র ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পরীক্ষার গুরুভার

(৬) বর্তমান পাঠ্যক্রমের আর একটি ত্রুটি এই যে, ইহাতে **টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বিশেষ নাই**। অনেকেই মাধ্যমিক

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ও বৃত্তি অনুসরণ করিবে। তাহাদের পক্ষে বৃত্তিগুলির প্রতি উপযুক্ত মনোভাব গড়িয়া উঠা তাই প্রয়োজন। শিক্ষার সহিত বৃত্তির সংযোগ থাকিলে তাহাদের কাছে বৃত্তিটি আনন্দদায়ক হইবে ও তাহারা আত্মবিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা প্রয়োজন।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার অভাব

পাঠ্যক্রম রচনা করিবার মূল নীতি

অতঃপর কমিশন কর্তৃক শিক্ষাক্রম রচনার মূল নীতিগুলি আলোচিত হইয়াছে। কমিশন এই বিষয়ে **৫টি নীতির** উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম নীতি হইতেছে, শিক্ষাকে শুধু মাত্র **পুস্তকাশ্রয়ী না করিয়া** শিক্ষার্থীর সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার আশ্রয় করিয়া তুলিতে হইবে এবং নানা কাজকর্ম, খেলাধুলা, শ্রেণী, পাঠাগার, পরীক্ষাগার, কর্মশালা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা এই সবগুলিই ঐরূপ অভিজ্ঞতার সুযোগ দিবে।

দ্বিতীয় নীতি হইতেছে, শিক্ষার্থীর রুচি ও আগ্রহ বিভিন্ন ধরণের, ইহা মনে রাখিয়া শিক্ষাকে একমুখী সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ না রাখিয়া **বিভিন্ন রুচি ও প্রবণতাযুক্ত শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ** ঘটিতে পারে, এমন সুযোগ-সুবিধা পাঠ্যক্রমে রাখিতে হইবে। অবশ্য কতকগুলি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সকলের প্রবেশাধিকার দানের প্রয়োজন আছে—অবশ্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি কতখানি সকলের জন্য অবশ্য গ্রহণীয় হইবে তাহা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সামর্থ্য বিচারপূর্বক নির্ধারণ করিতে হইবে। যাহারা ঐ সব বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের সামর্থ্য রাখে তাহারা অধিক জ্ঞানের সুযোগ পাইবে।

তৃতীয় নীতি হইতেছে, শিক্ষাকে **সমাজ-জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ** করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন স্থিতি স্থাপকতা থাকা প্রয়োজন যেন তাহা বিশেষ বিদ্যালয়ের সমাজ-পরিবেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত করিয়া লইবার সুযোগ পায়।

চতুর্থ নীতি হইতেছে, শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শুধু কর্মজীবনের যোগ্যতা প্রদান নয়—সে যেন তাহার **অবসরকেও সর্বাপেক্ষা আনন্দময়**

ও সৃজনধর্মী করিয়া তুলিতে পারে তাহার শিক্ষাও শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত করা প্রয়োজন। কারণ মানুষের জীবনে অবসরের স্থান মোটেই গৌণ নহে।

পঞ্চম নীতি হইতেছে—শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তাহারা **সামগ্রিকভাবেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে,** এই কথা মনে রাখিতে হইবে এবং বিষয়বস্তুগুলি যেন সেইরূপ সামগ্রিকতার সহায়ক হয়, তাহা দেখিতে হইবে।

উপরিউক্ত মূলনীতিগুলিকে ভিত্তি করিয়া কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার খসড়া পাঠ্যক্রম রচনার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে নিম্ন মাধ্যমিক ও তৎপরে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি হইতেছে প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী শ্রেণীর পরের ৪ বা ৩ বৎসরের শ্রেণীগুলি। ইহার বর্তমান দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে—উচ্চ বুনিয়াদী ও মধ্য বিদ্যালয় (Middle School)। পরে এই উভয় প্রকার বিদ্যালয় একই ধরণের বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে অর্থাৎ সবগুলিই হইবে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। তাই কমিশন মনে করেন যে, পাঠদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে পাঠদানের পার্থক্য থাকিলেও এখন ইহাদের মধ্যে একই পাঠ্যক্রম অনুসৃত হওয়া উচিত। আবার প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সহিত প্রথম দিকে ইহার সঙ্গতি স্থাপন প্রয়োজন। এই স্তরের পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করানো ততটা নহে যতটা তাহাদিগকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সহিত জ্ঞান-রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির পরিচয় করানো। স্বভাবতঃই ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ-পরিচিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহার অন্তর্গত হইবে। কিন্তু ইহা ব্যতীত এমন কতকগুলি বিষয় ইহার অন্তর্গত করিতে হইবে যেগুলিকে বর্তমানে ঐগুলির মত সহজ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এইগুলি হইতেছে শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প। ঐতিহাসিক বিচারে এইগুলি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলি অপেক্ষা প্রাচীনতা এবং গুরুত্বের দাবী করিতে পারে। ইহারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক-জীবনের বিকাশে অতি প্রয়োজনীয় সহায়। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও আনুভূতিক বিকাশে এইগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

শারীর-শিক্ষা বিষয়ে কমিশন পৃথকভাবে আলোচনা করেন নাই বলিয়া ইহার গুরুত্ব কম নহে। ইহাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হইবে—কিন্তু ইহাকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে না দেখিয়া বিদ্যালয়ে সকল কার্যকেই এই দিকটির ব্যবহারিক প্রয়োজনীতা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা করিতে হইবে, কারণ দেহ বাদ দিয়া কোন কিছুই সম্ভব নহে।

এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্ন স্তরের শিক্ষায় মানুষের জীবনের ও জ্ঞানরাজ্যের সকল দিকগুলির সহিত সাধারণ ভাবে পরিচিতির উপর কমিশন গুরুত্ব দিয়াছেন এবং "সাধারণ ভাবে" কথাটির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে বলিয়াছেন। উহার দ্বারা কমিশন শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও উপলব্ধির বিষয় করিয়া তোলার দিকে সচেতন থাকিয়া পাঠ্যসূচী নির্বাচনের কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। পাঠ্যক্রমকে "মৃত জ্ঞানের টুকরার স্তূপ" করিয়া না তুলিয়া ইহাকে মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশধারার সহিত জীবন্ত পরিচিতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ সাধন করিতে হইবে, ইহাই কমিশনের অভিমত।

উপরোক্ত বিচার অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্ন স্তরটির জন্য কমিশন নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি রাখিয়াছেন।

১। ভাষা ২। সমাজবিদ্যা ৩। সাধারণ বিজ্ঞান ৪। গণিত ৫। কলা ও সঙ্গীত ৬। হস্তশিল্প ৭। শারীর শিক্ষা।

ভাষার মধ্যে মাতৃ-ভাষা হইবে শিক্ষার মাধ্যম এবং একটি শিক্ষণীয় বিষয়। যেখানে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা এক নহে, সেখানে আঞ্চলিক ভাষাও শিখাইতে হইবে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে না পারিলে উহাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী শিক্ষাও এই পর্যায়ে শিখাইতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষাও এই পর্যায়ে সুরু হইবে, তবে হিন্দী ও ইংরাজী একই সঙ্গে শুরু না করিয়া পর পর বৎসরে শুরু করা হইবে। ইংরাজীকে অবশ্য আবশ্যিক শিক্ষার বিষয় করিতে হইবে না। যদি কোনও অভিভাবক উহা শিখাইবার প্রয়োজন নাই এই অভিমত জ্ঞাপন করেন, তবে সে ক্ষেত্রে উহা হইতে ছাত্রটিকে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব কমিশন দিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন যে, এই পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়াও দুইটি ভাষা শিক্ষা একটু গুরুভার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের মত বহুভাষা-ভাষী দেশে এই অসুবিধা থাকিবেই। কমিশন মাতৃ-ভাষার বেশ কিছুটা দখলের পরই অন্য ভাষা

শিক্ষা শুরু করার পক্ষে বলিয়াছেন। কমিশন শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প শিক্ষার উপযোগিতার কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে সকল শিশু সমান যোগ্যতার পরিচয় দিবে আশা করা যায় না, কিন্তু এইগুলি তাহার সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হইবে। হস্ত-শিল্পশিক্ষা বিষয়ে কমিশন স্থানীয় প্রচলিত হস্ত-শিল্প মাধ্যমে স্থানীয় সমাজ-জীবনের ও রীতি-নীতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিবে, এই বিষয়টির প্রতি অবহিত করিয়াছেন।

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা

অতঃপর কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, এই পর্যায়ের ছাত্রগণের অনেকখানি মানসিক শিক্ষা ঘটিবে, সুতরাং এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম অনুসরণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যেহেতু এখনো পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন উপযোগী পাঠ্যক্রম বাছিয়া দিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই, সেই জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত বাছিয়া লইবার সুযোগ দিতে হইবে। কমিশন বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমদ্বারা সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞের শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে চাহেন না—সাধারণ ভাবে বিকাশের সহিত তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষণীয় ধারা অনুসরণ করিয়া ঐ দিকে তাহাদের কর্মক্ষমতাকে বিকশিত করিবার সুযোগ রাখিতে চাহিয়াছেন। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শতকরা ৭০।৭৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র না পড়িয়া জীবনে প্রবেশ করিবে, সুতরাং এই পর্যায়ে জীবন-যাপন ও জীবিকা অনুসরণের সহায়ক শিক্ষাও দিতে হইবে। শিক্ষার্থী যে দিকে বিশেষ প্রবণতা অনুভব করে সেই ভাবেই যেন জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতির সুযোগ লাভ করে, তাই এই বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। কেহ যান্ত্রিক শিক্ষার প্রতি, কেহ কারিগরী শিক্ষার প্রতি, কেহ কৃষির প্রতি, কেহ বাণিজ্যের প্রতি প্রবণতা দেখাইবে—শিক্ষার্থীকে সেই সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান, ঝোঁক ও ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং ঐ বিষয়গুলিকেও শিক্ষার্থীর সাধারণ জ্ঞান অর্জন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক করিয়া

তুলিতে হইবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতিকেও সাধারণ শিক্ষার সহায়ক মনে করা হয়—সংস্কৃতিকে বর্তমানে পূর্বের মত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। সুতরাং এইরূপ মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিছক বৃত্তি-মূলক শিক্ষা মনে করিলে গুরুতর ভুল হইবে। কমিশন এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রম রাখার সময়ে ইহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের শিক্ষার সহিত সঙ্গতি স্থাপনের বিষয়েও অবহিত হইতে বলিয়াছেন। কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সঙ্গতি রাখার কথাও বলিয়াছেন। কমিশনের মতে পাঠ্যক্রমগুলিতে সংযুক্ত বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে সাঙ্গীকৃত করার খুবই প্রয়োজন—পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিলে তাহা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয় না। এই জন্য কমিশন কতকগুলি বিষয়গুচ্ছ একত্রিত করিয়া পাঠ্য-ক্রমের এক একটি ধারা রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষক ও অভিভাবকের সাহায্য ব্যতীত উপযোগী ধারাটি নির্বাচন সহজ নহে। এই জন্য কমিশন ছাত্রদিগকে ধারা নির্ধারণে সাহায্য করিবার উপযোগী শিক্ষকের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও এই বিষয়ে স্থানান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর কমিশন এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া রচনা করিয়াছেন ও আশা করিয়াছেন যে রাজ্য-শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক ঐ খসড়া অবলম্বনে বিস্তারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী রচিত হইবে প্রধানতঃ অনুসন্ধান ও তথ্যের ভিত্তিতে।

উপরি-উক্ত পাঠ্যক্রমের খসড়াটি নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক। (১) মাতৃ-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃ-ভাষা ও প্রধান ভাষার মিলিত কোর্স।

(২) নিম্নলিখিতগুলির মধ্য হইতে নির্ধারিত আর একটি ভাষা—

(i) হিন্দী—(যাহাদের মাতৃ-ভাষা হিন্দী নহে তাহাদের জন্য)

(ii) প্রাথমিক ইংরাজী—(যাহারা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী শেখে নাই তাহাদের জন্য)

(iii) অধিকতর ইংরাজী জ্ঞান—(যাহারা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী শিখিয়াছে তাহাদের জন্য)।

(iv) আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দী ছাড়া)

(v) আধুনিক বৈদেশিক ভাষা (ইংরাজী ছাড়া)

(vi) প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি)

খ। (i) সমাজ-বিদ্যার সাধারণ কোর্স (প্রথম দুই বৎসরের জন্য)

(ii) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত—সাধারণ কোর্স (প্রথম দুই বৎসরের জন্য)

গ। একটি শিল্প যাহা প্রদত্ত তালিকা হইতে নির্ধারিত করিতে হইবে (তালিকাটিকে প্রয়োজন বোধে বাড়ানো যায়)

(i) কাতাই ও বোনাই (ii) কাঠের কাজ (iii) ধাতুর কাজ (iv) কাগজের কাজ (v) সীবন শিল্প (vi) টাইপের কাজ (vi) কারখানার শিক্ষা (vii) সূচীশিল্প (viii) মডেলের কাজ।

ঘ। নিম্নলিখিত যে-কোনও একটি গ্রুপ হইতে গ্রুপভুক্ত তিনটি বিষয় নির্বাচিত করিতে হইবে :—

গ্রুপ ১—(**মানবিক বিদ্যাসমূহ**)—(i) ক এর (ii) হইতে একটি তৃতীয় ভাষা (যাহা লওয়া হয় নাই) অথবা কোনও প্রাচীন ভাষা (ii) ইতিহাস (iii) ভূগোল (iv) প্রাথমিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি (v) প্রাথমিক মনোবিদ্যা ও তর্কবিদ্যা (vi) গণিত (vii) সঙ্গীত (viii) গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান।

গ্রুপ ২—(**বিজ্ঞান**)—(i) পদার্থবিদ্যা (ii) রসায়ন (iii) জীব-বিদ্যা (Biology) (iv) ভূবিদ্যা (v) গণিত (vi) প্রাথমিক শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (Biology লইলে ইহা লওয়া চলিবে না)

গ্রুপ ৩—(**কারিগরী**)—(i) ফলিত গণিত ও জ্যামিতিক অংকন (ii) বিজ্ঞান (iii) প্রাথমিক যান্ত্রিক (mechanical) ইঞ্জিনিয়ারিং (iv) প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

গ্রুপ ৪—(**বাণিজ্য**)—(i) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিদ্যা (ii) বুক কিপিং (iii) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরনীতি (iv) সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং।

গ্রুপ ৫—(**কৃষি**)—(i) সাধারণ কৃষি (ii) পশুপালন (iii) উদ্যানরচনা ও সব্জীচাষ (iv) কৃষি-রসায়ন ও উদ্ভিদ-বিদ্যা।

গ্রুপ ৬—(**চারুকলা**)—(i) শিল্পকলার ইতিহাস (ii) অংকন ও নক্সা অংকন (iii) চিত্রাঙ্কন (iv) মডেলিং (v) সঙ্গীত (vi) নৃত্য।

গ্রুপ ৭—(i) **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান**—গার্হস্থ্য অর্থনীতি (ii) পুষ্টিবিজ্ঞান ও রন্ধনবিদ্যা (iii) মাতৃত্ব-বিদ্যা ও শিশু-পালন (iv) গৃহ-পরিচালন ও গার্হস্থ্য শুশ্রূষা।

ঙ। উপরে নির্বাচিত বিষয়গুলি ব্যতীত শিক্ষার্থী যে কোনও গ্রুপ হইতে আর একটি বিষয় নির্বাচিত করিতে পারিবে (ঐচ্ছিক)।

উপরোক্ত পাঠ্যক্রমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভাষা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষা ব্যতীত আর একটি ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবে শিখিতে হইবে। উহা ইংরাজীও হইতে পারে হিন্দীও হইতে পারে। অবশ্য যাহারা দেশী ভাষার প্রতি বেশী অনুরাগী হইবে তাহারা তৃতীয় আর একটী ভাষা এবং বিভাগ অনুসারে আরো একটি ভাষা লইবার সুযোগ পাইবে।

যাহারা সমাজবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানের সমতুল্য বিষয় নির্বাচিত করে নাই, তাহারা সকলেই **সমাজ বিদ্যা** ও **সাধারণ বিজ্ঞানের** একটি সাধারণ পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিবে। এই দুইটি বিষয় এবং ভাষা ও শিল্প এই বিষয়গুলি **মৌল বিষয়** (Core subject) রূপে পরিগণিত হইবে। সমাজবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী হইবে সাধারণ ধরণের এবং উহা প্রথম দুই বৎসর অনুসৃত হইবে, শেষ পরীক্ষণীয় বিষয় হইবে না। ইহাদের দ্বারা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ঐ বিষয়গুলিতে জ্ঞানকে পরিণতি প্রদান করা হইবে।

যাহারা **মানবিক বিদ্যা** গ্রুপের ইতিহাস ভূগোল বা অর্থবিদ্যা গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সমাজ-বিদ্যা আর পড়িতে হইবে না, শুধু সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। তেমনি যাহারা বিজ্ঞান বা কারিগরী বা কৃষিবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিজ্ঞানের বিষয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে আর সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে হইবে না, শুধু সমাজবিদ্যা পড়িতে হইবে। অনুরূপ ভাবে বাণিজ্যিক বিভাগের যাহারা অর্থনৈতিক ভূগোল বা প্রাথমিক অর্থনীতি পড়িবে তাহারা ঐখানে সমাজবিদ্যার কিছু অংশ পড়ে, অতএব তাহাদিগকে সমাজবিদ্যা পড়িতে হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকে সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে হইবে।

শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে শিল্পের অর্থকরী দিকটি বিবেচনা-যোগ্য হইলেও ইহাকে পাঠ্যক্রমভুক্ত করার উহাই একমাত্র কারণ নহে। ইহাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গণ্য করিতে হইবে। কারণ

এই স্তরে শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়া অর্থনীতি, ফলিত বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান, রুচিবোধ, কর্মক্ষমতা, পরিকল্পনা করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিকশিত হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষা অনুসৃত হইয়াছে, এই স্তরে সেই বিজ্ঞানই লইতে হইবে এমন বাঁধাধরা নিয়ম রাখার প্রয়োজন নাই।

শিল্পশিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের অভাবের কথা কমিশন আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পে কুশলতা এবং শিল্পের বৌদ্ধিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান এই উভয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। যতদিন ঐরূপ শিক্ষক না পাওয়া যাইবে, ততদিন এক বা একাধিক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া ঐ শিল্পকাজে কুশলী ব্যক্তিকে শিল্পশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু পরে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পশিক্ষক যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অতঃপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক বলিয়াছেন যে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন দ্বারাই শিক্ষার পরিবর্তন সূচিত হয় না—এই জন্য সকলের পূর্ণ সহযোগিতা ও তৎপর্য্যের উপলব্ধি প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ কোনও পাঠ্যক্রমই ত্রুটিহীন হয় না—অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহার ক্রমশঃ উন্নয়ন সম্ভব। এই জন্য কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে পাঠ্যক্রম অধিকতর ত্রুটিহীন ও আদর্শগত করার কাজে শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহের ও শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবার জন্য প্রতি রাজ্যে গবেষণালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।

অতঃপর কমিশন পুনরায় ভাষা, সমাজ-বিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। কমিশনের মতে মাতৃভাষা শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলে উহা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে প্রভূত সাহায্য করিতে পারে। ইহাকে নীরস শব্দসম্ভার ও ব্যাকরণের জ্ঞান লাভের শিক্ষা হিসাবে যেন না দেখা হয়। ইংরাজী হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকটিকেই কমিশন গুরুত্ব দিতে বলিয়াছেন।

সমাজ বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাকে পুঁথিসর্বস্ব ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সংগ্রহের শিক্ষা না করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানাগ্রহ, সমাজ-চেতনা ও নাগরিকতা-বোধের সৃষ্টির শিক্ষারূপে সংগঠিত করিতে বলিয়াছেন এবং এই জন্য উন্নত শিক্ষাদান-পদ্ধতির অনুসরণের কথা বলিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে পদার্থবিদ্যা রসায়ণবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক

বিষয়সমূহের জ্ঞানের সমাহাররূপে না দেখিয়া শিক্ষার্থীর পরিবেশ সম্বন্ধে জীবন্ত আগ্রহসহায়ক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-ক্ষমতার বিকাশ-সহায়ক বিষয়রূপে সংগঠিত করার কথা বলিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য হইবে—অসংলগ্ন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ বা কতকগুলি তত্ত্বের সহিত ভাসা ভাসা পরিচয় নহে।

নবম পরিচ্ছেদ

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন পাঠদান-পদ্ধতির উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা একটি পৃথক অনুচ্ছেদে মাধ্যমিক স্তরে গতিশীল শিক্ষাদান-পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

(১) শিক্ষাদান-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু জ্ঞান দান যথেষ্ট নহে—শিক্ষার্থীর উপযুক্ত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা ও তাহাদিগকে সক্রিয় করিয়া তোলাও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

(২) শিক্ষার্থীরা যাহাতে তাহাদের কাজে আনন্দ বা রস পায় এবং নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া কাজকে সুসম্পন্ন করিয়া তোলে, সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

(৩) বর্তমানে শিক্ষাদান ব্যাপারে শব্দ ও ভাষার প্রকাশের দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই জন্য স্মৃতিশক্তির ব্যবহার বেশী ঘটে। ইহার পরিবর্তে উপলব্ধিকরণ ও সম্পাদনের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে। এই জন্য কমিশন "কর্মকেন্দ্রী-পদ্ধতি" (activity method) ও "কর্ম সমস্যা পদ্ধতি" (project method) অনুমোদন করিয়াছেন।

(৪) শিক্ষার্থীরা যাহা শিখিবে তাহা যেন সম্পাদন করার সুযোগ এবং এই ভাবে আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায়, তাহা দেখিতে হইবে।

(৫) শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তা যেন সুস্পষ্ট হয় এবং কথ্য ও লিখিত রূপে তাহা ভাল ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে।

(৬) অনেক বিষয়বস্তু শেখানোর পরিবর্তে শিক্ষার প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে যেন তাহারা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারে ও নিজের চেষ্টায় লিখিতে শেখে, তাহা দেখিতে হইবে।

(৭) তীক্ষ্ণ-মেধা, সাধারণ-মেধা এবং স্বল্পমেধা—এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিকাশ যেন এক শ্রেণীর জন্য অপর শ্রেণীর ব্যাহত না হয়, তাহার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

(৮) শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এবং ঐ ভাবে দলগত জীবন ও সহযোগিতামূলক কাজের শিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৯) বিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী থাকিবে ও শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরী ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে। তাহারা বাহিরের লাইব্রেরীর সুযোগ যাহাতে পায়, তাহার জন্য পাবলিক লাইব্রেরীতে ছাত্রবিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১০) লাইব্রেরীগুলিতে আগ্রহশীল ও শিক্ষনপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ ও তাহাদের মাঝে মাঝে শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় এবং এই জন্য ট্রেনিং কলেজ মারফৎ ও রিফ্রেসার কোর্স মারফৎ শিক্ষকদিগকে লাইব্রেরী বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান করা উচিত।

(১১) যেখানে পাবলিক লাইব্রেরী নাই, সেখানে স্কুল-লাইব্রেরীতে জনসাধারণের পুস্তক গ্রহণের সুবিধা রাখা উচিত।

(১২) পাঠের উন্নতি বিধানার্থ পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধান ও সাধারণ পাঠ্য এবং অন্য উপযোগী পুস্তক-সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থাবলম্বন করা উচিত।

(১৩) শিক্ষকদের সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা সৃষ্টির জন্য রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের অগ্রসর হওয়া উচিত ও ঐ কাজের জন্য সরকারী শিক্ষা-বিভাগে অথবা কোনও বিশেষ শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(১৪) পাঠদান-পদ্ধতির ক্রমোন্নতি বিধান জন্য "পরীক্ষামূলক" ও "প্রদর্শনমূলক" বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। যেখানে ঐরূপ বিদ্যালয় রহিয়াছে, সেখানে বিদ্যালয়গুলিকে অধিক স্বাধীনতা, অনুপ্রেরণা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত।

অতঃপর কমিশন শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনে শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশনের মতে বিদ্যালয়ে সকল কাজ-কর্মেরই একটি প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত **চরিত্রের শিক্ষা প্রদান** ও এই কার্যে শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক। ইহার জন্য শিক্ষক-ছাত্রের সংযোগ বৃদ্ধি করা ও ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্ব-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে হাউস সিষ্টেম প্রবর্তন ও ছাত্রদের দ্বারা "আচরণ-বিধি" প্রণয়ন সহায়ক হইবে। নানা দলগত খেলাধূলার প্রবর্তন ও অন্যান্য নানা পাঠ্যক্রম অনুপূরক কার্যক্রম (Co-curricular activities) অত্যন্ত সহায়ক হইবে। কমিশনের মতে একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাহাতে রাজনৈতিক নির্বাচন ব্যাপারে ১৭ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কিশোর-কিশোরীকে নিয়োগ করিলে তাহা নির্বাচনী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

চরিত্র গঠন ও শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা বিধান বিষয়ে উপরোক্ত অভিমতের পর কমিশন **ধর্মীয় ও নীতি-শিক্ষা** সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহাদের মতে কেবল মাত্র স্বেচ্ছাধীন শিক্ষা হিসাবেই এবং বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে অভিভাবকের সম্মতির ভিত্তিতে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে।

ধর্মীয় শিক্ষা

পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যক্রম অনুসরণ প্রসঙ্গে কমিশনের মতে ঐগুলিকে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করিতে হইবে ও প্রত্যেক শিক্ষককে নির্ধারিত সময়ে ঐ কার্যক্রমে যোগদান আবশ্যিক করিতে হইবে। স্কাউট আন্দোলন, স্কাউট ক্যাম্প প্রভৃতির সুযোগ যেন ছাত্ররা বেশী পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এন. সি. সি. বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনিয়া তাহার উন্নতি বিধান করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, সেণ্ট জন্স এম্বুলেন্স শিক্ষা ও জুনিয়র রেডক্রসের কাজকে আরও জনপ্রিয় ও সক্রিয় করিতে কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন।

অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম

অতঃপর কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে **বৃত্তিমূলক নির্দেশনা** ও উপদেশনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। শিক্ষার্থী যাহাতে বিভিন্ন শিল্প

বৃত্তিমূলক নির্দেশনা

সংস্থা প্রভৃতির ধরণ ও সুবিধা-সুযোগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ঐ সব শিল্পের বাস্তব চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান দর্শনের ব্যবস্থা রাখা উচিত। শিক্ষণপ্রাপ্ত **নির্দেশক কর্মচারী** (Guidance officer) ও **বৃত্তি-নির্ধারক শিক্ষক** (Career Master) নিয়োগের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা করার সুপারিশ কমিশন করিয়াছেন।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কল্যাণ

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-কল্যাণ জন্য কমিশন নিম্নলিখিত ধরণের সুপারিশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-শিক্ষার জন্য **বিদ্যালয় চিকিৎসা-বিভাগ** (School medical service) সকল রাজ্যে থাকা উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের ভালভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকের নির্দেশমত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। কয়েক জন শিক্ষককে স্বাস্থ্য-বিধিসংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দিয়া চিকিৎসা বিভাগের সহায়করূপে নির্ধারিত করা উচিত। বিদ্যালয়-সংলগ্ন হোষ্টেলে স্বাস্থ্যসম্মত আহারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেখানে সম্ভব স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকে মিলিত ভাবে নিকটবর্তী অঞ্চলে স্বাস্থ্য-সম্মত ব্যবস্থায় সহায়তা করিবেন ও ইহাদ্বারা ছাত্ররা দৈহিক শ্রমের প্রতি মর্যাদাসম্পন্ন হইবে।

শারীর-শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী শরীর-চর্চার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সকল শিক্ষক বিভিন্ন শারীর-শিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করিয়া উহাকে শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবেন। শিক্ষার্থীদের শারীর-শিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতির বিবরণী রাখা হইবে। বিভিন্ন পেশীর বিকাশ ঘটে এমন শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য রাখিতে হইবে। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শারীর শিক্ষার শিক্ষকই শারীর-তত্ত্ব ও স্বাস্থ্য পড়াইবেন এবং তাঁহারা তাহাদের সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সমমর্যাদা ভোগ করিবেন। কমিশন এই জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির সিট সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও নূতন শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন।

কমিশন **পরীক্ষা ও মাননির্ণয়ন**-সংক্রান্ত ব্যাপারে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে

পরীক্ষা

(১) বাহিরের পরীক্ষার (External Examination) সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে এবং রচনাধর্মী (essay type) প্রশ্নের পরিবর্তে **নৈর্বক্তিক** (objective type) **প্রশ্নের** সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) প্রশ্নের ধরণ পাল্টানো প্রয়োজন হইবে। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন-মুখী বিকাশ পরিমাপ করার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের ভিত্তিতে প্রতি ছাত্রের অগ্রগতি-সংক্রান্ত বিবরণ রাখিতে হইবে।

(৩) ঐ রেকর্ড (বিবরণ) ও বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলকে ও শিক্ষার্থীর মাননির্ণয়ন জন্য উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে।

(৪) মান নির্ণয়ন জন্য সংখ্যা ব্যবহার অপেক্ষা **প্রতীক ব্যবহার** (অর্থাৎ খুব ভাল=A, ভাল=B, মাঝারী=C প্রভৃতি প্রতীক) করার সুপারিশ কমিশন করিয়াছেন।

(৫) কমিশন কোর্সের শেষে একটি সাধারণ **প্রকাশ্য পরীক্ষার** (Public Examination) সুপারিশ করিয়াছেন।

(৬) কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেটে ঐ সাধারণ প্রকাশ্য পরীক্ষায় পরীক্ষিত বিষয়াবলীতে অর্জিত মান, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহে অর্জিত মান এবং বিদ্যালয়ে কাজকর্মে অগ্রগতিসূচক মান সমস্তই লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

(৭) কমিশন কোনও বিষয়ে মানের নিম্ন বলিয়া বিবেচিত শিক্ষার্থীর কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুপারিশ করিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

শিক্ষকদের মান উন্নয়ন

অতঃপর কমিশন শিক্ষকদের মান উন্নয়ন বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত সুপারিশ করিয়াছেন। উহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) **শিক্ষক নির্বাচন** ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু নিয়ম প্রচলন করা। (২) সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে এক জন **সভ্য** হিসাবে যুক্ত করিয়া একটি ছোট নির্বাচন-বোর্ড গঠন করা।

শিক্ষকদের মান উন্নয়ন

(৩) শিক্ষকদের চাকুরীতে পাকা করার জন্য **প্রোবেশন কাল** ১ বৎসর করা।

(৪) উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষণের ডিগ্রীসহ গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ ও বিশেষ বিষয় পড়াইবার যোগ্য শিক্ষণপ্রাপ্তগণকে দিয়াই ঐ বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পড়াইবার যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ।

(৫) সমমানসম্পন্ন শিক্ষক যে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকুন না কেন, মান অনুযায়ী উপযুক্ত বেতন যেন পান তাহার ব্যবস্থা করা।

(৬) শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী বেতনের হার নির্ধারণ ও তাহাদের অর্থ-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য **পেনশন-প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড-সংযুক্ত ব্যবস্থা** গ্রহণ।

(৭) শিক্ষকদের **অবসর গ্রহণের কাল** বৃদ্ধি করিয়া ৬০ বৎসর করা।

(৮) শিক্ষকদের পুত্র-কন্যাদের **বিনা বেতনে** বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৯) ইহা ব্যতীত শিক্ষকদের গৃহ ব্যবস্থা করার জন্য **কো-অপারেটিভ স্কীম** করা।

(১০) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের **ভ্রমণ-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা** প্রদান, তাহাদের **চিকিৎসা-ব্যবস্থার সুবিধা** প্রদান, তাঁহাদের শিক্ষাবিষয়ক মানোন্নয়ন জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও তাহাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার সুপারিশও করা হইয়াছে।

(১০) কমিশন শিক্ষকগণের **প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ** করিতে বলিয়াছেন।

(১১) শিক্ষকদের চাকুরীক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে শিক্ষকদের অভিযোগের প্রতি সুবিচারের জন্য **আর্বিট্রেশন বোর্ডের** সুপারিশও কমিশন করিয়াছেন।

(১২) কমিশন প্রধান শিক্ষকগণের দায়িত্ব অনুযায়ী উচ্চ বেতনের সুপারিশ করিয়াছেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ

কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুই ধরণের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহাদের একটি হইবে স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তকারীদের জন্য এবং ইহার শিক্ষাকাল হইবে দুই বৎসর। গ্রাজুয়েটদের পৃথক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় হইবে ও উহার শিক্ষাকাল অন্যূন ১ বৎসর হইবে ও প্রয়োজনবোধে উহা বাড়াইতে হইবে। গ্রাজুয়েটদের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হইবে ও তাঁহারা ইউনিভারসিটি ডিগ্রী লাভ করিবে। অপর শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষ বোর্ড থাকিবে। শিক্ষণকালে শিক্ষকগণ পুরা বেতন ও ষ্টাইপেণ্ড পাইবেন। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি মাঝে মাঝে **ঝালাই পাঠ** (রিফ্রেসার কোর্স) বিশেষ বিষয়ে **স্বল্পকালীন বিশেষ শিক্ষণ** ও কাজকর্মের জন্য **বিশেষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা** করিবেন এবং **সম্মেলনাদির** ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির সহিত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়-প্রদর্শনী, পাঠদানের বিদ্যালয় ও গবেষণা-বিভাগ সংযুক্ত থাকিবে। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকালে কোনও বেতন শিক্ষার্থীদিগকে দিতে হইবে না। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ছাত্রাবাস সংযুক্ত থাকিবে ও সেখানে শিক্ষার্থীগণ সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। যাঁহারা শিক্ষনপ্রাপ্ত স্নাতক তাঁহারা তিন বৎসর শিক্ষা দান সমাপ্ত করিবার পর তবেই শিক্ষা বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারিবেন। শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়-পরিদর্শকদের মধ্যে স্থান-বিনিময় ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। শিক্ষকরা যাহাতে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার সুপারিশও কমিশন করিয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন-ব্যবস্থা—অতঃপর কমিশন শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিচালক-সংস্থাসমূহ বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রশাসন ব্যবস্থা

(১) কমিশনের মতে শিক্ষা-অধিকর্তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে উপযুক্ত মন্ত্রণা দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি, তবে তাঁহার পদমর্যাদা যুগ্ম-সেক্রেটারীর (Joint Secretary) সমান হওয়া উচিত।

(২) কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে ও ঐ কমিটিই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার বিস্তার জন্য অর্থ বণ্টন করিবে।

(৩) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে যোগাযোগ করিবার জন্য একটি সংযোগকারী কমিটি থাকা প্রয়োজন।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন-ভার ডিরেক্টার অব এডুকেশনের সভাপতিত্বে ১৫ জন সভ্যযুক্ত একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) ঐ বোর্ডের একটি সাবকমিটিকে পরীক্ষা পরিচালন দায়িত্ব প্রদত্ত হইবে।

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যালোচনা ও সর্তাদি নির্ধারণ জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বোর্ড থাকা উচিত।

(৭) বিভিন্ন রাজ্য উপদেষ্টা-পরিষদ রাজ্যে শিক্ষক-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করিবে ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-পরিষদ ইহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা ও সর্ব-ভারতীয় শিক্ষাসমস্যা বিষয়ক সিদ্ধান্তাদি গ্রহণের কাজ করিবে।

পরিদর্শন ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এইরূপ :—

পরিদর্শন

(১) পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইবে বিদ্যালয়ের সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া উপদেশ প্রদান ও সেই সব উপদেশ যথাযথ পালনে শিক্ষককে সাহায্য প্রদান।

(২) বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পরিদর্শনের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৩) পরিদর্শকদের উচ্চ শিক্ষাগত মান ছাড়াও ১০ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা অথবা শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) পরিদর্শকদের কার্যে সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী-বৃন্দ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৫) কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিষয়ে কাজকর্মের পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শকের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) পরিদর্শকের সঙ্গে তিন জন নির্বাচিত অভিজ্ঞ শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষক থাকিয়া কয়েক দিন ধরিয়া বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-মণ্ডলীর সহিত আলাপ-আলোচনাপূর্বক বিদ্যালয়ের সমস্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কার্যকরী পন্থা বলিয়া কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও পরিচালনা

বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও উহার পরিচালন বিষয়ে কমিশন কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন।—(১) কমিশনের মতে অনুমোদন জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। (২) পরিচালক-সংস্থাকে একটি রেজিষ্টার্ড সংস্থা হইতে হইবে ও তাহার পদাধিকার বলে সভ্য হইবেন প্রধান শিক্ষক।

(৩) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনে পরিচালক-সংস্থার কোনও সভ্যের হাত থাকিবে না।

(৪) প্রত্যেক পরিচালক-সংস্থা শিক্ষকদের চাকুরী সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রচনা করিবেন—তাহাতে মাহিনা ছুটি সংক্রান্ত বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট হইবে।

(৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পরিচালক-সংস্থার একটি অর্থকোষ থাকিবে ও তাহার আয় বিদ্যালয়ের হিসাবভুক্ত হইবে।

(৬) বিদ্যালয়ের মাহিনার যে হার পরিচালক-সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, তাহা শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) এই ব্যাপারে শিক্ষা-অধিকারকর্তৃক প্রয়োজনমত একটি কমিটি স্থাপনপূর্বক সকল বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাহিনার হার নির্ধারণ করা যায়। ছাত্রদত্ত বেতনের হিসাব হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

(৮) শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে উপযুক্ত মানের শিক্ষক নিয়োগ প্রচেষ্টা বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগকে সুনিশ্চিত করণ—বিদ্যালয়ের অনুমোদন-সর্তরূপে পরিগণিত হইবে।

(৯) অনুমোদনের আর একটি সর্ত হইবে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষোপকরণাদির ব্যবস্থা রাখা।

(১০) অধিক ছাত্র হইলে সেক্‌সনের ব্যবস্থাও উহার আর একটি সর্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) বিভিন্ন প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা রোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

(১২) শিক্ষক নিয়োগ যেন একটি বর্ণের লোক মধ্যেই সীমিত না থাকে তাহা দেখা প্রয়োজন হইবে।

(১৩) বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ দিবার জন্য অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৪) বিদ্যালয় খোলার জন্য শিক্ষা-বিভাগের অনুমতি লইতে হইবে ও উহার অনুমোদন সর্বনিম্ন সর্তাদি পালন-সাপেক্ষ হইবে।

বিদ্যালয়ের **পরিবেশ, বিদ্যালয়-গৃহ** ও **উপকরণাদি** সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত।—

(১) গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের অবস্থান হইবে এমন কোনও স্থানে যেখানে আশেপাশের ছাত্ররা সহজে যাইতে পারে।

(২) সহরে ঐ স্থানটি যতদূর সম্ভব ও ভীড় হইতে দূরে হইতে হইবে।

বিদ্যালয়-গৃহ ও উপকরণাদি

(৩) বিদ্যালয়ের সংলগ্ন খেলাধূলার ফাঁকা মাঠ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে ঐ উদ্দেশ্যে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার জমি দখল করিতে বা অন্য শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানাদিকে সংলগ্ন জমি ব্যবহারে নিবৃত্ত করিবেন।

(৪) বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় শ্রেণীতে ছাত্র পিছু অন্তত ১০ বর্গফুট স্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

(৫) প্রতি শ্রেণীতে ৩৬ জনের অনধিক ছাত্র হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫০০ এর অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে—কোনও ক্ষেত্রেই উহা ৭৫০এর বেশী হইবে না।

(৬) ইহার পরে যে কোনও বিদ্যালয়কে যেন বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করা যায় এমন ভাবে তাহার স্থান নির্ধারণ ও গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে।

(৭) ভারতীয় পরিবেশে সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়-গৃহ কিরূপ হইবে তৎবিষয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

(৮) বিদ্যালয়ের আসবাব ও উপকরণ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমবায়মূলক বিপনী খোলা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য জিনিস পত্র কেনা মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে।

(৯) সম্ভবমত ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাবাস নির্মাণ প্রয়োজন—ইহা দ্বারা বিদ্যালয়ের সংঘ-জীবন সমৃদ্ধ হইবে।

বিদ্যালয়ের **কার্যকাল** ও **ছুটি বিষয়েও** কমিশন কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের কাজের সময় নির্ধারণ ও বৃত্তি

(১) কমিশনের মতে সামাজিক পরিবেশ, জনসাধারণের বৃত্তি এবং আবহাওয়া অনুসারে বিদ্যালয়ের সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত।

(২) বিদ্যালয়ের কার্যকাল অন্ততঃ ২০০ দিন এবং সপ্তাহে অন্ততঃ ৪৫ মিঃ ব্যাপী ৩৫টি পিরিয়ড হওয়া উচিত। সপ্তাহে ৬ দিন কাজ হইবে, এক দিন অর্ধেক সময়ের জন্য শিক্ষক-ছাত্ররা সাধারণ ভাবে মিলিত হইবে ও নানা সমাজ-সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজে লিপ্ত হইবে।

(৩) বিদ্যালয়ের ছুটির সহিত সাধারণ ছুটির মিল হওয়ার প্রয়োজন কমিশন স্বীকার করেন না। কমিশন গ্রীষ্মের ২ মাস ছুটি ও বৎসরের অন্য দুইটি সময়ে ১০ হইতে ১৫ দিন ছুটির কথা লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর কমিশন **অর্থসংস্থান** বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন।

অর্থসংস্থান

(১) শিক্ষা ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

(২) শিল্প শিক্ষণকর নামে নূতন কর প্রবর্তন।

(৩) রেল, ডাক ও তার এবং যোগাযোগ বিভাগের আয় হইতে নির্ধারিত অংশ কারিগরী শিক্ষাখাতে প্রদান।

(৪) ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থার আয় হইতে শিক্ষাখাতে অর্থপ্রদান বিধি।

(৫) বিদ্যালয়-সংলগ্ন সম্পত্তিকে করমুক্ত করা।

(৬) বিদ্যালয়ের জন্য ক্রীত পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিকে করমুক্ত করা।

(৭) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষা ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের সুপারিশ অন্যতম।

অসুবিধাসমূহ

মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহ অনেক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব-ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল অন্যতম। এই কাউন্সিল **ভাষা শিক্ষা** সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে—অর্থাৎ কমিশনের নির্দেশ অপেক্ষা আর একটি বেশী ভাষা শিখিতে হইবে। কমিশন ইংরাজী বিষয়ে যে দুইটি পৃথক কোর্স প্রবর্তন করিতে বলিয়াছেন তাহা অনেকের মতে ত্রুটিযুক্ত। কাউন্সিল কমিশনের সুপারিশকে পরিবর্তন করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে তিন বৎসর করিতে বলিয়াছেন এবং কোর বিষয়গুলিকে ঐ তিন বৎসর ধরিয়া পাঠ্য রাখিতে বলিয়াছেন। অবশ্য অনেকের মতে শেষ বৎসর কোর বিষয়গুলি পাঠ্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কিন্তু যাহারা দশম শ্রেণীতে কোন বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে না, তাহারা উহা পরবর্তী শ্রেণীতে পড়িবে।

সুতরাং বর্তমানে **মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম** নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে— (i) তিনটি ভাষা, (ii) কোর বিষয়দ্বয়—অনেকের ক্ষেত্রে যাহার একটি বাদ হইবে, (iii) তিনটি নির্বাচিত বিষয়—যে যে ধারা অনুসরণ করিবে তদনুযায়ী, (iv) শারীর শিক্ষা। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে। বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব পর পর সম্বন্ধিত ভাবে শেখানো হইবে এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাস্তবাশ্রিতভাবে শিক্ষাদান করা হইবে। শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতার প্রতিও দৃষ্টি রাখার প্রচেষ্টা করা হইবে এবং শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাধারা ও বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য প্রদান করা হইবে।

বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে উন্নততর পর্যায়ের বিদ্যালয়ে পরিণত করা ও যেখানে সম্ভব বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করার কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে অনেকখানি নির্ভর করিতেছে **অর্থসাহায্যের উপর**। এই জন্য ঐ কার্য কিছুটা শ্লথ হইতেছে। রাজ্য

সরকার ঐরূপ উন্নয়নের ১০% প্রদান করেন ও অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্র মাত্র পরিকল্পনা সময় মধ্যে যে ব্যয় হইবে তাহাতে সাহায্য করেন—পরে রাজ্যকেই সমগ্র ব্যয় বহন করিতে হইবে এই বিধান থাকার জন্য রাজ্য সরকার তাহার পৌনপুনিক ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিদ্যালয়-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে শঙ্কিত হইতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স মাত্র ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে স্বীকৃত হওয়ায় তৎপূর্বে এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই—সুতরাং এইরূপ পরিবর্তন মাত্র কয়েক বৎসরই সুরু হইয়াছে বলিয়া তাহা এখনো দ্রুত প্রসার লাভ করে নাই।

এই সব অসুবিধা অপেক্ষাও সর্বাপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা দেখা দিয়াছে **উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব** হইতে। বর্তমানে ২,০০০ এর অধিক উচ্চতর ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০০ শিক্ষক ও প্রতি বৎসর নূতন ৭০০ বিদ্যালয়ের জন্য ১৪,০০০ শিক্ষক প্রয়োজন যাহারা এম. এ. পাশ অথবা বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স সহ পাশ হইবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ পরিমাণ এম. এ. অনার্স সহ পাশ প্রতি বৎসর বাহির হইতেছেন না এবং যাহারা পাশ করিতেছেন তাঁহারা শিক্ষকতা ছাড়া অন্য বৃত্তিতে যাইতেছেন। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে এম. এ. বা অনার্স পাশ করিয়া শিক্ষকতা অপেক্ষা অর্থকরী অন্য চাকুরীতে তাঁহারা আকৃষ্ট হন বলিয়া বিজ্ঞান বিষয়-সমূহের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। অথচ বর্তমানে বিজ্ঞানবিষয়ক ধারা অনুসরণের প্রবণতাই ছাত্রদের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

কমিশন **কৃষি-ধারাযুক্ত বিদ্যালয়** অধিক সংখ্যক খোলার নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু স্থানাভাব, শিক্ষকের অভাব ও অন্য অসুবিধা হেতু কমিশনের এই নির্দেশ ঠিকমত পালিত হইতেছে না। দেশের পরিস্থিতি বিচার করিলে এই অসুবিধাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের **পাঠ্যক্রম ও বৃত্তি নির্বাচনে নির্দেশ প্রদান** ব্যবস্থাটিও নানা কারণে ঠিকমত হইতেছে না। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার আধিক্য উপযুক্ত ভাবে ছাত্রদের বিকাশসূচী না রাখা, শিল্প-শিক্ষার সুব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি ইহার কারণ।

পরিদর্শন ব্যবস্থাটিও এখনো ঠিক মত সংগঠিত হয় নাই। **পরিদর্শকের সংখ্যাল্পতা** ও কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী **বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের অভাব**

ইহার কারণ। পরিদর্শকগণ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াতে পারিয়াছেন বলা যায় না—তাহারা নূতন পরিস্থিতিতে যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বিদ্যালয়সমূহের **ব্যবস্থাপনা** ও **পরিচালনার** ক্ষেত্রেও অসুবিধা রহিয়াছে। বিশেষতঃ লোক্যাল বোর্ড ও প্রাইভেট স্কুলগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা এখনো ত্রুটিপূর্ণ রহিয়াছে।

অর্থসংস্থা ব্যাপারেও একটি সুষ্ঠু সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠেনি। যদিও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে, তথাপি ইহা মনে করিবার কারণ আছে যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নূতন প্রচেষ্টা ও কর্মোদ্যম জাগ্রত হইয়াছে ও উহা উন্নতির পথে আগ্রহশীল হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা

বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বহু বাক্-বিতণ্ডার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা মোটেও উচ্চ সম্ভাবনাসূচিত করে নাই। ভারতীয় জীবনের সঙ্গেও উহা সংশ্লিষ্ট ছিল না। ভারত স্বাধীনতা পাইবার পরে, ভারতে নূতন নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইল, ফলে বৃটিশ যুগের মামুলি ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা আরও খাপ খাওয়াইতে পারিল না। এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচু ছিল, প্রশাসন-ব্যবস্থাও সুদৃঢ় ছিল না। তখন শুধু সাধারণ শিক্ষাই দেওয়া হইত, বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের কোন সংযোগই ছিল না, এবং উহা পরীক্ষার দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল। বর্তমানে ভারতের

মাধ্যমিক শিক্ষা নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই সুপারিশগুলি ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক দিক্‌গুলি পর্যবেক্ষণ করার পর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ সুপারিশ অনুসারে সম্পূর্ণ কাজ এখনও হইয়া ওঠে নাই। যদিও সমস্যাগুলির কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধানের সময় যে সব সমস্যা পুনরায় উত্থিত হইয়াছে এবং উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করিয়া দেখিব।

মাধ্যমিক শিক্ষা কি কি বিষয়ে ত্রুটিবহুল ছিল এবং ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে, তাহা আমরা কমিশনের আলোচনা কালেই জানিয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, প্যাটার্ণ ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নূতন পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের প্রস্তাবের কথাও আমরা জানিয়াছি।

ভাষা শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাটির সৃষ্টি করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজে এই সংস্থাটি প্রবৃত্ত হয়। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (A.I.C.S.E.)। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১১ই তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের ভাষাসমূহ শিক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশ বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং এই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তিনটি ভাষা শিখিবে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দুইটি ভাষা নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পরিষদ্ A.I.C.S.E.র সুপারিশসমূহ গ্রহণ করেন এবং দুইটি সূত্র রচনা করিয়া রাজ্যসরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। এই সূত্র অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ পক্ষে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে। যে সূত্র দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ রচনা করেন, সেই সূত্র অনুসারে প্রাচীন ভাষা (যথা সংস্কৃত, আরবী, পারসী ইত্যাদির) শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত কমিয়া যায়। কারণ প্রাচীন ভাষা-শিক্ষার একক ব্যবস্থা এই সূত্রে ছিল না।

হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষা আবশ্যিক ভাবে শিখিতে হইবে। যেখানে আঞ্চলিক ভাষা হিন্দী, সেইখানে শিক্ষার্থীকে অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইবে।

ইংরাজী ভাষা—আন্তর্জাতিক ভাষা এবং যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ইহা আবশ্যিক, সেই কারণে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ইংরাজী ভাষা শিখিতে হয়। শিক্ষার্থীদিগকে আরও একটি ভাষা নিজের স্থবিধা অনুযায়ী নির্বাচন করিতে হইবে। উহা ভারতীয় ভাষা বা প্রাচীন ভাষা বা ইংরাজী ছাড়া আধুনিক কোন ইউরোপীয় ভাষা।

এমনও দেখা যায় যে, কোন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং ইংরাজী শিখিতে চায়। এই অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাহাকে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। ঐরূপ ছাত্র গৃহে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াই উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে আসিতে পারে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে দেখা গিয়াছে যে অনেক ছাত্র মধ্য বাংলা বিদ্যালয় (Middle Vernacular School) হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে আসিয়াছে। সে ক্ষেত্রেও তাহারা ইংরাজীর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিয়া আসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ভাষাসমূহ ছাড়া সমাজ-বিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানও সকলের জন্য আবশ্যক হইবে। এইগুলি হইল মূল বিষয় এবং এই বিষয়গুলি অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ভিত্তিস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন চারি বৎসরের জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার স্থপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম দুই বৎসর মূল বিষয় (core subjects) শিখিতে হইবে এবং বাকী দুই বৎসর ধারা অনুযায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইবে। A. I. C. S. E. উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার কাল চারি বৎসর হইতে কমাইয়া তিন বৎসর করিয়াছেন। ঐ সংস্থা এইরূপ স্থপারিশ করেন যে, coreবিষয়গুলি তিন বৎসর ধরিয়াই পড়িতে হইবে। কিন্তু coreবিষয়গুলি দুই বৎসর ধরিয়া পড়ান এবং তৃতীয় বৎসর ধারা অনুযায়ী বিশেষ বিষয়সমূহ পড়াইলেই ভাল হয়। কারণ মূল বিষয় ও বিশেষ বিষয় একত্র পড়ান হইলে অস্থবিধার সৃষ্টি

হইতে পারে। বর্তমান সময়ে বহু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। এমত অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করিয়া অনেকে হয়ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইয়া ভীড় করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মূল বা core বিষয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দুই বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত করা বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হইল **তিনটি ভাষা,** ধারা অনুযায়ী **তিনটি বিশেষ বিষয়, একটি শিল্প** এবং **শারীর শিক্ষা।** শারীর শিক্ষা সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই আবশ্যিক, বিশেষ বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ীই স্থির করা হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে—(১) শিক্ষাদানের **মাধ্যম** হইবে **মাতৃভাষা,** (২) যথাসম্ভব **সম্বন্ধযুক্ত ভাবে শিক্ষা** দিতে হইবে, (৩) কোর্সগুলি ছাত্রছাত্রীদের **সামর্থ্য** এবং **স্থানীয় প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া স্থির** করিতে হইবে এবং (৪) ছাত্রছাত্রীদের **শিক্ষাবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার** ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিবে।

তরুণদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম রচনা

কিশোর ও তরুণদের মনের বিকাশ ও দেহের বিকাশের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানিয়াই তাহাদের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করিয়াছেন। আমরা এইখানে তরুণ-তরুণীদের দেহ ও মনের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

তরুণ-তরুণীদের জীবনে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং ফলে তাহাদের মনে নানা সমস্যার উদয় হইয়া থাকে। তাহাদের দেহের আকস্মিক বৃদ্ধি সাধন হয় এবং তাহারা অনেক সময় কোন কোন কাজ করিতে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তাহার কর্মচঞ্চলও হয় এবং কাজে উৎসাহ বোধও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সময় তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে বৃদ্ধির পার্থক্য পরিলক্ষিত

হয়। তাহাদের বৃদ্ধি সমান হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মেয়েদের বৃদ্ধি এই সময়ে একটু বেশী হইয়া থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির বিকাশ কি ভাবে হইতেছে তাহা জানিবার উপায় আছে। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক বয়স বাহির করা যায়। এবং বুদ্ধ্যঙ্ক বাহির করা যায় মানসিক বয়সকে জন্মগত বয়স দ্বারা ভাগ করিয়া। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বয়স নীচের দিকে যে হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ১৪ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। অতএব এই বয়সে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আচরণের মধ্যে **আকস্মিক পরিবর্তন** দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া তাহাদের আচরণের মধ্যে **প্রক্ষোভজনিত বৈচিত্র্য,** নানারূপ **অসামঞ্জস্য, আচরণের তীব্রতা** ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়। ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভসমূহ এই সময়ে প্রবল হইয়া থাকে। এই প্রক্ষোভসমূহে কেহ কোন বিষয়ে অপরিণত অবস্থায়ও থাকিতে পারে, আবার কেহ কেহ পরিণতি লাভও করে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এই সব আচরণের বৈশিষ্ট্য অনেক অভিভাবক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ফলে তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শাস্তি বিধানও করিয়া থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের এই দ্বন্দ্বসমূহ যদি অভিভাবক ও শিক্ষক-সম্প্রদায় সমবেদনার সঙ্গে বিচার না করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের নীতিজ্ঞান ব্যাহত হইতে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সে আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল **দিবাস্বপ্ন**। এই দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কল্পনার সাহায্যে এই অপূরণীয় আশার পূরণ করিয়া থাকে। দিবাস্বপ্ন অল্প হওয়া অবাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু উহা যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাহা হইলে উহার সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে? ছাত্রছাত্রীদিগকে যদি নানারকম চিত্তাকর্ষক কাজে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহা হইলে সে দিবাস্বপ্নের কুফল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের মনে **আত্মসম্মানের ভাবটি** বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট

হইয়া উঠে। তাহারা **আত্ম-প্রতিষ্ঠাও** চায়। ছাত্রছাত্রীরা বস্তু, পরিবেশ ও মানুষ সকলের উপরই **প্রভাব বিস্তার** করিতে চায়। ছাত্রছাত্রীরা এই বয়সে **দলবদ্ধ হইয়া কাজ** করিতে ভালবাসে। বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাহাদের আনুগত্য খুবই বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা **সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের কথা** পিতামাতা অভিভাবক ও শিক্ষকের অভিমতের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দলীয় মনোবৃত্তি ভাল ভাবে পাঠ্যক্রম পরিচালনায় কাজে লাগাইলে তাহা হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের **অনুকরণ প্রবৃত্তিও** প্রবল। অনুকরণ করিবার মত আদর্শ যদি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি **স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ** করিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিজেদের কৃতিত্ব বেশী করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। অপর পক্ষে ছাত্রদের প্রশংসা পাইবার জন্য নানাভাবে কাজ সুসম্পন্ন করিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীর এইরূপ আচরণ অভিভাবকমণ্ডলী পছন্দ করেন না। ফলে তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের উপর নানারূপ শাস্তিমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। এই কারণেই এই স্তরে সহশিক্ষা মনস্তত্ত্বসম্মত নয় বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করিয়া থাকেন।

এইরূপ নানা সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে থাকার জন্য অনেক সময়ে ছাত্রছাত্রীরা পাঠে উপযুক্ত ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এই কারণেই ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া যদি পাঠ্যক্রম রচনা করা যায় তাহা হইলে খুব ভাল হয়।

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীদের **আগ্রহ** ও **অনুরাগ** সাধারণতঃ এক হইতে পারে না। এই কারণে সকলের জন্য একই রূপ পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। অতএব তাহাদের আগ্রহ ও অনুরাগকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাঠ্যক্রম রচনার দুইটি দিক আছে—একটি হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ, অনুরাগ ও প্রয়োজন। অপর দিক হইল সমাজের প্রয়োজন মিটানো। গণতান্ত্রিক সমাজে ইহার প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহা বলাই বাহুল্য।

এই বয়সের **ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন** সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

(১) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ প্রয়োজন।

(২) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সমাজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকা।

(৩) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজ নিজ পরিবারবর্গের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

(৪) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে অবহিত থাকা।

(৫) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অবসর সময় যথাযথরূপে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা অর্জন করা।

(৬) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, প্রকৃতির সৌন্দর্য ইত্যাদি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অর্জন করা।

(৭) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের বিধিগুলা জানা।

(৮) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বয়স্কদের সম্মান করিতে জানা এবং সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বাস করিবার ক্ষমতা অর্জন করা।

(৯) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনন, অভিনিবেশ, সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ এবং উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ ও পঠনের ক্ষমতা অর্জন করা।

(১০) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর যে বৃত্তি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজের সুযোগ গ্রহণ করা।

ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধে এবং সংশ্লিষ্টভাবে সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইল। ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে।

(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র নহে। অতএব বয়স্ক প্রভাব হইতে বহির্ভূত ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে।

(খ) ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রয়োজন মিটে না, এমন পাঠ্যক্রম রচনা করিবেন মনে হতাশা আসিবে এবং তাহাদের আচরণ বিকৃত হইবে। ইহা রোধ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠ্যক্রম-পরিকল্পনায় থাকিবে।

(গ) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মন ও দেহের বিকাশের উপযোগী করিয়া ইহা রচনা করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও অনুরাগের পরিপ্রেক্ষিতে উহা পরিবর্তনশীল হইবে।

(ঙ) ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্য-অনুযায়ী পাঠ্যক্রম রচিত হইবে।

(চ) ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে, সেই সব বিষয় পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত থাকিবে।

(ছ) ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে তাহাদের কর্ম-সম্বন্ধে পথ-নির্দেশ থাকিবে।

(জ) পাঠ্যক্রমকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে।

(ঝ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে একটি বড় ত্রুটি হইল যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কিছুর ব্যবস্থা না থাকা। অথচ এই বয়সেই যৌন সম্পর্কিত চেতনা জাগ্রত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তাহারা সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের কোন সূত্র বা সাহায্য পায় না, এবং তাহারা বন্ধুবান্ধবদ্বারা নির্দেশিত হইয়া অযথা শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। এই কারণেই বর্তমান শিক্ষাবিদ্যা যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন।

সর্বশেষে বলা যায় যে, সহানুভূতি-সম্পন্ন পাঠ্যক্রম-প্রণেতা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ করিতে পারে, এমন পাঠ্যক্রম রচিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উহা হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে **ব্যক্তিগত বৈষম্য**। এই বৈষম্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ কি তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ জানা থাকিলে ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কিত অসুবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রধান— **বংশগতি, পরিবেশ, জাতি-বৈশিষ্ট্য, নারী-পুরুষের পার্থক্য** এবং **বয়স** ও তাহার পরিণতি।

সচরাচর দেখা যায় যে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের চিন্তাধারা, কর্মশক্তি ও কর্মপ্রবৃত্তির

মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে বহু ছাত্রছাত্রী যাইয়া মিলিত হয়। প্রত্যেকেই বিভিন্ন লোকের সন্তান। পিতামাতার বৈশিষ্ট্য ছাত্রছাত্রী পাইয়া থাকে। অতএব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, ছাত্রছাত্রী পরিবেশ-দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। শিশু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে এবং বাস করিয়া থাকে, সেইখানকার জলবায়ু, আলোবাতাস, বন-প্রান্তর ইত্যাদি তাহার শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, বংশগতির দ্বারা যে ব্যক্তি-বৈষম্য ঘটিয়া থাকে, তাহার গুরুত্ব খুব বেশী। পক্ষান্তরে আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পরিবেশজাত যে বৈষম্য তাহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাঁহারা ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের মত এই যে, **বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ই ব্যক্তি-বৈষম্যে প্রভাব বিস্তার** করিয়া থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তির উপর বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির ২৫% হইতে ৩০% পর্যন্ত পরিবেশের প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট বংশগতির প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। পরিবেশের প্রভাব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর অল্প, যদিও একই আবহাওয়া ও জলবায়ুর লোকদের মধ্যে দৈহিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের প্রভাব অল্প বলিয়াই দেখা যায়, ইহার প্রভাব বুদ্ধিবৃত্তির উপর অপেক্ষাকৃত বেশী। বুদ্ধির তারতম্যের জন্যই ব্যক্তি-বৈষম্য বিশেষ করিয়া দেখা যায়।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যক্তি-বৈষম্য দেখা যায়। ইহার কারণ বংশগতি না পরিবেশ সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে। বিভিন্ন জাতির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত যে ব্যক্তি-বৈষম্য দেখা পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধি কিংবা সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। শিক্ষার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সকলেরই বুদ্ধি বিকাশের ব্যবস্থা করা যাইবে।

ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হইত না। বালকদের চেয়ে বলিকারা বুদ্ধিতে ছোট বলিয়াই মনে করা হইত। কিন্তু গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বালক ও বালিকার মধ্যে সাধারণভাবে বুদ্ধির কোন তারতম্য থাকে না। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে

ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, আগ্রহ, অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়ে যে তারতম্য দেখা যায়—সেগুলি হয় দেহের কয়েকটি গ্রন্থির জন্য। ভাষা বিষয়ে ছেলে হইতে মেয়ে বেশী সমর্থ বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বালকগণ মেয়েদের হইতে অনেক বেশী যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু কারিগরী কাজে ছেলেরা অপেক্ষাকৃত দক্ষ, পক্ষান্তরে মেয়েরা স্মৃতিশক্তি ব্যাপারে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়স সীমার অধীন ছাত্রছাত্রীদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। ইহার পর হইতে উহাদের সামান্যই বিকাশ লাভ ঘটিয়া থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তি-বৈষম্যের প্রতি মর্যাদা দান

শ্রেণীতে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যকে কি ভাবে মর্যাদা দেওয়া যায় তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণীতে যখন পাঠদান করিয়া থাকেন, তখন তিনি সমগ্র শ্রেণীর উদ্দেশ্যে পাঠদান করিয়া থাকেন, বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর উপযোগী করিয়া সাধারণতঃ তিনি পাঠদান করেন না। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকা জানেন যে, তাঁহার শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরণের ছাত্রছাত্রী আছে। সকলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তিনি পাঠদান করিবেন। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদানে অগ্রসর হইবেন, তবেই পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ডল্টন প্ল্যান অনুযায়ী কিংবা লেবরেটরী শিক্ষাদান-পদ্ধতি অনুযায়ী যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন, তাহা হইলে সমগ্র ছাত্রছাত্রী সমাজের জন্য উহা মঙ্গলজনক হইবে। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের নিজ নিজ শিক্ষাগ্রহণের হার অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তি-বৈষম্য থাকিলেও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রের দিক হইতে তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই দল বিভাগ করিয়া লওয়া হয়। বয়স, বয়ঃসন্ধি, সামর্থ্য, বালক-বালিকা এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক দলকে সমনত্ব (homogenous)

করিবার চেষ্টা করা হয়, তারপর তাহাদের পড়ান হয়। প্রত্যেক স্তরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীরাও সহজে তাহাদের পাঠ বুঝিয়া থাকে।

বালক-বালিকাদের মধ্যে দৈহিক আকৃতি ও আগ্রহ-অনুরাগ সম্পর্কিত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নাই। যদি বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, তবে আর তাহাদের শিক্ষাদানে কোন সমস্যাই নাই। কিন্তু শরীর-চর্চার সময়ে তাহাদিগকে আলাদা ভাবে শিক্ষাদান করা উচিত। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে উত্তরকালে নারী-পুরুষের একত্রই বাস করিতে হইবে, অতএব তাহাদিগকে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ ও ব্যবহার শিখিতে হইবে বিদ্যালয় হইতেই। অতএব ছাত্রছাত্রীদিগকে সহশিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া অসুবিধাজনক। আমাদের দেশে সঠিক বয়সের হিসাব নাই। সকলে একই সময়ে শিক্ষালাভ করে না। অতএব একই শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স এক হয় না। বংশগতি ও পরিবেশের জন্য বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীরা এক সাথে আসিয়া পাঠগ্রহণ করে, অতএব বয়স অনুযায়ী দল বিভাগ অসঙ্গত ও অবাঞ্ছনীয়।

সকল শিক্ষাবিদই একমত যে শিক্ষার্থীর জীবনে **বয়ঃসন্ধিকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**। বয়ঃসন্ধিকালের পূর্ব ও পরের অবস্থায় এবং বয়ঃ-সন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঠদান করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ্ এই মতের সঙ্গে একমত নয়। তাঁহারা বলেন যে বয়ঃসন্ধি অনুযায়ী দলবিভাগ করা অসুবিধাজনক, কারণ বয়ঃসন্ধিকাল অতি ধীরে ধীরে আসে এবং সেই বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার হিসাব রাখা খুবই মুশকিল। এই কারণে কোন কোন শিক্ষাবিদ্ এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের উপর গুরুত্ব না দিয়া ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর শ্রেণী-বিভাগকেই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন।

বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা যদি স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের সাথে

একসঙ্গে পড়ে তাহা হইলে তাহারা স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের বিদ্রূপের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। উভয় দলের মধ্যে রেষারেষি দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ভাবও সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন শিক্ষাবিদ্ ইহার সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা সমাজের বহির্ভূত জীব নহে। তাহাদেরও সমাজে বাস করিতে হইবে। তাহাদিগকেও সমাজের সকল লোকের সঙ্গে আচার আচরণ ইত্যাদি করিতে হইবে। অতএব বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে সহযোগিতামূলক ও সমবেদনাপূর্ণ জীবন-যাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অতএব স্বাভাবিক ও বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের একসাথেই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শ্রেণীতে পড়াশুনাকালেই স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীরা সমবেদনাপূর্ণ মন লইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের ঐচ্ছিক শিক্ষার ধারা রহিয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষার ধারা নির্বাচন করিয়া লইতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্যের সমাধান বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনের মধ্য দিয়া হইতে পারে।

একটি আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সমস্ত দিকের আলোচনা করিয়াছেন। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, কমিশনের সুপারিশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি কিরূপ হইবে।

ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে। অতএব ইহার রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সংগঠিত হইয়াছে এবং বহু সমস্যারও সাথে সাথে সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে দেশের পক্ষে উহা অমঙ্গলই সূচনা করিবে। তাহা ছাড়া শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকিবে **পরিবেশ সম্পর্কে**। বিদ্যালয়গুলির পরিবেশ এমন হইবে যাহা আনন্দপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং

ছাত্রছাত্রীগণের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে নানাভাবে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিবে। এইরূপ পরিবেশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেগুলি বেশীর ভাগই অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। আসবাবপত্রের অবস্থাও তাই, শিক্ষোপকরণ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু এই সমস্ত বাধা দূর করা যাইতে পারেনা, একথা স্বীকার করা যায় না। যে সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মনে রাখিবেন যে, তাঁহাদের সহায় রহিয়াছে অগণিত ছাত্র ও স্থানীয় সমাজ। স্বাধীনোত্তর ভারতে সকলের কর্তব্যই সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। শিক্ষা একটি শক্তি। এই শক্তির বিকাশ করিতে সমাজ ও ছাত্রছাত্রী সমাজ অগ্রসর হইয়া আসিবে যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা আগ্রহ প্রদর্শন করেন।

ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অতএব ইহার মূল শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকিবে। অতএব বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের আচরণ ও মনোবৃত্তি যেন ভারতের **ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিপোষক** হয়।

ছাত্রছাত্রীদের **চরিত্র গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী** করিয়া তোলাও বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিবে। উপযুক্ত নাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলাও অত্যন্ত দুরূহ কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা যখন একান্তই প্রয়োজন, তখন বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিক্ষাদানের সুযোগ সকল শিক্ষার্থীকেই দিতে হবে। ইহার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিগত নৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের একান্তই প্রয়োজন। বিদ্যালয়ই তাহার ব্যবস্থা করিবে। কারণ ছাত্রছাত্রীরা তাহার অনুশীলন নিজে নিজেই করিতে পারিবে না। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে সহযোগিতামূলক কাজে অভ্যস্ত হয়, নূতন চিন্তাধারা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবনে প্রবেশ করিয়া থাকে, উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহারা অগ্রসর হয় না। এই কারণে এই শিক্ষার মধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা যেন পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীরা সত্যকে উপলব্ধি

করিবে, মিথ্যাকে পরিহার করিতে, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইবার কৌশল ও মনোবৃত্তি অর্জন করিবে। তাহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্পন্ন হইবে এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে। ছাত্রছাত্রীরা স্বচ্ছন্দভাবে তাহাদের ভাব কথায় ও লিখায় প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে **সুনাগরিকে পরিণত** করিতে হইবে এবং যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাহাদের জীবনে সঞ্চারিত করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক মানসিক, প্রক্ষোভজনিত এবং বাস্তব সকল সমস্যার সমাধান করিতে হবে। শুধু পুস্তক পঠনের মধ্য দিয়া এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারা যাইবে না। ব্যবহার, কার্য, কার্যসমস্যা-পদ্ধতি, বিদ্যালয়ে সহযোগিতামূলক আচার-আচরণ, বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ, সমস্যামূলক কাজ, দলীয় কাজ, সমাজবদ্ধ কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়া এই সমস্ত গুণ আহরণ করা যাইতে পারে। অতএব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকল প্রকার কাজেরই ব্যবস্থা থাকিবে। সহযোগিতার মনোভাব নিয়া সকল কার্য সম্পাদন করিতে হবে এবং অপরের ভাব, রুচি, আগ্রহ, বিভিন্নমত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সহনশীল হইতে হবে। ভারতে ধর্ম ও বহু মতের স্থান। এই অবস্থায় উপযুক্ত নাগরিক হইতে হইলে সহনশীলতা শিক্ষা করা একান্তই প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে **জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি** করা। আমরা ভারতবাসী, ভারতকে সমগ্র দেশগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে হইবে, ইহা সকল ছাত্রছাত্রীকে মনে রাখিতে হইবে। ভারত অল্প কিছুদিন হইল স্বাধীন হইয়াছে। এই স্বাধীনতা লাভ যেন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে ছাত্রছাত্রী-সমাজেরই দেখা একান্ত কর্তব্য। তাহারাই ভবিষ্যৎ নাগরিক, কিন্তু জাতীয়তাবোধে যেন সঙ্কীর্ণতাবোধ না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের জন্য বিশিষ্ট শক্তির পতন হইয়াছে, ইহা আমরা জানি। জাতীয়তা সৃষ্টির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মনে আন্তর্জাতিকতা বোধও সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের গান্ধীজী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরু বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করিতে হইবে, ইহা আমাদের দেশের সকল ছাত্রছাত্রীকে জানিতে হইবে। তাহাদের মনে যদি আন্ত-

জাতিকতাবোধ জাগ্রত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ যুগে ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মানিয়া চলিতে সক্ষম হইবে।

আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির কাজ হইল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে **নেতৃত্ব-বোধ জাগ্রত করা।**

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কাজগুলি করিতে হইবে। বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কাজ যদি ছাত্রছাত্রীরা সম্পাদন করে, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, সহযোগিতা, কাজে প্রবণতা, সামাজিকতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশ সাধন হইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং সহযোগিতামূলক কাজের মধ্যে দিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব-বোধ জাগ্রত হয়। অতএব বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রম-মূলক নানা কাজের ব্যবস্থা শিক্ষক-শিক্ষিকা করিবেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে **শিল্পকাজ ও উৎপাদনমূলক কাজের ব্যবস্থা** থাকিবে। ভারতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভারত অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। ছাত্রছাত্রীরা শিল্পকাজের মধ্য দিয়া কায়িক শ্রম করিতে শিক্ষা করিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নানারূপ পরিশ্রম-জনিত কাজ করিতে সক্ষম হইয়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইবে। শুধু তাহাই নয়, শিল্পমূলক উৎপাদনমূলক কাজের মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সুসম্বদ্ধ ও সুসংহত হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজের যেমন ব্যবস্থা থাকিবে, সেইরূপ **পাঠের সুযোগ** দানেরও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া ভাল পাঠাগার থাকিবে। ছাত্রছাত্রীরা যেন পাঠাগারটির উপযুক্ত ব্যবহার করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় **সমাজের একটি কেন্দ্র** হইয়া গড়িয়া উঠিবে, এই কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, বিদ্যালয়ের আর্থিক অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্থানীয় সমাজ অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে, যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিষয়ে একটু চেষ্টা করেন। হইবে ... র্ব অন্যত্র এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছি যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা হইবে প্রবেশ করিয় ... তে, একটি হইবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটানোর দিক হইতে, এই শিক্ষার মধ্যে ... ছ সমাজের প্রয়োজনের দিক হইতে। অতএব বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের লক্ষ্য

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজ স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং উহার উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হইবেন।

ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন ও তাহাদের শিক্ষাদান-সংক্রান্ত অনেক কথাই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। একটি বিষয়ের উল্লেখ করার প্রযোজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের **মাঝে মাঝে পেশাগত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থা** করিয়া দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই বহু দিন পূর্বে শিক্ষণ লাভ করিয়া শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার পরে শিক্ষাসম্বন্ধীয় অনেক উন্নতি হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত উন্নত শিক্ষাধারার সঙ্গে শিক্ষকবর্গকে পরিচিত হইতে হইবে। তাঁহারা সুযোগ বুঝিয়া শিক্ষামূলক আলোচনা-চক্রে ও সভায় যোগদান করিয়া সমৃদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঐ সমস্ত পড়িয়া লাভবান হইবেন।

উপরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে চিত্রটি সংক্ষেপে দেওয়া হইল, তাহা অবলম্বন করিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ উন্নীতকরণের সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের চেষ্টায় আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ প্রচেষ্টা দুই ভাবে চলিয়াছে : প্রথমতঃ, **মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নীতকরণ, দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তিশিক্ষা-সম্বলিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।** ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষাসম্বলিত বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৬০০টি। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজ্যসরকারগুলিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন। বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিকে উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহ করিবার জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার চারিটি আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীগণ এই আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বহুমুখী বিদ্যালয়-

সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এই আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ২০০ শিক্ষার্থী শিক্ষণ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবেন। এইখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিদ্যা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, চারুকলা এবং শিল্পসমূহ শিক্ষা করিবে। এই আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির সহিত একটি করিয়া প্রদর্শনী বহুমুখী বিদ্যালয় থাকিবে এবং এই শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলি চাকুরীতে থাকাকালীন ধারা-নির্দেশকদের এবং শিক্ষামূলক প্রশাসন বিভাগের সংগঠন করিবেন।

বহুমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও অনুরাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার বিভিন্ন ধারার ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া কৃষি, শিল্প, কারিগরী শিক্ষা, আবশ্যিক শিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে রাখা এবং ইহাদের মধ্য দিয়াই ছাত্রছাত্রী-সমাজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা এবং শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা।

অনেক বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে বেশী সংখ্যক রূপান্তরিত হইতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল রাজ্যসমূহ বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেছে এবং ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণও বৃত্তি-সম্বলিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপর বেশী আস্থাবান্। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নীতকরণ-নীতিকে রাজ্যসরকার খুব বেশী আগ্রহের সাথে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কালের জন্য উহা প্রযোজ্য বলিয়া রাজ্য-সরকার ইহার উপর বেশী গুরুত্ব দিতেছেন না। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিকরণের শতকরা ৪০ ভাগ খরচ রাজ্যসরকার মাত্র গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে বাকী সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ইহা স্বল্প-কালীন ব্যবস্থা। কয়েক বৎসরের পর কেন্দ্রীয় সরকার রূপান্তরিত করণের জন্য অর্থ বন্ধ করিয়াও দিতে পারে, তখন সমস্ত ব্যয়ভার পড়িবে রাজ্যসরকারের উপর। যেহেতু রাজ্য সরকার বেশীর ভাগ অর্থ বহু-মুখী বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য ব্যয় করিতেছে, সেই জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে

পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্যও উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্তালয়ে রূপান্তরিত করণের কাজ অত্যন্ত শ্লথ হইয়াছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্তালয়ের জন্য এম. এ. বা এম. এসসি-পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই। যত সংখ্যক এম. এ., এম. এস্‌সি-পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন তাহা বিশ্ববিত্তালয় প্রতি বৎসর সরবরাহ করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন অন্যান্য চাকুরির তুলনায় অত্যন্ত কম দেওয়া হয়। এই কারণে ভাল ভাল ছেলেমেয়েরা এম. এ., এম-এসসি পরীক্ষায় পাশ করিবার পর অন্যত্র চাকুরীর সংস্থানে যাইয়া থাকে।

বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের অসুবিধা

বহুমুখী বিত্তালয় সংগঠনে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ, বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালকবৃন্দ এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল নয়, কারণ তাঁহারা সকলেই এই ক্ষেত্রে নূতন। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (A. I. C. S. E.) এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যক্রম ও কার্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সাথে সাথে যদি ঐসব সংস্থা শিক্ষোপকরণের বিস্তৃত বিবরণ, দাম, কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদির কথাও লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ, এমন অনেক জায়গায় বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, যেখানে উহার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। খুব সাবধানে দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে জরীপ করিয়াই সেই সমস্ত স্থানে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। বহুমুখী বিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষার কয়েকটি ধারা থাকিবে এবং ঐসব ধারায় অন্ততঃ পক্ষে ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী থাকিবে। ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ঐরূপ না থাকিলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ উপযুক্ত অর্থব্যয়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা-পরিচালনা করিবার মত শিক্ষকের খুবই অভাব। শিল্পবিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক প্রবাহসহ বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এইরূপ

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। এদিকে সরকার এই সব বিদ্যালয়ের জন্য বিস্তর জায়গা, পরীক্ষণাগার, কর্মশালা ইত্যাদি স্থাপনের সর্ত আরোপ করিয়াছেন। এইগুলির ব্যবস্থা অন্য উপায়ে করা যাইতে পারে। যে সমস্ত অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৃত্তির ছাত্ররা ঐ সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক কাজগুলি সম্পন্ন করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ যদি সরকার করিয়া দেন, তাহা হইলে বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে চলিতে পারে।

কৃষি-বিদ্যালয়

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের বেশীর ভাগ লোকই কৃষিকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে। অথচ ভারতে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই স্বল্প। ভারতে জমির উৎপাদনক্ষমতা কমিয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে এখনও কৃষির কাজ চলিতেছে। গ্রামগুলি হইতে লোকজন সহরাভিমুখী হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে যদি ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই ভারতের কৃষির উন্নতি হইবে, নতুবা নয়।

ভারতের গ্রামগুলিতে ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে চারি হাজার উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রায় সতের হাজার মধ্য বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু ঐসমস্ত বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যক্রম অনুসৃত হইতেছে, সেই **পাঠ্যক্রম শহরাঞ্চলের প্রয়োজনের সমাধানের জন্য রচিত** হইয়াছে। **গ্রাম্য অঞ্চলের প্রয়োজনের দিকে মোটেই লক্ষ্য করা হয় নাই।** যতগুলি মধ্যবিদ্যালয় আছে, সেগুলিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করিয়া তাহাতে কৃষি ও উদ্যানের কাজকে মূল হিসাবে রাখা যাইতে পারে। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও গ্রাম্য ও শহরাঞ্চলের জন্য **পাঠ্যক্রম পৃথক** হওয়া প্রয়োজন। গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকে গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি গ্রাম্য শিল্প আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে।

সমগ্র ভারতে মাত্র ৭৭টি কৃষি-বিদ্যালয় আছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এত স্বল্পসংখ্যক কৃষি-বিদ্যালয় আমাদের দেশে আছে যেখানে ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষির উপরই নির্ভরশীল। বস্তুতঃ পক্ষে ভারতে বহু কৃষি-বিদ্যালয় থাকা উচিত, তাহা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে কৃষি-শিক্ষাও জুড়িয়া দেওয়া উচিত। কৃষি-শিক্ষার সাথে সাথে উদ্যান-রচনা শিক্ষা ও পশুপালন শিক্ষাও করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই শিক্ষা বাস্তবমুখী হইবে।

ধারা-নির্দেশক শিক্ষক (Guidance Teachers)

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাধারা-সম্বলিত উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণীতে থাকাকালীন এমন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না, যাহাতে তাহারা নিজেদের শিক্ষার ধারা বাছিয়া লইতে পারে। এই জন্য ধারা-নির্দেশক শিক্ষকের প্রয়োজন। তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের জীবনের উপযুক্ত ধারা নির্ধারণ করিতে সাহায্য করিবেন। এই কারণেই সরকার এই সব ধারা-নির্দেশক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাত্রছাত্রীকে ধারা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার পূর্বে ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে প্রথমে ছাত্রছাত্রীসম্প্রদায়কে জানিতে হইবে। দুইটি উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের জানা যায়। একটি হইতেছে আনুষ্ঠানিক (Formal), অপরটি হইতে অনানুষ্ঠানিক (Informal)। আনুষ্ঠানিক উপায়ে পরীক্ষা, অভীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা ছাত্রছাত্রীকে জানা যায়, পক্ষান্তরে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জানা যাইতে পারে।

আনুষ্ঠানিক উপায়ে বিভিন্ন অভীক্ষা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্রছাত্রীকে জানা যায়, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অভীক্ষাগুলি ভাষা-নির্ভর (verbal) এবং ভাষামুক্ত (non-verbal) হইতে পারে। আনুষ্ঠানিক উপায়গুলি হইতেছে বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা, অধীত বিদ্যার অভীক্ষা, কারিগরী কর্ম-প্রবণতা অভীক্ষা, শিল্পকলা-সম্পর্কিত প্রবণতা অভীক্ষা, বৃত্তিগত আগ্রহ নিরূপক অভীক্ষা ইত্যাদি। ইহাদের প্রয়োগ বিভিন্ন আগ্রহ-অনুরাগ নিরূপণে প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু সকল শিক্ষার্থীকে বুদ্ধি পরীক্ষা ও অধীত বিদ্যার অভীক্ষা দিতে হইবে।

অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে ধারানির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিবেন।

(ক) শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি ছাত্রছাত্রীর কোন প্রবণতার কথা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই কথা ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানাইবেন।

(খ) ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাহাদের সমস্যা, আগ্রহ-অনুরাগ, পারিবারিক-সমস্যা, বৃত্তিমূলক কাজ সম্বন্ধে প্রবণতা জানিতে চেষ্টা করিবেন।

(গ) ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক অবস্থা, আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(ঘ) অনেক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের বহির্ভূত সময়ে নানা বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকেন। ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের ঐ সব বৃত্তি অনুসরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

(ঙ) ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত বিষয়গুলি কি ভাবে গ্রহণ করে তাহা ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিতে হইবে।

(চ) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারানির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবহিত হইতে হইবে, কারণ ছাত্রছাত্রীদের ভগ্নস্বাস্থ্য পরবর্তী জীবনের কাজকর্মকে ব্যাহত করিতে পারে।

(ছ) ছাত্রছাত্রীদের গৃহের পরিবেশ, পিতার শিক্ষা ও তাঁহার কর্মজীবন ইত্যাদি ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিতে হইবে।

(জ) বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহার জন্য পরীক্ষা লওয়া হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফলও ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজের কাছে রক্ষা করিবেন।

ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা ও অনুধাবন করিয়া ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার ধারা নির্দেশ দিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাম্প্রতিক ঝোঁক

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য নানাদিক দিয়া চেষ্টা চলিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। শুধু যে প্রসার তাহা নহে, গুণগত বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা চলিতেছে।

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতি—নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি বা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (A.I.C.S.E) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সৃষ্ট হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনঃসংগঠনের জন্য ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত বৃদ্ধির জন্য ঐ সংস্থা কতকগুলি কার্যপন্থা গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের A.I.C.S.E.-র প্রশাসনিক ক্ষমতা মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগের অধিকর্তা (Director of Extention Programmes for Secondary Education) কর্তৃক গৃহীত হয়। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করিতে থাকে। A.I.C.S.E-র কাজকর্ম চলিতে থাকিলেও প্রশাসন-বিভাগের কাজ ভিন্ন ধারায় চলিতে থাকে।

শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহে সম্প্রসারণ বিভাগ—

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে A.I.C.S.E-র উদ্যোগে ২৪টি নির্বাচিত শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে সম্প্রসারণ বিভাগ খোলা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যভাগে এই সংখ্যা ২৪ হইতে ৫৪তে যাইয়া দাঁড়ায়। এই সম্প্রসারণ বিভাগের দুইটি উদ্দেশ্য—প্রথম হইতেছে, বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাসমূহের সহিত শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির যোগাযোগ স্থাপন এবং দ্বিতীয় হইতেছে নিকটবর্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ। শিক্ষক-শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের এই সম্প্রসারণ বিভাগ নানা রকম কর্মপন্থা অনুসরণ করিতেছেন। তাহার মধ্যে আঞ্চলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীতে থাকাকালীন শিক্ষণদান অন্যতম। কর্মতালিকার ঝালাই-পাঠ, আলোচনা-চক্র, সভা, কর্মশালা বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শনী পাঠ, শিক্ষামূলক পুস্তক লেনদেন, ফিল্ম প্রদর্শন এবং শিক্ষামূলক প্রবন্ধাদির প্রকাশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কর্মপন্থা।

নিখিল ভারত আলোচনা-চক্র ও শিক্ষা বিষয়ক সভা

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতি (A.I.C.S.E) এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগ গত ছয় বৎসর যাবৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকদের জন্য, শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য, মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্যাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন। ঐ সমস্ত আলোচনা-চক্রের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। A.I.C.S.E এবং সম্প্রসারণ বিভাগ Teacher Education

নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছেন। সেই পত্রিকায় মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ আলোচিত হয়।

বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিবিধান

A.I.C.S.E এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিকল্পে নানা রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহারা বিজ্ঞান শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন। তদুপরি বিজ্ঞান-সমিতিও (Science Club) তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞান-সমিতির উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ নিয়া সমিতিতে আলোচনা করিবে এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষকের সাহায্যে করিবে। বিজ্ঞান-সমিতির আরও একটি উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবণতা সৃষ্টি। শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত আছে, ঐ কেন্দ্রীয় সমিতি আঞ্চলিক বিজ্ঞান সমিতিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই বিভাগ বিভিন্ন বিদ্যালয়কে বিজ্ঞান-সমিতি পরিচালনা করিবার জন্য ট্রেনিংও দান করিয়াছে।

পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি সাধন

মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশের পর ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। A.I.C.S.E এবং সম্প্রসারণ বিভাগ এই উভয় দপ্তরেরই মূল্যায়ন করিবার সংস্থা আছে। এই মূল্যায়ন সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য মূল্যায়ন সম্পর্কিত চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা-চক্রের উদ্দেশ্য হইল অংশ গ্রহণকারীরা প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়সমূহের শিক্ষার বাস্তব উদ্দেশ্য বাহির করিবে এবং সেই বিষয়সমূহের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকার্য কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহা বাহির করিবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ নিজেদের জন্য মূল্যায়ন-সংস্থা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন। ভারতের অনেক রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তও করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে রচনাত্মক প্রশ্নও দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক রাজ্যে বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চতর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ গ্রহণ সম্বন্ধে উন্নতি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাহার উপরে বাৎসরিক পরীক্ষার সাফল্যও কিছুটা নির্ভর করিয়া থাকে।

উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষার প্যাটার্ন হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। যেখানে সুবিধা আছে সেখানে তাহারা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও প্রবেশ করে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহারা যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়, তখন তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাকে অনুসরণ করা হইতে বঞ্চিত হয়। এই কারণে উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজন হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৭—৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট ৩০টি উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত অল্প। বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাকে অনুসরণ করার ফলে বহু উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন রহিয়াছে। অবশ্য যে সমস্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেও একটি শিল্পকে আবশ্যিক শিক্ষার অন্তর্গত করা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পশিক্ষাই বুনিয়াদী শিক্ষা নয়।

হিন্দী শিক্ষার উন্নতি বিধান

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইয়াছে এবং রাষ্ট্রভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। হিন্দী যেখানে মাতৃভাষা, সেই অঞ্চলে শিক্ষার উন্নীতকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে অঞ্চলে মাতৃভাষা হিন্দী ব্যতীত অন্য ভাষা, সেই অঞ্চলেও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য শব্দের পরিভাষার তালিকা তৈয়ারী হইয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন বিষয়সমূহ হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইতে পারে।

আগ্রাতে একটি কেন্দ্রীয় হিন্দী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠান হিন্দী শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা এবং উচ্চতর হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি*

নিম্নলিখিত তালিকাটি * দেখিলে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি বুঝিতে পারা যাইবে।

বিদ্যালয়	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,২৮৮	১০,৮৩৮	১৪,০০০	১৮,০০০
বহুমুখী বিদ্যালয়	—	৩৬৭	১,৬০০	১,৮০০
১৪—১৭ বৎসরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	১২,০০,০০০	২০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৪৪,০০,০০০
অর্থ-সংস্থান	১৯৫১—৫৬ প্রথম পরিকল্পনা	১৯৫৬-৬১ দ্বিতীয় পরিকল্পনা	১৯৬১-৬৬ তৃতীয় পরিকল্পনা	
	২১·৯৪ কোটি	৫১ কোটি	৯০ কোটি	

* Sri B. D. Srivastava-রচিত The Development of Modern Indian Education হইতে গৃহীত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

পৃথিবীর সকল দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে আমেরিকার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ইহাকে সদা সক্রিয় ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিচালিত করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা দেখা যায়।

আমেরিকায় **নানা ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়** দেখা যায়। যথা—

প্রকার ভেদ

(১) সাধারণ হাই স্কুল—(৯-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের)

ইহার চারিটি ধরণ—(ক) Comprehensive বা ব্যাপক, (খ) বৃত্তি-মূলক, (গ) বিশেষ ধরণের ও (ঘ) সংরক্ষিত।

(২) সিনিয়র হাই স্কুল—(১০-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের)

ইহার দুইটি ধরণ—(ক) Comprehensive বা ব্যাপক ও (খ) বৃত্তি-মূলক।

(৩) জুনিয়র হাই স্কুল — (৭-৯ বৎসরের বালক-বালিকাদের)

ইহার দুইটি ধরণ—(ক) সাধারণ, (খ) Comprehensive বা ব্যাপক।

(৪) জুনিয়র-সিনিয়র হাই স্কুল—(৭-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য)

ইহার দুইটি ধরণ—(ক) Comprehensive বা ব্যাপক (খ) সংরক্ষিত।

(৫) সান্ধ্য বিদ্যালয়—(সাধারণতঃ কোনো নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা থাকে না)

ইহার দুইটি ধরণ—(ক) Comprehensive বা ব্যাপক (খ) বৃত্তি-মূলক।

(৬) উন্নীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়—(১৩-১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য)

ইহার দুইটি ধরণ—(ক) সাধারণ ও (খ) কারিগরী।

(৭) **হাইস্কুল ও কমিউনিটি কলেজ** (৭-১৯, ও ১১-১৪ বৎসর পর্যন্ত)—শুধু মাত্র Comprehensive ধরণের।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবন যতখানি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। আমেরিকান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই আইন করিয়া স্কুলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং সাধারণ আমেরিকান সমাজ মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিশালী সুনাগরিক গঠনে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় রাখে।

একথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমেরিকান শিক্ষা-ব্যবস্থা **ধনিকতন্ত্র-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা**। সেখানে শিক্ষার মধ্য দিয়া এমন সামাজিক বিন্যাস গঠন করা হয় যাহাতে ধনিক ও উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শিক্ষা-সংগঠনে, প্রসারে ও ফললাভে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে। ফলে যত বেশী উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায়, উপার্জন-সম্ভাবনাও অধিক হয়, তাহাতে সমাজের অতি নগণ্য অংশই সেই পর্যায়ে উঠিতে পারে। এই সমালোচনা সত্য হইলেও **মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুণগত উৎকর্ষতা ও ব্যাপক আয়োজন** আমেরিকার সাধারণ জন-জীবনে **গুরুতর পরিবর্তন** ঘটাইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতার উপর জাতির সমুন্নতি প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে আমেরিকা নিঃসন্দেহ। এমন কি **জাতীয় প্রতিরক্ষার সর্বপ্রধান স্তম্ভ যে শিক্ষা** একথার উপরও খুবই জোর দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার কতকগুলি **বৈশিষ্ট্য** সম্বন্ধে আমেরিকানরা সদা সচেতন। যথা,—

(১) সার্বজনীন অবৈতনিক জন-সাধারণের (Public) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংগঠন—প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যাহাতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার আয়োজন করা যায়, এমন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

(২) প্রতিটি তরুণ যাহাতে আপনার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটাইয়া সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার জন্য বিপুল পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি।

(৩) জাতির মনীষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন।

(৪) যোগ্য নাগরিক গঠনের প্রয়াস।

(৫) সমাজে উৎপাদনের গুণগত ও উৎপাদনগত উৎকর্ষতা বিধান।

(৬) আত্মবোধের উজ্জীবন।

(৭) পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিযোজন।

(৮) গবেষণাজাত উন্নততর শিক্ষণ-পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ সাধন।

(৯) উত্তম শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া শিক্ষার উন্নয়ন সাধন।

(১০) বিদ্যালয়গুলির উপর স্থানীয় জনসাধারণের কর্তৃত্ব অটুট রাখার চেষ্টা।

(১১) উত্তম শিক্ষক নির্বাচন।

কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইলেও আধুনিক কালে মাধ্যমিক শিক্ষাকে খুবই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এই সমালোচনাগুলির মধ্যে প্রধান হইল, আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আমেরিকান জীবনযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া তাহাদের কাজ চালাইতে পারে নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি তাহাদের কর্মপদ্ধতি নিজেরা রূপান্তর করিতে করিতে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে আসল যে কর্মপদ্ধতি তাহাদের হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য এবং বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য পাঠ্য বিষয়সমূহের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তাহা ছাড়া এরূপ সমালোচনাও করা হইয়া থাকে যে, বুদ্ধির দিক্ দিয়া যাহারা অধিকতর শ্রেষ্ঠ তাহাদের সক্ষমতা প্রকাশোপযোগী ব্যবস্থার অভাব ঘটিয়াছে। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষায় বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হয়। কিন্তু আধুনিক মত অনুযায়ী ইহাও যথেষ্ট নয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। তাহা ছাড়া, জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং উচ্চতর মানের দক্ষতা অর্জন দুই ক্ষেত্রেই ত্রুটি দেখা যাইতেছে।

সমালোচনা

তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা তীব্র সমালোচনা হইতেছে এই ব্যাপারে যে, বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের বা ছাত্রীদের মধ্যে **মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন অভ্যাস গঠন করিতে পারিতেছে না** এবং **উচ্চনৈতিক মান গঠনের**

(৭) **হাইস্কুল ও কমিউনিটি কলেজ** (৭-১২, ও ১১-১৪ বৎসর পর্যন্ত)—শুধু মাত্র Comprehensive ধরণের।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবন যতখানি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। আমেরিকান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই আইন করিয়া স্কুলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং সাধারণ আমেরিকান সমাজ মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিশালী সুনাগরিক গঠনে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় রাখে।

একথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমেরিকান শিক্ষা-ব্যবস্থা **ধনিকতন্ত্র-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা**। সেখানে শিক্ষার মধ্য দিয়া এমন সামাজিক বিন্যাস গঠন করা হয় যাহাতে ধনিক ও উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শিক্ষা-সংগঠনে, প্রসারে ও ফললাভে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে। ফলে যত বেশী উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায়, উপার্জন-সম্ভাবনাও অধিক হয়, তাহাতে সমাজের অতি নগণ্য অংশই সেই পর্যায়ে উঠিতে পারে। এই সমালোচনা সত্য হইলেও **মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুণগত উৎকর্ষতা ও ব্যাপক আয়োজন** আমেরিকার সাধারণ জন-জীবনে **গুরুতর পরিবর্তন** ঘটাইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতার উপর জাতির সমুন্নতি প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে আমেরিকা নিঃসন্দেহ। এমন কি **জাতীয় প্রতিরক্ষার সর্বপ্রধান স্তম্ভ যে শিক্ষা** একথার উপরও খুবই জোর দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার কতকগুলি **বৈশিষ্ট্য** সম্বন্ধে আমেরিকানরা সদা সচেতন। যথা,—

মাধ্যমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

(১) সার্বজনীন অবৈতনিক জন-সাধারণের (Public) মাধ্যমিক বিত্যালয় সংগঠন—প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে বিত্যালয় স্থাপন করিয়া যাহাতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার আয়োজন করা যায়, এমন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

(২) প্রতিটি তরুণ যাহাতে আপনার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটাইয়া সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার জন্য বিপুল পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি।

(৩) জাতির মনীষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন।

(৪) যোগ্য নাগরিক গঠনের প্রয়াস।

(৫) সমাজে উৎপাদনের গুণগত ও উৎপাদনগত উৎকর্ষতা বিধান।

(৬) আত্মবোধের উজ্জীবন।

(৭) পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিযোজন।

(৮) গবেষণাজাত উন্নততর শিক্ষণ-পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ সাধন।

(৯) উত্তম শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া শিক্ষার উন্নয়ন সাধন।

(১০) বিদ্যালয়গুলির উপর স্থানীয় জনসাধারণের কর্তৃত্ব অটুট রাখার চেষ্টা।

(১১) উত্তম শিক্ষক নির্বাচন।

কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইলেও আধুনিক কালে মাধ্যমিক শিক্ষাকে খুবই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এই সমালোচনাগুলির মধ্যে প্রধান হইল, আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আমেরিকান জীবনযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া তাহাদের কাজ চালাইতে পারে নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি তাহাদের কর্মপদ্ধতি নিজেরা রূপান্তর করিতে করিতে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে আসল যে কর্মপদ্ধতি তাহাদের হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য এবং বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য পাঠ্য বিষয়সমূহের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তাহা ছাড়া এরূপ সমালোচনাও করা হইয়া থাকে যে, বুদ্ধির দিক্ দিয়া যাহারা অধিকতর শ্রেষ্ঠ তাহাদের সক্ষমতা প্রকাশোপযোগী ব্যবস্থার অভাব ঘটিয়াছে। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষায় বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হয়। কিন্তু আধুনিক মত অনুযায়ী ইহাও যথেষ্ট নয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। তাহা ছাড়া, জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং উচ্চতর মানের দক্ষতা অর্জন দুই ক্ষেত্রেই ত্রুটি দেখা যাইতেছে।

সমালোচনা

তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা তীব্র সমালোচনা হইতেছে এই ব্যাপারে যে, বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের বা ছাত্রীদের মধ্যে **মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন অভ্যাস গঠন করিতে পারিতেছে না** এবং **উচ্চনৈতিক মান গঠনের**

সহায়তা করিতেছে না। সর্বোপরি, আমেরিকার যে চিরায়ত ঐতিহ্য তাহাও বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইতে পারিতেছে না।

এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের পুনর্গঠন এবং ইহার সাফল্য বহু দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করিয়াছে। তাহার ফলে বহু দেশেই আমেনিকার ধাঁচে শিক্ষাসংগঠন করার চেষ্টা চলিতেছে।

ব্রিটেনের মাধ্যমিক শিক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত অবস্থার মধ্যে ছিল। অতি অল্পসংখ্যক বালকই শিক্ষার সুযোগ পাইত। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনের পর শিক্ষাকে বিস্তৃত করিয়া দিবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাসংস্কারে স্পেন্স্ রিপোর্টের অবদান অসামান্য। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত এই রিপোর্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের আইনকে খুবই প্রভাবিত করে। স্পেন্স্ রিপোর্ট তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন—(১) গ্রামার স্কুল, (২) টেকনিক্যাল, (৩) মডার্ন।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি মূল সংস্কার সাধনের সুপারিশ করেন। ইহার ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

(১) পূর্বতন বোর্ড অব্ এডুকেশন্‌কে উন্নীত করিয়া শিক্ষামন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা-সংস্কার

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাহায্য দান করার জন্য দুইটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়।

(৩) কাউন্টি ও বুরো কাউন্সিলসমূহ বিদ্যালয় পরিচালনা-সংক্রান্ত যে কর্তৃত্ব ভোগ করিত, তাহার সংখ্যা হ্রাস করা হইল।

(৪) তিনটি প্রগতিসম্পন্ন পরিপূর্ণ শিক্ষাধারার সৃষ্টি হইল।

(ক) প্রাথমিক স্তর

(খ) বার হইতে উনিশ বৎসর বয়সের সকল তরুণ-তরুণীর জন্য প্রয়োজনীর শিক্ষাব্যবস্থা।

(গ) উচ্চতর শিক্ষা

(৫) ৫ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের বালকবালিকার শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক হইল।

(৬) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে অবৈতনিক করিয়া দেওয়া হইল।

(৭) অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল।

(৮) সমাজ-শিক্ষা শারীর-শিক্ষা ও বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হইল।

(৯) রাষ্ট্রীয় বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়াইয়া তোলা হইল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বিপুল উন্নয়ন সাধিত হইল। শিক্ষামন্ত্রণালয় তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা বলেন।

বিদ্যালয়ের প্রকার-ভেদ

গ্রামার স্কুল—এই বিদ্যালয়ে ৬।৭ বৎসরের পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়। এই বিদ্যালয়সমূহে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত বিষয়সমূহ হইতে বিষয় নির্বাচন করিয়া পড়িতে হয়। যথা:—

(ক) ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল।

(খ) ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানীশ, ল্যাটিন, গ্রীক

(গ) গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, উচ্চতর গণিত (calculas)

(ঘ) বিজ্ঞান—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা

(ঙ) অন্যান্য—কলা, সংগীত, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, সমসাময়িক ঘটনাসমূহ (current affairs), গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

সেকেণ্ডারী টেক্‌নিক্যাল স্কুল—১৯০৫ সাল হইতেই এই ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৪৪ এর পর হইতে এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির সময় কঠোরভাবে নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এই ধরণের প্রায় ২৯৫টি বিদ্যালয় আছে।

সেকেণ্ডারী মডার্ন স্কুল—হ্যাডো কমিটি এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের উৎসাহ প্রদানের সুপারিশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরণের বিদ্যালয়গুলিরই প্রাধান্য। কতকগুলি প্রগতিশীল পন্থা অনুসরণের জন্য এই বিদ্যালয়গুলি খ্যাত। যথা:— বিদ্যালয়ের কর্মপরিচালনা পদ্ধতির ব্যাপারে এই বিদ্যালয়গুলি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই বিদ্যালয়গুলি পাঠশেষে কোন রূপ সার্টিফিকেট প্রদান করে না। সে জন্য অনেকে ইহাকে সত্যকার সেকেণ্ডারী স্কুল বলিতে চান না, ফলে কিছুটা সম্মান লাঘব হয়।

মাধ্যমিক স্তরে এখনও গ্রামার স্কুলগুলির সর্বোচ্চ মর্যাদা। গ্রামার স্কুলে ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করিতে না পারিলে পিতামাতার বড়ই মনোবেদনার কারণ ঘটে।

মডার্ণ স্কুলগুলির পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ :—

(১) ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, চল্‌তি ঘটনা (current affairs), ধর্ম

(২) প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন বিদ্যা, প্রাথমিক জীববিদ্যা

(৩) আর্ট, ড্রইং, পেন্টিং, নক্সা, বই বাঁধাই, সূচীশিল্প, দৃশ্য অংকন

(৪) কাঠের কাজ—প্রায় সব রকম

(৫) ধাতুর কাজ—প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানসহ

(৬) গণিত, ইংরাজী, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, সংগীত (যন্ত্র ও কণ্ঠ)

(৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

(৮) উদ্যানবিদ্যা

(৯) ফরাসী ভাষা

(১০) শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলা

বাইল্যাটারেল, মাল্‌টিল্যাটারেল এবং কম্প্রিহেন্‌সিভ্‌ (Comprehensive) সেকেণ্ডারী স্কুল—একই বাড়ীতে অনেক সময় টেক্‌নিক্যাল ও মডার্ণ স্কুল একই সাথে পরিচালিত করা হয়। কখনও বা উপরি-উক্ত তিন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম একই স্কুলবাড়ীতে আলাদা আলাদা ভাবে অনুসৃত হয়। এইগুলিকে বাইল্যাটারেল মাল্‌টিল্যাটারেল স্কুল বলে।

আবার অনেক সময় একই বিদ্যালয়ে উপরোক্ত তিন ধারার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া পাঠদান চলিতে থাকে—এগুলিকে Comprehensive School বলে।

এই ধরণের কম্প্রিহেনসিভ্‌ স্কুল ইংল্যাণ্ডের খুবই **বিতর্কের সূচনা** করিয়াছে। সমাজের উচ্চ স্তরের অধিকাংশ ইংরেজ তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের **অভিজাত গ্রামার স্কুলে** পড়াইয়া আভিজাত্য বজায় রাখিতে উৎসুক। কাজেই অভিজাত সম্প্রদায়, গ্রামার স্কুলের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ গ্রামার স্কুলের মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। অপর দিকে **প্রগতিপন্থীরা কম্প্রিহেনসিভ্‌ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।**

সমালোচনা

কারণ, তাঁহারা মনে করেন, শিক্ষায় সকলের সম-অধিকার নীতি সার্থক করিতে হইলে এই পার্থক্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কম্প্রিহেনসিভ্‌ স্কুল প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম অধিকার সম্প্রসারিত হইবে। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পর এই আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। যুক্তরাজ্যের সমগ্র বালিকা ও বালকের মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগ গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করিয়া থাকে। অথচ মডার্ণ স্কুলগুলিতে শতকরা ৬০ ভাগ পড়াশুনা করে। যদিও গ্রামার স্কুলের আভিজাত্য বেশী, প্রবেশ করা কঠিন, কিন্তু গ্রামার স্কুলের গুরুত্ব দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এখন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া চলিতেছে—সে দ্বন্দ্ব সমাজের উপরতলার সহিত নীচের তলার।

ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা

ফ্রান্সের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের **কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের দ্বারা** যাবতীয় বিষয় **পরিচালিত** হয়। তাহা ছাড়া ইহা বিশ্বাস করা হয় যে জাতীয় জীবনে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কৃষ্টিমূলক ধারা অনুসরণ করিতে পারিলে সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই দৃষ্টি-ভঙ্গী সম্মুখে রাখিয়াই সমগ্র ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠিত।

শিক্ষার সমস্ত প্রকার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। শিক্ষামন্ত্রণালয় হইতে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবিষয়, শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই নির্দেশ দান করা হয়। পরীক্ষাও মন্ত্রণালয়ই গ্রহণ করে।

ফ্রান্সের শিক্ষাক্ষেত্রে **তিনটি স্তর**—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। কারিগরী শিক্ষা এখনও যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণতঃ ১১।১২ বৎসর বয়সে বালক-বালিকারা মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে সাধারণতঃ দুইটা স্তরে ভাগ করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ

প্রথম চারি বৎসর সাধারণ শিক্ষা ও দ্বিতীয় তিন বৎসর কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন। প্রতিটি পর্যায়ের শেষেই পরীক্ষার কড়াকড়ি ব্যবস্থা।

সাধারণতঃ **তিন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়** দেখা যাইত। আগেকার দিনে তিন ধরণের বিদ্যালয়ে খুব পার্থক্য থাকিলেও ক্রমেই তাহা বিলুপ্ত হইতেছে। প্রথম চারি বৎসর ধরিয়া ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, দুটি আধুনিক

ইউরোপীয় ভাষা, পৌরবিজ্ঞান, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সংগীত, কলা, শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থা। পঞ্চম বৎসর হইতে বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন স্থরু হয়। এখানে বিষয়গুলিকে গুচ্ছে গুচ্ছে ভাগ স্থরু হয়।

(ক) ক্ল্যাসিক্যাল :—ল্যাটিন, গ্রীক, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা।

ও (খ) ক্ল্যাসিক্যাল ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়—দুটি আধুনিক ভাষা,—যেমন, আধুনিক ভাষা ও ল্যাটিন, গণিত ও দুটি ভাষা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদি নানা জাতীয়।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাশে পাশে অনেক বেসরকারী বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় শতকরা ৪০ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়-গুলিতে পড়াশুনা করে। অনেক বিদ্যালয় মহাশিক্ষা-মূলক। প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে ৫ দিন বিদ্যালয় খোলা থাকে। অধিকাংশ স্কুলে খেলাধূলা বা পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কাজের ব্যবস্থা নাই। শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে বজায় রাখা হয়। ছাত্রদের মধ্যে দল গঠন, মন্ত্রীসভা গঠন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু পরিচালনা—এসব নাই। ঘরের কাজের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমগ্রভাবে দেখিলে ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় যেন সঙ্কীর্ণ, যেন খানিকটা পশ্চাৎপদ।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা

পৃথিবীর বহু দেশেই শিক্ষাকে জন্মগত অধিকার বলা হয়। এখনও বহু দেশই সকলের জন্য শিক্ষার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা সম্ভব হইয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। **নার্সারী হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরের শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া রাশিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।** একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

বর্তমানে রাশিয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত **তিন প্রকারের বিদ্যালয়** দেখা যায়।—

(১) প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী,

(২) প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী,

(৩) প্রথম হইতে একাদশ শ্রেণী।

বিদ্যালয় যে ধরণের হউক, সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ের **পাঠ্যক্রম একই প্রকার।** সাধারণতঃ তিনটি ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, শারীর-শিক্ষা, ব্যবহারিক কাজকর্ম ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শেখানো হয়। তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা স্থুরু হয়। মাতৃ-ভাষা যদি রাশিয়ান ভিন্ন অন্য ভাষা হয় তাহা হইলে রাশিয়ান শেখে, রাশিয়ান যদি মাতৃ-ভাষা হয় তাহা হইলে অন্য রিপাবলিকান্ ভাষা শেখে। পঞ্চম শ্রেণী হইতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা স্থুরু হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির সময় এই নূতন ভাষাগুলিতে পাশ করার জন্য আটকায়না। মাতৃ-ভাষা ছাড়া হয় রাশিয়ান বা অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় পাশ করিতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষামন্ত্রনালয় পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আলাদা আলাদা ভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে পাশ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না।

বিদ্যালয়ের প্রকারভেদ ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু

সর্বস্তরের শিক্ষা সহশিক্ষামূলক। মহিলারাই শিক্ষকতায় শতকরা ৭০ জন। কোন শ্রেণীতেই শেষ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া প্রমোশন দেওয়া হয় না। কিউমুলেটিভ্ রেকর্ড ও মাসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ করানো হয়। ফেল করা, লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়া বা আটক হইয়া যাওয়া রাশিয়ার ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে অজ্ঞাত। পাঠ্যপুস্তক সরকারীনিয়ন্ত্রনে থাকে।

পশ্চিম জার্মাণীর শিক্ষা-ব্যবস্থা

পশ্চিম জার্মাণীতে স্কুলকে বলে 'শুলে'। সমগ্র শিক্ষাস্তরকে প্রধানতঃ চারি ভাগ করা যায়।—(১) কিণ্ডারগার্টেন, (২) ফোক্শুলে (৩) ইওরেশুলে (৪) ইউনিভারসিটাট।

ইওরেশুলেতে দশ হইতে আঠার বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা থাকে। ইওরেশুলে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে একটি মাত্র অঙ্গরাজ্য ছাড়া সর্বত্র মহিলা শিক্ষিকা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সর্বস্তরে গ্রেডে নম্বর দিবার ব্যবস্থা। গ্রেডেও সংখ্যার ব্যবস্থা। ১ অর্থে সব থেকে

বেশী, ৫ অর্থে ফেল। প্রতি অংশে দুটি টার্মে পড়াশুনা চলে। 'সামার সিমেষ্টার', 'উইন্টার সিমেষ্টার'। সাড়ে তিন মাস সময়কে 'সিমেষ্টার' বলে।

মাধ্যমিক স্তরের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে আবিটুর। ছাত্রদের দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা

সমগ্র সুইজারল্যাণ্ড্ দেশটি ২২টি ক্যান্টনে বিভক্ত। প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই একই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দেশটির চারি দিকে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ইটালী ও জার্মাণী। রাষ্ট্রভাষা তিনটি—জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান। জার্মান ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা ৭২ জন, ফরাসী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন, বাকী ইটালিয়ান ভাষা-ভাষী।

এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Primar Schule) ছয়টি শ্রেণী।

মাধ্যমিক শিক্ষা চারিটি বিভাগে বিভক্ত।—

(১) ওপেরশুলে (Operschule), (২) সেকুণ্ডারশুলে (Sekundarschule), (৩) জিমনাসিয়াম, (৪) রিয়ালশুলে (Realschule)।

মাধ্যমিক স্তরের প্রথম ধরণের বিদ্যালয়গুলিকে বলা হয় ওপেরশুলে। এখানকার পাঠ আরম্ভের বয়স ১২+।

পাঠ্যবিষয় :—(১) মাতৃ-ভাষা (২) গণিত (৩) পঠন-লিখন (৪) রেখাঙ্কন (৫) ইতিহাস (৬) ভূগোল (৭) সন্তরণ (৮) স্কিপিং (৯) কাঠের কাজ (১০) ধাতুর কাজ (১১) বাগানের কাজ।

সেকেণ্ডারশুলেতে--পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়াও ইংরাজী, ইটালিয়ান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা পড়ানো হয়। ওপেরশুলেতে দুই শ্রেণী, সেকেণ্ডারশুলেতে তিন শ্রেণী। উভয়ই অবৈতনিক।

জিমনাসিয়াম ও রিয়্যালশুলেতে ৮ শ্রেণী। এখানে বেতন লাগে, বেতনের হার মাসে ৪ সুইসফ্রাঁ অর্থাৎ প্রায় ৪·৭৫ টাকা। ওপেরশুলে পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। জিমনাসিয়াম ও রিয়্যালশুলেতে সকল বিষয় বেশী করিয়া পড়ানো হয়। শেষে যে পরীক্ষা হয় তাহাকে বলে 'মাটুরিটাট'। 'মাটুরিটাট' পাশ করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, কারিগরি শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়। সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৪টা

বা ৫টা পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা ছুটি থাকে। তবে এই সব ব্যাপারে এক এক ক্যাণ্টনে এক এক প্রকার নিয়ম। (ক্যাণ্টন বা অঞ্চল সংখ্যা ৭টি) গ্রামাঞ্চলে গরীব ছাত্ররা দুপুরের খাবার বিনা পয়সায় পায়। শিক্ষকেরা বাড়ীতে যথেষ্ট কাজ দেন। মাধ্যমিক স্তরে অল্পস্বল্প প্রাইভেট পড়ানো আছে।

হল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা

হল্যাণ্ডের অপর নাম নেদারল্যাণ্ড বা পাতালপুরীর দেশ। হল্যাণ্ডের শিক্ষাধারা মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত—প্রাথমিক পর্যায়, মাধ্যমিক পর্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। হল্যাণ্ডে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ চারি প্রকারের।

(১) হুগের বার্গের (Hoogere Burger)—এই বিদ্যালয়ে ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের পড়াশুনা হয়। দরিদ্র ছাত্রদের বেতন দিতে হয় না। এই বিদ্যালয়ে ডাচ্, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মানী এই চারি ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা ও সামান্য হিসাবপত্র পড়ানো হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের হুগের বার্গের—এখানে ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের বালক-বালিকারা পড়াশুনা করে। পাঠ্য বিষয় উপরের মতই, তবে পরিমানে বেশী।

(৩) তৃতীয় প্রকারের হুগের বার্গের—এখানে ১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়সের বালক-বালিকারা পড়াশুনা করে। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। 'এ' ভাগে ডাচ, জার্মান, ইংরাজী ও ফরাসী এই চারি ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি, হিসাবপত্র পড়ানো হয়।

'বি' ভাগে ভাষা বাদ দিয়া ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও গণিত পড়ানো হয়।

(৪) ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের বালক-বালিকারা পড়াশুনা করে। তাহাতে উপরোক্ত চারিটি ভাষা ছাড়া গ্রীকভাষা, ল্যাটিন ভাষা, ইতিহাস ভূগোল, গনিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও জীববিদ্যা পড়ানো হয়। জিমনাসিয়াম স্কুলগুলি আবার দুই স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে ভাষা শিক্ষার

উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে, বিজ্ঞানের বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর মাস হইতে শিক্ষাবর্ষ স্বরু হইয়া জুলাই মাসে শেষ হয়। সারা বছরে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ১ হইতে ১০ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়। ৬ এর নীচে কেহ পাইলে সে ফেল হয়। শিক্ষা-বিভাগ বৎসরের শেষ পরীক্ষাগুলি পরিচালন করেন এবং প্রশ্নপত্র পাঠান। কোনো ছাত্র অনুত্তীর্ণ হইলে পরের বার পরীক্ষা দেয়। সকাল বিকাল দুই বেলাই কাজ চলে। শিক্ষকেরা প্রাইভেট টুইশনি করিয়া থাকেন। গরীব-ছাত্ররা বিনামূল্যে বই পায় ও বিনা বেতনে পড়িতে পায়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনোত্তর যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

স্বাধীন ভারতে প্রায় সতের বৎসর কালের মধ্যে বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	(১৮৫৭)
বোম্বাই "	(১৮৫৭)
মাদ্রাজ ,,	(১৮৫৭)
আগ্রা "	(১৯২৭)
আলিগড় "	(১৯২০)
এলাহাবাদ "	(১৮৮৭)
লক্ষ্ণৌ "	(১৯২১)
নাগপুর "	(১৯২৩)
পাটনা "	(১৯১৭)
দিল্লী "	(১৯২২)
বারাণসী হিন্দু "	(১৯১৬)
অন্ধ্র "	(১৯২৬)
গোরক্ষপুর "	(১৯৫৭)
আন্নামালাই "	(১৯২৯)
মহীশূর "	(১৯১৬)
ওসমানিয়া " হায়দরাবাদ	(১৯১৮)
কেরালা " ত্রিবান্দ্রম	(১৯৩৭)
কুরুক্ষেত্র "	(১৯৫৬)
উৎকল " কটক	(১৯৪৩)
জম্মু ও কাশ্মীর ,,	(১৯৪৮)
সাগর ,,	(১৯৪৬)
রাজস্থান ,, জয়পুর	(১৯৪৭)
এস. এন. ডি. টি. মহিলা ,, বোম্বাই	(১৯৫১)
গৌহাটি "	(১৯৪৮)
বিশ্বভারতী ,, শান্তিনিকেতন	(১৯৫১)
জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	(১৯৫৭)
বিক্রম " উজ্জয়িনী	(১৯৫৭)
পাঞ্জাব " (চণ্ডীগড়)	(১৯৪৭)
কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, ধারওয়ার	(১৯৪৯)
বরোদা "	(১৯৪৯)
গুজরাট ,, আমেদাবাদ	(১৯৫০)
পুনা "	(১৯৪৯)
ইঞ্জিনিয়ারিং " রুরকি	(১৯৪৯)
সর্দার বল্লভাই বিদ্যাপীঠ	(১৯৫৫)
শ্রীভেঙ্কটেশ্বর ,, তিরুপুতি	(১৯৫৫)
যাদবপুর "	(১৯৫৫)
বর্ধমান "	(১৯৬০)
ইন্দ্রকলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় খয়রাগড়	(১৮৫৮)
বারণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	(১৯৫৮)
সারাযওয়াগা আওরঙ্গাবাদ	(১৯৫৮)
কল্যাণী ,,	(১৯৬০)
কৃষি ,, রুদ্রপুর নৈনিতাল	
রাঁচী ,,	(১৯৬০)
ভাগলপুর ,,	(১৯৬০)
বিহার "	(১৯৫২)
মগধ ,,	—
রবীন্দ্রভারতী কলিকাতা	(১৯৬২)
উত্তর বঙ্গ " শিলিগুড়ি	(১৯৬১)
সংস্কৃত ,, দ্বারভাঙ্গা	(১৯৬১)
পাঞ্জাবী " পাতিয়ালা	(১৯৬১)
ছত্রপতি শিবাজী ,, কোলাপুর	(১৯৬২)

সূচনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় এক বৎসর কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি **বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** স্থাপিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, যিনি বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি। এই কমিশন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রকাশ করেন। কমিশনের সুপারিশসমূহ অন্যত্র পরিবেশিত হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ভারত বহু দিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া লিপ্ত থাকার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরাধীন ভারতে ভারতবাসী নানা কারণে শিক্ষা-দীক্ষায় নীচু স্তরে নামিয়া আসিয়াছিল। ভারতের এই সমগ্র মানব-সমাজকে উন্নত না করিলে ভারত কি প্রকারে জগৎ-সভায় স্থান পাইবে? এই কারণে ভারত সরকার সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেন শিক্ষার উপর। এই কারণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন শুধু উচ্চ শিক্ষার বিষয়েই সুপারিশ করেন না, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারেও কমিশন তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য করেন।

সূচনা

স্বাধীন যুগের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

স্বাধীন ভারতের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ কি ছিল তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থাগুলি জানিতে হইলে এই বৈশিষ্টগুলি জানা প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে (১) বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়, (২) বিভিন্ন ধরণের কলেজ, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থা, (৪) কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্থা।

বিভিন্ন রূপ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ

(১) বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীন ভারতে বর্তমানে প্রায় ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বর্তমান সময়ে ভারতে তিন রকম ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় আছে; যথা—অনুমোদনধর্মী, এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। অনুমোনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ হইতেছে' যে সকল মহাবিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদানের উপযুক্ত সেই সমস্ত মহাবিদ্যালয়কে অনুমোদন করা। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অনেকটা স্থান জুড়িয়া-ব্যাপ্ত, বহু মহাবিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনুমোদনধর্মী
বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্গে যুক্ত। যে সমস্ত মহাবিদ্যালয় বা কলেজ—অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রহিয়াছে, তাহারা এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই কাজ করিয়া থাকে। তবে সেই সমস্ত মহাবিদ্যালয়ের কর্ম-পদ্ধতির এবং বিশেষ করিয়া পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা। এই আইনে লিখিত আছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহকে পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন করিবেন, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করিবেন, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এবং পরীক্ষার পর উপাধি ইত্যাদি বিতরণ করিবেন। স্বীয় এলাকার মধ্যে যে সকল মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে তাহাদের অনুমোদন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করেন না, কিন্তু এই মহাবিদ্যালয়গুলি যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিতে পারে তাহার জন্য তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত সর্ত পালন করিবেন, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া দেখিবেন। যে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমোদন প্রার্থনা করিবেন, সেই মহাবিদ্যালয় সিণ্ডিকেটকে তাহার কার্যক্রম দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া যাইবে। যে সমস্ত বিষয়ে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্তুষ্ট করিবেন, সেই বিষয়গুলি হইল নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত :—(১) শিক্ষক, (২) মহাবিদ্যালয় সংগঠন, (৩) শিক্ষোপকরণ, (৪) মহাবিদ্যালয়-গৃহ ও আবাসগৃহ, (৫) ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্যা ও তাহাদের গুণাবলী, (৬) অর্থ, (৭) পুস্তকাগারে, (৮) মহাবিদ্যালয়ের রেকর্ড ও অন্যান্য কাগজপত্র, অন্যান্য বিবিধ বিষয় ইত্যাদি। এই আইনে আরও বিধিবদ্ধ আছে যে সিণ্ডিকেট মাঝে মাঝে উপযুক্ত পরিদর্শক দ্বারা মহাবিদ্যালয়গুলিকে পরিদর্শন করাইয়া মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা করিবেন।

এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রে অবস্থিত তাহাকে এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়।

এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়

এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষকে সমগ্র শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সমগ্র শিক্ষাদান কার্য ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নরূপ। (১) বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়সমূহ নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবে। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রতিটি মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্নীত শিক্ষামান অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ই তাহার স্বাতন্ত্র্য-বোধ কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মত প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান কার্য চলিবে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য চলিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান-সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবেই চলিয়া থাকে।

সংঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন

স্বাধীন ভারত গঠিত হইবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর ভারত সরকারের শিক্ষা-অধিকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি **বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** গঠিত হয়। ঐ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এইজন্য ইহা **রাধাকৃষ্ণ কমিশন** নামে খ্যাত। উহার অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে ডাঃ তারাচাঁদ, ডাঃ জাকীর হোসেন, ডাঃ লক্ষণস্বামী মুদালিয়র, ডাঃ মেঘনাথ সাহা, শ্রী নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত (সেক্রেটারী), স্যার জেমথ ভাষ, ডাঃ আর্থার মর্গান প্রভৃতি প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণ ছিলেন।

উদ্দেশ্য। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা-পূর্বক সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের নীতি নির্ধারণ ও প্রচেষ্টার সুপারিশাদি প্রদান করা।

(১) ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গবেষণা-সংক্রান্ত বিষয়ের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।

কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে।

(৩) শিক্ষার ও পরীক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা সম্বন্ধে।

(৪) বিজ্ঞান শিক্ষা ও মানবীয় বিদ্যাসমূহ শিক্ষার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করিয়া উপযুক্ত পাঠ্যক্রম সংগঠন বিষয়ে।

(৫) সংবিধানের মূল নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষামান নির্ধারণ বিষয়ে।

(৬) শিক্ষার মাধ্যম ভাষা বিষয়ে।

(৭) ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিল্পকলা ও ধর্ম বিষয় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে।

(৮) অর্থচালিত ভিত্তিতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সংগঠন বিষয়ে।

(৯) অর্থ ও সামর্থ্যের অপব্যয় নিবারণ জন্য উচ্চ গবেষণামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থাদির সংহতি সাধন বিষয়ে।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে।

(১১) বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রমুখ সর্বভারতীয় গুরুত্বপুর্ণ সংস্থাগুলির বিশেষ সমস্যাদির বিষয়।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের যোগ্যতা, চাকুরীর সর্তাদি, মাহিনা, সুযোগ সুবিধা ও গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি বিষয়।

(১৩) ছাত্রদের শৃঙ্খলা, ছাত্রাবাস, শিক্ষার বিশেষ সহায়তা প্রদান প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেই সব বিষয়।

কমিশন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব সম্পর্কে আসিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া ও তাহার উত্তরগুলি বিশ্লেষণ দ্বারা, এবং চিঠি-পত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত মতামত দ্বারা তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহ গঠন করিয়াছেন ও তাহার ভিত্তিতে একটি সুবৃহৎ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। ইহা **শিক্ষা-জগতে একটি মূল্যবান তথ্য-পুস্তক** রূপে স্থান করিয়া লইয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতে গিয়া কমিশন বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব, বর্তমান যুগের বৌদ্ধিক অগ্রগতি, জীবনের উপর শিক্ষার সামগ্রিক প্রভাব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পার্থক্য, বর্তমান ভারতের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যাহা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, নূতন ভারত, ন্যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও সৌহার্দের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকেই তাঁহাদের সামাজিক জীবনাদর্শ করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ইহার সহায়কের ভূমিকা লইতে হইবে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় কমিশন বলিয়াছেন, ব্যষ্টির দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অপুষ্টি হইতে মুক্তি দ্বারাই প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব। প্রকৃত সমাজনেতা ও বিজ্ঞ শাসক-সম্প্রদায় সৃষ্টি না হইলে ন্যায় বিচার সম্ভব নহে। স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে শিক্ষকদের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন এবং মৈত্রী বলিতে বর্তমানে জাতীয় মৈত্রী-মাত্র যথেষ্ট নহে—ইহার জন্য বিশ্ব-একতার বোধ প্রয়োজন। কমিশন ব্যক্তিত্বের মুক্তি ও বিকাশকে শিক্ষার বিচারে উচ্চ মূল্য দিয়াছেন। শারীরিক বিকাশের সহিত মানসিক বিকাশের সংহতি স্থাপন, সমাজ প্রকৃতি ও আত্মার সমন্বয় সাধন, মন ও জ্ঞানের সংহতি, মানসিক স্বাধীনতা, নূতন জীবনে দীক্ষা গ্রহণ—এইগুলি দ্বারা শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া কমিশন মনে করেন। সামাজিক সুবিচারের জন্য অধিকাংশ কৃষি-জীবীর জন্য কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা, কর্মীদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা, গ্রামীন জীবনের বিকাশ উপযোগী শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত মানবীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষার সমন্বয় সাধন, সমাজ-শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কমিশন আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। মুক্তির প্রতি সত্যকার অনুরাগ জন্য মানসিক চিন্তার বিমুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয় কমিশন বিশেষ অবহিত আছেন। সাম্যভাব সৃষ্টির জন্য কমিশন শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। কমিশন এই জন্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কমিশন ভারতীয় সভ্যতার একত্বকে গুরুত্ব দিয়াছেন এবং শিক্ষাকে ভারতীয় সংস্কৃতির অভিমুখী করণের উপর

গুরুত্ব দিয়াছেন। কমিশন ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতে যে একটি জাতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই গুরুত্ব দিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাসের পৌরাণিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রভাব দ্বারাই এই সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা একটি জীবন্ত সংস্কৃতি তাহাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করা তাই ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া কমিশন মনে করেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উপর কমিশন গুরুত্ব প্রদান করিয়া তাহার উপযোগী শিক্ষাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বলিয়া কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন।

শিক্ষকবর্গের উন্নতি-বিধান

কমিশন তাহার রিপোর্টের তৃতীয় অনুচ্ছেদে শিক্ষকবর্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষকবর্গের শিক্ষাকার্যের বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া বর্তমান অবস্থায় তাঁহার অনভিপ্রেত অবস্থা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষকের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা নিজ ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনের প্রবণতা দেখিয়া উহার কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উপযুক্ত অর্থের অভাব হেতু শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা ও তজ্জনিত কুফল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য নিম্নলিখিত পর্যায়ের শিক্ষক ও তাহাদের পার্শ্বে তাহাদের বেতনের স্কেল অনুমোদন করিয়াছেন।

শিক্ষকবর্গের অবস্থার উন্নতিসাধন

প্রফেসর—	৯০০	—	৫০	—	১৩৫০
রিডার—	৬০০	—	৩০	—	৯০০
লেক্চারার—	৩০০	—	২৫	—	৬০০
ইন্‌স্ট্রাক্টার বা ফেলো—	২৫০				
রিসার্চ ফেলো—	২৫০	—	২৫	—	৫০০

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির জন্য তাহারা নিম্নলিখিত পদ ও বেতনের সুপারিশ করিয়াছেন—

লেক্‌চারার— ২০০ — ১৫ ৩২০ — ২০ ৪০০৲

সিনিয়র পোষ্ট— ৪০০ — ২৫ ৬০০ (প্রত্যেক কলেজের জন্য ২টি করিয়া)

অধ্যক্ষ— ৬০০ — ৪০ — ৮০০

যদি কোনও কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণী থাকে তাহার জন্য—

লেকচারার—	২০০	—	১৫	—	৩৫০—২০—৪০০—২৫—৫০০
সিনিয়র পোষ্ট—	৫০০	—	২৫	—	৮০০ (প্রত্যেক কলেজে ২টি পদ)
অধ্যক্ষ—	৮০০	—	৪০	—	১০০০৲

কমিশন নিম্নলিখিত নিয়মগুলির শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসরণ-যোগ্য মনে করিয়াছেন—

(১) পদোন্নতি যোগ্যতার মাপকাঠি দ্বারা নিম্নলিখিত হওয়া উচিত।

(২) শিক্ষা নির্বাচনে উপযুক্ত সতর্কতা লওয়া উচিত।

(৩) নিম্নপদ (লেক্‌চারার ইন্‌স্ট্রাক্টার) ও উচ্চপদ (প্রফেসর ও রিডার) সংখ্যার হার হওয়া উচিত ২ : ১

(৪) চাকুরীর বয়সের ঊর্ধ্বতম সীমা ৬০ বৎসর হইবে তবে প্রফেসরদের ক্ষেত্রে তাহা ৬৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা চলিবে।

(৫) কাজের সময়, ছুটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্ধারিত বিষয় থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার মান

অতঃপর কমিশন চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিক্ষার মান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন বর্তমান শিক্ষার নিম্ন মান ও তাহাতে অকৃতকার্যতার হার দেখিয়া হতাশা ব্যক্ত করিয়াছেন ও শিক্ষকের নিম্ন-মানকে বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষার নিম্ন মানের জন্য দায়ী করিয়াছেন। কমিশন স্কুলের ও কলেজের শিক্ষার পরিবেশ যে পৃথক ধরণের তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ বয়স ১৮ বৎসর হওয়া উচিত দেখাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯) আধুনিক কলেজ-সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া কমিশন দেখাইয়াছেন

শিক্ষার মান

ইহার উদ্দেশ্য পালিত হয় নাই। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া কমিশন উহার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিফ্রেসার কোর্স-এর উপযোগিতা বিষয়ে কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে কমিশন পাঠদান-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করিয়াছেন ও প্রসঙ্গত পাঠ্যপুস্তক, বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, সান্ধ্য-কলেজ বিষয়ে আলোচনা

করিয়াছেন। কমিশন টিউটোরিয়াল শ্রেণী, সেমিনার প্রভৃতি পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন লাইব্রেরীর উপযোগিতা ও তাহার উৎকৃষ্ট সংগঠন বিষয়ে এবং পরীক্ষাগার বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনা করিয়াছেন। উপরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ।—

(১) স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ১২ বৎসর পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে।

(২) ইহার জন্য বহু সংখ্যক সুপরিচালিত ও উত্তম মাধ্যমিক কলেজের প্রয়োজন হইবে যাহাতে ৯ম হইতে ১২তম অথবা ৬ষ্ঠ হইতে ১২তম শ্রেণীর শিক্ষা প্রদত্ত হইবে।

(৩) ১০ বৎসর অথবা ১২ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ দিবার উপযোগী অনেক বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন।

(৪) বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ জন্য রিফ্রেসার কোর্স-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাহাতে অত্যধিক না হয়, সেই জন্য শিক্ষা-প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা ৩০০০ ও অনুমোদিত কলেজের সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা ১৫০০ করিতে হইবে।

(৬) শিক্ষা বৎসরে তিনটি টার্ম থাকিবে ও প্রতি টার্মের দৈর্ঘ্য হইবে ১১ সপ্তাহ এবং মোট কার্যকাল হইবে পরীক্ষার জন্য ব্যয়িত দিন বাদে ১৮০ দিন (সর্বনিম্ন)।

(৭) লেকচারগুলি সযত্নে পরিচালিত হইবে ও তাহার সহায়ক হিসাবে টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরীর কাজ ও লেখার কাজ রাখিতে হইবে।

(৮) কোনও পাঠ ক্রমের জন্যই বাঁধাধরা পাঠ্য পুস্তক থাকিবে না।

(৯) মাধ্যমিক কলেজের স্তরের জন্য লেকচারসমূহে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হইবে। কয়েক স্তরের পরীক্ষার্থীকেই মাত্র প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু কর্মরত শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে নৈশ শ্রেণীর সুযোগ দিতে হইবে।

(১০) টিউটোরিয়াল শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাদান-কারী কলেজে থাকিবে ও তাহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-অনুসারে পরিচালিত হইবে।—

(ক) কোন টিউটোরিয়াল শ্রেণীতে ৬ জনের বেশী ছাত্র থাকিবে না।

(খ) পাস ও অনার্স কোর্সের সকল ছাত্রই ইহার সুযোগ পাইবে।

(গ) ইহাদ্বারা শুধু পরীক্ষা পাশের কৌশল আয়ত্ত করানো হইবে না, চিন্তা-শক্তির বিকাশ ঘটানো হইবে।

(ঘ) ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে শিক্ষাদাতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ও গুণগত যোগ্যতা বৃদ্ধির উপর।

(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটাইতে হইবে ও তজ্জন্য—

(ক) প্রচুর বাৎসরিক অর্থমঞ্জুরী আবশ্যক।

(খ) খোলা আলমারী হইতে পুস্তক লওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন আবশ্যক।

(গ) গ্রন্থাগার দীর্ঘ সময় খোলা রাখা আবশ্যক।

(ঘ) উহার সংগঠন উন্নত হওয়া আবশ্যক।

(ঙ) পুস্তক নির্বাচনে সাহায্যকারী শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ প্রয়োজন।

(চ) ইহার গৃহ-পুস্তকাধার ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নয়ন প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ের পাঠ্যক্রম

অতঃপর কমিশন বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন শিক্ষাকে বর্তমানে নানা সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করার যে প্রবণতা দেখিয়াছেন, তাহার ত্রুটি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং একটি সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। বর্তমানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে এইরূপ সাধারণ শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য জীবনের পটভূমিকে উন্নত-বুদ্ধি ও চেতনার সহিত পর্যালোচনা করিতে পারা। তৎপরে ঐ সাধারণ শিক্ষায় বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যাসমূহের স্থান সম্বন্ধে কমিশন আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় এইরূপ সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও ঐ স্তরের নবম দশম ও ১১শ ১২শ শ্রেণীর জন্য বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও সাধারণ শিক্ষার উন্নততর পর্যায় অনুসৃত হওয়া উচিত। কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি প্রদত্ত হইল।—

(১) বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজে ১২ বৎসর পাঠের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অথবা ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইবে।

(২) যাঁহারা পাশ কোর্সে ডিগ্রী পাশ করিবেন তাহারা ২ বৎসর পড়িয়া ও অনার্স কোর্সে পাশ করিলে ১ বৎসর পড়িয়া এম. এ. পাশ করিবেন।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষায় ও কলেজী শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষার (general education) একটি পাঠ্যক্রম অনুপাতে হইবে—কলেজী শিক্ষায় ইহার পাঠ্যক্রম এমন হইবে যেন উহার জন্য বেশী সময় ব্যয়িত না হয়।

(৪) বর্তমান শিক্ষার সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতা দোষ মুক্তির জন্য অহেতুক বিলম্ব না ঘটাইয়া মাধ্যমিক কলেজ স্তরে ও ডিগ্রী স্তরে এইরূপ সাধারণ জ্ঞান শীঘ্র প্রবর্তন করা উচিত হইবে।

(৫) প্রতি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও উপযুক্ত বিচারপূর্বক উপরিউক্ত সাধারণ জ্ঞানমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে।

স্নাতকোত্তর-শিক্ষা ও গবেষণা।—৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে কমিশন স্নাতকোত্তর-শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করিয়াছেন।

(১) পাশকোর্সের ডিগ্রী-ধারীগণ ২ বৎসর পড়িয়া ও অনার্স-কোর্সের ডিগ্রীধারীগণ ১ বৎসর পড়িয়া এম. এ. বা এম. এসসি. পরীক্ষা দিবে। ঐ কোর্সে লেকচার সেমিনার পরীক্ষাগারের ব্যবহার ও গবেষণাকাজ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান থাকিবে। শিক্ষক-ছাত্রের যোগাযোগ বেশী হওয়া উচিত।

(২) পি. এইচ. ডির জন্য ২ বৎসর কাজ করিতে হইবে ও উহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত ও গভীর জ্ঞান থাকা চাই। তাহার সাধারণ জ্ঞান ও কথাবার্তা বলিয়া পরীক্ষা গ্রহণ ও তাহার গবেষণা-ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরীক্ষিত হইবে।

(৩) শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিয়া গবেষণার কার্যের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবেন।

(৪) গবেষণাকারীর জন্য উপযুক্ত স্কলারশিপ প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) বিশেষ প্রশংসাযোগ্য প্রকাশিত কাজ-কর্মের জন্য ডি. লিট বা ডি. এস. সি ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষাদান ও গবেষণা-কার্যে অধিকতর মনোযোগী হইবেন।

(৭) ভাষা ও সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক) দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ বাড়াইতে হইবে।

(৮) প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বাড়াইতে হইবে।

(৯) বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী লোকের অভাব মিটাইবার জন্য অনেককে শিক্ষা দিতে হইবে।

(১০) শিক্ষাদাতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(১১) বায়োলজি শিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের জন্য ৫টি সামুদ্রিক বায়োলজিক্যাল ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা, বায়োকেমিষ্ট্রি, বায়োফিজিক্স, জিওকেমিষ্ট্রি, জিওফিজিক্স শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি সুপারিশও কমিশন দিয়াছেন।

শিক্ষণ

অতঃপর কমিশন শিক্ষা (education) বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করিয়াছেন।—

(১) শিক্ষণ-কোর্সগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া ও উহাকে অধিকতর বাস্তব শিল্পকর্ম-সংযুক্ত করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীর মান নির্ধারণে বাস্তব সম্পাদনায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(২) আভ্যাসিক পঠন ইত্যাদি জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে যত দূর সম্ভব বিদ্যালয়ের কাজের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহার উন্নতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে।

(৪) যাহাদের বাস্তব শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের মধ্য হইতে যত দূর সম্ভব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্ধারিত করিতে হইবে।

(৫) শিক্ষানীতি প্রভৃতি তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাঠ্যক্রমকে যতদূর সম্ভব স্থানীয় অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে।

(৬) বেশ কয়েক বৎসর শিক্ষা-সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তবেই ছাত্রকে শিক্ষা বিষয়ক মাষ্টারস ডিগ্রীর জন্য চেষ্টা করিতে বলা হইবে।

(৭) অধ্যাপক ও লেকচারারদের মৌলিক কাজ-কর্মগুলিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পনা করিতে হইবে।

পরীক্ষা গ্রহণ

পরীক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশগুলি অপেক্ষাকৃত সুদূর প্রসারী। তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে অব্‌জেকটিভ ধরণের পরীক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন ও ঐ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বা দুই জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়াছেন যাঁহাদের ঐ বিষয়ে ডাক্তার ডিগ্রী থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহারা কেন্দ্রীয়ভাবে ঐ বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করিবেন ও তাহার ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সরবরাহ করিবেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করিয়া স্থায়ী পরীক্ষাবিষয়ক বোর্ড থাকিবে ও তাহার সভ্যগণের সংখ্যা তিনের বেশী হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহাদের পরীক্ষা ও সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চ যোগ্যতা এবং অন্ততঃ ৫ বৎসর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিবে। ঐ বোর্ড প্রত্যেক কলেজকে তাহাদের পাঠ্য হইতে উপযোগী প্রশ্ন করিতে উপদেশাদি দিবে এবং কলেজের পাঠন মান যাহাতে নামিয়া না যায় তাহা দেখিয়া মঞ্জুরীদান নিয়ন্ত্রণ করিবে। কমিশন উপরিউক্ত ধরণের বিশেষজ্ঞ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের কার্যকালে ঐরূপ কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া যোগ্য লোককে ৬ মাসের জন্য সেমিনার ইত্যাদি মারফৎ বিশেষ যোগ্যতা প্রদান করা যায় অথবা স্কলারশিপ দিয়া আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনুরূপ বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারা যায়। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষার যোগ্যতা বিচারের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও অগ্রগতি-সংক্রান্ত পরিমাপ জন্য অভীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন ও ঐ উদ্দেশ্যে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করার যুক্তি দিয়াছেন। কমিশন শ্রেণীর অগ্রগতি পরিমাপের উপযোগী testএর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, এই ভাবে আমাদের দেশের উপযোগী টেষ্ট শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে ও এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী "নর্ম"ও শীঘ্র আবিষ্কৃত হইবে। "নর্ম" সম্বন্ধে কমিশন সর্বভারতীয় মান নির্ধারণ অপেক্ষা স্থানীয় "নর্ম" বেশী উপযোগী বলিয়া মনে করেন, কারণ ভাষা ও অন্যান্য নানা পার্থক্য জন্য সর্বভারতীয় 'নর্ম' এখানের যোগ্য হইবে না।

পরীক্ষা গ্রহণ

কমিশন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষাসূচি রাখার প্রস্তাবও দিয়াছেন ও আমেরিকার সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহের বিকাশ-সূচির একটি নমুনাও দিয়াছেন।

কমিশন এইরূপ সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের পূর্বে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির ক্রটি দূরীকরণের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনাও দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফলকে সরকারী চাকুরীর যোগ্যতা বিচারের মাপকাটি না ধরিয়া তাহার জন্য পৃথক পরীক্ষা-ব্যবস্থা রাখা। কমিশন শ্রেণীর কাজের উপর এক-তৃতীয়াংশ নম্বর রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন—যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানে নিযুক্ত তাহারা ইহা সহজে করিতে পারেন ও এফিলিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ নম্বর দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া কমিশন তিন বৎসরের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রতি বৎসরেই একটি করিয়া পরীক্ষা রাখার পক্ষপাতী। কমিশন পরীক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ও রচনা-ধর্মী পরীক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি বাহির করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং পরীক্ষার মান উন্নয়ন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন গ্রেস মার্ক দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও তদূর্ধ্ব ও বিশেষ বৃত্তি-মূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কথাবার্তা মারফৎ পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে বলিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি

স্বাধীনতার যুগে বিভিন্ন ধরণের মহাবিদ্যালয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে অভূতপূর্ব। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৬টিতে। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে এই সংখ্যা ৬০-এর উপরে যাইবে বলিয়া সরকার মনে করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলা ও বিজ্ঞানের মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯৭টি। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ছিল ১৯৯টি, এবং বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪০টি। কিন্তু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার অভূতপূর্ব

বিস্তার দেখা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভাগগুলির সংখ্যা ঐ সময়ে ছিল ৪৬২টি এবং অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২২৮টি। তাহা ছাড়া মঞ্জুরীকৃত মহাবিদ্যালয় ছিল ১,৩১৬ এবং রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ছিল ৮৩টি। ইহা ছাড়া আরও প্রায় ৫৮১টি উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন ছিল যেগুলি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিযুক্ত ছিল না।

বিভিন্ন ধরণের মহাবিদ্যালয় শিক্ষার অগ্রগতি

উচ্চ শিক্ষার এত বিস্তার সত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে ভারত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। ভারতের উচ্চ শিক্ষার হারের সঙ্গে যদি যুক্তসাম্রাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও রাশিয়ার উচ্চ শিক্ষার হারের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ভারত এখনও উচ্চ শিক্ষায় অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষাও স্বাধীন ভারতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। কৃষিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে অভূতপূর্ব। তাহা ছাড়া, শিল্পশিক্ষা ও চিকিৎসা বিদ্যায়ও একই রূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আমরা যদি ১৯৪৮—৫০ খৃষ্টাব্দের অবস্থার সঙ্গে ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দের বিভিন্ন বৃত্তিগত বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা ঐ উন্নতির অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইব।

	১৯৪৯-৫০	১৯৫৮-৫৯
কৃষিশিক্ষা	১৫	২৯
চিকিৎসা বিদ্যা	৩৫	১০৯
ইন্‌জিনিয়ারিং	২৩	৫৫
টেক্‌নোলজি	৫	৯

সংখ্যার বৃদ্ধি যে হইয়াছে তাহা আমরা উপরের তালিকা হইতেই পাইলাম, কিন্তু ইহাও বিরাট দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে চারিটি আঞ্চলিক টেকনোলজিকাল কলেজ স্থাপনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবাংলার খড়্গপুরে, উত্তরপ্রদেশের

কানপুরে, বোম্বাইয়ে ও মাদ্রাজে—চারিটি আঞ্চলিক টেকনোলজিকাল কলেজ খোলা হয়। এই কলেজগুলিতে উচ্চতর ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বাধীনোত্তর যুগে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিশিক্ষামূলক কলেজগুলিই হইতেছে এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পরবত সময়ে উচ্চ শিক্ষার যে এত বিস্তার হইয়াছে, তাহা অন্য দেশের তুলনায় কম হইলেও, আমাদের দেশে এইরূপ আকস্মিক বিস্তার আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য তিনটি মূল কারণ দায়ী। প্রথমতঃ বহুসংখ্যক কলা ও বাণিজ্যবিভাগযুক্ত কলেজের স্থাপন, দ্বিতীয় হইতেছে নিম্নমানের মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং তৃতীয়তঃ হইতেছে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ে গ্রহণ। এই তিনটি কারণ মহাবিদ্যালয়সমূহে বহু ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। কিন্তু শেষ পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হইতেছে, বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইতেছে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-সমিতি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিদ নহে এমন সব সভ্যদ্বারা গঠিত। এই সমিতিকে বর্তমান নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোর্ট বলা হয়। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এখনও সিনেট নামেই উহা পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আলোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এক্সিকিউটি কাউন্সিল বলা হয় আর পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বলা হয় সিণ্ডিকেট। ইহা ছাড়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে। কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাকাল্‌টি (Faculty) আছে। এই ফ্যাকালটিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রশাসন-ব্যবস্থা

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা হইতেছেন চ্যান্সেলার। সাধারণতঃ যে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্যের রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হইয়া থাকেন। বর্তমানে কোন কোন রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হইয়াছে। সেই স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতিকে তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চ্যান্সেলার নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

চ্যান্সেলারের পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের স্থান। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চ্যান্সেলারই ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। কিন্তু নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট ও সিনেটের সভ্যগণ কর্তৃক এক রচিত তালিকা হইতে ভাইস-চান্সেলার নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশ্য উহা চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ। পূর্বে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদসমূহ অবৈতনিক ছিল, বর্তমানে ভাইস-চ্যান্সেলারগণ বেতন পাইয়া থাকেন।

(৪) **প্রশাসনিক সংস্থা**—কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্থার কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত, উহারা হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (University Grants Commission)।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড—এই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। ২০৬ পৃঃ

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড (এই পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন—(University Grants Commission বা U. G. C.)—সার্জেণ্ট রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে একটি সংস্থা ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। প্রথম অবস্থায় ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল মোটে চারি জন এবং ইহা শুধু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দেখাশুনা করিতেন।

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (Radhakrishnan Commission) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নূতন ভাবে গঠিত করিবার সুপারিশ করেন, ফলে U.G.C.-র কাজ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নূতন ভাবে গঠিত করেন এবং ঐ কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ইহার কার্যসূচী নিম্নরূপ।—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাগত মান সংরক্ষণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দান।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্তব্য

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সাহায্যদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দান।

(গ) কেন্দ্রীয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বণ্টন।

(ঘ) নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে স্থাপয়িতাদের পরামর্শ দান বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ সম্পর্কে পরামর্শ দান।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে তাহা হইলে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দান।

(চ) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অনুমোদন সম্পর্কে পরামর্শ দান।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দান।

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে কর্তব্য সাধন।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে U. G. C বিধিবদ্ধ আইনগত সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই সংস্থায় ৯ জন সভ্য থাকিবে, তাঁহাদের মধ্যে কম পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের তিন জন ভাইস-চ্যান্সেলার, দুই জন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং চারি জন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ থাকিবেন।

অর্থনৈতিক তথ্যানুসন্ধান, অর্থ বণ্টন ইত্যাদি কার্য ছাড়াও U. G. C. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার যাহাতে কোনও ক্রমে ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ে করিয়াছি। এইখানে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য একটি গ্রামীণ শিক্ষাসংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সুপারিশের পর এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করা হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সরকার গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সমিতি (Rural Higher Education Committee) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত ইহার সম্পর্ক এবং অন্যান্য সমস্যার সহিত ইহার যোগাযোগ—ইহাদের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার সুপারিশ করা।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সমিতি

এই সমিতি নানা অবস্থার পর্যবেক্ষণান্তে বলেন যে, বর্তমানে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই, তাহার পরিবর্তে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনই বাঞ্ছনীয় হইবে। এই সমিতির সুপারিশের ফলে

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-সম্পর্কিত জাতীয় পরিষদ (National Council of Higher Rural Education) স্থাপিত হয়। এই পরিষদ গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহার পরামর্শ দিবার জন্য গঠিত হয়।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Rural Institute)। বিভিন্ন সমিতির সুপারিশের পর মোট দশটি গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত স্থানে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে; যথা,—শ্রীনিকেতন, মাদুরাই, জামিয়ানগর, উদয়পুর, সুন্দরনগর, বিরৌসি, আগ্রা, সানোসারা, রাজপুরা কয়েম্বেটোর, অমরাবতী ও গার্গোটি। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় পরিষদের কাজ হইল এই এগারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখা।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এই গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পরে গ্রামীন যুবকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। অবশ্য ঐ শিক্ষা গ্রামীণ তরুণদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্খাকে অবলম্বন করিয়াই দিতে হইবে। এইখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই জাতীয় উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পরিপোষক শিক্ষাদান সহরাঞ্চলের কলেজসমূহ একেবারেই দিয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হইল, গ্রাম্য সমাজের উন্নতিমূলক কাজকে দক্ষতার সঙ্গে গড়িয়া তোলার জন্য শিক্ষাদান। এই উদ্দেশ্যে এই গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রামের উন্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে ; যথা,—গ্রামসেবা, সিভিল ও গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি। শিক্ষা এবং গবেষণা বিভাগ ছাড়া আর একটি বিভাগও কয়েকটি গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে সম্প্রসারণ বিভাগ স্থাপন করা। এইরূপ সম্প্রসারণ বিভাগ খোলার ফলে গ্রামের সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। গবেষণা বিভাগের কার্যসমূহ গ্রামীণ গৃহসমস্যার সহিত জড়িত থাকিবে এবং গ্রামের লোকেরাও তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আসিবে। পঞ্চায়েত এবং জেলাস্তরের কর্মীবৃন্দের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষা এবং আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থাও এই গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি করিতেছে।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র ৮ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প। অতএব এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া গ্রামের কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা বলা এখনও শক্ত। তবে একটি বিষয় এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্ত গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই সহরাঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁহারা গ্রামের সমস্যার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এদিকে গবেষণা কাজও গ্রামীণ পর্যায়ে ঠিকমত হইতেছে না। তাহা ছাড়া এই সমস্ত গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মামুলি গতানুগতিক পুস্তকানুগ শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স এবং দুই বৎসরের সার্টিফিকেট কোর্স আছে। ডিপ্লোমা কোর্সটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সের অনুরূপ। গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষাকে মর্যাদা দেওয়ার ফলে একটি সুবিধা হইতে পারে, তাহা হইল গ্রামের এই উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের ভীড় বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু যদি এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্ররা যদি গ্রামের প্রয়োজনেই না লাগে তবে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইল। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী National Council of Higher Rural Education-এর দ্বিতীয় সভার উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন, "The whole purpose of the Rural Iustitutes will be defeated if the majority of students after finishing their education in the institutes proceed to town and add to the unemployed".

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাজ্যের অধীন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ণয় ও সমন্বয় সাধন কিংবা গবেষণা-কার্য এবং উচ্চতর শিল্প শিক্ষা এবং উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে সকল শিল্প ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংস্থা বলিয়া পরিগণিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে চলে, তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

সরকার ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার। ভারতের অনেক রাজ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম নহে। রাজ্যকে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার পর রাজ্যসরকার হইতে শিক্ষাখাতে এমন কোন অর্থ মজুদ থাকে না, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ করা যাইতে পারে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে কিনা তাহাই প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করাকে উচিত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ইহার বিপক্ষে দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথম কারণ হইতেছে যদি কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে একই শিক্ষার ধারা দেখা যাইবে। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা যদি রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে দুই শিক্ষার মধ্যে একটা ফাঁক থাকিয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অবশ্য কত দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহার একটি সীমারেখা নির্ধারণ করিয়াছেন। আর্থিক সমস্যা, বিশেষ বিষয় শিক্ষাদান, জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ, জাতীয় গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় রাজ্যসরকার

বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যসরকার। ভারত সরকার দিল্লী, আলিগড়, বারাণসী, ও বিশ্বভারতী—এই চারিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যের অধীনস্থ হইলেও উহারা রাজ্যসরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। রাজ্যের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যের কাছে দুইটি বিষয়ে নির্ভরশীল। প্রথমতঃ উহারা রাজ্যের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন ও সংবিধানের জন্য দায়ী। কারণ রাজ্যের আইন সভার সৃষ্ট আইন দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যসরকার হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স। স্যাড্‌লার কমিশন এবং রাধাকৃষ্ণান কমিশন উভয়েই তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স, বার বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষার পরে গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহারা এক বৎসরের অধিক শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট

ডিগ্রী কোর্স

শিক্ষা যদি মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত হয় তাহা হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা ১২ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে এবং তাহার পর তিন বৎসর কাল ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হবে। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাকাল (ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত) সম্পর্কে এক বৎসর বেশী শিক্ষাগ্রহণের কথা সকলে ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে চান না। যে বিষয়টি সকলে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাহা হইল সমগ্র শিক্ষাকাল (ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত) পুনরায় বণ্টন করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা দশ বৎসরের পরিবর্তে এগার বৎসর কাল স্থায়ী হইবে এবং ডিগ্রী কোর্স হইবে তিন বৎসর। এইরূপ করিলে সমগ্র শিক্ষাকাল একই থাকে এবং সময়ের বণ্টন হয় মাত্র। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত কালে এগার বৎসরের পর ছাত্রছাত্রীরা বেশী পরিপক্কতা লক্ষ্য করিবে এবং ঐ সময়ে উহারা হয় জীবনে প্রবেশ করিবে, আর না হয় তাহারা উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। কিংবা বৃত্তিমূলক বা কারিগরী কাজে যোগদান করিবে।

বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্সকে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ এখনও এই বিষয়ে মতি স্থির করিতে পারে নাই। কিন্তু তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনে এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অবশ্য তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনও রহিয়া গিয়াছে, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় নাই। অন্তবর্তীকালীন অবস্থা হিসাবে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। সেই ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স গ্রহণ করিতে হইতেছে, এক বৎসর কাল ঐ কোর্স পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্স গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত হইয়া থাকে। এই এক বৎসর প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স না ঘরকা না ঘাটকা, অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথেও তাহার সংহতি নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও তাহার যোগাযোগ নাই। ফলে যে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স বিলুপ্ত করিতে চাওয়া হইতেছে, সেই ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সেরই তাহারা অন্তর্গত হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিন বৎসর কাল মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিন বৎসরকাল ডিগ্রী কোর্সের অনুসরণের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতেছে।

সাধারণ শিক্ষা (General Education)। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই কৃষ্টিমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাব রহিয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণই হইল সাধারণ কৃষ্টি-সম্পন্ন শিক্ষার অধিকারী হওয়া। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বিষয়ে অত্যধিক বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা একরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি বলিয়া কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ অত্যধিক বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষালাভকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা-কমিশন কতকগুলি বিষয় শিক্ষার সুপারিশ করিয়াছেন যাহা কলা, বিজ্ঞান বা বৃত্তিশিক্ষা যে কোন শাখায় শিক্ষালাভ করিতেই শিক্ষার্থী যাক না কেন, তাহাদিগকে উহা পড়িতেই হইবে। উহা পড়িলে শিক্ষার্থী উদার মনোভাবাপন্ন হইতে পারিবে। ইহাই হইল সাধারণ শিক্ষার মূলকথা। পৃথিবীর প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ই সাধারণ শিক্ষার তাৎপর্য সম্বন্ধে একমত।

সাধারণ শিক্ষা

ধারা নির্দেশনা এবং পরামর্শ দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের নিমিত্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার যত বিভিন্ন ধারা থাকুক না কেন, উপযুক্ত শিক্ষা যদি শিক্ষার্থী পাইতে চায় তাহা হইলে বিভিন্ন শিক্ষার ধারা নির্বাচন করিতে সাহায্য করিবার জন্য এবং পরামর্শ দান করিবার জন্য ধারা-নির্দেশকের প্রয়োজন। এই জন্য প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারা-নির্দেশক থাকার প্রয়োজন। তিনি ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষাগত ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধারাতে পরিচালিত করিতে পারিবেন।

পরামর্শ-সংসদ

শিক্ষাদানের মাধ্যম। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কয়েকটি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য হিন্দী অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যদিও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, তবুও ইহা বলিতে হইবে যে, বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়াই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং তাহার ফলে ছাত্রছাত্রীদের অধীত বিদ্যার মান অত্যন্ত নিম্নগামী হইয়াছে। যদি আঞ্চলিক ভাষা কোন কোন বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও আরও মুশকিলের কথা। ইহার ফলে

শিক্ষাদানের মাধ্যম

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে, কারণ তাহাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া যাইবে। জাতীয় সংহতির দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধরিয়া লইলে ভাল হয়। কারণ হিন্দী-ভাষাশিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী ভাষা এত দিন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষার মাধ্যম। ইংরাজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ধীরে ধীরে করিতে হইবে।

ইংরাজী শিক্ষার স্থান

ইংরাজী শিক্ষার স্থান। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কিংবা ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে অনেক কিছু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীগণ বিষয়বস্তু আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন। ভারতের কৃষ্টিসম্পর্কীয় বহু বিষয় ভারতীয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছে। অতএব ঐ বিষয়সমূহ জানিতে হইলে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না করিয়া দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষালাভ করা যায়। গান্ধীজী ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের যথেষ্ট কুফল আমাদের দেশে ফলিয়াছে। ইহা আমাদের জাতির কর্মশক্তিকে শোষণ করিয়া লইয়াছে। ইহা মানুষের জীবনকালকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে, গণসংযোগ ব্যাহত করিয়াছে এবং ইহা শিক্ষাকে অনর্থক ব্যয়বহুল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন আঞ্চলিক ভাষাকে কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত করিয়াছেন। ইহাতে বহু তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন। ইহাতে আরও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার যৌক্তিকতা আছে। কারণ ছাত্রছাত্রীরা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করিবে। ইহা তাহারা দাবী হিসাবে জানাইতে পারে, কারণ শিক্ষালাভ তাহাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু ইহার অসুবিধা আছে, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রাখা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাবিদ্ই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অবলুপ্ত হইলে খুবই ক্ষতিকর হইবে, কারণ ইংরাজী ভাষা দেশের বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত ছাত্রছাত্রী সকলের কাছেই বোধগম্য, আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হইলে সকলের পক্ষে উহা বোধগম্য হইবে না। তাহা ছাড়া ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর শিক্ষা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি।

শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য U. G. C. ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত এন্. এন্. কুঞ্জুরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সমস্ত ভাষাগুলির সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি আরও বলেন যে ইংরাজী ভাষা হইতে কোন দেশীয় ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমকে পরিবর্তিত করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রস্তুতি করার পরেই করা যাইতে পারে। কমিটি ইংরাজী শিক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর পরিবর্তন ঘটিলেও ইংরাজী ভাষা সকল শিক্ষার্থীকেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

গবেষণা-কার্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ কাল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার কাজ খুবই কম হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত গবেষণা-কার্য চলিয়াছে, তাহা সংখ্যায় কম ত বটেই, তাহা ছাড়া যেসব গবেষণা কাজ সম্পন্নও হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানগত মূল্যও খুব সীমিত। যে যে কারণের জন্য গবেষণা-বিভাগের কার্যসমূহ বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইতেছে নিম্নরূপ।—

গবেষণা কার্য

(ক) টাকা পয়সার অভাব।

(খ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অতিরিক্ত কর্মভার

(গ) উপযুক্ত পাঠাগার ও পরীক্ষণাগারের অভাব।

(ঘ) আর্থিক আকর্ষণের অভাবে উপযুক্ত ব্যক্তিরা গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য আগ্রহবোধ করে না।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব।

(চ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার অভাব।

এই অসুবিধাগুলি দূর না করিলে গবেষণা বিভাগের কার্যের বৃদ্ধি হইবে না। কিছুকাল যাবৎ এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে গবেষণা বিভাগের কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে। বেশী অর্থ এই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বহু উপযুক্ত ব্যক্তি এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫২৭টি গবেষণা-ভাতার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সম্প্রসারণ বিভাগ। বর্তমান মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি বড় ত্রুটি হইতেছে, ইহাদের সঙ্গে সমাজের কোন সংযোগ না থাকা। সমাজের প্রতি কোন কর্তব্যই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি করে না। আমাদের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে—(১) বয়স্ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে এবং (২) সমাজ সেবার মাধ্যমে।

সম্প্রসারণ বিভাগের কাজ

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন ভাবে সমাজকে সাহায্য করিতে পারে। যে সমস্ত বয়স্ক শিক্ষিত তাহাদের জন্য আরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাঁহারা যদি কোন বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেই বৃত্তি সম্পর্কিত জ্ঞানে যাহাতে তাঁহারা সমৃদ্ধ হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারে। বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বয়স্কগণ ঝালাই পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য নেতা-সংগঠনের কাজেও ট্রেনিং দিতে পারেন।

সমাজ-সেবামূলক কাজ

সমাজ-সেবা। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদিগের মারফত সমাজ-সেবার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা সমাজে নানারকম বিনোদন ব্যবস্থা (যথা যাত্রাগান, সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, কথকতা ইত্যাদি) পরিবেশন করিয়া সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়ন সমস্যা— ভারতে উচ্চশিক্ষা স্তরের মান উন্নয়ন করিবার বিভিন্ন প্রয়াস দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন,

পাঠাগার ও পরীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ও গবেষণা কার্যের উন্নতি-সাধন, আবাসিক ব্যবস্থার উন্নতি, অধ্যাপকাদের বেতন বৃদ্ধি, গবেষণা বিভাগের ভাতা বৃদ্ধি, আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা, এবং ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলের দিকে বিশেষ দৃষ্টিদান। কিন্তু যত প্রচেষ্টাই গুণগত উন্নতি সাধনের জন্য করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিম্ন মান এবং বিশৃঙ্খলার মূল হইতেছে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর ভীড়। অনেকে মনে করেন যে, মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করিয়া ভর্তি করা উচিত, কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আবার অনেক শিক্ষাবিদ বলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে, অতএব নির্বাচন-প্রথা এইখানে প্রজোয্য নয়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার বলিতে এই কথা মনে করা উচিত নয় যে, যাহার যেরূপ পারদর্শিতাই থাকুক না কেন, সে সকলের সাথে একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিবে। শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যেখানে রহিয়াছে, সেখানে নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর চাপ কমাইবার জন্য **সান্ধ্যকালীন ক্লাস** খোলার ব্যবস্থা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে করিতে হইবে। তাহা ছাড়া **চিঠিপত্রে পাঠ** গ্রহণের ব্যবস্থা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, যত দিন পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে বহু প্রকারের শিক্ষার ধারার ব্যবস্থা না হয়।

শিক্ষার মান সমস্যা

বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান। ভারতের বিভিন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষকের খুবই অভাব দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পবিভাগ ইত্যাদিতেও কর্মীর স্বল্পতা দেখা যাইতেছে। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৪০জন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান পড়িবে। U. G. C. এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দান করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অগ্রগতি—নিম্নলিখিত তালিকা* হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রগতি পরিলক্ষিত হইবে।

	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
আর্টস ও সায়েন্স কলেজের সংখ্যা	৪৮৮	৯৪৭	১,১০০
ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা	৩,২৩,৮৮২	৬,৩৪,০০০	৯,০০,০০০

উপসংহার। আমরা রাধাকৃষ্ণান কমিশন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। **মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি** পাইয়াছে, **ছাত্রছাত্রী-সংখ্যাও প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি** পাইয়াছে। **বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা** স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর **প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি** পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহাবিদ্যালয়গুলির **শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি** করিবার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস দেখা গিয়াছে। অবাঞ্ছিত ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারে, তাহার জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। **সান্ধ্যকালীন শিক্ষার ব্যবস্থাও** করা হইয়াছে। কিন্তু এত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের **শিক্ষার মান** যেরূপ **নীচু** ছিল, আজও তাহাই রহিয়া গিয়াছে।

উপসংহার

ইহার **মূল কারণ** হইল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে অবাঞ্ছিত ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। যেহেতু চাকুরী পাইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রয়োজন, সেই হেতু যাহাদেরই অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহারাই মহাবিদ্যালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযুক্ত হইতে চেষ্টিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতেও ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্-

* Sri Bhagawan Dayal Srivastava-রচিত The Development of Modern Indian Education হইতে গৃহীত।

বিদ্যালয়ে আগমন করে। তাহারা অধ্যয়ন কালে নিজেদের দলীয় নীতিগুলির প্রচারে সক্রিয় হইয়া উঠে। ফলে বিভিন্ন দলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মহাবিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবর্গের মান উপযুক্ত নয়। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর লোক তাঁহারা অন্য কাজে যাইয়া যোগদান করেন, কারণ শিক্ষকতাকার্যে বেশী অর্থ পাওয়া যায় না। মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পড়ান, তাঁহারা প্রায়শঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সে বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কিত সমস্যা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন। রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশসমূহ কতটা কার্যকরী এবং গৃহীত হইয়াছে তাহাও কমিটি দেখেন।

প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়গুলি সহরাঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, অথচ ভারতের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যাই খুব বেশী। স্বাধীনতার পূর্বে গ্রামাঞ্চলের লোকদের জন্য গ্রামের প্রয়োজনে উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। রাধাকৃষ্ণান-কমিশনে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। কিন্তু গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তাহার পরিবর্তে স্থাপিত হয় গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Rural Institutes)। ইহাদের পরিচালনা ও পরামর্শদানের জন্য নিখিল ভারত গ্রামীণ উচ্চতর জাতীয় শিক্ষা সমিতি (All India National Council for Higher Education) স্থাপিত হয়।

ভারতে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা আছে এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য চেষ্টাও চলিতেছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দোষ-ত্রুটির কথা যাহাই বলা হউক না কেন, একথা সত্যি যে ভারতের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারী। অতএব ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চ আদর্শ, সত্যকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা, শিক্ষাদানে স্বাধীনতা ইত্যাদি থাকিবে, ইহাই আমরা কামনা করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ-শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

"There is such thing as Social Education and education outside the books. This education is distinctly higher in India than in any part of the Christendom. Through relations of ancient stories and legends, through religious songs and passion plays, through fairs and pilgrimages, the Hindu masses all over India received a general culture and education on which they are in no way lower, but positively higher than the general level of culture and education received through schools and newspapers or even through the ministrations of churches in Western Christian lands. It is an education, not in the so-called three R's but in the humanity"—What India can teach us (Max Muller)

ম্যাক্সমূলার অবশ্য যে দিনের কথা এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভারতের অতীত কালের কথা। ঐ সময়ে অবশ্য সমাজশিক্ষার সমস্যা এত তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই। ভারতীয় ঐতিহ্যের গতি-প্রকৃতি যদি অনুধাবন করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিক্ষা সমাজের উপর একটা সহজ স্বাভাবিক বাতাবরণের মত বিন্যস্ত ছিল এবং উহা সমাজের জনসাধারণের জীবন হইতে বিমুক্ত করিয়া কল্পনা করা যাইত না।

ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য

ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা অঙ্কুরিত ও পরিপোষিত হইয়াছিল। ভারতের পক্ষেও ইহার ব্যত্যয় হয়

নাই। সমগ্র সমাজে ধর্মাশ্রয়ী যে শিক্ষা বিস্তৃত ছিল তাহাকে আমরা অতীত যুগের সমাজশিক্ষা বলিতে পারি। ভারতবর্ষে এক বিশেষ অর্থে ধর্মকে সামাজিক জীবনে কাজে লাগানো হইয়াছিল। সামাজিক কল্যাণের জন্য যে সমস্ত প্রথা আচার আচরণ ঐতিহ্য মানুষের সমাজ জীবনের ঐক্য রক্ষা করিত তাহাকেই ধর্ম বলা হইয়াছিল। এইরূপ অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করায় সমাজে জন-শিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ফলে সমাজশিক্ষার সমস্যা আমাদের দেশে ছিল না।

ধর্মের বিশেষ অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনে প্রয়োগ

প্রতি দেশেই একটা সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিয়া থাকে। তাহা হইল সকল ব্যক্তির মধ্যে চিত্তের সংযোগ রক্ষা করা। সমাজের একদল লোক বিদ্যা ও কৌলিন্যের আলাদা জগৎ সৃজন করিয়া উঁচু স্তরে বিচরণ করে, আর এক শ্রেণী "নীচের থাকের লোক, অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে।" সমাজ-জীবনে এই সমস্যাটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

"শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচন ক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে, আর নীচের স্তর পরম্পরা নিত্যরস কাঠিন্যে সুদূর প্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি।" —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সময়েই জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক চিত্তের সংযোগের অভাবজনিত সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে। সাত শত বৎসরের মুসলমান শাসন বা তাহার পূর্ববর্তী কালেও দীর্ঘ দিন ধরিয়া চিত্তের ঐক্য বজায় ছিল, তাহা আমরা ম্যাক্সমূলারের উদ্ধৃতিতে দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত, সেই একই ধারা সংস্কৃতির রূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে।... আমাদের দেশের সমস্ত সমাজ দেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণ-প্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে।"

বস্তুতঃ পক্ষে কিছুকাল পূর্বেও মনের দিক দিয়া দেশের অজ্ঞ লোকটির সঙ্গে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কোনও প্রভেদ ছিল না। মানসিক সম্পদের দিক দিয়া লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য ভারতবাসী কোন অংশেই শিক্ষিত

ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। গান্ধীজী অশিক্ষিতদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

মানসিক সম্পদের দিক দিয়া একত্ব

"But the moment you speak to them, they begin to speak. You will find that wisdom drops from their lips. Behind the crude exterior, you will find a deep reservoir of spirituality. I call this culture. In the case of the Indian villager, an age old culture is hidden under an encrustment of crudeness."

বিদগ্ধ ব্যক্তিরা কাব্য সাহিত্য বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে জ্ঞান বা রসানুভূতি লাভ করিতেন, সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা অভিনয়, নাট্যগীতি, পাঁচালী, তরজার মধ্য দিয়া একই রসানুভূতি লাভ করিতেন। জীবনের ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান ফসল ফলিয়া উঠিত।

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার সাথে সাথে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনের দিক দিয়া শিক্ষিত ভারতীয় ভারতের মাটীতে তাহার মূল হারাইয়া ফেলিল।

সমস্যার রূপান্তর

ভারতে এত দিন নিরক্ষতা ও সাক্ষরতাকে শিক্ষার একটা মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই। মাপকাঠিটা প্রধানতঃ ছিল জীবনে শিক্ষার প্রতিফলনে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তৃত ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সংগে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না, যেখানে রামায়ণ মহাভারত, পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যায় নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত।"

কাজেই তখন এমন ঘটনা বহু দেখা যাইত যে, নিরক্ষর অথচ আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ বহু মানুষ সমাজের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির পূজনীয় হইয়াছিল।

অত্যন্ত আধুনিক কালে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জনশিক্ষার জন্য আবশ্যিক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের জন শিক্ষা ছিল স্বৈচ্ছিক। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তার পশ্চাতে কোন আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃ সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে।"

ভারতবর্ষে জনশিক্ষা স্বৈচ্ছিক

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নিরিখে যাহা শিক্ষা বলা যাইতে পারে তাহার পরিবর্তন ঘটিল। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি, তার আরম্ভ সহরে। তার পেছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। সহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেনড্-আলোকিত .... নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা শীতলা, সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্য-নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোন দিন চালানো হয় নি।"

শিক্ষার কার্যের দ্রুত পরিবর্তন

শিক্ষার লক্ষ্যের এই দ্রুত পরিবর্তন অতি সহজে শিক্ষিত-অশিক্ষিতে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিল। নগরী হইল শিক্ষিতদের বাসস্থানের যোগ্য, গ্রাম হইল তাঁহাদের কাছে বসবাসের অযোগ্য।

দ্বিতীয় সমস্যা আরও মারাত্মক। লোকশিক্ষার যে চিরায়ত উপায়গুলি দেশের লোকেরা এতদিন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা ধ্বংস হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে জনশিক্ষা বিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে।" নূতন বিদ্যার প্রবাহ দেশে প্রবাহিত হইল সত্য, কিন্তু তাহা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল না।

ভারতে যাহা আদৌ সমস্যা ছিল না—তাহাই এক ব্যাপক আকারে দেখা দিল। সমগ্র সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন আধুনিকতার পথে যাত্রা সুরু করিয়া দিল, আর বাকী সকলে অন্ধকারে আবদ্ধ রহিল। এক দিকে গড়িয়া উঠিল ধন-বিদ্যা-প্রাসাদগর্বিত নগর, অপর দিকে সমস্ত গ্রাম অশিক্ষা, রোগ, মহামারী ও কুসংস্কারের আবিল আবর্তে পতিত হইল।

নুরুল্লা ও নায়েক তাঁহাদের প্রসিদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "By the end of the nineteenth century, ... the old

indigenous system of education disappeared almost completly from the field and a new system of education ……… was firmly established in its place."

এই যে দৃঢ়ভাবে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, ইহা কোন সময়েই দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য হয় নাই।

ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকটা ইউরোপীয় সভ্যতার চাকচিক্যে ধাধা লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু অনতিবিলম্বে শিক্ষার মন্থর গতি ও জাতীয় জীবনে তাহার ব্যর্থতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ভারতবাসীরাও সচেতন হইয়া উঠিল। শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ হইতে বিরত হইয়া জাতির অতীত জীবনের দিকে মনোনিবেশ করিল। জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কি ভাবে শিক্ষার পুনর্গঠন করা যায় তাহার প্রচেষ্টা সুরু হইল।

জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসী জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

স্বাধীনতার পূর্বকালে জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জনশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োগ শুরু হয়। তখন ইহার লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বয়স্ক ব্যক্তিদের আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন করিয়া তোলাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ প্রচেষ্ট ছিল বেসরকারী এবং অত্যন্ত সীমিত পরিসরে উহা সুরু হইয়াছিল।

মহামতি গোখলে মনে করিয়াছিলেন যে, যদি ভারতবর্ষে সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের নিরক্ষরতা হ্রাস পাইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভায় একটি বিল উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শীঘ্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মহামতি গোখলে

স্বামী বিবেকানন্দও এই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who having been educated at their expense, pays not the least heed to them." স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সারা ভারতে

রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সেই মিশনগুলি শিক্ষার বিস্তার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। রুশ বিপ্লবের পর জনগণের হাতে ক্ষমতা আসিয়া যায় এবং দ্রুত জাতি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

লেনিন

লেনিন বলেন, "The liquidation of illiteracy is not a political problem; it is a condition without which it is impossible to speak of politics. An illiterate man is outside of politics and before he can be brought in, he must be taught the alphabet. Without this there can be no politics—only rumours, gossips tales and superstitions." তৎকালে লেনিনের এই সব বাণী ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করে; এবং জাতীয় আন্দোলনের কর্মীরা জনশিক্ষার বিস্তারে আগ্রহী হন।

কংগ্রেস কর্মীরা গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে তৎপর হইলেন এবং সাথে সাথে তাঁহারা রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তার করিতে লাগিলেন।

সুসংগঠিত উপায়ে যাঁহারা জনশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথ দুই উপায়ে লোক শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পূর্বে যে পরোক্ষ পন্থায় লোকশিক্ষা চলিত, তাহা তিনি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ করিয়া পৌষমেলা ও মাঘমেলা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই উভয় মেলায় প্রাচীন লোকশিক্ষার উপকরণসমূহের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা চলিতে লাগিল। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা-সংসদ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন বিভাগ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

রবীন্দ্রনাথ

গান্ধীজীও দেশের অগণিত জনসাধারণকে দ্রুত শিক্ষিত করিয়া তোলার চেষ্টা করেন। তাঁহার নঈতালিম কর্মসূচীতে বয়স্কদের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যে শিক্ষা

গান্ধীজী

পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তাহার সর্বপ্রথম কথা ছিল --"Adult education for the men and women in all stages of life."

অতএব দেখা যাইতেছে, দেশে বেসরকারীভাবে সমাজশিক্ষার কাজ কিছু কিছু চলিতেছিল। দেশের সকল মনীষীই ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা গদি পরিত্যাগ করে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেও কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা দ্রুত নিরক্ষতা দূরীকরণের চেষ্টা করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি বয়স্ক-শিক্ষার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। বিহারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ ছিলেন ইহার সভাপতি।

ডাঃ সৈয়দ মামুদ

ডাঃ সৈয়দ মামুদের নেতৃত্বে এই কমিটি দুইটি কাজ করেন। বিভিন্ন প্রদেশে সমাজ-শিক্ষার যে কর্মধারা অনুসৃত হইতেছিল তাহার মূল্যায়ন করেন এবং বর্তমানে কি কর্মধারা অনুসরণ করা উচিত তাহার পরিকল্পনা দাখিল করিলেন। কমিটি নিম্নরূপ কর্মধারা অনুসরণ করেন।—

(১) নিরক্ষর বয়স্কদের পড়ালেখা ও অঙ্কশিক্ষা দিবার ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। (২) নিরক্ষর বয়স্কদের তাহার কর্মজীবনের সাথে সংযুক্ত শিক্ষাদান করার এবং তাহাদিগকে সুনাগরিক করিবার জন্য শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেন।

প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং একে অন্যের পরিপূরক। শুধু অক্ষরজ্ঞান লাভ কোন বিদ্যাই নয়। অক্ষর-জ্ঞান জ্ঞান-জগতে প্রবেশের চাবিকাঠিস্বরূপ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যের সাহায্যেই সার্থক হইবে এবং বয়স্করা যে কাজ করেন সে সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান যতই বাড়িবে ততই তাহারা মানসিক জড়ত্ব হইতে মুক্তি পাইবেন।

এই কমিটির মতে বয়স্কশিক্ষা, সমাজের উপর দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, সমাজ উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যথোচিত সহায়তা করার

প্রবণতা বয়স্ক শিক্ষার ফলে সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, আপন সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদান করার গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিভাবকগণ সচেতন হন। ফলে শিক্ষা-বিস্তারে তাহারা উদ্যোগী হন। ১৯৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি অত্যন্ত উদ্দীপনা সহকারে বয়স্ক-শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীসভাগুলির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক ভাবে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর আবার পুরাতন কর্মসূচীগুলি বাঁচাইয়া তোলা হয় ও কাজ শুরু হয়।

স্বাধীনতোত্তর যুগে সমাজ-শিক্ষা

বস্তুতঃ ইহা লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার পূর্বকালে বয়স্ক-শিক্ষার আন্দোলন প্রধানতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। সৈয়দ মামুদ কমিটির রিপোর্টে যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছিল তদনুযায়ী বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে সংগঠিত করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা তাহা পান নাই। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইহার ফলে সারা পৃথিবীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া গেল। স্বাধীনতা লাভ করার পর জাতিগঠনের ক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হইল। বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহা প্রতিফলিত হইল।

রাষ্ট্রিক লক্ষ্য। স্বাধীনতার পরই ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসন করার সংবিধান রচিত হইল। কাজেই যে বিপুল জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা সরকার গঠন করিবে, তাহাদের ন্যূনতম শিক্ষা না থাকিলে গণতন্ত্র বিফল হইতে বাধ্য। কাজেই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সার্থক করার জন্য অবিলম্বে বয়স্কদের শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভূত হইল।

সামাজিক লক্ষ্য। ভারত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তৎপর হইল। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে গ্রামীণ সমাজোন্নয়নের বিষয় ছিল প্রধান। বিশেষতঃ প্রথম দিকের পরিকল্পনায় গ্রামীণ সমাজ ও কৃষির উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনাগুলির মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম্য সমাজের পুনর্জাগরণ। কাজেই তাহার জন্য বয়স্কশিক্ষার প্রসার আবশ্যিক ছিল।

বয়স্ক কে ? পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইংল্যাণ্ডে ১৮ বছরের উর্ধে যাহাদের বয়স তাহাদের বয়স্ক ধরা হয়। ইহাদের জন্য আংশিক সময় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমেরিকায় ২০ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের সকলকে বয়স্ক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতের পল্লী অঞ্চলে ১৪ বৎসর বয়সকেই বয়স্ক শিক্ষার জন্য ধরা দরকার। কারণ ১১ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইয়া যাইতেছে। ইহার পরবর্তী স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা আজিও সব গ্রামে করা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় যদি ১৪ বৎসর বয়সকে বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে একদিক দিয়া নিরক্ষরতা রোধে তাহা সহায়ক হইবে। অপর দিকে চৌদ্দ বৎসর হইতেই বরং আরও কম হইতেই, গ্রামের ছেলেরা জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। কাজেই সৈয়দ মামুদ কমিটি যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক করিতে হইলে এই সময় হইতেই তাহা আরম্ভ করা প্রয়োজন।

১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রথম ঘোষণা করিলেন, "Adult Education should not be limited to making people literate."

এখন হইতে 'Adult Education' এই কথার পবিবর্তে 'Social Education' কথাটি প্রচলিত হইল। মৌলানা আজাদ ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিলেন—

(১) নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার।

(২) বয়স্কদের মধ্যে সাহিত্যিক শিক্ষার বিস্তার না করিতে পারিলেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত মনের সৃষ্টি করা।

(৩) ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে নিরক্ষর বয়স্কদের অবহিত করা।

মৌলানা আজাদের উপরোক্ত ঘোষণা সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন দ্বার উন্মোচিত করিল। সমাজ-শিক্ষা বিস্তারের উপায় হিসাবে পাঁচটী পন্থা স্থিরীকৃত হইল।

১। সাক্ষরতা বিধান ২। স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসার ৩। জীবিকা বা পেশার অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য দক্ষতা অর্জনের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ৪। নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা ৫। উন্নত মানের অবসর বিনোদনের শিক্ষা।

ইতিমধ্যে সমাজ-শিক্ষা ব্যাপারে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি দিল্লী প্রদেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত **বারটি কর্ম-পন্থা** গ্রহণ করেন :—

(১) গ্রাম্য বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র ছাড়া খেলা, সেবামূলক কর্ম এবং অবসর বিনোদেরও কেন্দ্র হবে।

(২) ঐ কর্মপন্থা অনুসরণের জন্য শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন মহিলা ও বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

বারটি কর্মপন্থা

(৪) মোটর ভ্যানে প্রজেক্টার ও লাউড-স্পীকার থাকিবে এবং সেই মোটর ভ্যান গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে যাইবে। সেইখানে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন এবং সিনেমার ছবি দেখান হইবে।

(৫) বিদ্যালয়গুলিতে রেডিও সেট থাকিবে। শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন সময়ে রেডিও শুনিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৬) বিদ্যালয়গুলিতে জনপ্রিয় নাটকগুলির অভিনয় হইবে এবং ভাল অভিনয়ের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৭) জাতীয় ও গণ-সঙ্গীত শিখাইবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকিবে।

(৮) সমাজের অনুসরণের উপযুক্ত শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকিবে।

(৯) স্বাস্থ্য, শ্রম ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে সামাজিক স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটিরশিল্প এবং সমবায়মূলক কাজ সম্বন্ধে প্রেরণা দিবার জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) গ্রামে মাঝে মাঝে জনসাধারণের নেতারা যাইয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগকে অবহিত করিবেন।

(১১) দলীয় খেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) মাঝে মাঝে প্রদর্শনী, মেলা এবং শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঐ বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এক সভায় মিলিত হন। তিনি ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঐ সভায় কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক সমাজশিক্ষার জন্য মঞ্জুরীকৃত এক কোটি টাকা সম্বন্ধে আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, ১০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় কর্মপন্থা

অনুসরণের জন্য ব্যয় হইবে এবং বাকী ৯০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ-শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের সমাজশিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবে এবং কেন্দ্র হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাইবে। বলা বাহুল্য যে, কেন্দ্র যে টাকা প্রদেশকে দিবে, সেই টাকা প্রদেশকেও খরচ করিতে হইবে।

অর্থ বণ্টন

কেন্দ্রীয় অর্থ-সাহায্য বিভিন্ন রাজ্যকে সমাজ-শিক্ষা প্রসারে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মধ্য ভারতে ৪,৩৯৮টি সমাজ শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল এবং ঐ সব কেন্দ্রে মোট শ্রেণীসংখ্যা ছিল ৮,২৮৪। ঐসব বিদ্যালয় হইতে ১,২১,০৪৫ জন বয়স্ক, সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেয় এবং ৭৫,৮৩৪ জন পুরুষ এবং ১৬,৩০০ জন মহিলা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে।

বিভিন্ন রাজ্যে সমাজশিক্ষার প্রসার

উত্তর-প্রদেশ রাজ্যে বয়স্ক ও তরুণ যাহারা ১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য 'Continuation Class' খোলা হয়। এইখানে কিছু শিল্পশিক্ষাও দেওয়া হইত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালীন অবসর সময়ে ৬৫টি সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ঐ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে নানা রকম শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, আজমীঢ় এবং অন্যান্য স্থানে সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিম বাংলায় অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে নানারূপ নৃত্য, নাটক, যাত্রা, কীর্তন, ভজনমণ্ডলী ইত্যাদি কর্মের ব্যবস্থা করা হয়।

বোম্বাই রাজ্যে সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্যে আত্যন্তিক এলাকা স্থাপিত হয়। এই এলাকা এক জন বিশিষ্ট সমাজ-শিক্ষা কর্মচারীর অধীনে থাকে। তিনি প্রতি বৎসরে তাঁহার এলাকা হইতে ১০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরে রূপান্তরিত করিবেন বলিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে মৌলানা আজাদের বক্তৃতা সমাজ-শিক্ষায় নূতন করিয়া গতি সঞ্চার করিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সমাজ-শিক্ষা বিস্তারের নানা পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতে লাগিল।

(১) কার্যনির্বাহক সংস্থা গড়িয়া তোলা, যাহা সর্বতোভাবে সমাজ-শিক্ষা বিস্তারে নিরত থাকিতে পারিবে।

(২) সমাজ-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা।

(৩) সমাজ-শিক্ষাকর্মীদের বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৪) সমাজ-শিক্ষার সর্বস্তরের কর্মীদের আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা।

(৫) সাক্ষরতা বিধানের পরবর্তীকালীন সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা।

পরিচালনা-ব্যবস্থা (Administration)

(ক) **সর্বভারতীয় পরিচালনা**—কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর সমাজ শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হইলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের মূল কাজ হইল তিনটি।— (১) সকল প্রকার সংস্থার কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন, (২) পরামর্শদান, (৩) আর্থিক সাহায্য দান।

(১) **সমন্বয় সাধন**—কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর এই কাজ দুই ভাবে নির্বাহ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর যে সব পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাহা রাজ্যসমূহে প্রেরিত হয়, রাজ্যসমূহের কার্য-কলাপ সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর অবহিত থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে বা সময়ান্তরে নিযুক্ত সভাসমিতির মাধ্যমে সমাজ-শিক্ষার সমস্যা, অগ্রগতি ইত্যাদি সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করেন। রাজ্যসমূহও এ বিষয়ে সহায়ক হয়।

(২) **পরামর্শ দান**—কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির অন্তর্ভুক্ত সমাজ-শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সমাজ-শিক্ষা বিভাগ (Central Advisory Board of Education on Social Education) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার-সমূহকে সমাজ-শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দান করেন। এই কমিটির পরামর্শানুসারে National Fundamental Education Centre স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান চতুর্বিধ কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।

ন্যাশনাল ফাণ্ডামেণ্টাল এডুকেশন সেণ্টার
(National Fundamental Education Centre)

- সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা (যেমন D.S.E.O. দের শিক্ষণ-ব্যবস্থা)
- সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা ও মূল্যায়ন
- শিক্ষোপকরণ ও পুস্তক-প্রকাশন
- সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণকে ও দেশকে অবহিত রাখা।

(৩) **আর্থিক সাহায্য দান**—কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর রাজ্যসরকার-গুলিকে এবং সমাজ-শিক্ষা প্রসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাবিধ গবেষণা, নূতন সাক্ষরদের নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদির জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তাহা ছাড়া নানাবিধ সেমিনার ইত্যাদি সংগঠনের জন্যও অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য কর্মশালার মাধ্যমে সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের জন্য অনেক পুস্তক রচিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের আওতায় কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সমিতি (Central Social Welfare Board) ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থা কার্য করিতেছে তাহাদের কর্মধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং উৎসাহ দান করেন।

(৪) **রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা।** রাজ্যগুলিতে প্রধানতঃ দুই পক্ষীয় পরিচালনা-ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-দপ্তর তাঁহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজ-শিক্ষা প্রসারের যে চেষ্টা করিতেন তাহা অব্যাহত আছে। আবার সমাজ-সংস্থাসমূহ (Community Projects) নূতন ভাবে সমাজ-শিক্ষা সংগঠনের কাজে নামিয়াছেন। ইহার ফলে বাস্তবে নানা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে ইহা সর্বস্বীকৃত যে উভয় প্রকার কর্তৃত্বের বিলোপ সাধন করিয়া সমগ্র ব্যবস্থা এক কর্তৃত্বের অন্তর্গত করা দরকার।

সমাজ-শিক্ষা প্রসারের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা

সমাজ-শিক্ষা প্রসারের জন্য মোটামুটি চারি ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়া থাকে।

(ক) **অক্ষর-জ্ঞান দিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়।** এইগুলি সমাজ-উন্নয়ন সংস্থা এবং প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন।

(খ) **সমাজ-মিলন-কেন্দ্র**—সমাজ মিলন-কেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ সমাজ-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি (Community Projects) দ্বারা পরিচালিত হয়। এইগুলি প্রধানতঃ বিনোদনমূলক কাজ-কর্ম সংগঠন করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও বয়স্কদের শিল্প-শিক্ষা ইত্যাদি কাজও চলিয়া থাকে।

(গ) **ইয়ুথ ক্লাব প্রভৃতি**—এই ক্লাবগুলি খেলাধূলা, আমোদ-অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন প্রধানতঃ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে এই ক্লাবগুলি বয়স্ক শিক্ষার ভার গ্রহণ না করিলেও বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের উপর

ইহার প্রভাব আছে। পাঞ্জাবে এই সংস্থাগুলি কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদিতে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে।

(ঘ) মহিলা সমিতি—সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে সমাজ-শিক্ষা সংগঠক (S.E.O) নিযুক্ত হন। ইহারা গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন করিতে সচেষ্ট থাকেন।

কর্মীদের শিক্ষণের অন্য প্রতিষ্ঠান

দিল্লীতে ফাণ্ডামেণ্টাল এডুকেশন (Fundamental Education) প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রদেশে প্রদেশে সমাজ-শিক্ষা কর্মীদের নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রশাসনিক কর্মচারী এবং গবেষকগণ স্নাতকোত্তর **শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে** শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের সমাজ-সেবামূলক কাজে বিশেষ পারদর্শিতা থাকিবে।

গ্রামসেবকদের শিক্ষণায়তন—পশ্চিমবংগে ফুলিয়ায় এইরূপ দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ-শিক্ষা সার্থক করিয়া তোলার উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠিত হইয়াছে এবং অনুরূপ যাবতীয় আয়োজন রহিয়াছে।

সমাজ-শিক্ষা সংগঠকদিগের শিক্ষণায়তন (S.E.O.T.C.)—পশ্চিম-বংগে বেলুড় ও শ্রীনিকেতনে দুইটি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। এখান হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া কর্মীরা ব্লকে ব্লকে কর্মের জন্য নিযুক্ত হন।

জনতা মহাবিদ্যালয় (Peoples College)

গ্রাম্য তরুণ ও শিক্ষকদের তিন মাস কোর্সের শিক্ষণ দান করা হয়। মূলতঃ গ্রামনেতৃত্ব অর্জন ও সমাজ-শিক্ষায় সহায়ক করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে বাণীপুরে এবং কালিম্পঙে দুইটি জনতা মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে। জনতা মহাবিদ্যালয়ের কোর্স কোন কোন রাজ্যে চারি মাস। শিক্ষার্থীদিগকে নানাবিধ হাতের কাজ, উন্নত ধরণের কৃষি, পশুপালন, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, পঞ্চায়েত গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে জানিতে হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের শেষে নিজ নিজ গ্রামে গমন করিয়া সমাজসেবামূলক কাজে ব্যাপৃত থাকেন। পশ্চিমবংগ ছাড়া প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে একটি অথবা দুইটি করিয়া জনতা কলেজ আছে।

সমাজ-শিক্ষা দানের অন্যান্য আয়োজন

বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ-শিক্ষা বিষয়ে পড়াশুনা করিতে হয়।

নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাদানরত অধ্যাপকদিগের কোনো S.E.O.T.C.তে স্বল্পকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনায় জেলা সমাজ-শিক্ষাধিকারিক (District Social Education Officer) মাঝে মাঝে শিক্ষকদের লইয়া youth workers' camp পরিচালনা করিয়া থাকেন।

উন্নয়ন ব্লকগুলি মাঝে মাঝে গ্রামনেতৃত্ব শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেন। ইহাতে গ্রামবাসী ও গ্রাম্য-শিক্ষকেরা যোগদান করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া শিক্ষা-দপ্তর এবং ব্লক উভয় পক্ষ হইতেই গ্রামে গ্রামে পাঠাগার গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা চলিতেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম্য নৈশ-বিদ্যালয় এবং যুবসংস্থাগুলির মারফতে পাঠাগার গড়িয়া উঠিতেছে। সরকারের প্রচার-বিভাগও লোকশিক্ষা-সহায়ক নানা ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া সমাজ-শিক্ষা প্রসারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সরকারী প্রচেষ্টায় কোথাও কোথাও লোকরঞ্জন শাখা গঠিত হইয়াছে। ইহারা উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া পরোক্ষ ভাবে সমাজশিক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইউনেস্কোর পক্ষ হইতেও নিয়মিত ভাবে আলোচনা-চক্র ইত্যাদির আয়োজন চলিতেছে।

সাক্ষরতা বিধানের পর তাহা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বয়স্কদের জন্য সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ভাল ভাল বই সস্তায় ছাপিয়া বাহির করার জন্য National Book Trust নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারত-সরকার ছায়াচিত্র রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সাফল্য ও সুবিধা অনুভব করিয়া National Board of Audio-visual Education নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। চলচ্চিত্র উৎপাদনের জন্যও নানা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। যথা— Documentary Film Production Centre ইত্যাদি। প্রতি রাজ্যে ফিল্ম লাইব্রেরীও স্থাপিত হইয়াছে। ফিল্ম লাইব্রেরীগুলি নানাজাতীয় ফিল্ম সরবরাহ করিয়া থাকেন। রেডিওতে নিয়মিত আসর পরিচালনা দ্বারা জনশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়।

সমাজ শিক্ষার স্তিমিত অবস্থার কারণ

এই ভাবে এক বিপুল উদ্যোগ লইয়া সমাজশিক্ষা বিস্তারের কাজ আরম্ভ হয়। সমাজ-শিক্ষা প্রসারের জন্য এই বিপুল উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও অতি অল্প কালেই ইহা স্তিমিত হইয়া পড়ে। তাহার কারণগুলি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ মারফত পরিচালিত হয়। রেল, শ্রম, প্রতিরক্ষা বিভাগ আপন আপন কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চালাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক শিক্ষাদপ্তর আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালান। উন্নয়ন সংস্থা, প্রচার বিভাগ ইত্যাদিও স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন। ফলে সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে আসল কাজ বিশেষ হয় নাই। উপরের দিকে প্রতিষ্ঠান অনেক গড়িয়া উঠিলেও আসলে গ্রামের মধ্যে বিশেষ কাজ হয় নাই। সেজন্য সমাজশিক্ষার উপযোগী আড়ম্বর-বহুল বিপুলায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হইলেও গ্রামের মধ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

(২) সমাজ-শিক্ষার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে। অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় গ্রাম-জীবনের মৌল অসুবিধাগুলি দূর করা যায় নাই। ফলে অধিকাংশ গ্রাম্য নৈশবিদ্যালয়গুলি ও পাঠাগারগুলি কোনো রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখিলেও কোনো রকম উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে নাই। ফলে যে পরিমাণ প্রচারের মাধ্যমে যে উজ্জ্বলচিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে, আসলে ততখানি কাজ হয় নাই।

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জনশিক্ষা প্রসারের উপযোগী আন্তরিকতা ও মনোভাব সৃজন করিতে সরকার অসমর্থ হইয়াছেন। এই অসন্তুষ্ট সরকারী কর্মচারীরা মনপ্রাণ ঢালিয়া কাজ করিতে পারেন নাই।

(৪) অধিকাংশ সমাজ-শিক্ষাকর্মী (বিশেষতঃ পঃ বঙ্গে) সহর হইতে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহারা গ্রামের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ফলে সমাজ-শিক্ষার কাজ বিঘ্নিত হইয়াছে।

(৫) সমাজশিক্ষার সমস্যা একক সমস্যা নহে। অন্যান্য বহু সমস্যার সংগে সংযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাবে সমাধানের অপেক্ষা রাখে।

গ্রামগুলি পুনরুজ্জীবনে সরকারী ব্যর্থতা অনেকাংশে সমাজ-শিক্ষাকেও ব্যাহত করিয়াছে।

(৬) দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি এ সমস্যাকে আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

সমাজ শিক্ষার অগ্রগতি

যদিও উপরে আলোচিত ত্রুটিসমূহ নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে, তাহা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর ভারত-সরকার সমাজ-শিক্ষার প্রসারের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। আজিও সে চেষ্টা বজায় আছে।

১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে ৪৩,৪৬৩টি প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারত সরকার ব্যয় করিতেন—৭১·৮৩ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬,০৯১ এবং ভারত সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬ লক্ষ টাকা। এই সময়ে এই সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২৭৮,৮২৭ জন।

১৯৪১ সালে ভারতে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল শতকরা ১২ জন। আশা করা গিয়াছিল, ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে। সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মনে করা হইয়াছিল, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরতা বিধানের ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সম্ভব হইবে।

নুরুল্লা এবং নায়েক স্বীকার করিয়াছেন, যদিও প্রতি বৎসর ৫০,০০০ করিয়া বয়স্কবিদ্যালয়ে প্রায় ১২ লক্ষ করিয়া বয়স্কের মধ্যে ৪।৫ লক্ষের সাক্ষরতা বিধান চলিতেছিল, তবুও সারা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা ছিল অত্যন্ত মন্থর গতি।

১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে প্রকাশ পায়, ভারতে শিক্ষিতের হার ১৬·৬৭ হইতে ২৩·৭ এ উন্নীত হয়। আদমসুমারীতে এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে যে, ভারতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ কোটি বয়স্কের সাক্ষরতা বিধান হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বে এইরূপ ক্রমবৃদ্ধি দেখিয়া একথা মনে করা ঠিক হইবে না যে, সত্যই এত সংখ্যক সাক্ষর ব্যক্তি সমাজে আছেন। সাক্ষরতা বিধান পদ্ধতিতে কতকগুলি ত্রুটির ফলে ইহা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সাক্ষরতা বিধানের জন্য প্রতিটি সাক্ষর ব্যক্তির জন্য এক টাকা হিসাবে শিক্ষকমহাশয়কে পুরস্কার দেওয়া হইত।

এই পুরস্কারের লোভে এমন অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রামবাসীর মোট সংখ্যা অপেক্ষা সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়া একই সাক্ষর ব্যক্তিকে কয়েক মাস পর পর হিসাবের মধ্যে দেখানো হইয়াছে। সেই রিপোর্টগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু মাত্র 'সাক্ষরতা বিধান' সমাজ শিক্ষার এই উদ্দেশ্য স্বাধীনতাত্তোর কালে পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য—"Socialisation of the adult and on his preparation for the new society in which he has to live."—Nurulla & Nayek.

উপরোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভারতের গ্রাম-সমাজে পরিবর্তন সূচিত হইতেছে। পর পর কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও রাজনীতি সচেতনতা পৌছাইয়া দিয়াছে, সমাজ-উন্নয়ন-সংস্থাগুলি আপন আপন সীমার মধ্যে সর্বাংগীন উন্নয়নের পরিকল্পনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে ধীরে হইলেও পরিবর্তন স্থরু হইয়াছে। এইখানেই সমাজ শিক্ষার সাফল্য।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজশিক্ষা

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ১৬'৬ ছিল। কিন্তু পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাক্ষরতার বিশেষ পার্থক্য ছিল, পুরুষের শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল। ২৪'৯ এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৭'৯। শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ৩৪'৬ এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মোট শতকরা ১২'১। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকার ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, যদি সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটে, তাহা হইলে ভারতের গণতন্ত্র সার্থক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে না। এই কারণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজে শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হয়। সমাজ উন্নয়ন ব্লক ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ৫৫টি স্থাপিত হয়। সমাজ উন্নয়ন ব্লকের আওতায় ৪,০০,০০০গ্রাম পড়ে এবং প্রায় ২০ কোটি লোকের উন্নয়নের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আসিয়া পড়ে। সমাজ উন্নয়নে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা হয়—কৃষি, সেচ, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সহযোগী কর্মব্যবস্থা, গৃহ ইত্যাদির উন্নতি সাধন। সমাজ উন্নয়ন বিভাগের একটি বিশেষ কার্যক্রম হয় সমাজ-শিক্ষা। বিভিন্ন

রাজ্যে সমাজ-শিক্ষার জন্য গ্রামসেবক এবং সমাজ-শিক্ষা সংগঠকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে। সমাজ-শিক্ষা পরিচালকদের সমাজ পরিচালন, সাক্ষরতা বিধানের কাজ, নাগারিকতার শিক্ষা, পাঠাগার পরিচালনা, বিনোদনের কার্যক্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কার্যক্রম হইল সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং সমাজ শিক্ষার জন্য শিক্ষণদান, পাঠাগার স্থাপন, নূতন সাক্ষরদের জন্য পুস্তক রচনায় পুরস্কার প্রদান, বয়স্ক শিক্ষায় শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষাসরঞ্জামের ব্যবস্থা, যুবসঙ্ঘ স্থাপন, মহিলা সমিতি স্থাপন ও জনতা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা সংস্থার (National Institute of Education) অংশ হিসাবে National Fundamental Education Centre খোলা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ শিক্ষার (সমাজ উন্নয়ন সহ) জন্য ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খরচ হইয়াছে ১৫ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে সমাজশিক্ষার চিত্র

পশ্চিমবঙ্গে সমাজশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনের ইতিহাস ভারতেরই মত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক হইতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। সমাজশিক্ষার দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী মতে ছিল চতুর্থ, কিন্তু উহা ১৯৬১ সনের আদমসুমারীতে হয় নবম।

কেন এই অবনতি?

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব বেশী তাই নিরক্ষরদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাক্ষরতার ধাপও নীচে নামিয়া গিয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি কারণ।—

(১) প্রথমতঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহু লোক পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসে। এই বিপুল সংখ্যক লোকদের মধ্যে বহু লোক নিরক্ষর। (২) দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পুরুলিয়ার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসে। পুরুলিয়ার নিরক্ষর জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পার্শ্ববর্তী রাজ্য হইতে বহু লোক জীবিকা সংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসে। ইহারাও বেশীর ভাগ নিরক্ষরের পর্যায়ের। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

কারিগরী শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পটভূমিকা

ভারতের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতীত কালে ভারতবাসীরা কারিগরী বিদ্যায় অতি উচ্চ স্তরের নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের যে অতীত নিদর্শনগুলি আজিও রহিয়া গিয়াছে সেগুলি ভারতবাসীদের নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মহেঞ্জোদারোর নগর-পরিকল্পনা, আলেকজাণ্ডারের সময়ের ইস্পাতশিল্প ইত্যাদি তাহার উদাহরণ।

ভাস্কর্য ও গঠন-নৈপুণ্যে ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলি আজও বিস্ময়ের বস্তু। অজন্তার অঙ্কন ও বর্ণবিলাসও অতীত ভারতের গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, দিল্লীর মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভ, ঢাকার মসলিন, মুঘল আমলের স্থাপত্য-শিল্প, ভারতীয় কারিগরী প্রতিভা কি উন্নত পর্যায়ে উঠিয়াছিল তাঁহার পরিচয় দিতেছে। প্রাচীন কালের শিল্পনৈপুণ্যের এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতের প্রাচীনকালের কারিগরী বিদ্যাচর্চার পশ্চাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

(১) এক এক বৃত্তি-অবলম্বনকারী গোষ্ঠীর মধ্যেই সেই বিদ্যা আবদ্ধ থাকিত। যথাসম্ভব মন্ত্রগুপ্তি রক্ষিত হইত।

প্রাচীন ভারতে কারিগরী চর্চার বৈশিষ্ট্য

(২) বিপুলায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া উৎপাদনকে কোনো সময় কেন্দ্রীভূত করা হয় নাই। শিল্প সকল সময় বিকেন্দ্রিত এবং ক্ষুদ্রায়তন ছিল।

(৩) শিল্পে পরিবারের সকল সভ্য অংশ গ্রহণ করিত, পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে শিল্পকর্ম চলিত এবং এই শিল্প-পরিবেশের মধ্যে শিশুরা সহজভাবে শিক্ষানবিশী করিত এবং ক্রমে দক্ষ কারিগর হইয়া উঠিত।

(৪) শিল্প পারিবারিক পরিবেশে চলিত বলিয়া ইহার উৎপাদন-ব্যয় অত্যন্ত কম থাকিত।

(৫) শিল্প-পণ্য বিক্রয়ের ও বাণিজ্যের সুন্দর ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(৬) সমাজে দক্ষ কারিগরের খুবই সম্মান ছিল, রাজন্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ইহাদের পোষকতা করিতেন।

সমস্যার উদ্ভব

ভারতে এই যে এত কালের শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার ঐতিহ্য, তাহা হঠাৎ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ইহার পশ্চাতে যে কারণগুলি বর্তমান ছিল তাহা নিম্নরূপ।

সমস্যা

(১) মোগল যুগের অবসানের কাল হইতে দৃঢ়ভাবে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল পর্যন্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তির ভারসাম্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ফলে সমাজে নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা বিঘ্নিত হইতে থাকে। তাহার ফলে সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে নানা ধরণের বাধা ঘটিতে থাকে। জনসাধারণ বিশেষতঃ শিল্পজীবী শ্রেণী ক্রমাগত দরিদ্র হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের দক্ষতার অবনতি ঘটিতে থাকে।

(২) ইংরাজ রাজত্বের সুরু হওয়ার কাল হইতেই সত্যকার সমস্যার উদ্ভব ঘটিল। ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটিল। এই শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া সারা ইউরোপে দেখা দিল। সমগ্র ইউরোপে অভূতপূর্ব উৎপাদন-প্রাচুর্য দেখা দিল। ফলে ব্যবসায়-ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া ইউরোপ সাম্রাজ্য বিস্তার করিল। ইউরোপীয় বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান-জাত শিল্পদ্রব্যাদি বিপুল বন্যায় ভারতে আসিতে লাগিল। ইংরাজ সরকার দেশীয় শিল্পোৎপাদনকে যেমন নিরুৎসাহ করিতে লাগিল, অপর দিকে ইউরোপীয় শিল্পের বাজার প্রসারিত করিতে লাগিল।

(৩) ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থাও ইহার জন্য দায়ী। প্রথম দিকে ইংরাজী শিক্ষা যে আকারে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাতে কারিগরী শিক্ষার আয়োজন ছিল না। শুধু তাহাই নহে, যে বিদ্যার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা লাভ করিয়া কেরাণীগিরি লাভ সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্যা ভারতীয় সমাজের উপর দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শহরে বিদ্যা ও বিলাসের আয়োজন কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠায় গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শহরে ভীড় জমাইলেন। ফলে যে পোষকতা ও উৎসাহে গ্রামের শিল্প অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা বিনষ্ট হইল। দ্বিতীয়তঃ, সস্তা ইংরাজী-বিদ্যা অর্জন দ্বারা যে শিক্ষিত

সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারা অত্যধিক পরিমাণে কল্পজগতে বিহার করিয়া পার্থিব জীবনের প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিল। কারিগরী বিদ্যার চর্চা খানিকটা অপাঙক্তেয় হইয়া পড়িল। এই কারণে অতি অল্পকালেই সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের পিতৃপুরুষের বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া সরকারী চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিলেন। এই মনোভাব হইতে অতি দ্রুত গ্রামীণ কারিগরীসমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

(৪) বর্তমান রাজশক্তি দেশীয় শিল্পের কদর বুঝিতেন না। কারণ তাঁহাদের রুচিই ছিল অন্য প্রকারের। যে কয়টি শিল্পের কদর তাঁহারা বুঝিতেন (যথা মস্‌লিন প্রভৃতি) সেগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলার জন্য অবিরাম চেষ্টা চলিয়াছিল।

ইংরাজ শাসনকালে কারিগরী বিদ্যার প্রসার

ইংরাজ কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মনোভাব প্রথমে দেখাইয়াছিল, অনতিকাল মধ্যে তাহা পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বহু দেশে দ্রুত যন্ত্রশিল্প ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রসার ঘটিতে লাগিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, বাণিজ্যের প্রসার যুদ্ধোদ্যমে পরিণত হইল। অবশেষে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ ঘটিয়া গেল। এত কালের প্রচলিত যুদ্ধের রীতিনীতি পরিবর্তিত হইল। এই যুদ্ধে পরিস্ফুট হইল, কারিগরী শিল্পে যাহার যত উন্নতি, তাহার জয় তত সুনিশ্চিত। ইহার প্রভাব শিক্ষার উপর আসিয়া পড়িল। শিক্ষার এত কাল যে মূল্যবোধ ছিল তাহা পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ভারতও এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিল না।

কারিগরী বিদ্যার প্রসার

পরাধীন ভারতে কারিগরী বিদ্যার ইতিহাসকে আমরা মোট **তিন ভাগে** ভাগ করিতে পারি।

১। ইংরাজ শাসন সুরু হওয়ার পর সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত,

২। সিপাহী বিদ্রোহের কাল হইতে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত,

৩। বঙ্গভঙ্গ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

(১) প্রথম পর্যায়—১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে নিছক সরকারী প্রয়োজনে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের সূচনা হইল। এই প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদে বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতায় কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রুরকীতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও পুনাতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী ক্লাশ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। মাদ্রাজে সুরু হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে।

বোম্বাইতে নেটিভ্ স্কুলবুক ও স্কুল সোসাইটি ১৪ জন ইউরোপীয় ও ৩৬ জন ভারতীয় ছাত্র লইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাশ সুরু করেন। ঐ বৎসরেই উক্ত সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে "School for native Doctors" এই নামে ডাক্তারী ক্লাশের উদ্বোধন হইল এবং ২০জন ছাত্র প্রথম ভর্তি হন। ঐ বৎসরই পুণাতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাশ ও একটি মেকানিক্যাল ক্লাশের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইল। বোম্বাইতে ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল যে মাতৃ-ভাষাতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী ক্লাশ সুরু হয়।

প্রথম পর্যায়

(২) দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হইল ১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডস্ ডেসপ্যাচ্ (Wood's despatch) ইংল্যাণ্ডের কলা-বিভাগ ও বিজ্ঞান-বিভাগ প্রতিষ্ঠার দ্বারা হয়ত প্রভাবিত হইয়াছিল। সেই জন্য উড্স্ ডেসপ্যাচে কারিগরী ও বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার ইঙ্গিত মাত্র ছিল।

কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে বিশেষ কোনো কাজ হয় নাই। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পুনা ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাশ কলেজে পরিণত হইল। বোম্বাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ইতিমধ্যে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় অনেক ছোট ছোট শিল্প-বিদ্যালয় খোলা হইতেছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রায় ৮০টি শিল্প-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। এগুলিতে প্রায় ৪৮০০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়

(৩) তৃতীয় পর্যায় - বঙ্গভঙ্গ হইতে স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত। ১৮৮৫ সালে দেশে কংগ্রেস স্থাপিত হইল। কংগ্রেস অধিবেশনে দেশের নানাবিধ সমস্যা লইয়া আলোচনা চলিত। তাহার মধ্যে শিক্ষাসমস্যা ছিল প্রধান। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, দ্রুত বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার দরকার। কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য চাপ দেওয়া হইতে থাকিল। ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া খানিকটা সচেতন হইতে হইল। সরকার আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় পর্যায়

কিন্তু ইহাতে দেশীয় লোকদের তুষ্ট করা গেল না। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের মুখে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় "Association for the advancement of Scientific and Industrial Education" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নানা দেশে ছাত্র প্রেরণ আরম্ভ হইল।

এই সময় জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন সুরু হইল। মহাসমারোহে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হইল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ১৯০৮ সালে যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করিল।

১৯২১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে ধানবাদের খনিবিদ্যালয়, কানপুর, বম্বে প্রভৃতি স্থানের অনেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সর্বতোভাবে যান্ত্রিক জ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ভারত এই যুদ্ধের অন্যতম সীমান্ত হওয়ায় ভারতের উপর যুদ্ধের চাপ ভয়ানক ভাবে পড়িতে লাগিল। ভারতে অতি দ্রুত শিল্পায়ন ও ভারতীয়দের যন্ত্রকুশলী করিয়া তোলার প্রয়োজন হইল। এ প্রয়োজন অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরেই। ভারত সরকার অবিলম্বে কারিগরী শিক্ষাকে প্রাদেশিক সরকারের আওতা হইতে মুক্ত করিয়া কেন্দ্রের অধীনে আনয়নে তৎপর হইলেন।

এইখানে আরও একটু আগের কথা বলা আবশ্যক। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড স্থাপিত হয়। এই বোর্ড শিক্ষা সংস্কারের যে পরিকল্পনা দিলেন তাহাতে বলা হইল, "A radical re-adjustment of the present System of Education in schools should be made in such a way as not only to prepare pupils for professional and University courses but also to enable them at the completion of the appropriate stages to be diverted to occupations or to separate vocational Institutions." এই উপদেষ্টা বোর্ড যে শিক্ষাধারা সুপারিশ করিলেন তাহার মধ্যে কারিগরী শিক্ষা, অন্যান্য শিক্ষার অন্যতম ছিল।

ইহারা কর্মনিয়োগ সংস্থা (Employment bureau) গড়িয়া তোলারও পরামর্শ দিলেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় তাঁহাদের কর্মসূচী রূপায়িত করিতে বলিলেন। তদনুসারে ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক মিঃ এম্ এ এ্যাবট্ এবং এস্ এইচ্ উড্ (S. H. Wood, Director of Intelligence, Board of Education) ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারকে সাহায্য করার জন্য ভারতে আগমন করিলেন। ইহারা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট 'উড্ এ্যাণ্ড্ এ্যাবটস্ রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে কারিগরী শিক্ষার কথা সুপারিশ করা হইল।

ঠিক এই সময়েই মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন বসিল এবং নূতন ধরণের এক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থাপিত হইল।

১৯৩৯ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে শিল্পবিস্তার ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে লাগিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে সর্বদেশেই ইহা অনুভূত হইল যে, যুদ্ধরত দেশগুলির সাফল্য নির্ভর করিবে শিল্পদক্ষতার উপর। ফলে ভারতেও দ্রুত শিল্পশিক্ষার ও শিল্পের বিস্তার ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কারিগরী শিক্ষা বিষয়টিকে প্রাদেশিক দপ্তর হইতে কেন্দ্রীর পরিচালনায় আনিলেন এবং ইহার উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এই পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ—

(১) বৈজ্ঞানিক ও কারীগরী শিক্ষার গবেষণা ও মান উন্নয়নের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হইল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে।

(২) দিল্লীতে পলিটেক্‌নিক স্থাপিত হইল ১৯৪১ সালে।

(৩) ভারতে শিল্পশিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে 'সরকার কমিটি' গঠিত হইল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। তাহা ছাড়া 'All India Council for Technical Education' নামেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল।

(৪) "Scientific Man-power Committee" নামে একটি কমিটি গঠিত হইল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। এই কমিটি হিসাব করিল যে পরবর্তী ১০ বৎসরে ভারতে প্রায় ৫৪০০০ ইঞ্জিনীয়ার ও প্রায় ২০,০০০ কারিগর প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। ইতিমধ্যে ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়া গেল, ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রগতি এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল।

স্বাধীন ভারতে কারিগরী শিক্ষা

ভারত স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে ভারতের সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল। ইহার প্রভাব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও হইল। ভারত-সরকার পরিকল্পিত উপায়ে সারা দেশের উন্নয়নে ব্রতী হইলেন। রাশিয়ার অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সকল দিকে পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা হইল। জাতিকে দ্রুত উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে শিল্প, কৃষি, সেচন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন, যাতায়াত, চিকিৎসার দ্রুত প্রসার, দ্রুত খনিবিদ্যার প্রসার, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্তকার্যের প্রসার ইত্যাদি দ্রুত উন্নত করিয়া তোলার প্রয়োজন হইল ইহার। ফলে অতি দ্রুত কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন হইল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষা যে পর্যায়ে ছিল তাহার উন্নতি-বিধান করা হইতে লাগিল। আবার অপর দিকে ভবিষ্যতে যাহাতে কারিগরী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কারিগরী শিক্ষার মান উন্নত হইয়া উঠিতে পারে, তাহার আয়োজন করা হইতে লাগিল।

কারিগরী শিক্ষার চাহিদা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন **কারিগরী শিক্ষা** সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন।

কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ

(১) বহুসংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় এককভাবে কিংবা বহুমুখী বিদ্যালয়ের শাখারূপে স্থাপিত করিতে হইবে।

(২) বড় বড় শহরে কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে হইবে, যাহা স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয়।

(৩) যেখানে সম্ভব সেইখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং সেইখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারিগরী শিক্ষা-কেন্দ্র একযোগে কাজ হইবে।

(৪) কারিগরী-শিক্ষায় শিক্ষানবিশী কাজ একটি গুরুতর অংশ, এবং আইন-প্রণয়ন করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষানবিশী করিতে দিতে বাধ্য করিতে হইবে।

(৫) কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা-কালে বাণিজ্যিক সংস্থা ও শিল্প-সংস্থাগুলির সঙ্গে খুব বেশী যোগাযোগ রাখিতে হইবে।

(৬) কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কিছু 'শিল্পকর' বসাইতে হইবে।

(৭) মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার একটি উপযুক্ত প্যাটার্ন গ্রহণের জন্য A.I.C.T.E.-র সাহায্যে কারিগরী শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে।

কিন্তু এই সুপারিশসমূহ কারিগরী শিক্ষার উন্নতির উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে কারিগরী শিক্ষায় দেশের চিত্র ছিল নিম্নরূপ।—

১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ

	কলেজ		স্কুল	
	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
কৃষি	১৫	৩,০৮২	৩৯	১,৮৮২
কলা ও শিল্প	—	—	১৩৭	৯,৮৮৭
বাণিজ্য	২১	৮,১৮৭	৪১২	২৭,৬২১
ইঞ্জিনীয়ারিং	২৩	৯,৪১১	১৯	৩,০৯৬
বন	৪	৩৮৯	২	৫৩
শিল্প ও টেকনিক্যাল	—	—	৪৮৬	৩৪,৩২৬
আইন	২০	৬৬,৭৯	—	—
ডাক্তারী	৩৫	১১,৭৭২	৩৯	৩,৭৯০
টেকনোলজি	৫	১,৫৪১	—	—
পশু চিকিৎসা	১০	১,৪৮৬	—	—
	১১৩	৪২৫৪৭	১১৩৪	৮০৬৫৫

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮'৭ কোটি টাকা কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হইল। প্রথম পরিকল্পনা-কালে ইহার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩০ কোটী টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে ব্যাপক আয়োজন ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই পরিকল্পনা মাফিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

	কলেজ		স্কুল	
	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
কৃষি	২৯	১০৮৭১	১০২	৭,৪১১
কলা ও শিল্প	—	—	৩৭৪	১৫,৬৯৬
বাণিজ্য	৩৫	৬৬,৬১৩	৯৬৬	৯৮,৭৫৪
ইঞ্জিনীয়ারিং	৫৫	৩১,৭০৭	১১৯	৪৬,৬০৭
বন	৩	৫৮৯	৫	২৩৭
শিল্প ও টেক্‌নিক্যাল	—	—	৬৯৬	৪৫,৪০৩
আইন	৩২	২৪০৫৫	—	—
ডাক্তারী	১০৯	৩২৪৮০	১২৪	১০,৬৮৮
টেক্‌নোলোজি	৯	৩৩৭৩	১৩৭	১৯,৮১৪
ভেটিরিনারি	১৭	৫১৩৭	১০	১০৯৩

উপরোক্ত তথ্য দুইটি হইতে দেখা যায় যে, কলেজ পর্যায়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য বিষয়ে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজির জন্য

মাত্র ৩৮টি কলেজ ছিল, ১০ বৎসর পরে ১৯৫৭ সালে তাহা দাঁড়ায় ৭৪টিতে। এই ভাবে কলেজের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে তেমনি পূর্বতন কলেজগুলিকে নানাভাবে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ও নূতন কলেজগুলির সাহায্যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যেখানে ২৯৪০ জন ছাত্র ডিগ্রী লাভ করিত, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৯৭৭৮ জন।

কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সূচনা পরিকল্পনা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কারিগরী শিক্ষার উন্নতি চারিটি পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারা যায়—প্রশাসন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষার দ্রুত উন্নতি এবং নূতন নূতন পরিকল্পনা।

প্রশাসন—নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সমিতি ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতির সুপারিশে চারিটি আঞ্চলিক কমিটি—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—স্থাপিত হয়। এই কমিটিগুলি নিজ নিজ এলাকায় কারিগরী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে। নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সমিতি (AICTE) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন। সমিতি সরকার কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং চারিটি আঞ্চলিক টেকনোলজিকাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার কথা বলেন। এই AICTE বৎসরে একবার মিলিত হইয়া কারিগরী শিক্ষার নীতি, কার্যক্রম ইত্যাদি আলোচনা করিয়া থাকেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—কারিগরী শিক্ষার তিন রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তিন ধরণের কর্মীকে শিক্ষাদান করিয়া থাকে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তরের কর্মীদের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তৃতীয় ধরণের কর্মীদের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মের দক্ষতা অর্জন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন যে দ্রুততালে অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া কারিগরী শিক্ষার প্রসার করা যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেই দেশে প্রায় ১৫০০০ হাজার গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারের এবং ৩০,০০০ ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ারের অভাব ছিল।

কারিগরী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। প্রতি বছর যাহাতে ২০ হাজার গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার সরবরাহ করা যায় এমন চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাহা ছাড়া নীচুমানের কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন অসংখ্য ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে দুর্গাপুর, ভূপাল, দিল্লী, এলাহাবাদ, মাঙ্গালোর, বারঙ্গল, নাগপুর, শ্রীনগর ও জামসেদপুরে বড় বড় রিজিওনাল কলেজ খোলা হইল। এগুলিতে বহু সংখ্যক তরুণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কলেজগুলি হইতে ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা কিছু মিটিবে। অবশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার আসিবে পুরাতন কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া। AICTE ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৭টি Polytechnic স্থাপনের নির্দেশ দেন। এই Polytechnic-গুলিতে শিক্ষাদান শেষে ডিপ্লোমা দান করা হইবে।

কর্মীদিগকে কুশলী কর্মী করিয়া বাহির করিবার জন্য সরকার ব্যবস্থা করিতেছেন। ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে শিল্পকাজে দক্ষ কর্মীদের যে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে ১০,৫০০ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে পারিত। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ২৬,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমানে দেশে কারিগরী শিক্ষার যে আয়োজন রহিয়াছে তাহা প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত।—(১) সরাসরি কলেজ হইতে বা স্কুল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে কারিগরীজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যোগদান করিতেছেন।

(২) কর্মক্ষেত্রেই নানা রকম কাজ শেখার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বস্তুতঃ, শেষোক্ত উপায়েই বহু সংখ্যক ব্যক্তি কারিগরী জ্ঞান লাভ করিতেছেন এবং নিজেদের দক্ষতার মান উন্নয়ন করিতেছেন।

ইহা ছাড়া আরও একটি ব্যবস্থা আছে যাহা পর্যাপ্ত নহে এবং অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাহা হইতেছে কর্মীদের বিদেশে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কারিগরী শিক্ষার যে ভাবে দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে আলোচনা করা যায়।

(১) শিল্পশিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দিক দিয়া উন্নতি।—প্রথমেই ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সারা দেশের পক্ষে কি ধরণের কারিগরী জ্ঞানের প্রসার

ও কত পরিমাণ কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি আবশ্যক, ইহার একটি ব্যাপক সমীক্ষণ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন বিস্তৃত কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। সারা দেশের জন্য সামগ্রিক ভাবে এই আয়োজনের জন্য চেষ্টা করা আগে হয় নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপন করিয়া ইহার মর্যাদা আরও বাড়ানো হইল। ইহা ছাড়া প্রতিটি দপ্তরের মধ্যেই স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা তো থাকিলই। অবশ্য ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইহা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল মাত্র। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের পর ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-মন্ত্রীর আওতায় আসিয়াছে।

কারিগরী শিক্ষাদানে বিভিন্ন প্রচেষ্টা

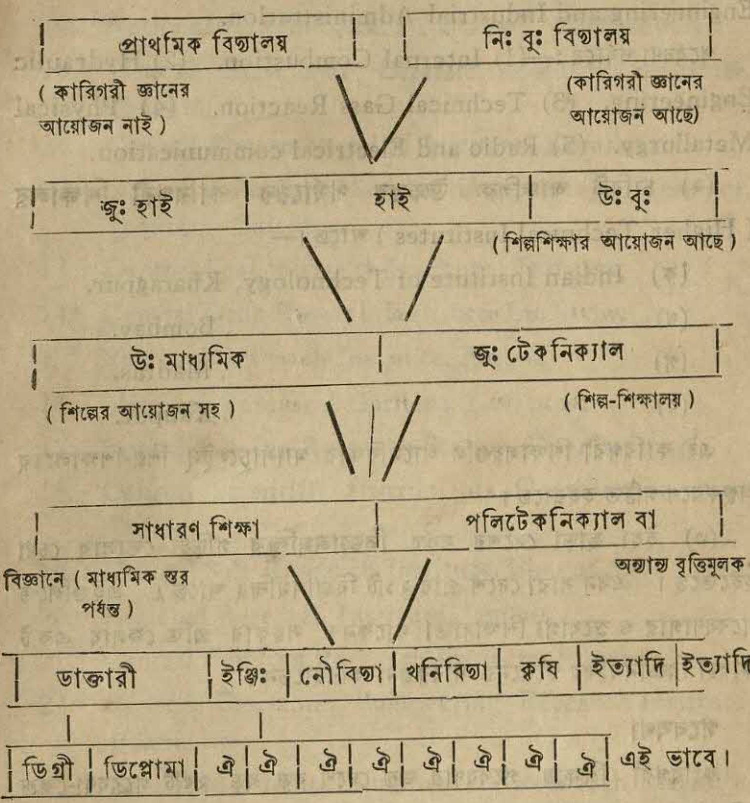
দেশে যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য নানা রকম শিক্ষার আয়োজন যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাহাতে মান উন্নত হয় এবং পরিমাণ না কমে, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইতেছে। দেশের মধ্যে বড় বড় সংস্থা (যেমন—রেল, ভারতীয় ইস্পাত প্রতিষ্ঠান, ডাক ও তার, চটকলসমূহ, চাশিল্পসমূহ ইত্যাদি) নিজেরাই বড় বড় প্রতিষ্ঠান খুলিয়া কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বড় বড় ও ভারী ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই ত গেল ব্যবস্থা। ছোট ছোট চারু ও কারুশিল্পগুলিরও যাহাতে উন্নতি হয়, গ্রামীণ শিল্পগুলি যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তাহার জন্যও নানা চেষ্টা করা হইতেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরী ও শিল্প-শিক্ষা

ব্লকে ব্লকে গ্রামের তরুণদের শিক্ষার জন্য নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার আয়োজন করা হইতেছে। দারুশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদি গ্রামের শিল্পীদের যাহাতে বৃত্তিচ্যুত না হইয়া পড়িতে হয়, তাহার জন্য অর্থসাহায্য করা হইতেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষার আয়োজন করা হইতেছে। প্রাদেশিক স্তরে শিল্পাধিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিল্পাধিকার,

শিক্ষাধিকার বা অন্যান্য দপ্তরেরও সাহায্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টার বিরাম নাই। শিল্প-শিক্ষার জন্য নানা রকম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। তাহার ধারাটি নিম্নরূপ :—



কারিগরী বিদ্যার প্রসারকল্পে বহু বড় বড় সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(১) **ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সয়েন্স**—বাঙ্গালোর। ইহা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বহু ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করিয়াছে। তাঁহারা সকলেই উচ্চ পর্যায়ে কর্ম করিয়া ভারতকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উঠিয়াছে।

এখানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে—(1) Soil Mechanics and Foundation Engineering (2) Automobile Engineering. (3) Foundry Engineering. (4) Electrical Engineering. (5) Industrial and Production Engineering and Industrial Administration.

গবেষণা পর্যায়ে :—(1) Internal Combustion. (2) Hydraulic Engineering. (3) Technical Gass Reaction. (4) Physical Metallurgy. (5) Radio and Electrical communication.

(২) চারিটি আঞ্চলিক **উচ্চতর পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষালয়** (Higher Technical Institutes) আছে।—

(ক) Indian Institute of Technology, Kharagpur.
(খ) " " " " , Bombay.
(গ) " " " " , Madras.
(ঘ) " " " " , Kanpur.

এই কারিগরী শিক্ষালয়গুলি আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ শিল্প-শিক্ষালয়ের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে।

(৩) ইহা ছাড়া দেশের সর্বত্র **বিজ্ঞানমন্দির** গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। এখন সারা দেশে প্রায় ২১টি বিজ্ঞানমন্দির আছে। এইগুলিতে গবেষণাগার ও সুযোগ্য শিক্ষাদাতা থাকেন। সরকার প্রতি জেলায় একটি করিয়া বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

গবেষণা

কারিগরী শিক্ষায় গবেষণার জন্য দেশে বড় বড় ২৫টি গবেষণা-কেন্দ্র রহিয়াছে। এইগুলির তালিকা নিম্নে লিখিত হইল।—

1. National Chemical Laboratory, Poona.
2. Central Food Technological Research Institute. Mysore.
3. Regional Research Laboratory, Hyderabad.
4. National Aeronautical Laboratory, Bangalore.
5. Central Indian Medical Plants Organisation, New Delhi.

6. National Physical Laboratory, New Delhi.
7. Central Road Research Institute, New Delhi.
8. Indian Institute of Bio-chemistry and Experimental Medicine, Calcutta.
9. National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur.
10. Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta.
11. Central Electro-chemical Institute, Karaikudi.
12. Central Public Health Engineering Research Institute, Calcutta.
13. Central Fuel Research Institute, Jealgora.
14. Central Drug Reserch Institute, Lucknow.
15 Regional Research Institute, Assam.
16. National Botanical Gardens, Lucknow.
17. Central Mining Research Station, Dhanbad.
18. Central Scientific Instruments Crganisation, New Delhi.
19. Central Salt Research Institute, Bhavnagor.
20. Regional Research Institute, Jammu.
21. Central Building Research Institute, Roorkee.
22. Central Electronic Engineering Research Institute, Pilani.
23. Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur.
24. Central Leather Research Institute, Madras.
25. Birla Industrial and Technical Museum, Calcutta.

ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে নানা ধরণের গবেষণা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে Jute Research Institute এবং River Research Institute উল্লেখযোগ্য। সারা ভারতের গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় করিবার জন্য ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে National Research Development Corporation প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারিগরী শিক্ষার সমস্যা

সমগ্র ইংরাজ শাসনকালে ভারতে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও শিল্পের বিস্তারের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। প্রায় দুই শত বৎসর ভারত পরাধীন ছিল এবং ভারত যাবতীয় পণ্যের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল ছিল। শাসকগোষ্ঠী চাহিত না যে, ভারত শিল্পে ও কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক। কারণ ইউরোপে যে শিল্পোৎপাদন ঘটিতেছিল তাহার বাজার ছিল এশিয়া ও ও আফ্রিকার দেশসমূহ। এইরূপ অবস্থায় ভারতের মত এত বড় বাজার নষ্ট হইয়া যাইত, যদি ভারতে কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার প্রসার ঘটিত। তাই ইংরেজ সরকার ভারতে শিল্প প্রসার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে পক্ষপাতী ছিলেন না।

সমস্যা

অথচ একই সময়ে জাপান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ কারিগরী শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি লাভ করে। কিন্তু ভারতে প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারত আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলির পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। দেশকে দ্রুত শিল্পে উন্নত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা দৃষ্ট হইল। এইগুলি নিম্নরূপ :—

ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র—ভারত দার্শনিকদের দেশ বলিয়া অনেকে মনে করেন। কথাটি অসত্য নয়। কোন কিছুকে কর্মে রূপায়িত করা, কোন কাজ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা, নূতন আবিষ্কারসমূহ প্রয়োগ করিয়া দেখা ইত্যাদিতে ভারতবাসীর উৎসাহ কম। ভারতীয়েরা জীবনকে লঘুভাবে দেখে এবং উদ্যমহীন ভাবে কোনও রকমে কাজ করে। ইহার প্রভাব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র কারিগরী শিক্ষাকে শিথিল করিয়াছে।

প্রাকৃতিক প্রভাব

ভারতীয় চরিত্রের যে শ্লথ ভাবের কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জন্য অনেকটা দায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশ। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল গ্রীষ্ম

মণ্ডলে অবস্থিত। গ্রীষ্ম মানুষের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমাইয়া দেয়। আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্লান্তি বৃদ্ধি করে। এই প্রাকৃতিক প্রভাব ভারতীয়দের উপর পড়ার ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক প্রভাব

তাহা ছাড়া, ভারতের নদীবহুল বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল কৃষিকাজের উপযুক্ত হওয়ায় বেশীর ভাগ লোকই কৃষির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কৃষির উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে, পক্ষান্তরে শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার প্রতি লোক তত আকৃষ্ট হইতেছে না। ইহাও কারিগরী শিক্ষার বাধা।

সামাজিক কারণ

ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা গ্রামীণ সভ্যতা। অনেকেই গ্রামে বাস করেন। ইহার ফলে ভারতীয় জীবন বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাহারা পূর্বের জীবন-যাপন-প্রণালীতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে, আর নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে কষ্ট স্বীকার করিতে চান না। এই মনোভাব কারিগরী শিক্ষার পরিপন্থী।

সামাজিক কারণ

দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্মুখী জীবন-যাপন করার ফলে জাতির সামগ্রিক চিন্তাধারা সাহিত্য, দর্শন, সুকুমার কলাশিল্প, গীতবিদ্যা ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়াছে। ফলে সমগ্র জাতির রুচি ঐ ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই লোকে ডাক্তারী অপেক্ষা অধ্যাপকের কাজ করিতে চাহিয়াছেন, শিল্পকাজ করা অপেক্ষা শিক্ষকতা-বৃত্তি বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। এইরূপ রুচি গড়িয়া উঠার ফলে সাধারণ লোকে তাহাদের সন্তানদের কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেরণা দিতেছেন না।

জাতিভেদ—জাতিভেদ কারিগরী শিক্ষার প্রসারের আর একটি অন্তরায়। যাহারা এতদিন সমাজে কারিগরী বা বৃত্তিমূলক কাজ করিত, তাহাদের নীচ-জাতীয় লোক বলিয়া গণ্য করা হইত। প্রাচীন যুগের বর্ণবিভাগ এখনও সমাজ-জীবনে চলিয়া আসিতেছিল। ফলে কারিগরী কাজের প্রতি উচ্চবর্ণের লোকের বিরূপতা দেখা যায়। এই বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাধারা বৈপ্লবিক। তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা চর্ম্ম-শিল্পের কাজ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু

জাতিভেদ

বহু কাল ধরিয়া যে জাতিভেদ-প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বাধাস্বরূপ ছিল।

অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ—ভারতীয় পুরুষেরা অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং সংসারে প্রবেশ করে। এত অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ করার ফলে কোন বৃত্তি শিক্ষা করা ও দক্ষতা অর্জন করিয়া তাহা আয়ত্ত করার উপায় আর থাকে না।

অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা—ইহা কারিগরী শিক্ষার অপর একটি বাধা। একান্নবর্তী পরিবারে খাওয়া-পরার অসুবিধা ছিল না। ফলে সংসারের তরুণ পুরুষেরা সংসারচিন্তা করিত না। তাহারা দায়িত্বহীন ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইত। অথবা তাহারা পরিবারের অপরে যে বৃত্তি অনুসরণ করিত তাহাই করিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা ছিল কৃষি। ফলে কারিগরী শিক্ষা ব্যাহত হয়।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা

নিম্নমানের জীবনযাত্রা—ভারতীয়দের নিম্ন-মানের জীবনযাত্রা পরোক্ষভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের বাধাস্বরূপ ছিল।

নিম্নমানের জীবনযাত্রা

ইহা ছাড়াও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেমন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারও উদ্ভব ঘটিয়াছে। সেই সমস্যাগুলি নিম্নরূপ।

দক্ষ শ্রমিক। সমগ্রভাবে চিরকাল ধরিয়া সমাজ-ব্যবস্থা এমনই ভাবে গঠিত যে নিম্ন স্তরের ব্যক্তিরাই সাধারণভাবে দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজে রত থাকেন। এই শ্রেণীর জনসংখ্যাই সমধিক। অথচ কারিগরী কাজ করিতে যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। একেবারে অশিক্ষিত অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় না।

দক্ষ শ্রমিক

কারিগরী-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি—কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন অগ্রাধিকার লাভ করায় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের চাহিদা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। যে অনুপাতে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদা বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে কারিগরী শিক্ষণ-ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায় নাই।

কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি

ভাষার মাধ্যম—যে শ্রেণী হইতে কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য ব্যক্তিরা আসে, সেই শ্রেণীতে লেখাপড়ার প্রসার কম। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় তাহারা কথা বলিয়া থাকে। আবার কারিগরী বিদ্যা শিখাইবার উপযুক্ত বাহন হিসাবে কোনও ভারতীয় ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে কি ভাষায় এই শিক্ষা পরিচালনা করা যায়, তাহাই গুরুতর সমস্যার বিষয়। কারণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে অশিক্ষিত শ্রমিকদের কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাদান অসম্ভব।

ভাষার মাধ্যম

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব—ভারতে কারিগরী শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের অভাব। বিদ্যালয় স্তর, তাহার পরবর্তী স্তর, কারখানা, কারিগরী শিক্ষালয়ের সর্বত্র কারিগরী শিক্ষাদানের আয়োজনের অভাব।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব

শিক্ষকের অভাব—সব চেয়ে বড় অভাব শিক্ষকের। কারিগরী শিক্ষা দিতে খুব কম লোকই অগ্রসর হইয়া থাকেন।

শিক্ষকের অভাব

অর্থাভাব—ভারতীয় সরকারকে উক্ত সমস্ত রকম বাধা অপেক্ষাও বড় বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইল অর্থের অভাব। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহার বিরাট অংশ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য আমদানীতে ব্যয়িত হইতেছিল। ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা সম্ভব হয় নাই।

অর্থাভাব

সরকার অবশ্য সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য খুবই চেষ্টিত হইয়াছেন। সম্প্রতিকালে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার প্রচার ও উন্নতি সম্পর্কিত গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্রুত নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে। ভারত সরকার অতি দ্রুত আরও উন্নতি লাভে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য

পুরাতন যুগে বৌদ্ধিক শিক্ষা বা Liberal Education-কেই প্রধানতঃ "শিক্ষা"র মর্যাদা দেওয়া হইত। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া হইত না। ইহা যে শুধু ইংরাজ আমলের শিক্ষার ত্রুটি তাহাই নহে। হিন্দু ও মুসলমান যুগেও শিক্ষায় এই একদেশদর্শিতা দেখা দিয়াছিল। অবশ্য আর্যযুগের আশ্রম-শিক্ষায় আচরণধর্মিতা ছিল, কিন্তু তথাপি বৃত্তিগুলি নিম্নবর্ণের লোকদের হাতে থাকায় তাহা শিক্ষার গুরুত্ব পায় নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে তখনো বলা হইত, "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"—অর্থাৎ যাহা মনের মুক্তি ঘটায় তাহাই জ্ঞান বা শিক্ষা। ইহার সহিত Liberal Education ধারণার বেশ সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞানের দ্বারাই কি মনের মুক্তি হয়? আমরা অস্বীকার করিলেই কি শরীরের চাহিদার পরিসমাপ্তি ঘটিবে? তাহা কদাচ ঘটেনা, তাই এইরূপ ধারণা ভুল। এই ভুল সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কারণ সমাজে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-শোষণ হইতে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী জন্মলাভ করিয়াছিল যাহারা কায়িক শ্রমের দায়দায়িত্ব অধীনস্থ শ্রেণীর উপর চাপাইয়া নিজেরা নিছক জ্ঞানচর্চার সুযোগ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এই ধারণা জন্মিয়াছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগে। ইউরোপে এই ধারণা জন্মলাভ করিয়াছিল রোমান যুগে। তদপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় এই ভ্রান্তি ততখানি বদ্ধমূল হয় নাই। ইহা আমরা প্লেটোর রিপাবলিক পুস্তকে দেখি, যদিও উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভব তখনও হইয়াছিল এবং প্লেটো আভিজাত্যের এক জন সমর্থক ছিলেন। শিক্ষার এই একদেশদর্শিতারূপ ত্রুটি সত্ত্বেও ইউরোপীয়গণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার প্রেরণায় কর্মকে ততখানি অবহেলা করে নাই যতটা আমরা করিয়াছি। সেই জন্যই আমরা পার্থিব ক্ষেত্রে পদে পদে পরাজয় বরণ করিয়াছি। যাহা হউক বিলম্বে হইলেও সম্প্রতি আমাদের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তথাপি আমরা ইহার পূর্ণ

মনের মুক্তি

তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি নাই। আমরা শিক্ষিত বেকার-সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া প্রথম দিকে ইহার প্রয়োজন বুঝিতে সুরু করিয়াছি। এই ভাবে বৃত্তির প্রয়োজন হইতে বৃত্তি শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে যাহারা উচ্চ শিক্ষায় তাদৃশ সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিবে বলিয়াই সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য মাত্র এবং এই ভাবে বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন বিচার করিলে তাহাকে অত্যন্ত গৌণ করা হইবে।

বৃত্তিশিক্ষা সংযুক্ত

বৃত্তিশিক্ষা সংযুক্ত হইলে তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহার অভাবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ, ইহার দ্বারা মানুষ পরিবেশকে আপন অনুকূলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। যদি কোনও ব্যক্তি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম না হন এবং যদি তিনি সামান্য বৈরী পরিবেশে হতাশ হইয়া পড়েন, তবে তাহাকে শিক্ষিত বলা যায় না। যদি একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তি তাহার বাসগৃহটিকে অপেক্ষাকৃত শ্রী ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত রাখিতে সক্ষম হন ও নিজেদের জীবনে অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োগ ঘটাইতে পারেন, তবেই তাঁহার যথার্থ শিক্ষা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি শিক্ষার সহিত বৃত্তি শিক্ষার কোনও সংযোগ না থাকে, যদি কেবল পুঁথিগত ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সেই শিক্ষার মধ্য হইতে ঐরূপ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে আশা করা যায় কি? অথচ আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষার দৈনন্দিন পরিচয় তো আমরা জীবন-যাপনের পদ্ধতি হইতে সংগ্রহ করি।

শিক্ষাকে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ-সাধক রূপে বর্তমান যুগে খুব কম ব্যক্তিই দেখেন। বর্তমান জীবনে নিজেকে ও অন্যান্যকে সুখী ও সার্থক করা যাইবে, এই অনুপ্রেরণা হইতেই আমরা আজ শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্যকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলরূপে গণ্য করি না। আমরা প্রত্যাশা করি যে, শিক্ষা লাভ করিলে অধিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী কর্মে নিযুক্ত হইব। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা ঐরূপ উচ্চ সুযোগ-সুবিধাযুক্ত কর্ম-নিযুক্তির সুযোগ কখনো অসীম হইত পারে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবে ইহাই প্রত্যাশিত। সুতরাং যাহারাই

শিক্ষালাভ করিবে তাহারাই অধিক আর্থিক কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইবে, ইহা আশা করা ঠিক নহে। যদি জীবনকে সমৃদ্ধ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে ঐরূপ সুযোগের অপেক্ষা না করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি যেন আপনার উন্নত রুচি প্রবৃত্তি অনুযায়ী সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনে নিজেরাই নিজেদের শ্রম নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার শিক্ষা অবশ্যই তাহাকে দিতে হইবে—নতুবা শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইবে না এবং এই জন্য বৃত্তি শিক্ষাকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে।

সমস্যা সমাধান করিবার ক্ষমতা

শিক্ষাদ্বারা আমরা সমস্যা সমাধান করিবার ক্ষমতা অর্জন করি। কোনও বিরূপ পরিবেশ ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে যে ব্যক্তি তাহার মধ্য হইতে পথ বাহির করিতে পারেন তাহাকেই আমরা প্রকৃত শিক্ষিত বলিব। এইরূপ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কদাচ আয়ত্ত সাধ্য নহে। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকালে আমাদিগকে ঐরূপ ছোট বড় নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় ও লব্ধজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া তাহার সমাধান বাহির করিতে হয়। তবে যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় জীবনের অস্তিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষমতা প্রদান, তাহা হইলে ইহাকে বৃত্তি শিক্ষার সহিত অবশ্যই যুক্ত করিতে হইবে।

শিক্ষা জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে, ইহাই শিক্ষার একটি সর্বজন-স্বীকৃত গুণ। কিন্তু এই গুণ নিছক পুঁথিগত বিদ্যা হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইয়াই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। এত দিন শিক্ষাকে যে ভাবে পুঁথিসর্বস্ব করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে বাস্তব জীবনের কোনও স্পর্শই শিক্ষা জীবনে পড়িত নয়। ফ্রেমে আটা ল্যাণ্ডস্কেপ যেমন প্রকৃতির জীবনময় স্পর্শ বহন করে না, তেমনি পুঁথিগত জ্ঞান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে না। তাই পুঁথি-সর্বস্ব শিক্ষার ফলে অনেক শিক্ষার্থীই বাস্তব জীবনে আসিয়া একান্ত অসহায় বোধ করিত, তাহার শিক্ষা জীবনের চলার পথে কোন সহায়তাই প্রদান করিত না। শিক্ষার এই জীবন-বিমুখতা দূর করিতে হইলে বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে।

পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার একটি অন্যতম ত্রুটি, ইহা শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা নষ্ট করিয়া দেয়। মেধাবী ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র—তাহারা হয়তো যে কোনও

শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতেই রস আহরণ করিয়া আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে সক্ষম। কিন্তু সাধারণ মেধার শিক্ষার্থী নিজেরা কিছু চিন্তা ও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বে অনেক বড় বড় ব্যক্তির চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়। ঐগুলি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাচাই করার সুযোগ পায় না বলিয়া তাহারা উহাদের চিন্তা উহাদের অভিজ্ঞতাকেই গলাধঃকরণ করে—জ্ঞান যে উপলব্ধির দ্বারাই গৃহীত এবং উপলব্ধির জন্য যে নিজের সক্রিয় অভিজ্ঞতা ও চিন্তনের প্রয়োজন তাহা যেন বর্তমান পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতেই লোপ পাইতেছে। তাই চিন্তা-ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা উঠিয়া যাইতেছে। আমরা শিক্ষিতরা ফ্যাসন-মাফিক চিন্তা করি ও মত প্রকাশ করি। চিন্তা করি বলিলে ভুল হইবে—চিন্তার ভান করি ও পুঁথি হইতে যে জ্ঞানের কথাগুলি মুখস্থ করিয়াছি তাহা বলিয়া চিন্তাশীলতা জাহির করি। খবরের কাগজ হইতে সমসাময়িক ঘটনার উপর মতামত গঠন করি—উহাদের মধ্যে যে কত পরস্পর-বিরোধিতা ও ভ্রান্তি আছে তাহা তলাইয়া বুঝিবার শ্রমটুকুও স্বীকার করি না। কারণ আমরা চিন্তার ভার পুঁথিকে দিয়াছি—জীবনের অভিজ্ঞতাও পুঁথি হইতেই সংগ্রহ করিতে শিখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ শিক্ষার সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত হইলে তবেই মহৎ ব্যক্তির চিন্তা নিজের করিয়া লওয়া যায়, যেমন হজম ক্রিয়া দ্বারাই ভুক্তদ্রব্য দেহ-উপাদানে পরিণত হয়। আর সেই অভিজ্ঞতা আসে কাজ-কর্মের মধ্য দিয়া—বৃত্তিশিক্ষা তাহার সুযোগ করিয়া দেয়। তাই এমন কি মানসিক শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা শিক্ষা কেবলমাত্র তোতাপাখী সৃষ্টি করিবে—প্রকৃত চিন্তাশীলতা, প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটাইবে এবং "প্রচার পত্রের যুগ" আরো তীব্র আকার ধারণ করিবে।

সক্রিয় অভিজ্ঞতা

শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, ইহা মানুষকে আত্মমূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে। প্রাচীন ভারতে বলা হইত, আত্মানং বিদ্ধি Know thyself. বাস্তবিক নিজ মূল্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা মানুষের পক্ষে একটি মহৎ জ্ঞান। যাহারা হীনমন্য, নিজেকে অক্ষম অসহায় মনে করে, তাহারা নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না, নিজের ও অপরের জীবনে নানা দুঃখ ডাকিয়া আনে। ইহার বিপরীতধর্মী

আত্মমূল্য নির্ধারণ

পণ্ডিতম্মন্যগণ নিজ শিক্ষাকে অত্যন্ত বেশী বড় ভাবিয়া সমান বিপদ ডাকিয়া আনেন। তাঁহারা সমাজের কাছ হইতে সর্বদা উচ্চমূল্য চাহেন ও তাহা পান না বলিয়া বিনা কারণে সমাজের উপর বিরূপ হইয়া নিজ ও সমাজ জীবনে অশান্তি ডাকিয়া আনেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা যে কার্য-সাধনে সক্ষম নহেন এমন কাজ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে বিফলতার সম্মুখীন হন। তাঁহাদের এই বিফলতা যে তাঁহাদের নিজ অক্ষমতা-জনিত ত্রুটি ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, উহার দোষ অন্যের উপর চাপাইয়া দেন ও এইভাবে নূতন অশান্তি সৃষ্টি করেন। অনেকের এই উভয় ত্রুটি—হীনমন্যতা ও শ্রেষ্ঠমন্যতা একই সঙ্গে থাকে এবং তাঁহারা শ্রেষ্ঠমন্যতা বজায় রাখিবার জন্য সব কাজকেই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের তুলনায় নগণ্য এই ভাব দেখাইয়া অপরের সমালোচনা দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা বজায় রাখিতে প্রয়াসী হ'ন। এইরূপ বিকৃত ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অসংখ্য দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষার সংযোগহীনতা। বৃত্তিশিক্ষা শিক্ষার্থীকে সম্পাদ্য কর্মের সম্মুখীন করে ও তাহার ফলে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গমের পূর্ণ সুযোগ পায়। ইহাতে সে নিজের যথার্থ মূল্যায়ন করিতে পারে এবং কোন কোন বিষয়ে সে শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্যরা যে অন্য বিষয়ে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিয়া অহেতুক অহমিকা পরিহার করিতে শিখে। এই ভাবে নিজ মূল্য জানিয়া তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশেও সে যথাযথ যত্ন লইবার প্রেরণা পায়। পরিশেষে সে সেই পথটি সেই কাজটি খুঁজিয়া লইতে সক্ষম হয় যাহা দ্বারা সে নিজ জীবনকে সার্থক করিতে পারিবে। এই জন্য শিক্ষার সহিত বৃত্তি শিক্ষার সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

উপরের যুক্তিগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষার সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষার্থীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ দেওয়া নহে, ইহা শিক্ষার অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলির পূর্তি ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য ইহা মনে করিবার কারণ নাই যে, শিক্ষার্থীর বৃত্তি নির্বাচন ও বৃত্তিগত বুৎপত্তি প্রদান শিক্ষার একটি উপেক্ষাযোগ্য উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রে সকলেই শিক্ষার সুযোগ পাইবে এবং জীবনের জন্য সকলেই কোন না কোন বৃত্তি অনুসরণ করিবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে পরশ্রমজীবীর স্থান থাকিতে পারে না। সুতরাং বৃত্তিশিক্ষাও ইহার নিজের সার্থকতাতেই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী রাখে। তথাপি

ইহা যে মাত্র ঐ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে না, শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যকেও পূর্ণতা দান করে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। বর্তমান পুঁথি-সর্বস্ব শিক্ষা শিক্ষার কোনও উদ্দেশ্যই পূর্ণ করিতেছে না, কারণ ইহা শিক্ষার্থীকে কোনও জীবন-অভিজ্ঞতা প্রদান করে না, কোনও চিন্তার প্রেরণা দেয় না, শুধু অপরের চিন্তা, অপরের অভিজ্ঞতা গলাধঃকরণ করিতে শিখায়, যাহা প্রকৃত শিক্ষাই নহে। তাই এই একপেশে শিক্ষায় মুষ্টিমেয় প্রকৃত মেধাবী ব্যক্তিও শিক্ষার প্রকৃত আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য-সূচক মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেক শিক্ষাবিদ বলেন যে, বৃত্তিশিক্ষা সাধারণ শিক্ষারই একটি অঙ্গ, যেমন অঙ্ক ও ইতিহাস সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু আর এক দল শিক্ষাবিদ আছেন, যাঁহারা বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার এইরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, বৃত্তিশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষার দুইটি শাখা, এবং একটির সাথে অপরটির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মূলতত্ত্ব

বৃত্তিশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মূলতত্ত্বের কথা এই স্থানে জানা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা হইতেছে তাহা যাহা সার্থক জীবন-যাপনের জন্য দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জনের সহায়ক। ইহার সঙ্গে বৃত্তি-বিশেষ আয়ত্ত করার কোন প্রশ্ন আসে না। এই ধরণের শিক্ষাকে উদার শিক্ষা, সংস্কৃতি শিক্ষা, বৃত্তিহীন শিক্ষা ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। আবার বৃত্তিশিক্ষা বলিতে সেই শিক্ষাই বুঝিতে পারা যায় যেখানে শিক্ষার্থী বৃত্তির ক্ষেত্রে উপযোগিতা লাভ করিয়াছে।

ভিন্ন মতবাদ

শিক্ষা-দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ রহিয়াছে। ঐ সমস্ত মতবাদের বিভিন্নতার জন্যই এইরূপ দ্বন্দ্ব দেখা যায়। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, সাধারণ মৌলিক শিক্ষার মধ্যেই বৃত্তিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে সব সামান্য কৃষি-সম্পর্কিত কথা, গৃহ-বিজ্ঞান, শিল্পের কথা, বাণিজ্যের কথা রহিয়াছে তাহাই যথেষ্ট এবং এইখানে আলাদা করিয়া বৃত্তিশিক্ষার আর

৩৮

কোন দরকার নাই। পক্ষান্তরে বৃত্তিশিক্ষার পক্ষাবলম্বীরা বলেন, সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নয়। অতএব তাঁহারা মনে করেন যে, কোনও বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, সেই বৃত্তির জন্য ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন।

কিন্তু দ্বন্দ্ব যাহাই থাকুক না কেন, একটু নির্লিপ্তভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, দুই শিক্ষারই প্রয়োজন আছে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশ্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বৃত্তিশিক্ষার কার্যসূচীতে সাধারণ শিক্ষা হইতে কিছুটা গ্রহণ করা যেমন কর্তব্য, সেইরূপ সাধারণ শিক্ষার পাঠ্য-সূচীতে বৃত্তিশিক্ষার কিছু আকর্ষণীয় অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উভয় শিক্ষা-ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতেই হইবে, তাহা হইলেই সামগ্রিক শিক্ষা সুন্দর ও সফল হইবে।

উভয়ের সংমিশ্রণ

অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করিয়া থাকেন যে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর বৃত্তিশিক্ষা হইতেছে অর্জন করিবার উপযোগিতা সম্পর্কিত। শিক্ষার্থী যদি উপার্জনের ক্ষেত্রে সর্বদাই মনোযোগী হয়, তাহা হইলে তাহার সংস্কৃতিগত মনোবৃত্তি ধ্বংস পাইয়া যাইবে। তাঁহাদের মতে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা উভয়ে উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু যাঁহারা বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ইহাকে আশ্রয় করিয়া ও সঙ্কীর্ণ মতবাদকে গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃতি অর্থ অতীতের ঐতিহ্য। কিন্তু একথা বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃতি শুধু অতীতের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে না। সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করিয়া সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনই সংস্কৃতি। যিনি সুষ্ঠু ভাবে জীবনযাপন করিতে সক্ষম, তিনিই সমস্ত কাজের মধ্যে সত্য এবং সুন্দরকে বুঝিতে পারেন। অতএব বৃত্তি শিক্ষার মধ্যেও সংস্কৃতি অধোগামী হইবার আশঙ্কা কিছু মাত্র নাই।

শিক্ষার্থীর কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রসম্মত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ সেই শিক্ষার্থী অপর কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় না। শিক্ষার্থীরা যদি সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া আপন চেষ্টায় কোন বৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহা গণতন্ত্র-সম্মত হয়। এই নীতি অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ বৃত্তি-শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দিতে

গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা

হইবে না, সাধারণভাবে বৃত্তিসমূহের সাথে সাধারণ শিক্ষা মারফত পরিচয়ই যথেষ্ট।

অনেকে এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, সমাজে সকল কর্মী সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে এবং তাহাই গণতন্ত্রসম্মত এবং সেই কারণে সাধারণ শিক্ষা সকল প্রকার বৃত্তিশিক্ষার দাবী মিটাইতে পারে না। এই কারণে পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন। এই কারণেই বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ

অনেকে বৃত্তিশিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে বলিয়াছেন, কারণ ছোট বয়সে বৃত্তি অনুসরণ করিবার মত শক্তি থাকে না। কিন্তু এই মতবাদকে সমর্থন করা চলে না, কারণ ছাত্রের স্বাভাবিক আগ্রহ পূর্বেই জাগ্রত হইতে পারে, তখন তাহাকে আগ্রহ-অনুযায়ী শিক্ষা না দিয়া সাধারণ শিক্ষার চাপে রাখা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

বৃত্তিশিক্ষা ও বেকার-সমস্যার সমাধান

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি অপরিকল্পিত স্বাধীনতা থাকে, তবে দেশে বেকার-সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্বাধীন অর্থনীতির ফলে পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হয় এবং অর্থনৈতিক বণ্টনের সমতা রক্ষা হয় না। বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্রতা বিস্তার লাভ করিয়া থাকে।

যাঁহারা অর্থনীতিবিদ তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, যখন পণ্যদ্রব্যের চাহিদার অভাব দেখা যায় তখন আয় হয় কম, তখন পুজিপতিরা লোকজন কর্মে নিযুক্ত করে না এবং বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহার প্রতিরোধ করিতে হইলে সরকারের উচিত পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্য দিয়া জাতীয় ব্যয়ের বৃদ্ধি সাধন করা। যদি জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদনের জন্য চাপ পড়িয়াছে এবং কর্মের সংস্থানও হইতেছে। ফলে বেকার-সমস্যা সমাধান হইতেছে। তাহা ছাড়া সরকার যদি নানা ভাবে কর্মের সংস্থান করেন, (যথা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, সেচ গ্রহণ ইত্যাদি) তাহা হইলে বহু লোক সেই কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, বেকার-সমস্যার সমাধানও হইতে পারে।

পণ্যদ্রব্যের চাহিদার অভাবের ফলে বেকার-সমস্যা

যখন কর্মসংস্থানের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, তখনই কি বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে? না, তাহা নয়। পুঁজিপতিরা কর্মব্যবস্থা করিতে উৎসুক বটে, কিন্তু অদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন তাঁহাদের কাজে নাই। তাঁহারা নিঃসন্দেহে বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চাহিবেন। এই অবস্থায় বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকেরাও বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার দিকে ঝুকিয়া পড়িবে। কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে করিতে হইবে।

বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন

কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার বহুল পরিমাণে ব্যবস্থা হইলেও বহু দক্ষ কর্মী শিক্ষণান্তে বাহির হইবে। কিন্তু তাহারা যদি উপযুক্ত কর্ম না পায়, তাহা হইলে বৃত্তি বা কারিগরী শিক্ষাকে তাহারা অনর্থক বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং তাহাদের মধ্যে নিরাশার সঞ্চার হইবে। ফলে বৃত্তিশিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমিয়া যাইবে।

বৃত্তিশিক্ষার প্রতি বিরাগের হেতু

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে লোকের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাহারা বৃত্তিশিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহাদিগকে পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি-ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সরকার এই বিষয়ে পূর্বেই পরিকল্পনা করিবেন এবং সমস্ত ব্যবস্থার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যে বৃত্তি-ক্ষেত্রে চাহিদা কম, সেই বৃত্তিশিক্ষাই যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে বেকার-সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে সরকারের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন্ ক্ষেত্রে চাহিদা বেশি। সেই ক্ষেত্রের জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিকল্পিত বৃত্তিশিক্ষা

বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও একটি অসুবিধার কথা এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে বৃত্তিতে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা বেশী, সেই বৃত্তিশিক্ষা করিতে অভিভাবকগণ ছাত্রদিগের উপর বেশী চাপ দেন। ফলে শিক্ষণ-প্রাপ্ত বৃত্তি-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম সংস্থানের চাহিদার তুলনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বেশী থাকে এবং বেকার-সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণে জাতীয়

চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা

স্বার্থে যে সব বৃত্তির ক্ষেত্রে যেরূপ চাহিদা, সেই অনুযায়ীই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের প্রয়োজন।

বৃত্তি শিক্ষণ প্রাপ্তির পর যাহাতে যুবকেরা কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করা দরকার। বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

Guidance Bureau-র সহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ

প্রতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া Guidance bureau বা পথনির্দেশক কেন্দ্র থাকিবে। এই পথ-নির্দেশক কেন্দ্র বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, কারিগরী প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের চাহিদা কিরূপ তাহা জানিয়া লইবেন। তাহার পর শিক্ষার্থীদের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃত্তিশিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য যথাসম্ভব বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন বৃত্তি-ক্ষেত্রের সম্ভাবনা একেবারেই নাই বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি-সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া লাভ কি? তাহার বদলে সংশ্লিষ্ট অন্য বৃত্তি, যাহার চাহিদা আছে, তাহা শিক্ষালাভ করিলে ক্ষতিই বা কি।

বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষকগণের কাজ

বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষকগণ অনেকেই বৃত্তিক্ষেত্রসমূহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত আছেন। বৃত্তি শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে যাহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারে, সেই ভাবে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদিগকে তৈয়ারী করিয়া দিবেন, তাহা হইলে আর কোন পক্ষে অপচয় হইবে না।

Employment Exchange-এর কাজ

দেশে অনেক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বা কর্মসংস্থান-কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলি যেমন বৃত্তি-শিক্ষার্থীদের কর্ম-সংস্থান করিয়া দিবে, সেইরূপ বৃত্তিক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা সেই ভাবে প্রস্তুত হইলে কোন পক্ষ হইতেই আর অপচয় ঘটিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি-নীতি ও কৃষি-শিক্ষা*

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকাজের জন্য সর্বত্রই তৎপরতা দেখা যায়, কিন্তু জাতীয় কৃষি-নীতি কি তাহা ভাল ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। কৃষি-শিক্ষা ভাল ভাবে সংগঠিত হইলেই তাহার মধ্যে কৃষি-নীতির প্রতিফলন দেখা যাইবে।

বর্তমানে যে কৃষি-পদ্ধতি ও নীতি অনুসৃত হইতেছে, ইহা কোনও নিজস্ব দেশের বিষয় নয়। বহু দেশের অবদান হইতে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা এবং বিভিন্ন দেশের কৃষিকাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়া ভারতের কৃষিনীতি কি হইবে তাহার পরিকল্পনা কর্তব্য।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ডের কথাই প্রথম ধরা যাক। ইংলণ্ডে প্রথমে গবাদি পশু নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত (যেমন ভারতে গবাদি পশু ঘুরিয়া বেড়ায়) এবং গবাদি পশুর সন্তানপ্রসব নিয়ন্ত্রিত ছিল না। যখন ঐখানকার গোচারণ-ভূমিকে ঘেরাও করা হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন হইতেই আর গবাদি পশুসকল স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত না। ফলে গবাদি পশুর সন্তানপ্রসবও নিয়ন্ত্রিত হইল এবং গবাদি পশুর মোটামুটি ওজন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

Rothamsted পরীক্ষণ-কেন্দ্র প্রথমে শস্য ও মৃত্তিকা সম্বন্ধে নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সেই অনুসারে কাজ হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে কৃষির উন্নতিও হয়। ইংলণ্ডের কাছে আমরা সার প্রয়োগের ব্যাপারে ঋণী।

জার্মানী

জার্মানীই প্রথম কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় সাধন করে। শর্করাশিল্প এবং কৃষিকাজ উভয়ের প্রচেষ্টায় বিট-চিনির অংশ বৃদ্ধি পায় এবং আলুর ক্ষেত্রেও শ্বেতসারের বৃদ্ধি দেখা যায়। ভারত পাটশিল্প-কার্যে জার্মানী হইতে কৃষি-নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে।

* এই পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবদান খুব বেশী। বিরাট পর্যায়ে যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা প্রথমে আমেরিকাতেই হয়। তাহা ছাড়া একটি বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী কৃষিকাজের নিয়ম প্রথমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রবর্তিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা ফার্ম কাহারও জমিতে বা ফার্মে চাষ করিবার জন্য বর্তমানে প্রচলিত কৃষি-যন্ত্রসমূহের ব্যবহার বিনা পয়সায় করিতে পারে। তাহা ছাড়া আমেরিকার ফলাদি উৎপাদনের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে চাষের কাজ হইয়া থাকে। ভারত আমেরিকা হইতে অনেক কৃষিনীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কৃষি সম্বন্ধে ডেনমার্কের অবদান খুব বেশী। অন্যান্য দেশে কৃষকেরা সরকারের সংগঠন-কার্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু ডেনমার্কের কৃষকেরা নিজেরাই সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ডেনমার্কের লোকসংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ এবং ভারতের লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি। কিন্তু ডেনমার্কে কৃষি-কলেজের সংখ্যা খুবই বেশী। সরকার এই কলেজগুলিকে সাহায্য দান করেন বটে, কিন্তু ঐগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। ডেনমার্কে কৃষকেরা সমবায়-পদ্ধতিতে সমস্ত কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কৃষি-ব্যবস্থাতে ডেনমার্কের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল কৃষকদের জনতা কলেজের মাধ্যমে কৃষ্টিমূলক সমৃদ্ধি সাধন। এই সমস্ত নীতি গ্রহণ করার ফলে ডেনমার্কের মত দরিদ্র দেশ অজ্ঞতার অন্ধকার ও দারিদ্র্যের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। বর্তমানে ডেনমার্ক যে কোন ইউরোপীয় দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পর্যায়ে এক হইবার দাবী করিতে পারে।

ডেনমার্ক

রাশিয়া

রাশিয়াতে সমবেত কৃষি-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ভারত সেই নীতি অনুসরণ করিয়া কিছুটা অকর্ষিত ভূমিতে সমবেত চাষের ব্যবস্থা করিয়াছে।

মেক্সিকো ও প্যালেষ্টাইন

মেক্সিকো ও প্যালেষ্টাইন রাশিয়ার মতই সমবেত কৃষির ব্যবস্থা করিয়াছে।

জাপান

জাপানের অবদান কৃষি-উৎপাদনে কম নয়। জাপান ক্ষুদ্র দেশ, অথচ লোকসংখ্যা বেশী। কৃষকসম্প্রদায় তাহাদের অতিরিক্ত সময়ে ছোট ছোট শিল্পকাজের মধ্য দিয়া নিজেদের অবস্থার

উন্নতি সাধন করিয়াছে। তাহা ছাড়া সমুদ্রের মাছ ধরিয়াও তাহারা জাতীয় খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ডের কৃষিকার্যে অবদান বৈশিষ্ট্যমূলক।

কৃষি-নেতা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যকতা

ভারতে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এই সমস্ত লোক কৃষিসম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে এরূপ অভিজ্ঞ হইবেন যাহাতে ভারতের কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

কৃষি-নেতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য কৃষিশিক্ষার বিষয় পরিকল্পনা করিতে হইবে। গ্রামীণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামীণ মহাবিদ্যালয় ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ কৃষি-বিশেষজ্ঞ হইয়া কৃষি-সম্পর্কীয় নেতা হইতে পারিবেন।

কৃষি-নেতা

কৃষি-সম্পর্কীয় উন্নতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। কিছুকাল পূর্বে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালে Sir John Meghaw নামে এক জন চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খাদ্যের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখেন। তাঁহাকে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ৬০০ জন ডাক্তার সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষের শতকরা ৪০ ভাগ লোক উপযুক্ত খাদ্য পায়, শতকরা ৪০ ভাগ লোক খুব কম খাদ্য পায় এবং শতকরা ২০ভাগ লোক খাদ্য প্রায় পায়ই না।

ভারতের পক্ষে তাহার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জন্য খাদ্যসমস্যার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন। খাদ্য অবস্থার উন্নতি যদি ভারতে না হয় তাহা হইলে বহু লোক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্তমান সময়ে ভারতের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা

কৃষি-শিক্ষার প্রতি এখন সরকারী ও বেসরকারী দৃষ্টি পড়িয়াছে। খাদ্য সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে, ভারত পূর্বের ন্যায় তিমিরান্ধকারেই থাকিয়া যাইবে। এই জন্যই সরকার ইহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়াছেন।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় ভারতের কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৩টি এবং কৃষি-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০০টি। কৃষি-মহাবিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয়ে ঐ সময়ে প্রায় ২১ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা মোটেই উপযুক্ত নয়। তাহা ছাড়া একটি বিষয় এইখানে বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। কৃষি সম্বন্ধে যাহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাহার শতকরা মাত্র ২।৩ জন লোক কৃষিবিষয়ে যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগ করেন। বাকীরা অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইংলণ্ডের এক জন অভিজ্ঞ কৃষি-বিশেষজ্ঞ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, ভারতের কৃষিতে যে সব লোক নিযুক্ত আছেন, তাহারা কেহই বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বিদ্যায় অভিজ্ঞ নয়। ভারতীয় কৃষকেরা যদি কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে এবং কৃষি বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সম্বন্ধে জানিয়া উহার প্রয়োগ করিবার সুবিধা পায়, তাহা হইলেই কৃষকেরা কৃষিকার্যে আরও বেশী আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। কৃষকদিগকে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এই বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সেণ্ট্রাল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব ফ্রুট টেকনোলজি প্রভৃতি কৃষি-সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ভারতীয় কৃষিকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (যথা—বেনারস, বোম্বাই, নাগপুর, আগ্রা, মাদ্রাজ প্রভৃতিতে) কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চতর স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যথা—ইণ্ডিয়ান ভেটেরেনারি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, পুনার এগ্রিকালচারাল মেটিআরোলজিক্যাল কেন্দ্র) কৃষি-সম্পর্কিত উচ্চ গবেষণার কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গরু-পালন, মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা গ্রাজুয়েটদের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আমাদের বিরাট দেশ, লোকসংখ্যা খুব বেশী। বিরাট দেশের বহু-লোকের মুখে অন্ন দিতে হইলে আমাদের দেশের কৃষির সবিশেষ উন্নতি

সাধন করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষি-শিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার সুপারিশ

রাধাকৃষ্ণান কমিশন কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। যেহেতু দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষিজীবী, তাই কমিশনের মতে শিক্ষার মাধ্যমে কৃষি-বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ও উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজন — বিশেষতঃ, যখন এই কৃষিজীবী জনগণ অত্যন্ত কর-ভারাক্রান্ত এবং যখন ইহারা জাতীয় আয় হইতে সামান্যই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। বর্তমানে কৃষি-ব্যবস্থা অবনতিগ্রস্ত, জাতীয় খাদ্য ও পরিধেয় জোগাইতে এই কৃষি-ব্যবস্থা সক্ষম নহে। তাই ইহার উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজন ও শিক্ষা দ্বারাই ইহা সম্ভব। বর্তমানে দেশের কৃষি-সংক্রান্ত দর্শন ও নীতি সুগঠিত না হওয়ায় ইহার অগ্রগতি ঘটিতেছে না। শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যেন উহা গড়িয়া উঠে। এই জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ করিয়াছেন।—

(১) কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাকে একটি জাতীয় সমস্যা রূপে দেখিতে হইবে।

(২) যেহেতু কোনও গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় কৃষিনীতি উহাতে অংশ গ্রহণকারী জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই গঠিত হইতে পারে, সেই জন্য জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা-স্তরে কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৩) এই জন্য যত দূর সম্ভব কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা, কৃষি-সংক্রান্ত নীতি ও কৃষিবিষয়ক গবেষণার ভার এমন ব্যক্তিদের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়, যাঁহাদের কৃষি-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

(৪) কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষা যতদূর সম্ভব গ্রাম্য পরিবেশে দিতে হইবে যেন শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থা দেখিতে পায়।

(৫) বর্তমান কৃষিবিষয়ক কলেজগুলির ব্যবস্থাদি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিকাশ সাধন ও তাহার সহিত সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধন এবং কৃষি-ঋণদান সমিতি কৃষি-সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

(৬) যদি নূতন কৃষি-কলেজসমূহ যেখানে সম্ভব গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত অন্যান্য দিকের জ্ঞানের সংযোগ সাধিত হইবে ও ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) দেশের নানা স্থানে পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়া তাহাতে অভিজ্ঞ কৃষি-বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরের সকল বিদ্যালয়ের সহিত এইরূপ পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র সংযুক্ত থাকিবে। ইহা জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হইবে।

(৮) কৃষি-সংক্রান্ত পরীক্ষাগার ও গবেষণাগারগুলির উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরবর্তী স্তরে কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণার বিকাশ ঘটাইতে হইবে।

(১০) কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা বিভাগের কৃষি-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা প্রচার ও গবেষণা-লব্ধ ফল প্রচার করিতে হইবে। রেডিও মারফৎ প্রচার প্রভৃতি ব্যাপারে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে।

(১১) উক্ত সংস্থার অধীনে ভারতের কৃষি-সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা একটি গবেষণা বিভাগ খোলা প্রয়োজন—ইহারা ভারতীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করিবেন।

(১২) ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট কমিশনে যে ইঞ্জিনীয়ারিং ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার প্যানেল রচিত হইয়াছে, তাহাতে কৃষি শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার তালিকা সংযুক্ত হওয়া ও উপযুক্ত সাহায্যাদির ব্যবস্থা প্রয়োজন।

(১৩) উক্ত ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নতির জন্য এবং বিশেষ গ্রাণ্ট দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবহার্য উপকরণের উপর ট্যাক্স ধার্যের কথা বিবেচনা করিবেন।

(১৪) মৎস্য চাষ কৃষির মতই খাদ্য ও সার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহার জন্যও শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা

পূর্ব ইতিহাস। ভারতবর্ষে প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য বিষয় শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। ইহাই পরে Government Commercial College এ রূপান্তরিত হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর ছাত্রগণ এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিত, এবং অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যেমন দিনমানে পড়িত, এইখানেও তাহারা সেই ভাবে পড়িত। ছাত্রগণকে ইংরেজী, বাণিজ্যিক চিঠি পত্রাদি লেখা, চিঠি খসড়া করা, বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার করা, অঙ্ক, মানসাঙ্ক, মাতৃভাষা, Shorthand, Typewriting, Book-Keeping ইত্যাদি শিখিতে হইত। সন্ধ্যায়ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময়ে Banking, Accountancy and Book-Keeping, Mercantile Law and Insurance, Shorthand and Typewriting পড়ান হইত।

ধীরে ধীরে অন্যত্রও বাণিজ্যিক কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বোম্বাইয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Sydenham College of Commerce and Economics স্থাপিত হয়। পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনেই বাণিজ্যিক কলেজ স্থাপিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশেই যে সমস্ত ছাত্রগণ বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করিতে ইচ্ছুক হইত, তাহারা ইন্টারমিডিয়েট কোর্স হইতেই বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পাঠ করিত। ইন্টারমিডিয়েট স্তরে Elementary Banking and Accountancy, Short-hand, Typewriting, ইত্যাদি পড়িয়া ছাত্রগণ ডিগ্রী ক্লাশের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। ডিগ্রী ক্লাশে ছাত্রদের ঐসব বিষয়ের উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া ইংরাজী এবং অর্থনীতি পড়িতে হইত। তাহা ছাড়া Business Organisation, Secretarial

পূর্বেকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক কলেজ ও কোর্স

Practice, Commercial Geography, Commercial Statistics and Mercantile Law ইত্যাদিও পড়িতে হইত। কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Acturial Science এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পসংগঠন সম্বন্ধেও পড়িতে হইত। অন্ধ্র এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের অনার্স কোর্সেরও ব্যবস্থা ছিল। বোম্বাই, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে M. Com. ডিগ্রীর জন্যও ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতে পারিত।

বাণিজ্যিক কোর্স শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। বাণিজ্যক কোর্স কি কারণে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয় কি Accountancy কিংবা Banking কিংবা Insurance সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষণ প্রদান করেন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক সংগঠনের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থানে চাকুরী করিবার জন্য উপযুক্ত করিয়া দেন? শেষোক্ত উদ্দেশ্যই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ বিষয়ে বাণিজ্য-বিষয়ে ডিগ্রীধারীরা যাঁহারা অর্থনীতি লইয়া বি. এ. ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন তাহাদের চেয়ে উচ্চশক্তি সম্পন্ন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রী লইয়া পরে ছাত্রগণ অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন এবং বাণিজ্য প্রশাসন সম্বন্ধে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। আবার কেহ কেহ বাণিজ্যিক ডিগ্রীলাভ করিয়া আইন পড়েন এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের মোকদ্দমা আইন চালাইতে অধিকতর দক্ষ বলিয়াও দাবী করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, এম. কম. পাশ করিয়া ছাত্রগণ শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য আগ্রহান্বিত হন কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে কাজ করিতে যান। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন, তাঁহারা বি. কম. কিংবা এম. কম. পাশ ছাত্রদিগকে পছন্দ করেন না। তাঁহারা কারণস্বরূপে বলেন যে বাণিজ্যিক ডিগ্রীধারী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য সম্বন্ধে শুধু তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নাই এবং সাধারণ বি. এ. পাশদের যেরূপে ব্যবহারিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা দিতে হয়

বাণিজ্যিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

বাণিজ্যিক বিষয়ে ডিগ্রাধারীদের স্বরূপ

বাণিজ্য বিষয়ের ডিগ্রীধারীদের অসুবিধা

বাণিজ্যিক ডিগ্রীধারী ছাত্রগণকেও সেইরূপ শিক্ষাদান করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণ বি. এ. পাশদের শিক্ষা দান করা সহজ, কারণ তাঁহাদের বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোন ধারণা না থাকার দরুণ তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লওয়া যায়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি করণীয় তাহাই চিন্তার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান করিবার সময় কোনও রূপ ব্যবহারিক শিক্ষাদান করিবার সুযোগ পান না। প্রথমতঃ ছাত্রদিগকে দিনমানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি সকালে ও সন্ধ্যায় সুযোগ করিয়া বাণিজ্যিকতত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাহা হইলেও তাঁহারা ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য দুপুরে কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিবেন না, কারণ কোনও বাণিজ্যিক সংস্থাই ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে রাজী হইবে না।

এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে যে, ছাত্রগণ বাণিজ্যিক ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া, কোনও বাণিজ্যসংস্থায় যাইয়া সেইখানে শিক্ষানবীশ হইবেন। সেইখানে তাহারা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এই এপ্রেন্টিস থাকাকালীন ছাত্র ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঐ সংস্থাকে টাকা দিবেন, যেমন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে শিক্ষা দান করেন, তাহা সম্পূর্ণই তত্ত্ববিষয়ক এবং তাহাদ্বারা ছাত্রগণ শুধু ব্যবসা-সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা লাভ করিতে পারে মাত্র।

শিক্ষানবীশ

কিন্তু ডিগ্রী লাভের পর এই শিক্ষানবীশী ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি না। এই কারণে ডিগ্রী কোর্সে থাকাকালীনই ছাত্রগণ যাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন যাহাতে ছাত্রগণ শিক্ষা গ্রহণ কালেই তিনটি বা চারটি বাণিজ্যিক সংস্থায় যাইয়া কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীর কাজ সেই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যদি বাণিজ্যিক বিভাগের ছাত্রদের আমরা ভালভাবে সমৃদ্ধ করিতে চাই, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির গভীর যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে।

ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ

বাণিজ্যিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে কাজ করিবার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও উৎসাহ দান করেন না। যাঁহারা এম. কম. পাশ করিবেন তাঁহারা শুধু শিক্ষকতা কাজই করিবেন। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে কাজ করিবার জন্য বি.কম. ডিগ্রীই যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ

(ক) শিক্ষালাভের সময় ছাত্রদিগকে তিন বা চারি ধরণের বিভিন্ন ফার্মের শিক্ষানবিশী অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে।

(খ) ডিগ্রী লাভের পর ছাত্রদের কিছুসংখ্যককে হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে উপদেশ দেওয়া এবং তাহার জন্য প্রয়োগকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) কমার্সের মাষ্টারস্ ডিগ্রীর ছাত্রসংখ্যা কমানো এবং তাহাদিগকে কম তত্ত্বমূলক ও পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষা দান করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিকাল কলেজের যোগাযোগ

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মূলে হইতেছে বিজ্ঞান এবং যেখানে বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা এবং গবেষণা হইয়া থাকে সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিবে। ইঞ্জিনিয়ারও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তিনি মানবতামূলক শিক্ষা, ব্যবসাসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্য, শিল্পসংক্রান্ত যোগাযোগ, শ্রমসম্পর্কিত অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত। এই কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঐ সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই উহা থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও আবেষ্টনী

এই পুস্তকে ২২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

বর্তমানে যে সমস্ত নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সঙ্গে কলা, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা আমেরিকার উদাহরণ গ্রহণ করিতে পারি। আমেরিকার সব চেয়ে ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিরিয়ারিং শিক্ষার এইরূপ ওতঃপ্রোত সম্পর্কের কথা ভারতে পূর্বে স্বীকৃত হয় নাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা যেহেতু শিল্পীদের শিক্ষা হইতেই উদ্ভূত সেই কারণে পূর্বের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরেই স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ্ হইল রুরকি ও পুনা। পুনার ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কারণ পুনা এখন একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র। গিণ্ডি এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক দূরে শহরতলীতে অবস্থিত।

অনেকে মনে করেন যে, উচ্চতর শিল্পশিক্ষা অন্যান্য ধরণের উচ্চ-শিক্ষা হইতে পৃথক অবস্থায় থাকিবে এবং শিল্পশিক্ষণ-সংস্থাগুলি প্রত্যেকটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু শিল্পবিজ্ঞানই শিক্ষা দান করা হইবে, অন্য কোন রূপ সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। বলা বাহুল্য ইহার পরিণতি ভাল নয়। ইহা পিছনের দিকেই টানিয়া লওয়া হইতেছে, সম্মুখের দিকে অগ্রসর করাইতেছে না।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে অভিজ্ঞ হইলে চলিবে না, তাঁহাকে সাধারণ শিক্ষাতেও অভিজ্ঞ করিতে হইবে। এই কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ থাকিবে, নিজেরাই ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া দাঁড়াইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার ভিতরে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়গুলি থাকে, তবে ঐ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি ব্যাপক শিক্ষার অধিকারী হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরিকাতে কতকগুলি কারিগরী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ঐ সমস্ত বিদ্যালয়গুলি ও মহাবিদ্যালয়গুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মতবাদের উপর

প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেইখানে শুধু কারিগরী শিক্ষাই দেওয়া হইত, ব্যাপকতর শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু মাসাচুসেটসে যে কারিগরী শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সেস্থানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্পর্কিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াও কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক প্রশাসন এবং সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। ফলে মাসাচুসেটসের কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় হইতে অগ্রগতির সূচনা করে।

কিছু কাল পূর্বে একদল শিল্প-বিজ্ঞানী চিকাগোতে উচ্চ স্তরের Institute of Technology স্থাপন করিবার জন্য অগ্রণী হন। তাঁহারা সেখানে কোন স্বাধীন শিক্ষাবিজ্ঞানের কলেজ খোলেন না, তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট Technological বিভাগ খোলেন মাত্র। দেখা গিয়াছে যে, পুরাতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনোলজিকাল ইনষ্টিটিউট যাহারা ব্যাপকতর শিক্ষার অনুসরণ না করিয়া শুধু সঙ্কীর্ণ শিক্ষা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিকাল শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইতেছে। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনোলজিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটগুলি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিবে, তাহা হইলেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার অগ্রগতি দেখা যাইবে।

আমাদের বিশ্বাস, ভারতে স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এই যে শ্লথগতি, তাহা শুধু বিদেশী শাসনের ফলেই নয়, ইহার মূলে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ।

বিভিন্ন ধরণের প্রশাসন। একটি প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতা নির্ভর করে তাহার প্রশাসনের উপর। আমাদের ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়-গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সরকার দ্বারা পরিচালিত ; যথা—গিনডি, পুনা, শিবপুর।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ; যথা—বারাণসী, আলিগড় ও আন্নামালাই।

(গ) সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ। কিন্তু ইহারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। যথা—রুরকির থমসন কলেজ।

(ঘ) স্বাধিকার প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ। ইহারা সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়, কিন্তু ইহারা বিশেষ সংসদ দ্বারা পরিচালিত। যথা—যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির কলেজ।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ-সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি (শিল্প-বিজ্ঞান)

কমিশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা বিভিন্ন ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্স, শিক্ষকবর্গ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে ইহার সব দিকেই যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে। কোর্সের সংখ্যা খুবই অল্প ও গতানুগতিক, শিক্ষকবর্গের সংখ্যা অপ্রতুল ও তাহাদের বেতন যথেষ্ট নহে এবং শিক্ষার সুযোগ আমেরিকার $\frac{1}{20}$ ও ইংল্যাণ্ডের $\frac{1}{5}$ মাত্র। দেশের উন্নতির জন্য এই ধারার শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া কমিশন মনে করেন। এই জন্য কমিশন নিম্নলিখিত **সুপারিশসমূহের** প্রস্তাব করেন।— (১) যে কোনও প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি-সংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পদ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে একটি উপদেষ্টা-পরিষদের তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য পন্থা অনুসন্ধান করিতে হইবে। (২) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল বিশেষতঃ ৪র্থ ও ৫ম গ্রেডের কর্মচারীর (ড্রাফটসম্যান ফোরম্যান ক্রাফটসম্যান ওভারশিয়ার প্রভৃতি) শিক্ষণ-ব্যবস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৩) এইরূপ শিক্ষার কোর্স সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে সাধারণ শিক্ষা, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের শিক্ষা ও স্বল্পসংখ্যক প্রয়োগ বিদ্যা ও কোর্সের শেষের দিকে বিশেষ বিভাগীয় শিক্ষা প্রদত্ত হয়। সেই জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষার প্রথম কয়েক বৎসর একত্র চলিতে পারে। (৫) ঠিকমত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রয়োগবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, এই জন্য ছুটিতে অথবা ডিগ্রীর পরে বাস্তব প্রয়োগ অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (৬) যেখানেই সম্ভব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির বিভাগ গঠন পূর্বক স্নাতকোত্তর শিক্ষার ও বিশেষ বিশেষ বিভাগের গবেষণার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ইহার জন্য অবশ্য

উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত মনোভাব ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। তবে সকল কলেজের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য নহে। (৭) উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট খোলার যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে হইবে। (৮) আমেরিকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারগণের উপযুক্ত শিক্ষা-সংক্রান্ত সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। (৯) ভারতের পক্ষে কি ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান কত জনের প্রয়োজন তাহা অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী নূতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিতে হইবে। শিক্ষাদান এমন করিতে হইবে যেন শিক্ষার পরে আত্মনির্ভরশীলরূপে তাহারা স্বল্প মূলধনে নিজেরা কর্মশালা খুলিতে পারে ও ঐরূপ কর্মশালার জন্য সাহায্য-ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (১০) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি মন্ত্রণালয় বা অন্য কোন সংস্থার অধীনে না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সংক্রান্ত ফ্যাকালটির অধীনে আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালনাধীনে রাখা ভাল। (১১) ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্থলে "ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি" রাখা প্রয়োজন ও উহার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার শিক্ষক, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ও মানবিক বিদ্যাসমূহের শিক্ষক ও কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনোলজিষ্টগণ থাকিবেন। (১২) কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্স কমিশনের সাহায্যার্থে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি-বিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলী থাকিবেন ও তাহারা প্রয়োজন মত সাহায্য কেন্দ্রীয় অর্থকোষ হইতে জোগাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আইন শিক্ষা *

ইউরোপ এবং আমেরিকাতে আইন শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বহু দিন যাবৎই হইয়াছে। আইন শিক্ষা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সমাজে সুদৃঢ় স্থান অর্জন করিয়াছেন। আইন শিক্ষার শিক্ষকগণও সর্বজন-সমাদৃত। বিদেশের আইনজ্ঞ Dicey, Pollock, Anson, Maine এবং Holdsworth প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

আমাদের দেশেও অনেক খ্যাতনামা এবং বিদ্বান আইনজীবী ও বিচারক আছেন। আমাদের দেশের বড় বড় নেতা আইনজ্ঞ ছিলেন। আইনজ্ঞ বড় বড় নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রথমেই অন্যান্য শিক্ষার ফ্যাকালটি খোলার সাথে আইনের ফ্যাকালটিও খোলা হয়।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে আইন শিক্ষা ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-সমূহকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে আমাদের সংবিধানের উন্নতি করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরও উন্নতি করা। ইহার ফলে আমাদের বর্তমানে কর্তব্য হইতেছে উচ্চস্তরের বিভিন্ন আইন কলেজ স্থাপন করা। এই কলেজগুলিতে এমন সব খ্যাতনামা আইন-শিক্ষক থাকিবেন, যাঁহারা সংবিধানগত, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনসমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

আমাদের পরিবর্তিত অবস্থা

* এই পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় আমাদের আইন-কলেজগুলির অবস্থা উপযুক্ত নয় বলিয়া রাধাকৃষ্ণান কমিশন বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের আইন শিক্ষার ব্যবস্থা খুব বেশী উৎকর্ষের ছিল না। যাহা ছিল তাহা অন্যান্য ফ্যাকালটির তুলনায় অত্যন্ত নীচু স্তরের ছিল।

আমাদের আইন-কলেজগুলির অবস্থা

প্রথমেই প্রশ্ন আসে, আইন শিক্ষাদান করিবেন কাহারা? যে সব খ্যাতনামা আইনজীবী আছেন, তাঁহারা নিজস্ব কর্মে এতই ব্যস্ত যে, আইন কলেজে আসিয়া পড়াইবার সময় পান না। অতএব আইন কলেজে পড়াইতে আসেন তাঁহারাই যাঁহাদের আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম এবং নূতন আইনজীবী হইয়াছেন। অনভিজ্ঞ আইন-জীবিগণ নূতন পেশায় নামিয়াছেন, সেখানে অর্থাগম কম, সেই জন্য তাঁহারা আইন কলেজে পাঠদান করিয়া তাঁহাদের আয়কে সমৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা পড়ান বটে, কিন্তু তাঁহাদের হয়ত শিক্ষাদানের প্রতি প্রকৃত আগ্রহ নাই, শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁহারা পড়াইয়া থাকেন। তাঁহারা সকালে সন্ধ্যায় আসিয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। আবার শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আরও একটি বড় ত্রুটি দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা আইন শিক্ষাকে মুখ্য স্থান দিয়া তাহার অনুসরণ করেন না। অন্যান্য কাজের সঙ্গে তাহারা আইন পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ এম. এ. পড়িতে পড়িতে আইন পড়েন, কেহ চাকুরী করিতে করিতে বা অন্য ব্যবস্থা করিতে সকাল ও সন্ধ্যায় অবসর সময়ে আইন পড়িয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন আইন-কলেজগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন। পরিবর্তিত অবস্থায় আইন শিক্ষার উপরই প্রধান গুরুত্ব দিতে হইবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দর্শন, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদের কৃষ্টিগত মূল্য আছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, উহাদের ব্যক্তিগত মূল্য আছে। আইন শিক্ষা এই দুইএর মাঝখানে অবস্থিত। কেহ কেহ আইন শিক্ষা করেন সাধারণ শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইতে, আবার কেহ কেহ আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

আইন শিক্ষার প্রকৃতি

যাহারা সরকারী আন্তর্জাতিক কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থায় কাজ করিতে চান, তাঁহারা অনেকে আইন পড়িয়া থাকেন।

শিক্ষবিদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, আইন-কলেজগুলি পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্যই আইন শিক্ষা দিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য বৃত্তিগত নয়, এবং ইহার জন্য অন্য কোন সংস্থা আইনের ছাত্রদিগকে পেশা ও বৃত্তির দিকে পরিচালিত করিবে।

অতএব এই অবস্থায় আমাদের আইন-কলেজগুলির কি করা কর্তব্য? রাধাকৃষ্ণান কমিশন মনে করেন, আইন কলেজগুলিতে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ আইন পড়িয়া জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত হয়। এবং আইনকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিবারও সুযোগ পায়। এই দুইটি কাজই আইন-কলেজগুলিকে করিতে হইবে। আমেরিকাতে এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেখানে কাজ ভাল ভাবেই চলিতেছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষাস্তরে আরও বেশী পড়াশুনা এবং গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে। স্নাতকোত্তর কোর্স দুই বৎসরের হইবে এবং ইহার শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এম. এল. ডিগ্রী পাইবে। পরে আরও গবেষণা করিয়া ছাত্রছাত্রীরা ডক্টরেট ডিগ্রীও পাইতে পারিবে।

আইন শিক্ষার মধ্যে দুইটি স্তর থাকিবে বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রথম হইতেছে প্রাক-আইন স্তরে সাধারণ শিক্ষা। যাঁহারা আইন শিক্ষা করিতে চায়, তাহারা সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করিবে, এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার পরের স্তরের আইন সম্পর্কীয় শিক্ষা হইবে। দ্বিতীয় স্তরে আইন-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ছাত্রছাত্রী লাভ করিবে।

প্রাক-আইন স্তরে শিক্ষালাভ—অনেকে আবার মনে করেন যে, প্রাক-আইন স্তরে সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আব্রাহাম লিঙ্কনের উদাহরণ দিয়া বলেন যে, আব্রাহাম লিঙ্কন কোন দিন কলেজে যান নাই, অথচ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু সংসারে কয়টা লোক আব্রাহাম লিঙ্কনের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, ইহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া আইন শিক্ষা করিতে গেলে তাহার ফল ভাল হয়। আমেরিকার আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে

দেখা যায় যে ছাত্রদিগকে আইন শিক্ষার পূর্বে দুই বৎসর কাল সাধারণ শিক্ষালাভ করিতে হয়। কিন্তু হারভার্ড, কলম্বিয়া, মিচিগান, চিকাগো, কালিফোর্নিয়া প্রভৃতি আইনের সবচেয়ে ভাল কলেজ। কোন ছাত্রছাত্রী আইন পড়িতে চাহিলে, তাহাদিগকে কলা বা বিজ্ঞানে চারি বৎসরের ডিগ্রী লাভ করিয়া তবে আইন কলেজে যাইতে হয়।

সাধারণ শিক্ষায় কি কি কোর্স থাকিবে, তাহা লইয়া অনেকে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন কোর্সের সাথে আইনের কতটা সম্বন্ধ তাহা বাহির করা মুশকিল। আইন এত বেশী ব্যাপক যে জীবনের যে-কোন ক্ষেত্র লইয়া উহার প্রয়োগ হইতে পারে। তবে ভাষ্য, যুক্তি ও বিচার, সরকারী কর্মাবলী, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে আইন পড়ার সুবিধা হয়। কিন্তু এই সব বিষয় ছাড়া পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় আইনের শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিবে না, এমন কথা বলা যায় না। অতএব প্রাক্-আইন শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এইটুকুই জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

আইনের ডিগ্রী কোর্স—আইনের ডিগ্রী কোর্সে কি কি বিষয় সারা ভারতবর্ষে পড়ান হইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনা করা এখানে নিরর্থক। রাধাকৃষ্ণান কমিশন আইনের ডিগ্রী কোর্সের জন্য তিন বৎসর কাল ধার্য করিয়াছেন এবং শেষ বৎসরের ব্যবহারিক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের আচার, আচরণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া পাঠ্যবিষয়ের পার্থক্য থাকিবে।

কমিশন মনে করেন যে, রোমান 'ল', যাহা বর্তমান সমস্ত আইনসমূহের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা পাঠ্যসূচীতে স্থান পাইবে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আইনও অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। কমিশন সংবিধানগত আইন, আন্তর্জাতিক আইন, আইনের ইতিহাস এবং আইনশাস্ত্রের মূলনীতিগুলি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, বিষয় যাহাই ছাত্র শিক্ষা করুক না কেন, তাহার পরিষ্কার চিন্তাধারা, সঠিক বিশ্লেষণ এবং প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকিবে। এই সমস্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে সে ভাল আইনজীবী হইতে পারিবে না। আইন শিক্ষা শুধু পুস্তকাশ্রয়ী হইবে না, ইহাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশী দিতে হইবে। আলোচনা

চক্র, শিক্ষার জন্য কাল্পনিক মোকদ্দমা সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিশন সর্বশেষে আইন শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত **সুপারিশ** করিয়াছেন।—

(ক) আইন-কলেজগুলির সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রনে আইন-সংক্রান্ত ফ্যাকালটি থাকিবে।

(গ) স্নাতক পরীক্ষার পর তিন বৎসর পড়িয়া আইন-সংক্রান্ত ডিগ্রীর যোগ্যতা অর্জিত হইবে।

(ঘ) শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ থাকিবেন পুরা সময়ের জন্য। তাহা ছাড়াও আইনগত পেশায় নিযুক্ত এমন ব্যবহারজীবিগণকে স্বল্প-কালীন (Part time) শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইবে।

(ঙ) আইন-সংক্রান্ত শ্রেণীগুলিতে নিয়মিতভাবে শিক্ষণ কাজ চলিবে।

(চ) আইন শিক্ষাকালে আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে অধ্যয়নরত থাকিতে দেওয়া হইবে না।

(ছ) প্রত্যেক আইন ফ্যাকালটিতে গবেষণার, বিশেষতঃ সংবিধান সংক্রান্ত আইন, আন্তর্জাতিক আইন, শাসন-সংক্রান্ত আইন ও জুরিস্প্রুডেন্স এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(জ) অগ্রগতি পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ সময় অনুসারে ও বিষয় অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা*

প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে মেডিকেল কলেজ ছিল এবং উহা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ চিকিৎসা-বিদ্যার শিক্ষার্থী মেডিকেল স্কুল হইতে শিক্ষালাভ করেন। মেডিকেল স্কুলগুলি প্রতি প্রদেশে কয়েকটি ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করিতেন; কিছু কিছু মেডিকেল স্কুল মিশনারীদের

* এই পুস্তকের ২২৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

দ্বারাও পরিচালিত হইত। মেডিকেল স্কুল হইতে যাঁহারা পাশ করিতেন, তাঁহারা সহকারী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করিতেন এবং হাসপাতালে বড় বড় অসুখে তাঁহাদিগকে চিকিৎসা করিবার স্বাধীন অধিকার দেওয়া হইত না। এই সাহায্যকারী চিকিৎসকদের Sub-Assistant Surgeon বলা হইত। Sub-Assistantদের মেডিকেল স্কুলে ৪ বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হইত এবং শুধু ডাক্তারী করিতে যেসব বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলিই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। চিকিৎসা-বিদ্যার কিছু বিষয়ের শিক্ষা তাঁহারা করিতে পারিতেন না। পরে অবশ্য মেডিকেল স্কুলের পাঠ্যসূচীর কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং মেডিকেল কলেজে যে পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত ছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

মেডিকেল স্কুল

মেডিকেল স্কুলগুলিতে ভর্তি হইতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া ভর্তি হইতে হইত।

ডিগ্রী কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চিকিৎসা-বিদ্যার ডিগ্রী কোর্সে দুই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীরা দুই রকম ডিগ্রী লাভ করিতে পারিতেন,—L.M.S. অথবা M.B.B.S. দুইটি কোর্সে ভর্তি হইবার নিম্নতম পারদর্শিতা ছিল একই। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইলেই চলিত। কিন্তু মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে সেখানে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইত এবং সেই পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। মেডিকেল কলেজে প্রবেশের জন্য শিক্ষামান একই ছিল। কিন্তু L.M.S. এবং M.B.B.S. শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়ের ও শিক্ষার মানের কিছুটা পার্থক্য ছিল।

মেডিকেল কলেজ

কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল মেডিকেল কলেজেই দুইটি শিক্ষার মান রহিয়াছে M.B.B.S. এবং L.M.S. শিক্ষা এবং উহা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় L.M.S. শিক্ষা ও পরীক্ষা তুলিয়া দিলেন। পরে মেডিকেল স্কুলের শিক্ষাও তুলিয়া দেওয়া হয়। মাত্র একটি চিকিৎসা-বিদ্যার কোর্স খোলা থাকে, তাহা হইল M.B.B.S.এর কোর্স।

জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি দান—মেডিকেল কলেজ হইতে চিকিৎসা-বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় পাশ করিলেই তাঁহাদিগকে

ব্রিটিশ রাজত্বের যে কোন জায়গায় চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবার অনুমতি দেওয়া হইত এবং জেনারেল মেডিকেল রেজিষ্টারে তাঁহাদের নাম তালিকাবদ্ধ করা হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেন যে, মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাশ করিলেই তাঁহাদিগকে কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত করা হইবে না এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে চিকিৎসা-বিদ্যার নিম্নতম পারদর্শিতা শিক্ষার্থীরা লাভ করিতেছে কিনা। তাহার পরই পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইবে। আসলে ত্রুটি দেখা গিয়াছিল এক জায়গায়—তাহা হইতেছে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ধাত্রীবিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না। সে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই ত্রুটিগুলি দেখানর পর ধাত্রীবিদ্যায় ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য চারি দিকে প্রচেষ্টা দেখা গেল।

অবশ্য এই জাতীয় পরিদর্শন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই, ফলে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের ফলে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে Indian Medical Council স্থাপিত হয়। Indian Medical Council স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার শেষ পরীক্ষার সর্বনিম্ন মান স্থির করা। এই কাউন্সিল এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাফল্য অর্জন করে।

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের এই কাজের পর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার আদর্শ স্থিরীকৃত হয় এবং উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মেডিকেল স্কুলগুলি মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্যা যথাসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার কাজ। মেডিকেল কলেজ হইতে শিক্ষালাভের পর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মেডিকেল কলেজে House Surgeon হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কাজ ১৫ মাস কাল স্থায়ী হইবে। এইখানে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া না গেলে কোন চিকিৎসকই চিকিৎসা-ব্যবসা করার অনুমতি পাইত না।

মেডিকেল কলেজে ছাত্রসংখ্যা এবং উপকরণ। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং উপকরণেরও পার্থক্য আছে। মেডিকেল স্কুলগুলিও মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হইতেছে। অথচ

তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করেন যে, প্রতি বৎসরে সর্বনিম্ন ৫০ এবং সর্ব উচ্চ ৭০ এর বেশী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত নয়।

শিক্ষকবর্গ। মেডিকেল কলেজে তিন ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করিতে হইবে। প্রথম হইতেছে বিভাগীয় প্রধান—ইঁহাদের বহু দিনের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিবে এবং ইঁহারা সকল সময়ের জন্য কর্মে নিযুক্ত থাকিবেন এবং ইঁহারা Medicine, Surgery এবং Midwifery-র ভার গ্রহণ করিবেন। কমিশন মনে করেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে সব সময়ের জন্য একজন বিভাগীয় প্রধানকে থাকিতে হইবে, তাহা হইলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইবে। মেডিকেল কলেজে আর এক ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদান করিবেন। অনেক প্রদেশে দেখা গিয়াছে যে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসককে অনারারী (ভাতাশূন্য) হিসাবে শিক্ষাদানে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষাদান সম্পর্কে বলা যায় যে শিক্ষকগণ সর্বসময়ের জন্য কিংবা আংশিক সময়ের জন্য কিংবা ভাতাহীন বা ভাতাসহ যে জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাই নিযুক্ত হউন না কেন, তাঁহাদের শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিবে এবং তাঁহাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কাজের বণ্টন করা হইবে, তাহাই তাঁহারা করিবেন।

গ্রামীণ চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য

ভারতের বেশী সংখ্যক নাগরিকই গ্রামে বাস করে এবং গ্রামগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতের গ্রামের অবস্থাগুলি এখনও প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। রাজ্যসরকারের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল গ্রাম্য স্বাস্থ্য। গ্রামীণ লোকের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সমস্যা আমাদের বড় রকম সমস্যা। সরকার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেন যে, যেহেতু গ্রাম ভারতের প্রাণকেন্দ্র, সেই হেতু গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্রামীণ চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য, ইত্যাদি করিতেই হইবে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করিবার বিষয়টি হইতেছে এই যে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে গ্রামে যাহাতে রোগ প্রবেশ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করতে হইবে।

দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থা—আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী

আমাদের দেশে শুধু যে এ্যালোপেথিক চিকিৎসাই চলিতেছে এমন নয়। ভারতে বহু দিন যাবতই আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে। কমিশন বলেন যে দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থায় চিকিৎসক শুধু বিশেষ ব্যাধিটি চিকিৎসা করেন না, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সমগ্র ব্যাক্তিত্বের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বর্তমান এ্যালোপেথিক চিকিৎসায় নির্দিষ্ট রোগটিরই চিকিৎসা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া দেশীয় ঔষধগুলি অনেক সময় এ্যালোপেথিক ঔষধাদি হইতে বেশী কার্যকারক। দেশীয় ঔষধাদির বিপক্ষতা যাঁহারা করেন, তাঁহারা বলেন যে দেশীয় চিকিৎসকেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দেন না। তাহা ছাড়া দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আর তাঁহারা গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই চলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেশীয় চিকিৎসকেরা সকলেই অপরিচ্ছন্ন নহেন এবং তাহাদের দেহবিজ্ঞান-সম্পর্কিত যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এই সমস্ত দেশীয় চিকিৎসকেরাও আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেকে হয়ত এ্যালোপেথিক চিকিৎসার সুযোগ পায় না, কিন্তু দেশীয় চিকিৎসার সুযোগ সকলেই এক রকম পাইয়া থাকে।

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ

রাধাকৃষ্ণান কমিশন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ

(ক) প্রতি মেডিকেল কলেজে ১০০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী লওয়া হইবে না এবং ঐরূপ ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। (খ) একই স্থানে কলেজ ও হাসপাতাল থাকিতে হইবে। (গ) ছাত্রছাত্রী প্রতি ১০টি করিয়া বেড থাকা উচিত। (ঘ) প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে গ্রাম্য-চিকিৎসাকেন্দ্র সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির সংযুক্ত কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (চ) সাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও নার্সিং শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হইবে। (ছ) দেশীয় ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হইবে। (জ) প্রথম স্নাতক স্তরে ঔষধের ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতীয় ঔষধসমূহের ইতিহাস বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

ইহা ছাড়া কমিশন কয়েকটি নূতন বৃত্তির জন্য শিক্ষাদানের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, যথা—(ক) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা শিক্ষা। (খ) সাধারণ শাসন-পরিচালনা শিক্ষা। (গ) শিল্প-সংক্রান্ত সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষা ইত্যাদি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা

ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা শুরু হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে। 'সংস্কৃতি ও চারুকলার মানবিকতা' বিকাশের উদ্দেশ্যে ডাঃ হাণ্টার নামে মাদ্রাজের এক জন ডাক্তার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ইহার এক বৎসর পর তিনি শিল্পকলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরে সংযুক্ত করা হয় এবং তাহাদের একক নাম হয় 'দি স্কুল অব আর্টস' এবং ইহা সরকারের পরিচালনাধীন হয়। উহা বর্তমান সময়ে 'মাদ্রাজ স্কুল অব আর্ট্স্' নামে পরিচিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে স্যার জে. জে. টাটা শিল্পকলার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই টাকায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে স্যার জে. জে. টাটা স্কুল অব আর্ট্স্ নামে একটি শিল্পকলা বিদ্যালয় বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উডের ডেচপ্যাচের পরে ভারতে বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মাত্র উল্লেখিত দুইটি শিল্পকলার বিদ্যালয় ছিল। পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে মেয়ো স্কুল অব আর্ট্স এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল অব আর্টস স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট্স্ শিল্পকলা বিদ্যালয়গুলি কারিগরী বিদ্যালয়ে পরিণত করায় নির্দেশ দেন

কিন্তু তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ইহার বিরোধিতা করেন এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটের নির্দেশ কার্যকরী হয় না।

লর্ড কার্জনের সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা শিক্ষার কিছু উন্নতি দেখা যায়। লর্ড কার্জনের শাসনকালে সিমলায় একটি শিক্ষা-সম্মেলন হইয়াছিল। এই শিক্ষা-সম্মেলনে ভারতীয় শিল্পকলা স্কুলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং এই বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে কারিগরী বৃত্তি শিক্ষাদানের কথাও বলা হইয়া থাকে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তে এই নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং শিল্পকলা-বিদ্যালয়সমূহে অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা না দিয়া অল্প কয়েকটি শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই সময় হইতে শিল্পকলা বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা হয় এবং তাহাতে বৃত্তিশিল্প ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও খোলা হইয়া থাকে।

রাধাকৃষ্ণান কমিশন বলেন যে, তখন পর্যন্তও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী কোর্সের মধ্যে সঙ্গীত ও চিত্রকলার কোন স্থান ছিল না, তখন পর্যন্তও ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে গতানুগতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইত। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার মান স্থির নাই। কিন্তু সঙ্গীত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে এবং সাথে সাথে উহার তাত্ত্বিক দিক ও ইতিহাসের দিক সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। এই কোর্সের সাথে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই দুইটি বিষয় থাকিবে। ফলে সঙ্গীতের কোর্সকে আর কেহ পেশাগত বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারিবে না। সঙ্গীত সম্বন্ধে উচ্চ পর্যায়ের কাজ খুব কমই তখন পর্যন্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন সঙ্গীত সংগ্রহ, বৈদিক সামগান ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, বিভিন্ন ঘরোয়ানা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীত সম্বন্ধে সমন্বয় সাধনের কাজ অনায়াসে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তরে হইতে পারিবে।

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশের পর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সময়ে ঐ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য পুরুষদের জন্য কলেজ ছিল ৪২টি এবং মেয়েদের কলেজ ছিল ৭টি। ইহা ছাড়া পুরুষদের জন্য স্কুলের সংখ্যা ১৫১টি এবং মেয়েদের জন্য স্কুলের সংখ্যা ৫৯টি। কিন্তু এই সমস্ত

শিক্ষা ব্যাপারে মেয়েরাই বেশী আগ্রহী এবং তাহাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অল্প।

সঙ্গীত, নৃত্যে ও চারুকলা বিষয়ে কলেজ ও স্কুলসমূহে শিক্ষার্থী নির্বাচনের বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা নাই। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা এক নয়। সাধারণ শিক্ষায় যেমন সকল শিক্ষার্থী আসিয়াই শিক্ষাগ্রহণের দাবী জানাইতে পারে, সঙ্গীত, নৃত্য ও চারুকলা শিক্ষায় তাহা হয় না। কারণ ঐ সমস্ত বিষয় অনুসরণ করিবার মত প্রাথমিক দক্ষতা থাকা একান্তই আবশ্যক, না হইলে উহা সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুসরণ করা অসম্ভব।

এই সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যক্রম এখনও পরিপূর্ণভাবে রচিত হয় নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার রচনা করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা

(The Teaching of Handicapped Children)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহু বিচিত্র ধরণের মানুষ লইয়া আমাদের এই সমাজ গঠিত। কেহ সুন্দর সবল সুস্থ দেহ ও মন লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কাহারও বা তীক্ষবুদ্ধি, কেহ বা জড়ধী। যাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন তাঁহারও জানেন, দুইটি বালক বা বালিকা কোনো সময়েই সমান নহে। এক জনের প্রগতি আর এক জনের সমান নহে। কেহ কোনো বিষয়ে অগ্রসর, কেহ বা পশ্চাৎপদ।

এই যে এক জন অপেক্ষা আর এক জনের সামর্থ্যের তারতম্য-জনিত পশ্চাৎবর্তিতা—ইহা কি?

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, সমাজের যে সব শিশু কোনো না কোনো ত্রুটি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া নিজ নিজ সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশ ঘটাইতে পারিতেছে না, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ব্যাহত শক্তিসম্পন্ন বলা হয়। তাহা ছাড়া, শারীরিক দিক হইতে কোনো ত্রুটি না থাকিলেও মানসিক শক্তির ন্যূনতাবশতঃ যাহারা আপন আপন শক্তির ও সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশ ঘটাইবার সুযোগ লাভ করে নাই, তাহাদেরও অনগ্রসর বলা হইয়া থাকে। এগুলি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক নানা কারণ শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

বিদ্যালয়ে পড়াইতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্রেণীর মধ্যে সকল ছাত্র কোনো রূপেই সমান নহে। বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শারীরিক ক্ষমতায়, দৈহিক মাপে, শিখিবার সামর্থ্যে, কথা বলার ভঙ্গীতে প্রত্যেকে প্রত্যেক অপেক্ষা ভিন্ন। অন্যান্য সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, শুধু শেখার বিষয়টি ধরিলেই দেখা যাইবে, প্রতি বালক অথবা বালিকার শেখার গতি

প্রকৃতি আলাদা আলাদা ধরণের। অর্থাৎ বয়স এক হইলেও, সকলে সব জিনিস সমানভাবে শিখিতে পারে না। সমান গতিতেও শিখে না। কেহ আগে আগে সব জিনিস শিখিয়া যায়, কেহ ধীর গতিতে শিখিতে থাকে। কেহ বা গণিত ভাল বোঝে, কেহ গণিত বুঝিতেই পারে না। এই রকম সহস্র প্রকার পার্থক্য দেখা দেয়। তাহা হইলেও প্রচলিত বিত্থালয়সমূহে কিন্তু এত পার্থক্য ও বিচিত্রতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। শ্রেণীগত একটি নির্দিষ্ট মান তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়, সেই মান অনুযায়ী যাহারা দক্ষতা দেখাইতে পারে, তাহারা পাশ করে। যাহারা ভাল ফল দেখাইতে পারে তাহাদের বলা হয় বুদ্ধিমান (gifted), আর যাহারা পারে না, তাহাদের বলা হয় অনগ্রসর (backward)। শ্রেণীতেই হউক, বিদ্যালয়েই হউক অথবা সমাজের যে কোন কাজ-কর্মেই হউক, বয়স অনুযায়ী একটি করিয়া সাধারণ মান মানুষকে তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। ফলে, যে বয়সের যে মান (Standard) তদনুযায়ী যদি কেহ দক্ষতা দেখাইতে না পারে তাহা হইলেই সে 'Backward', 'Slow learner', 'Handicapped' এর দলে পড়িয়া গেল।

ধরা যাউক, 'স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা' এইরূপ একটি মান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড। মনে করা হইয়াছে যে, ষোল বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়া দশটি বৎসর অতিবাহিত করার পর যে পরিপক্কতা (Maturity) লাভ হইবে, তাহার মান স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার মানের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু সবাই কি তাহা পারে ? কত জনই তো ষোল বৎসর বয়সের আগেই পারে, আবার কত জনের আরও অনেক বেশী বছর লাগিয়া যায়।

এই ভাবে শেখার দিক দিয়া তারতম্য লক্ষ্য করিয়া মানুষের বুদ্ধি-সংক্রান্ত নানা তথ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। সচরাচর বলা হয়, যাহারা বেশী বুদ্ধিমান তাহারা তাড়াতাড়ি শেখে, যাহারা কম বুদ্ধিমান তাহারা তাড়াতাড়ি শিখিতে পারে না। এই ভাবে, যাহারা আপন বয়সের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্বাভাবিক সময়ে শিখিতে পারে না, তাহাদের কারণ আবিষ্কার করিতে যাইয়া অনগ্রসরতাকে নানা ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং না শিখিতে পারার পিছনে কিসের প্রভাব কার্যকর তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের ব্যাহত শিশু—

অনগ্রসর বা ব্যাহতদের চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) মানসিক ক্ষমতার ন্যূনতা বশতঃ অনগ্রসর বা শ্লথগতি

(২) শারীরিক অক্ষমতা, ত্রুটি, বিকৃতির জন্য সামর্থ্য বিকাশে ব্যাঘাত

(৩) প্রক্ষোভিক বিকাশে জটিলতার জন্য অনগ্রসরতা

(৪) সামাজিক কারণে অনগ্রসরতা

মানসিক কারণে অনগ্রসরতা বা শক্তি-সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশে ব্যাঘাত সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

শারীরিক অক্ষমতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটিজনিত শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশে যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

শারীরিক কোনো ত্রুটির জন্য যাহারা অনগ্রসর বা ব্যাহত তাহাদের কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা:—(ক) আঙ্গিক সংস্থানগত ত্রুটি।

শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটিজনিত কারণে যদি কাহারও কর্মক্ষমতা প্রকাশের, সামাজিক অভিযোজন ক্ষমতার ও মানসিক সুস্থতার কোনো হানি ঘটে, তবে অনগ্রসরতা বা ব্যাঘাতের কারণ হিসাবে ধরা যায়। এইরূপ সংস্থানগত ত্রুটি দুই ধরণের হইতে পারে। যথা:—(১) **প্রকাশিত** ও (২) **অপ্রকাশিত**

প্রকাশিত:—বিকৃত চোখ, তির্যক দৃষ্টি, বাঁকানো চোয়াল, অবিন্যস্ত দাঁতের পাটি, বাঁকা হাত, বাঁকা আঙ্গুল, কব্জি, হাঁটু, পায়ের পাতা, কোমর, জড়তাপূর্ণ ছোট জিভ, গজদন্ত এই সমস্ত হইল প্রকাশিত ত্রুটি।

অপ্রকাশিত:—ব্রেন-টিউমার, অস্থি-বিকৃতি, নানা জাতীয় আন্ত্রিক প্রদাহ, গ্যাসট্রিক পেন, কোলাইটিস, এ্যানিমিয়া এই সমস্ত অপ্রকাশিত।

এইগুলি আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। যেগুলি স্থায়ী সেইগুলিকে সারাইয়া তোলা যায় না, সেই-গুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই উন্নতির জন্য আলাদা ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন ট্যারা চোখ অথবা অঙ্গহীনতা, বোবা কালা ইত্যাদি। এইগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই অন্য ব্যবস্থা করিতে হয়।

অন্য কতকগুলি আছে যেগুলির বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অবস্থান্তর হয় এবং এক এক সময় মানুষের কর্মক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য কমাইতে থাকে। এগুলির অধিকাংশই চিকিৎসাদ্বারা সারানো যায়।

শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাঘাতের বহু প্রকার-ভেদ আছে। উহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারের জন্যই বিশেষ শিক্ষাদানের আয়োজন করা হয়।

(১) বধির (২) বোবা (৩) অন্ধ (৪) বিকলাঙ্গ।

(খ) কোনো বিশেষ অঙ্গের ত্রুটি না থাকিলেও দেহের গঠন, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনেকের কম দেখা যায়। কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ ক্ষীণদেহ বা ক্ষীণশক্তি হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ইহার বিশেষ কোনো প্রতিকার সম্ভব হয় না।

সামাজিক কারণ—

যদিও মানসিক ও দৈহিক কারণে শক্তি-সামর্থ্যের যথাযথ প্রকাশে ব্যাঘাত দেখা যায় সত্য, তবুও পৃথিবীর বহু অনগ্রসর দেশেই সামাজিক কারণটিও উপেক্ষণীয় নহে।

জন্ম, বংশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক বাধা ইত্যাদি কারণেও যদি স্বাভাবিক ভাবে কাহারও শক্তি-সামর্থ্যের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহাও অনগ্রসরতা বা বিকাশের ব্যাঘাত সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে অনগ্রসরতার কারণ দুইটি—(১) দৈহিক ও মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক ও (২) সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক

অনগ্রসরতা বিধানে বা সামর্থ্যের বিকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে কার্যকরী প্রভাবসমূহ।

১। বংশগতির প্রভাব

মনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথা স্বীকার করা হয় যে, মানুষ জন্মের সংগে সংগে বংশধারার অনেক দোষগুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সচরাচর ইহা দেখিতেও পাওয়া যায়, নানা জাতীয় দুরারোগ্য জটিল যৌনরোগাক্রান্ত দম্পতির সন্ততিরা অনেক সময় বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা অনুরূপ রোগগ্রস্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। আবার কতকগুলি সাধারণ রোগও বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। আর এক দিকেও বংশগতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার জুক্‌স্ ও ক্যালিকাক্‌স্ বংশধারার পর্যবেক্ষণের ফলাফলে জানা গিয়াছিল, সাংঘাতিক ধরণের অপরাধী, দুশ্চরিত্র, মদ্যপ

ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে অনুরূপ দোষসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য। সাধারণতঃ কোন মানুষই বংশধারা কর্তৃক নির্দিষ্ট দৈহিক ও মানসিক সীমার ও ক্ষমতার খুব বেশী উপরে উঠিতে পারে না। ফলে অল্প-ধীশক্তিসম্পন্ন বংশধারায় খুব উচ্চ-ধীশক্তি-সম্পন্ন সন্তান জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা কম।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য (Individual difference) তাহা বংশগতিকর্তৃক প্রভাবিত। বংশধারার সাধারণ অনেক বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী বংশধারার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। যেমন, চোখের রং, চুলের রং, ঠোঁটের গড়ন, জিহ্বার গড়ন, পাগলামী, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি অনগ্রসরতা বা সামর্থ্য বিকাশের ব্যাঘাতে সহায়ক হয়।

২। **পরিবেশের প্রভাব।**

(ক) বিত্থালয়, (খ) গৃহ, (গ) সমাজ

(ক) বিত্থালয় অনেক সময় অনগ্রসরতা বৃদ্ধির পরিপোষক হইয়া থাকে। সাধারণ বিত্থালয়ে যে যে অনগ্রসরতা দেখা যায় সেগুলি প্রধানতঃ ৪ প্রকার।—(১) মানসিক ক্ষমতার ন্যূনতার জন্য

(২) মানসিক ক্ষমতা সমান হইলেও বিত্থালয়ের কোনো ত্রুটির জন্য

(৩) শারীরিক ছোটখাট ত্রুটির জন্য

(৪) প্রক্ষোভিক বিকাশে জট পাকানোর জন্য।

(১) মানসিক ক্ষমতার ন্যূনতা—বুদ্ধ্যঙ্ক কম-বেশী হওয়ার জন্য বিত্থালয়ে শেখার গতির নানা তারতম্য ঘটিতে পারে। সামান্য পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহা অনেকটা দূরীভূত করা যায়।

(২) মানসিক ক্ষমতা সমান থাকিলেও বিত্থালয় পরিচালনা ও পাঠদানগত ত্রুটির জন্য নানা বিষয়ে অনেকের অনগ্রসরতা ঘটিতে থাকে। যথা—ভাল শিক্ষকের অভাব, সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি। এইগুলিও সারাইয়া তোলা কঠিন নয়।

(৩) কেহ হয়ত চোখে কম দেখে, কেহ কানে কম শোনে, কেহ বা সামান্য তোত্‌লা, তাই কথা কহিতে চায় না, সে জন্য ইহারা শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে চায়। ফলে ইহাদের মধ্যে অনগ্রসরতা বাড়িতে থাকে।

(৪) বিত্থালয়ে অতিরিক্ত মারধোর করা, কঠোর শাসনে রাখা অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলহীনতা, শাস্তির একান্ত অভাব ইত্যাদি কারণে প্রক্ষোভিক

বিকাশ জটিল হইয়া নানা ধরণের অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়। যেমন, সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়ের অতিরিক্ত শাসন ও কর্কশতা অধিকাংশ ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষায় অনাগ্রহী করিয়া তোলে।

(খ) গৃহের প্রভাব

অনগ্রসরতা সৃষ্টিতে বা শিশুর সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে গৃহের অবদানও কম নয়। সাধারণতঃ অশান্তিপূর্ণ গৃহ, অথবা অত্যধিক আদর বা অত্যধিক অনাদর, অস্বাস্থ্যকর বাস, চিকিৎসার প্রতি অনাগ্রহ, কঠোর দারিদ্র্য, বয়স্কদের মনোমালিন্য, এই সমস্তই শিশুর যথোচিত বিকাশে বাধা হইতে পারে। মা-বাবার রীতিনীতি, জীবনযাপনের অভ্যাস, পেশা অথবা অতিরিক্ত ধনীর বাড়ীতে ভৃত্যকুলে বড় হওয়া, অতিরিক্ত আদর পাওয়া—এই সবও অনগ্রসরতার সহায়ক হইতে পারে।

(গ) সমাজের প্রভাবও ব্যক্তির উপর অত্যধিক পড়িতে থাকে, নানা ভাবে পড়িতে থাকে। বিশেষতঃ কৈশোর অতিক্রান্ত হইলেই গৃহের প্রভাব অপেক্ষা সমাজের প্রভাব প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজে শিক্ষাদীক্ষার অভাব, উৎসাহহীনতা, নানা কুপ্রথা, অর্থনৈতিক ভাঙন মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা নষ্ট করিয়া দেয়।

রাজনৈতিক পরিবর্তন, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনে, তাহাতেও মানুষের নানা ধরণের অনগ্রসরতা ও সামর্থ্য বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন বিগত আনবিক যুদ্ধে বহু সহস্র মানুষ বহু ভাবে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একটি যুদ্ধে বহু সহস্র লোক তাহাদের সামর্থ্য হারাইয়াছে। ভারত বিভাগের ফলে অসংখ্য উদ্বাস্তু তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহাদের যথাযথ সামর্থ্য বিকাশে অপারগ হইতেছে। তাহা ছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির প্রভাবও কম নয়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ কালো মানুষদের প্রতিভা বিকাশে বাধা হইয়া আছে। আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষও তাহাই। ভারতে কিছু কাল আগেও নিম্নবর্ণীয়গণ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল।

এই ভাবে দেখা যায়, সামাজিক নানা কারণও অনগ্রসরতা ও সামর্থ্য বিকাশের ব্যাঘাত হইতে পারে।

অনগ্রসরদের ও শারীরিকভাবে-অক্ষমদের শিক্ষার সমস্যা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এই সমস্যাটিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখার দরকার। প্রথম হইতেছে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা-সমস্যা এবং দ্বিতীয় হইতেছে — প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-সমস্যা।

বিদ্যালয়-সীমার মধ্যে যে সব বালক-বালিকা আসে, তাহাদের শিক্ষা-সমস্যা মূলতঃ তিন প্রকার।

যাহারা বুদ্ধির দিক দিয়া সামান্য ন্যূন অথবা যাহাদের প্রক্ষোভিক বিকাশে জট আছে বা যাহারা সামান্য অসুস্থ, তাহাদের বিদ্যালয়ের মধ্যেই বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সারাইয়া তোলা।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

তৃতীয়তঃ, যাহারা বিকলাঙ্গ, বোবা, অন্ধ বা কঠিন রোগগ্রস্ত তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে সমস্যা দুই প্রকার। প্রথমতঃ, যাহারা জন্ম হইতেই কোনো না কোনো ত্রুটি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

পরবর্তী কালে আকস্মিক দুর্ঘটনা যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে যাহারা অঙ্গহীন হইয়াছেন, তাহাদের পুনরায় কোনো বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই উভয় প্রকার সমস্যার গুরুত্ব এবং ইহার সমাধানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অপরিসীম।

পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই বর্তমানে সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের কাজে রাষ্ট্র ব্যাপৃত। কাজেই এই ধরণের বিকলাঙ্গ, জড়ধীদের শিক্ষার এবং স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করিতে পারেন না। সমস্যাটির গুরুত্ব আর একদিক দিয়াও বিচার্য। বয়স্ক, বিকলাঙ্গ ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও, সারা ভারতে বহু লক্ষ বালক-বালিকা কোনো না কোনো ভাবে অনগ্রসর বা ব্যাহত রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলাতেই ইহার সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। এই বিপুল সংখ্যার বালক-বালিকার স্বাভাবিক সামর্থ্য যদি বিকশিত হইতে না পায়, তাহা হইলে ইহারা পরনির্ভর

থাকিয়া জীবন-যাপন করিবে। এতগুলি উপার্জনাক্ষম ব্যক্তি জাতীয় আয়ে কোন অংশ গ্রহণ না করায় জাতীয় আয় মাথাপিছু হারে নামিয়া যাইবে। তাহাই নহে, ইহারা পরনির্ভর থাকিয়া জীবন-যাপন করিবে এবং হয়ত ক্রমশঃ স্বাভাবিক সুস্থ জীবনক্ষেত্র হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া নানা অসামাজিক জীবনে আসক্ত হইয়া পড়িবে। ফলে এতগুলি বালক-বালিকার একাংশকে আমরা ভিখারী, মাতাল, দুশ্চরিত্র, চোর, বদমায়েশরূপে দেখিতে পাইব,—যাহারা স্বাভাবিক জীবন-যাপনের কোনো অধিকার ও যোগ্যতা লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবনের অন্ধকার আবর্তে নির্বাসিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই এত বিপুল সংখ্যক ভবিষ্যৎ নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতেই হয়। জাতির সমগ্র জীবনের উপরও ইহার প্রভাব কম নয়। জাতির মধ্য হইতে ভিক্ষাবৃত্তি, নানা ধরণের কুৎসিত জীবন-যাপন, নানা ধরণের গুণ্ডামী, দাগাবাজি, বেশ্যাবৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া জাতিকে সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের সুযোগ সকলকে দিতে হইবে। কাজেই যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনো না কোনো অঙ্গ হারাইয়াছে অথবা বিকৃত অপুষ্ট অঙ্গ লইয়া অথবা জড়বুদ্ধি লইয়া অথবা বিকৃত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক সুস্থ জীবন-যাপনের সুযোগলাভে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের পবিত্রতম কর্তব্য।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন এক দিন ছিল যখন এই সব হতভাগ্যদের শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকারও অধিকার ছিল না। স্পার্টার ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র এই সব শিশুদের হত্যা করিয়া ফেলিত। কিন্তু যতই যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ততই মানবজাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা চলিয়াছে সর্বদিক হইতে। তাই সমাজ ইহাদের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে নাই। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে এই সব অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গদের খাদ্য বস্ত্র অন্ন আবাস দিয়া পালন করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছিল এবং তাহার জন্য বহু অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে আত্ম নির্ভর করিয়া স্বজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গী আমরা লাভ করিয়াছি পাশ্চাত্য দেশ হইতে। আধুনিক যুগে প্রতিটি দেশেই এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দান করা হয়।

ভারতে বিকলাঙ্গ, ব্যাহত ও অনগ্রসরদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—স্বাধীনতার আগে ও পরে।

প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়—একমাত্র অশোকের সময় রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে একথা স্বীকার করা হইয়াছিল যে রাজ্যমধ্যস্থ যাবতীয় মানব ও মানবেতর প্রাণীর কল্যাণ-সাধন রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই কল্যাণনীতি আদর্শ অনুযায়ী রাজ্যের নানাস্থানে অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বিকলাঙ্গদের প্রতিপালনের জন্য অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা করার কোনো চিন্তা তৎকালে পাওয়া যায় না।

ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তাহার পর রাজী হইলেও আন্তরিকতার সহিত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোনো চেষ্টা হয় নাই। সাধারণ বালক-বালিকাদেরই শিক্ষার আয়োজন করা যায় নাই, ইহাদের তো পরের কথা। কিন্তু তৎকালেই অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অনেক সহৃদয় নরনারী জনকল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মেরী এ্যানি শার্প নাম্নী জনৈকা ইউরোপীয়ান মহিলা অমৃতসরে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠানটি দেরাদুনে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লালবাহাদুর শাহ নামক জনৈক সহৃদয় বাঙালী খৃষ্টান ভদ্রলোকের দাক্ষিণ্যে কলিকাতায় অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিস্ আনা মিলার্ড নাম্নী জনৈকা আমেরিকান মহিলা বোম্বাইতে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইভাবে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত নানাস্থানে অন্ধ, বধির ও বোবা, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বালক-বালিকাদের প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। তবে তাহাদের সংখ্যা যে খুব কম ছিল তাহা নহে।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে এই ধরণের বিদ্যালয় :—

অন্ধ বিদ্যালয় :—

বাংলা :—কলিকাতা ১ (আসামের জন্য ২৪টি সিট)

বেহালা	১	বিহার—	রাচী	১
কালিম্পং	১		পাটনা	১

বোম্বাই—	বোম্বাই	২	উত্তর প্রদেশ—	দেরাদুন	১
	পুণা	১		আলিগড়	১
	আমেদাবাদ	১		মৈনপুরী	১
মাদ্রাজ—		৯		লখ্নৌ	১
পাঞ্জাব—	অমৃতসর	১		বেনারস	১
	লাহোর	১		নৈনি	১
আজমীর—		১	দিল্লী—		১
					২৮টি

এই ২৮টি অন্ধ বিত্থালয়ের মধ্যে কোনো কোনোটি সহশিক্ষামূলক ছিল এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ইউরোপীয় পরিচালন-সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হইত।

অন্ধ ও বধির বিদ্যালয়

আসাম—	সিলেট	১	বিহার—	রাচী	১
বাংলা—	কলিকাতা	১		পাটনা	১
	ঢাকা	১		বোম্বাই	৮
	মৈমনসিং	১		মধ্যপ্রদেশ	১
	চট্টগ্রাম	১		মাদ্রাজ	৫
	সিউরী	১	উড়িষ্যা—	কটক	১
	বহরমপুর	১	উত্তরপ্রদেশ—	এলাহাবাদ	১
	বর্দ্ধমান	১		লক্ষ্ণৌ	১
	রাজসাহী	১	দিল্লী—		১
	বগুড়া	১			১
	বরিশাল	১			
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১			৩২

এই বিত্থালয়গুলি অধিকাংশই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ছিল।

অন্যান্য শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন শিশুদের বিত্থালয়

গুরুতর চর্মরোগ, হৃদরোগ বা অন্যান্য গুরুতর ধরণের রোগে আক্রান্ত বালক-বালিকাদের শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু পুরুলিয়া ও মাদ্রাজে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জড়ধী প্রভৃতিদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

বাংলায় একটি ও বোম্বাইতে একটি এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশেষ পরিচালিত হইত না। ইহা ছাড়া আর এক ধরণের বিদ্যালয় প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ অপরাধী ও বদ ছেলেদের সংশোধনের জন্য এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়গুলিকে বোর্ষ্টল স্কুলও বলা হইত।

বাংলায় তিনটি, মাদ্রাজে পাঁচটি, পাঞ্জাবে ২টি, বিহার, বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশে ১টি করিয়া মোট ১৩টি বিদ্যালয় ছিল। এইগুলি কারাবিভাগের পরিচালনায় পরিচালিত হইত।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অগ্রগতি

অন্ধ বিদ্যালয়—অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য আবিষ্কৃত ব্রেইলি পদ্ধতির ভারতীয়করণ ১৯৪১ সালেই সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় ব্রেইলি কোড রচনা করা হয়। একটি ব্রেইলী মুদ্রাযন্ত্রও স্বাধীনতার আগেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। একটি আদর্শ অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব ছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী পদ্ধতির ভারতীয় রূপ অধিকাংশ অন্ধবিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী-পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য ইউনেস্কোর পক্ষে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং দূরপ্রাচ্যের ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ তাহাতে যোগদান করে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়া 'ভারতীয় ব্রেইলী'র প্রবর্তন করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সমাজ কল্যাণ বোর্ড হিসাব করেন সারা ভারতে অন্ধের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ।

ভারত সরকার অন্ধদের শিক্ষার উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে অন্ধ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯টি। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী প্রেস স্থাপিত হয় এবং সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। দেরাদুনে সরকার একটি আদর্শ অন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কিছু কিছু গবেষণার কাজও চলে। ভারতে অন্ধদের জন্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারী হইত না।

সম্প্রতি ব্রেইলী প্রেসের সংগে একটি ছোটখাট কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-পর্ষদ অনগ্রসরদের শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিশন অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন।

অন্ধ-বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ ব্রেইলী-পদ্ধতিতে লেখাপড়ার কাজ ছাড়াও বাঁশ-বেতের কাজ কার্পেটের কাজ, তাঁতের কাজ, বই বাঁধাই ইত্যাদি শেখানো হয়।

মূক ও বধিরদের শিক্ষা

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মূক বধির বিদ্যালয়টি সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া মূক বধির বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সারা ভারতে পাঁচটি শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জামসেদপুরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর নানা জায়গায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত নূতন নূতন মূকবধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। অবিভক্ত বাংলায় অনেকগুলি মূকবধির বিদ্যালয় পুর্বপাকিস্তানে পড়িয়া যায়। বিভক্ত বঙ্গেও অনেক নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত অন্ধবিদ্যালয় উহাদের অন্যতম। ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত সারা ভারতে মূক বধির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৪টি এবং এইগুলিতে ২২৯০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা যতখানি শিক্ষামূলক, তাহার অপেক্ষা অধিক চিকিৎসামূলক। পোলিও, অপুষ্টি অথবা অন্যান্য কারণে কোনো অঙ্গহানি বা বৈকল্য দেখা দিলে ইহাদের নানাবিধ পেশীসঞ্চালন ও চিকিৎসার মধ্য দিয়া স্বাভাবিক করিয়া তোলার চেষ্টা হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ কোনো না কোনো হাসপাতালের সহিত যুক্ত থাকে। বিকলাঙ্গদের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ও উন্নতি ঘটিতেছে এবং নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে।

অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষাদান

শিশুর অনগ্রসরতা দূরীকরণ শিক্ষকদিগের সম্মুখে একটা বিরাট সমস্যা। কেননা নিজ নিজ শ্রেণীর নির্দিষ্ট মান সকলের সঙ্গে সমান গতিতে অনুসরণ

করিতে পারে না বলিয়াই তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখিয়া সুচিন্তিত ও বিশেষ পদ্ধতিতে তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রশ্ন উঠে। কিন্তু পূর্ব হইতেই পদ্ধতি ঠিক করিয়া লওয়া এইখানে চলে না। এই প্রতিবিধানমূলক শিক্ষাদানকালে প্রতি পদক্ষেপেই শিশুর অনগ্রসরতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষককে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। শিক্ষককে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিশুর মনের অবস্থা, অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিক্ষাগত ও শিক্ষাবহির্ভূত ক্ষেত্রে তাহার আগ্রহের কেন্দ্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। মূলতঃ এই অনুসন্ধান-লব্ধ বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই যথোপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হয়। এই দিক হইতে পিছিয়ে পড়া শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ কয়েকটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

(ক) ব্যক্তিগত সাহচর্য দান (Individual attention)

(খ) শিক্ষকের উপযুক্ত মনোভাব (Correct altitude of a teacher)

(গ) শিশুর আগ্রহের মূল কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পরিবেশন (Use of materials related to the dominant interests and motives of the child)

(ঘ) শিশুর অসুবিধাগুলি দূরীকরণের সহায়ক যথোপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন।

(ঙ) সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক পাঠদান (short, continuous lessons of systematic kind)।

ব্যক্তিগত সাহচার্য দান। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের দিক হইতেই ব্যক্তিগত সাহচর্যদানের যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে। কারণ ইহার ফলে একদিকে শিক্ষক ছাত্রকে ভালভাবে জানিবার সুযোগ পান, তাহার অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সম্যকরূপে ধারণা হয়। আবার ছাত্রও তাহার নিজস্ব গতি অনুসারে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। প্রতিবিধানমূলক শিক্ষাদানের ফলাফল কয়েকটি ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে অনগ্রসর ছাত্ররা সবচাইতে বেশী যাহা পাইতে চায় তাহা হইল ব্যক্তিগত সাহচর্য। শিক্ষাদান-ব্যবস্থার ত্রুটি এবং যথোপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রের অনগ্রসরতা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ছাত্র যখন কিছুমাত্র ব্যক্তিগত সাহচর্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তখন দিনের পর দিন সে ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য দিক হইতে দেখা যায় যে, শিক্ষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ও সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়া ছাত্র কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসিয়া ছাত্র নিজের অসুবিধাগুলি তুলিয়া ধরিতে পারে ও তাহার সহায়তায় আপন আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে।

কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদানের সার কথা হইল শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রকে জানা, তাহাদের মানসিক দৈহিক ও শিক্ষাগত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু ছাত্রকে জানিতে হইলে ধারাবাহিক ও সুসংগত ভাবে জানিতে হইবে। ছাত্রকে ব্যক্তিগত ও যথাযথভাবে জানিতে হইলে শিক্ষক শুধু তাহার বর্তমান অবস্থারই অনুসন্ধান করিবেন না, অতীতের সমস্ত বিবরণও সংগ্রহ করিবেন। এই অনুসন্ধানের কার্যে নিম্নরূপ পরিকল্পনা লওয়া যাইতে পারে।—

(১) অনুসন্ধান কার্যের প্রাথমিক পর্ব হইবে ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপন (measurement of intelligence)

(২) দ্বিতীয় পর্যায় হইবে কৃত্যভীক্ষা প্রয়োগ (applications of achievement test)

(৩) প্রতিবিধানমূলক অভীক্ষা প্রয়োজনমত প্রয়োগ করা হইবে। (application of diagnostic tests)

(৪) ইন্দ্রিয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে (sensory tests)

(৫) আগ্রহের ক্ষেত্র নির্ণয় করা হইবে (recording of interests)

(৬) ছাত্রের জীবন ইতিহাসের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে নেওয়া হইবে (brief enquiry into persoal history)

(৭) শিক্ষাগত ইতিহাসের বিবরণ নেওয়া হইবে। (enquiry into educational history)

(৮) ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রের সংগে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহার মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-ভাবনা ও উৎকণ্ঠার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

(Personal interviews, possible anxieties and conflicts of the pupil)

ছাত্রদের সম্পর্কে সমস্ত খবরাদি বিশেষভাবে সংগ্রহ করিবার পরই প্রশ্ন উঠে, শিক্ষকের দিক হইতে কি করণীয় আছে। অনগ্রসর শিশুদিগের

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় কথা হইল শিক্ষকের যথোপযুক্ত মনোভাব অবলম্বন। শিক্ষকের কাছ হইতে উৎসাহ ও আশার বাণী শুনিয়া ছাত্রগণ লেখাপড়ায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারিবে। শিক্ষককে সচরাচর ছাত্রদের পরস্পরিক পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ছাত্রদের মনে অকৃতকার্যতার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকিতে হইবে। সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও উৎসাহ প্রদানের দ্বারা তিনি যে পিছিয়-পড়া ছাত্রদিগের আচরণে সামঞ্জস্য আনয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে করিতে পারেন, এই কথা তাঁহাকে সবিশেষ মনে রাখিতে হইবে।

অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষাদান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে যথোপযুক্ত মনোভাব লইয়া শিক্ষককে কাজ করিতে হইবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপযোগী করিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত বিষয়বস্তু পরিবেশন করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষাদান প্রণালীতে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া গঠন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। নূতন পদ্ধতির মূল কথা হইবে খেলা ও কার্যের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বিষয়বস্তু ক্রম অনুসারে তাহাদের পরিবেশন করা। কেননা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের হাতের কাজের দক্ষতা যদি বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মানসিক শক্তিরও কিছুটা দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। হাতের কাজ দ্বারা আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির বিকাশ হয় বলিয়া ইহার দ্বারা মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলি বিকাশের সাহায্য হয়। অতএব অঙ্কন, মাটির কাজ, কাগজ কাটা, বাগানের কাজ ইত্যাদি সকল রকমের হাতের কাজের ব্যবস্থা করা অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পক্ষান্তরে নৃত্যগীত, খেলা, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি আনন্দদায়ক কার্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে লেখাপড়া তাহাদের কাছে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে, ফলে তাহারা লেখাপড়াকে বাহির হইতে চাপানো বলিয়া মনে করিবে না। শিশু যাহা করিতে চায়, সেই কাজে যাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে, সে দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দিতে হইবে। তিনি সর্বদা শিশুকে কার্যে আগ্রহান্বিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

সাধারণ শিশুদের কার্যক্রম অনগ্রসর শিশুদের কার্যক্রম হইতে ভিন্ন রূপ হইবে। সহজতর পাঠদানের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতিবিধানমূলক শিক্ষা দেওয়া শুরু করিতে হইবে। তাহারা যত দূর পর্যন্ত গিয়া অগ্রসর হইতে

অক্ষম হইয়াছিল, তাহারও নিম্নস্তর হইতে শিক্ষার কাজ শুরু করা প্রয়োজন। কারণ প্রথম হইতে কঠিনতর পথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহারা হতোদ্যম হইয়া পড়িবে। কিন্তু প্রথম হইতে সফলতার আনন্দ আস্বাদন করিতে পারিলে তাহারা একটু একটু করিয়া লেখাপড়ায় আগ্রহ অনুভব করিবে, সুপরিকল্পিত ও ক্রম-অনুযায়ী বিন্যস্ত ধারাবাহিক পাঠ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দিলে সে নিজ গতি অনুসারে কিছু না কিছু শিখিতে আগ্রহান্বিত বোধ করিবে।

আমেরিকায় অন্ধ ও মূক-বধিরদের শিক্ষা

আমেরিকায় যাহারা একেবারে অন্ধ, তাহাদেরই উপর প্রথম প্রথম নজর দেওয়া হইয়াছিল। পরে ক্রমশঃ একেবারে অন্ধ নয় অথবা দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ যে জীবিকা অর্জনে অক্ষম এমন ব্যক্তিদেরও চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়াও আমেরিকায় আরও নানা প্রকার অন্ধত্বের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়া থাকে। যেমন, বর্ণান্ধ, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি শিল্পে কাজ করার পক্ষে নিরাপদ নয়, অথবা যাহারা এমন ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন তাহাদেরও অন্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়।

একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৪০,০০০ হাজার হইতে ২৮০,০০০ ব্যক্তি অন্ধ। সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি হাজারে ১·৭ জন অন্ধ। ইহার সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ১২০০ অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা যুক্ত হয়। অন্ধত্বের কারণ হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা প্রায় ৫০ জন কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ধ হইয়াছিল এবং প্রায় শতকরা ১৭ জন দুর্ঘটনা-জনিত কারণে অন্ধ হইয়াছিল। প্রথম ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মেরীল্যাণ্ড কলোনীতে আইনানুগতভাবে অন্ধত্বনিবারণ ও চিকিৎসা সুরু হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধত্ব বিষয়ক আইন প্রণীত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৩৬ সালে সামাজিক নিরাপত্তাবিধান আইন অনুযায়ী অন্ধদের আর্থিক সাহায্যদান সুরু হয়। তাহা ছাড়া বৎসরে বৎসরে নানা আইন-কানুন প্রণীত হইতে থাকে। প্র্যাটস্মুট এ্যাক্ট, র‍্যাণ্ডোল্‌প্‌ বিল অন্ধদের নানা সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেয়।

ইংলণ্ডে মূক-বধির ইত্যাদি ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষা

ইংলণ্ডের মূকবধির প্রমুখ ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় ১৮৯২—৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে। ১৮৯৯ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মূকবধির

শিশুদের জন্য দুইটি আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আইনে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলিকে মানসিক ও ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদিগকে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ও ঐসব শিশুদের জন্য এক আইন করা হয়। ঐ আইনে বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার জন্য খুবই ভাল ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁহারা যেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সাহায্যে বিকলমনা শিশুদের বাছিয়া বাহির করেন এবং তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অভিভাবকগণেরও এই ক্ষেত্রে কর্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা তাহাদের বিকলাঙ্গ ও মানসিক বৈকল্যযুক্ত শিশুদিগকে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতে পারেন। ইংলণ্ডে বিকলাঙ্গ ও বিকলচিত্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল আছে। সেই স্কুলে পাঁচ বছর হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত পড়িতে হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের আইনে বহু সংখ্যক বিশেষ বিদ্যালয় খুলিবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অভিভাবকগণ বিশেষ বিদ্যালয়গুলি পছন্দ করেন না। ইহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডের অনেক লোকই এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলিকে 'পাগলা স্কুল' বলিয়া নাম দিয়াছেন। এই জন্য মানসিক বৈকল্য কমিটি (Mental deficiency committee) বলিয়াছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি ও বিকলমনা শিশুরা সাধারণ শিশুদের মতই সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যাহারা বিকলমনা তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। বিকলমনাদের বিদ্যালয়ে পড়ান ব্যাপারটি নানাদিক দিয়া অসুবিধাজনক বোধ হয়। এই জন্য ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের আইনে বলা হয় যে, যাহারা বিকলমনা ও বিকলাঙ্গ তাহাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খোলা হইবে এবং যাহারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তাহারা সাধারণ বিদ্যালয়েই পড়িবে।

নবম অধ্যায়
শিক্ষক-শিক্ষণ

শিক্ষকের স্থান সকল দেশেই খুবই উচ্চে। ভারতেও শিক্ষকের স্থান উচ্চে বলা যাইতে পারে, যদিও তাঁহারা আশানুরূপ অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম নন। কিন্তু যে মহান কার্যে শিক্ষকগণ নিযুক্ত, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের স্থান উচ্চে বলা যাইতে পারে। শিক্ষকগণ দেশ গঠন করিতেছেন, কারণ তাঁহারাই দেশের ছেলেমেয়েরূপ মালমসলাকে উপযুক্তভাবে গঠন ও রূপায়িত করিতেছেন। আর দেশের ছেলেমেয়েরাই উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া দেশ ও সমাজ পরিচালনা করিতেছেন। এই দিক হইতে শিক্ষকদের স্থান খুবই উচ্চে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ যুগে ভারতের শিক্ষকগণ উপযুক্ত মর্যাদা লাভ মোটেই করিতে পারেন নাই। স্বাধীন ভারতে অবশ্য সরকার ও তথা মানব-সমাজের দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে।

ভারতে প্রায় বার লক্ষ লোক শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই বার লক্ষ শিক্ষক সকলেই শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন। ইহার কিছু অংশ মাত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষাবৃত্তি যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি শিক্ষণপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে উৎকর্ষতা দেখা দিবে বলিয়া শিক্ষাবিদ্‌দের বিশ্বাস। এই কারণে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমাদের দেশ অল্প কিছুদিন হইল মাত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। শিক্ষার সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারই করিয়াছেন। অতএব শিক্ষকদের জন্য অন্যান্য দেশে শিক্ষণের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, আমাদের পরাধীন দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা হয় নাই।

ভারতে শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই শুরু হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। ঐ সময় হইতে বর্তমান কাল

পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণের তিনটি ধারা আমরা দেখিতে পাই। যথা—ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার পড়ো দ্বারা শিক্ষাদান রীতি, শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক-শিক্ষা।

ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার পড়ো

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদান ভাল ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিলেও, ঐ রীতি যে তখনই সৃষ্ট হইয়াছে এমন নহে। ভারতে বহু পূর্বকাল হইতেই এই রীতির প্রচলন আমরা দেখিতে পাই। শিক্ষক বিভিন্ন মানের ছাত্রদের পড়ান। অতঃপর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শিক্ষক উচ্চমানের একজন ছাত্রকে দিয়া নিম্নমানের ছাত্রদের পড়ানর ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ভারতের এইরূপ শিক্ষাদান রীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাদ্রাজের প্রধান যাজক ডাঃ বেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মাদ্রাজের অন্তর্গত এগমোরে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সেনাসমূহের অনাথ শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রমে শিক্ষাদানের জন্য সর্দার-পড়ো দ্বারা শিক্ষাদান রীতির অনুসরণ করেন। ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার-পড়োর দ্বারা পড়ানোর রীতিকে ইংরাজিতে 'Monitorial System'ও বলা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকে একটি পড়াশুনায় অগ্রসর ছাত্র। সেই অগ্রসর ছাত্রগণ নিজ নিজ দলের ছাত্রদের শিক্ষাদান করিত এবং তাহারা পরে শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের অগ্রগতির হিসাব দিত। Dr. Bell এই শিক্ষাদান রীতি সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; পুস্তকটির নাম হইল 'An experiment in Education made at the Male Asylum at Madras, suggesting a system by which a School or a family may teach itself under the superintendence of the master or the parent'.

Dr. Bell এর এই শিক্ষাদানরীতি পুরাতন ভারতীয় শিক্ষাদানরীতি হইলেও ইহা ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব দেখা দেয়। ঐ সময় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। এদিকে শিক্ষকের সংখ্যা কম, শিক্ষার চাহিদা বেশী। এই কারণে ইংলণ্ড Dr. Bell এর monitorial system গ্রহণ করিয়া অগ্রসর ছাত্রদের দ্বারা নিম্নমানের ছাত্রদের পড়াইয়া শিক্ষাদান

সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। Dr. Bell এর এই monitorial system সামান্য পরিবর্তন করিয়া এই পদ্ধতিকে নানা নামে অভিহিত করা হয়। যথা—Lancastrian plan, Glasgow plan, Pupil teacher system ইত্যাদি।

ডেনমার্কের খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সব প্রতিষ্ঠানে Dr. Bell এর বা Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়া হইত মাত্র। শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে কোন নূতনত্ব ছিল না।

বোম্বাইতে The Bombay Native School Book and School Society নামে একটি সংস্থা ছিল। ঐ সংস্থা একটি সমিতি স্থাপন করিয়া বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উহার সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করিতে বলেন। ঐ সমিতি ঐ প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা ত্রুটি ত্রুটি দর্শাইয়া ঐ সব অপসরণ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ঐ সুপারিশের মধ্যে শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষক-শিক্ষণের প্রস্তাবও ছিল। শিক্ষণ-কেন্দ্র সমূহে Lancastrian পদ্ধতি শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা ছিল।

মাদ্রাজে সার টমাস মুনরোর নির্দেশক্রমে মাদ্রাজে ১৮২৬ সনে শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, এই সব প্রতিষ্ঠানেও Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকদিগের শিক্ষণ-ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই সকল বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এই সময় কয়েকটি সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে এলফিনষ্টোন ইন্‌সটিটিউশন, পুনা সংস্কৃত স্কুল এবং সুরাট ইংরেজী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা, আগ্রা, মীরাট, বেনারস প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৮৫৪ সনের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে এক সুপারিশ করে। ইংলণ্ডের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে সুপারিশ করা হয়। যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক হইতে চান, তাঁহাদের বাছাইয়ের পর তাঁহারা সামান্য বৃত্তির বিনিময়ে কোনও বিদ্যালয়ের

শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হইবেন। সেই শিক্ষকগণ ঐ শিক্ষার্থী শিক্ষককে অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান দান করিবেন এবং সেই জন্য ঐ শিক্ষকগণ কিছু ভাতাও পাইবেন। শিক্ষার্থী শিক্ষক কিছু দিন ঐভাবে কার্যকরী জ্ঞান লাভ করিবার পর শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে। নির্দ্দিষ্টকাল ঐ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শিক্ষাদানের সার্টি-ফিকেট লাভ করিবেন এবং তখন তাঁহারা বিদ্যালয়ে উচ্চতর মাহিনায় নিযুক্ত হইবেন।

কিন্তু ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী বিশেষ কিছু কাজ হয় না। ১৮৫৯ সনের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচে দেখা যায় যে ১৮৫৯ সনের পরে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য নূতন সরকারী সাহায্যদানের নিয়মাবলী প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষণ গ্রহণের চাহিদা দৃষ্টি হয় এবং ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে ১০৬ নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। এই সমস্ত নর্মাল স্কুলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিক্ষণ লাভ করিতেন। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণসূচী বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পূর্বে Lancastrian পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা হইত। এই সময়ে ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষকদিগকে শিক্ষানবিশী করিবার সুযোগ দেওয়া হইল মাত্র।

যদিও ১৮৫৪ সনের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, তবুও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ডেসপ্যাচের প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে কিছু হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের Indian Education Commission এর পূর্বে ভারতবর্ষে মোটে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ছিল—একটি ছিল মাদ্রাজে, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে; অপরটী ছিল লাহোরে, উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ছিলেন ৮জন গ্রাজুয়েট; আই, এ পরীক্ষার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ ৩ জন, এবং ১৮ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। লাহোর কলেজে ৩০ জন ছাত্র ছিল এবং তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আই. এ. পরীক্ষার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার পাশের উপর। যদিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে

শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য ছিল, তবুও তাঁহারা একই পাঠ্যসূচী পাঠ করিতেন। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত কোন পাঠদান করিবার বিদ্যালয় (practising schools) ছিল না। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে শিক্ষকগণ ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে কতটা শিক্ষা করিয়া আসিতেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিলে দেখা যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে সাতটি পুরুষদের জন্য এবং দুইটি মেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছিল। শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৫৩৩ জন। মধ্য প্রদেশে পুরুষদের জন্য চারিটি এবং মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলাদেশে এই জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা ছিল ২৬টি এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও ৪৬টি নূতন নর্মাল ইস্কুল খুলিবার জন্য ১৪৬,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নাই, কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদৌ শিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহা নিয়া মতদ্বৈধতা দেখা গিয়াছিল। যাহারা শিক্ষণের পক্ষপাতী নহেন তাঁহারা মন্তব্য করেন যে, ভাল শিক্ষিত এবং বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা পাইলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার কোনই প্রয়োজন নাই। এই মতবিরোধের ফলে নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছিল। মাদ্রাজে ঐ সময়ে ৩২টি ট্রেনীং ইস্কুল ছিল, এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৯২৭টি। পূর্বে বলা হইয়াছে, সমগ্র ভারতে নর্মাল স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি এবং তাহাদের শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৩,৮৮৬ এবং ঐ সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষকের ব্যয় হইত প্রায় ৪লাখ টাকা।

১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ১০৬টি নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত হইলেও ঐ সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য মাত্র দুইটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখানেও শিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ততার দাবী করা হয় বলিয়া ঐদিকে প্রসারও বন্ধ করা যায়।

শিক্ষক-শিক্ষণ (১৮৮২-১৯৪৭) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন অবশ্য উপরোক্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেন। কমিশন বলেন যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী করিতেই হইবে। কমিশন বলেন যে, নর্মাল ইস্কুলের সংখ্যা শুধু বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, ভারতের সর্বস্থানে ইহার স্থাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিশন এই সূত্রে সুপারিশ করেন যে, সরকারী ও বেসরকারী নর্মাল ইস্কুলগুলি এমন ভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে স্থানীয় প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য যে টাকা খরচ হইবে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ টাকা হইতে ব্যয় হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করেন যে, প্রত্যেক মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষানীতি এবং পাঠদানে দক্ষতা লাভ করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারূপে গণ্য হইতে হইলে তাঁহাদিগকে এই সব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। কমিশনের প্রস্তাবে ইহাও দেখা যায় যে, যদি কোন গ্রাজুয়েট নর্মাল ইস্কুল হইতে শিক্ষানীতিতে ও পাঠদানে পারদর্শিতা লাভ করিতে চান, তাহা হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত যথার্থভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশ অনুসারেই শিক্ষক-শিক্ষণের উপর এতটা গুরুত্ব দেখা যাইতেছে। সরকারী শিক্ষা-সিদ্ধান্তও (১৯০৪) শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বি. এ. পাশ (গ্রাজুয়েট) এবং বি. এ. পাশ নন (আণ্ডার গ্রাজুয়েট) শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদানের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। পাঠ্যসূচী ও শিক্ষণের ধারা এই দুই দিক দিয়াই পার্থক্য থাকিবে বলিয়া কমিশন সুপারিশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখা যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ছয়টি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় ও পঞ্চাশটি শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইয়াছে মাদ্রাজ, লাহোর, রাজামুন্দ্রী, কার্শিয়াং, জব্বলপুর এবং এলাহাবাদে।

ইহার পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ঐ সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, যে সমস্ত

প্রদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নাই, সেই সব প্রদেশে অবিলম্বে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং উহাদের উন্নতির ধারা ঐ সিদ্ধান্তে উল্লিখিত আছে।

(১) উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চতর শিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের উপযুক্ত কর্মচারী হইয়া উঠিতে পারেন।

(২) সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, ঠিক ততটা গুরুত্বই আরোপ করা হইবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ দানের জন্য শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর।

(৩) বি. এ. পাশদের (গ্রাজুয়েট) শিক্ষণকাল হইবে এক বৎসর সময় এবং শিক্ষণশেষে সাফল্য লাভ করিলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইবেন। পাঠ্যক্রমের মধ্যে নির্দেশ থাকিবে যে শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, শিক্ষানীতির অন্তর্গত শিক্ষাদানের কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং চিত্রকলা শিক্ষা ব্যাপারেও তাঁহারা কিছুটা যান্ত্রিক কুশলতা অর্জন করিবেন।

যাঁহারা বি. এ. পাশ নন, অর্থাৎ আণ্ডার-গ্রাজুয়েট তাঁহাদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা অন্যরূপ হইবে। তাঁহারা দুই বৎসর কাল শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে এমন জ্ঞান লাভ করিবেন যেন তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাতে পরিণত হতে পারেন।

(৪) শিক্ষাদানের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সঙ্গে উহার ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবহিত হইবেন এবং এইজন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাঠদান শিক্ষার জন্য প্র্যাকটিসিং ইস্কুল যুক্ত থাকিবে।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণকাল শেষের পর যাহাতে যে সমস্ত শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি শিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ প্রদান—লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

করেন। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তিনি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান বেশী করিয়া স্থাপন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। কারণ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা শতকরা হিসাবে খুব কম ছিল। লর্ড কার্জন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষণকাল দুই বৎসরের কম কিছুতে হইবে না। লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান হইতেছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য কৃষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণের সুপারিশ। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই আসিয়া থাকে কৃষিজীবীদের পরিবার হইতে, অতএব গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে লর্ড কার্জন কৃষি শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকশিক্ষিকাদের ঐ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ গ্রহণের সময় কৃষিশিক্ষা গ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াদিলেন।

এদিকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ফলে বেশী সংখ্যক শিক্ষকগণকে শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হইতে দেখা যায়, পক্ষান্তরে সরকার আরও বেশী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে শিক্ষণের জন্য আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হয় যে যদি কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদানের উপযুক্ত সার্টিফিকেট (শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত) না থাকে, তবে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে দেওয়া হইবে না। অবশ্য এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত করিতে হইলে বহুসংখ্যক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন, এবং খুব তাড়াতাড়ি তাহার প্রবর্তন করাও সম্ভবপর হইবে না। সে যাহাই হউক সরকারী সিদ্ধান্তের সুপারিশ অনুযায়ী খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ দেখা যায়। ফলে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩তে গিয়া দাঁড়ায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা ছিল মোট ৬।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্ত এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্ত হইতে একটি সুদূরপ্রসারী ফল দেখা গেল। (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, (২) গ্রাজুয়েট ও

আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পাঠ্যক্রম ও ভিন্ন শিক্ষাকাল গৃহীত হইল এবং (৩) প্রত্যেক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের সহিত পাঠদান সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য প্র্যাকটিসিং স্কুল খোলা হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষণের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন বলেন যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। কমিশন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষণ-বিভাগ খুলিবার জন্য সুপারিশ করেন। এই কমিশন প্রত্যেকটি শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি Demonstration School বা পাঠ প্রদর্শনীর জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা সুপারিশ করেন। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলিতে শুধু শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাই পাঠদান অভ্যাস করিবেন না, শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও এই বিদ্যালয়ে আদর্শ পাঠদান করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষা দিবেন। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২১টি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১,২৫৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐসব শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণদানের জন্য ৬৯৫টি নর্মাল ইস্কুল ও গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়ন করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভাল ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁহাদের মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ ও শিক্ষামূলক সভার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা শিক্ষণ সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে যাহাতে ভাল ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কাজে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইয়া আসেন।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের পর হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা এবং শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখিলেই ঐ সময়কার শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিব।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা হইতেই ঐ যুগের শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করিতে পারা যাইবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১৯৩১—১৯৪৭

প্রতিষ্ঠান	১৯৩১-৩২	১৯৩৬-৩৭	১৯৪০-৪১	১৯৪৬-৪৭
শিক্ষক-শিক্ষণ মহা-বিদ্যালয়	২৩	২৩	২৫	৩৪
শিক্ষার্থী-সংখ্যা	১,৫৮২	১,৭৭৯	২,২১৮	২,৪৯৩
নর্মাল স্কুল, গুরু ট্রেনিং স্কুল ইত্যাদি	৪২৫	৩৩৪	৩৭৬	৩৩৮
শিক্ষার্থী-সংখ্যা	২১,৮২৩	১৯,১২৫	২২,৪৩৫	২৩,৭৫৪
মেয়েদের নর্মাল স্কুল	২০৯	২০৫	২৩৬	১৮৯
শিক্ষার্থী-সংখ্যা	৬,৯৪৫	৭,০৮২	৮,৮৯৬	১০,১৯৩

উপরের সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা অপ্রচুর ছিল। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ছিল ৪, ৭৮,১৯৩। এই সংখ্যার শতকরা ৪৩ জন ছিল শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮·৭, এবং ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার হার ছিল শতকরা ৩৮·৫।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণের অপ্রাচুর্যের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এই পরিকল্পনাকে সমিতির সভাপতির নাম অনুসারে সার্জেন্ট পরিকল্পনাও বলা

হইয়া থাকে। কমিটি বলেন যে, যত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে, সেই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে যে সব শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ মৃত্যু এবং অবসরজনিত খালি হইয়াছে, সেই সব পদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষাদান করা নাকি চলে না, নূতন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষাদান ত দূরের কথা। ইহা খুবই নৈরাশ্যজনক কথা অর্থাৎ শিক্ষণ-দানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সেই সময় বিশেষ অভাব ছিল। অতএব কমিটি সুপারিশ করেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র নূতন শিক্ষণ-বিদ্যালয় অচিরে স্থাপন করিতে হইবে।

সার্জেন্ট কমিটি শিক্ষণ ব্যাপারে অন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। কমিটি বলেন যে স্কুল ফাইনাল কোর্স শেষ হইবার মুখে উপযুক্ত সংখ্যক কিশোর, কিশোরীকে শিক্ষাদান কার্যের জন্য বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহাদিগকে তখনই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোন ফি গ্রহণ করা হইবে না, পক্ষান্তরে গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা থাকিবে। শিক্ষাক্রম হইবে বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক এবং ঐ শিক্ষার্থীরা যে সব জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ করিবে, তাহাদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ (Refreshers Course) এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে বিদেশে গিয়া গবেষণা ইত্যাদি করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটি প্রাথমিক দুরবস্থা ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা-গণের দুরবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি গাঁথিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের ঐ সামান্য বেতন দিলে চলিবে না। কমিটি ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বর্ধিত হারে বেতনের সুপারিশ করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পারদর্শিতাগত মানের বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

কমিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার পারদর্শিতা সম্বন্ধে যেসব সুপারিশ করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) সরকারী বা বেসরকারী যে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ঢুকিবার জন্য সর্বনিম্ন পারদর্শিতা হইতেছে প্রবেশিকা বা অনুরূপ পরীক্ষায় পাশ। ১৬ বৎসরের নীচে কেহ শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

(৩) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের স্তরের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই গ্রাজুয়েট হইবেন।

(৪) নার্সারি এবং শিশুবিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষাদান করিবেন তাঁহারা সকলেই হইবেন শিক্ষিকা। কমিটি এই মত প্রকাশ করেন ৮ বৎসরের নীচে যেসব ছেলে মেয়ের বয়স, তাহারা শিক্ষক হইতে শিক্ষিকার শিক্ষাদান দ্বারা বেশী উপকৃত হইবে।

(৫) প্রাথমিক, নার্সারি, শিশু-বিদ্যালয় ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগ্রহণকাল হইবে ২ বৎসর। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগের শিক্ষাদান হইবে ৩ বৎসর এবং উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের শিক্ষণকাল হইবে ১ বৎসর, ১৮ মাস হইলেই ভাল।

(৬) প্রাথমিক ও নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরর (নার্সারি ও শিশু বিদ্যালয়-সহ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য যে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট আছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ থাকিবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিষয়গুলি জানিবার ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে স্থানীয় সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, জানিতে হইবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

স্বাধীনতার পর শিক্ষণ-শিক্ষার অগ্রগতি

ভারতে যত রকমের পেশা আছে, শিক্ষকতা তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ শিক্ষকতায় নিযুক্ত।

ভারতে বিংশ শতকেরও বেশ কিছু দিন পর্য্যন্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ (Training) দেওয়ার কাজ চলিতেছিল। অতি সম্প্রতি শিক্ষণের (Training) বদলে শিক্ষা (Education) কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে। বলাই বাহুল্য 'শিক্ষা' কথাটি ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষণের যে রীতি-নীতি, সংগঠন এতদিন পর্যন্ত ছিল, তাহা এখন অনেক পরিমাণে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতার পর আরও বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে রাখিয়া Teacher Eduction বলা হইতেছে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের মর্যাদা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই সেই মর্যাদাকে পূর্ণভাবে রক্ষার জন্য যাবতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন। তাহা ছাড়া প্রাক্-স্বাধীনতা কালে যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হইত তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। তাহা ছাড়া কিলপ্যাট্রিকের উক্তিটি স্মরণীয়; "One trains circus performers, and animals, but one educates teachers" বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের পর শিক্ষকদের আদর্শের ও মনোভাবের পরিবর্তনে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অভ্যাসে গুরুতর পরিবর্তন আসিল। ফলে 'শিক্ষণ' এই শব্দের বদলে 'শিক্ষা' কথাটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টেও শিক্ষকদের শিক্ষা এই বিষয়টির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখন সারা ভারতের শিক্ষণব্যবস্থাকে 'Teacher Education' হিসাবে গড়িয়া তোলার প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার যে ছক তাহা নিম্নরূপ।—

(১) প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য
(২) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য
(৩) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য—প্রাকপর্যায়ের
(৪) মাধ্যমিক স্তরের স্নাতকদের জন্য
(৫) বিশেষ ধরণের শিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য
(৬) মহিলাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা।

প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা

প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে হয় নাই। ইহার ব্যবস্থা অপ্রচুর বলিলেই হয়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে পরিলক্ষিত হয়, মাত্র ৩২টি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা কেন্দ্র ভারতে আছে। ইহাদের মধ্যে সরকার পরিচালিত মোট ৩টি, অপরগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ঐ সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পুরুষ মাত্র ৭৮জন এবং মহিলা, ১,৬৬১জন। এই সমস্ত শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ বা প্রাইমারী সার্টিফিকেট পাশ করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লওয়া হয় এবং শিক্ষাকাল একবৎসর।

এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যক্রম একই প্রকারের নয়। বিভিন্ন ধরণের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যথা কিণ্ডারগার্টেন, মন্টেসরী, প্রাক্-বুনিয়াদী ইত্যাদি প্রাক্-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী এই সমস্ত প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রের পাঠ্যক্রম নির্নীত হইয়া থাকে। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রের কর্মসূচী সাধারণতঃ কর্মকেন্দ্রিক এবং উহা নিম্নরূপ: (১) সমষ্টিজীবন সংগঠন, (২) সামাজিকতা শিক্ষণ, (৩) শিশুপর্যবেক্ষণ, (৪) শিশুশিক্ষার ইতিহাস, (৫) প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি ও লক্ষ্য, (৬) প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয়বস্তু, (৭) কর্ম-সংগঠন, (৮) পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য, (৯) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (বাগানের কাজ ও পশু পালন সহ), (১০) ভাষা ও সাহিত্য, (১১) সঙ্গীত ও ছন্দ, (১২) শিল্প-কলা।

কোনও কোনও কেন্দ্রে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উচ্চতর কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং Child Developmentএ এম. এস্.সি. ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিহারের বিক্রমে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, উহা শিশু পর্য-বেক্ষণের পরীক্ষণাগার।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার Indian Committee on Early Child-hood Education নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি পরামর্শদাতা জাতীয় কমিটি হিসাবে কাজ করিবেন এবং মাঝে মাঝে শিশুশিক্ষার উন্নতিমূলক ব্যবস্থার কথা সুপারিশ করিবেন। এই কমিটি দেশের বেসরকারী শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনও করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষণ-বিদ্যালয়

ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত—বুনিয়াদী ও অবুনিয়াদী। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৮৫৬টি বুনিয়াদী এবং ২৫৮টি অবুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ৯৮৩০৭ এবং ৩৪,২৯১ জন। এই সমস্ত শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান নানাভাবে

পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষণ-কেন্দ্র ছিল সরকারী এবং তারপরই আছে সাহায্যপুষ্ট (aided) শিক্ষণ-কেন্দ্র। তাহা ছাড়া বেসরকারী সাহায্যবিহীন ইত্যাদিও কয়েকটি কেন্দ্র আছে।

এই দুই ধরণের অর্থাৎ বুনিয়াদী ও অবুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে দুই ধরণের ছাত্রছাত্রী আসিয়া সমবেত হয়।—(১) প্রাইমারী সাটিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা অর্থাৎ যাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে ৭ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিয়াছেন এবং (২) প্রবেশিকা পরীক্ষায় বা স্কুল ফাইনাল পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষণকাল প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুই বৎসরকাল। কিন্তু শিক্ষণশেষে প্রথম ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকারা জুনিয়ার সার্টিফিকেট এবং দ্বিতীয় ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সিনিয়ার সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নিয়ম। পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষণ-কাল এক বৎসর। প্রথম ও দ্বিতীয় ধরণের এই উভয় ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একই রকম সার্টিফিকেট পাইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল হইতে পাশ করিলে প্রাইমারী ট্রেনিং সার্টিফিকেট পাশ এবং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে পাশ করিলে ঐখানকার সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন।

অবুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু প্যাটার্ণ প্রায় একইরূপ। সাধারণ পাঠ্যক্রম হিসাবে পাঞ্জাবের পাঠ্যক্রম দেওয়া হইল। ইহা নিম্নরূপ :—

যথা, প্রথম পত্র—একটি ভারতীয় ভাষা (উর্দু অথবা হিন্দী অথবা পাঞ্জাবী)। দ্বিতীয় পত্র—অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষাপদ্ধতি। তৃতীয় পত্র—সাধারণ জ্ঞান, পৌরনীতি ও প্রাথমিক বিজ্ঞান পদ্ধতি-শিক্ষা। চতুর্থ পত্র—শ্রেণী-পরিচালন। পঞ্চম পত্র—সাধারণ শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাতত্ত্ব। ষষ্ঠ পত্র—হিন্দী অথবা পাঞ্জাবী।

পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষাদান ছাড়া শিক্ষার্থীদিগকে নানা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান ও হস্তশিল্প শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে।

সিনিয়ার সার্টিফিকেটের শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও প্রায় জুনিয়ার শিক্ষার্থীদের মতই, কিন্তু একটু উন্নত পর্যায়ের। তাহা ছাড়া পার্থক্যের মধ্যে হইল প্রথমতঃ, দ্বিতীয় পত্রে—অঙ্ক পদ্ধতির সাথে বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা পদ্ধতিও শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, চতুর্থ পত্রে—বিদ্যালয়-সংগঠন সম্বন্ধেও

শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, হস্তশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষার্থীকে দুইটি বিষয় শিক্ষা করিতে হয়—পশুপক্ষী পালন, বাড়ী নির্মাণের কাজ, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প, রংএর কাজ, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, যন্ত্রবিদ্যা, বস্ত্র তৈয়ারী, কম্বল তৈয়ারী, রেশমগুটি পালন, গোপালন, মৌমাছি পালন।

বুনিয়াদী শিক্ষণে নঈতালিমে শিক্ষানীতি পালিত হইয়া থাকে। এইখানে কয়েকটি মূলশিক্ষা ও সাহায্যকারী শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মহিলাদের গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিখিতে হয় শিক্ষানীতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা, শিক্ষাদান-পদ্ধতি। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিতে হয়। কুড়িটি অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠদান, ৫০টি পাঠদান পর্যবেক্ষণ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এক সপ্তাহকাল ক্রমাগত পাঠদান, বিভিন্ন শ্রেণীতে একত্রে পাঠদান ৩টি ও দুইটি শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী করিতে হয়।

পুস্তকাশ্রয়ী-শিক্ষা ৬টি পত্রে গ্রহণ করিতে হয়—(১) আঞ্চলিক ভাষা (পাঠ্যপুস্তক), (২) আঞ্চলিক ভাষা (সাধারণ), (৩) হিন্দী (৪) সমাজ-বিদ্যা, (৫) সাধারণ বিজ্ঞান, (৬) সাধারণ অঙ্ক বা সংস্কৃত।

ইহা ছাড়া সমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাও শিক্ষার্থীদিগকে অর্জন করিতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষণ-বিদ্যালয়

মধ্য কিংবা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রাক্-স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ম্যাট্রিক কিংবা ইণ্টারমিডিয়েট পাশ শিক্ষার্থীসমূহ মাধ্যমিক শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য শিক্ষা পাইয়া থাকেন। শিক্ষণকাল রাজ্যভেদে এক কিংবা দুই বৎসর এবং শিক্ষণশেষে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্য-শিক্ষাবিভাগ হইতে সার্টিফিকেট কিংবা ডিপ্লোমা পাইয়া থাকেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে T. D. এবং কোনও স্থানে Dip. T, দেওয়া হয়, কোনও কোনও রাজ্য-শিক্ষা-বিভাগ S. T. C., M. P. C. T. ইত্যাদি সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন।

পাঠ্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়-ভেদে এবং রাজ্যভেদে বিভিন্ন, কিন্তু উহা মূলতঃ প্রায় একই প্রকার। যথা—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, বিদ্যালয়-সংগঠন, স্বাস্থ্য ও পাঠদান।

শিক্ষণ-মহাবিত্মালয়

ভারতের গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ শিক্ষণ-মহাবিত্মালয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী ধরণের শিক্ষণ-মহাবিত্মালয়ের সংখ্যা ছিল ২৫৯টি এবং অবুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিত্মালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮০টি। বেশীর ভাগ মহাবিত্মালয়েই পুরুষ ও মহিলা একত্রে পড়িয়া থাকেন। ভারতের শিক্ষণ-মহাবিত্মালয়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত—অবুনিয়াদী ও বুনিয়াদী।

অবুনিয়াদী মহাবিত্মালয়গুলিতে শিক্ষাকাল প্রায় ১ বৎসর এবং শিক্ষণান্তে শিক্ষক-শিক্ষিকারা B. ED., B. T., L. T., অথবা Dip in Education ইত্যাদি ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। পাঠ্যক্রমের ধারা সাধারণতঃ নিম্নরূপ—(১) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান, (২) শিক্ষানীতি ও সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতি, (৩) বিত্মালয়-পরিচালন এবং প্রশাসন ও স্বাস্থ্যবিধি, (৪) শিক্ষাদান-পদ্ধতি, (৫) শিক্ষার ইতিহাস, (৬) পাঠদান।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিত্মালয় এই দেশে অনেকগুলি স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষণ-কাল সাধারণতঃ এক বৎসর, এবং পাঠ্যক্রম সাধারণতঃ নিম্নরূপ।—

(১) শিক্ষাতত্ত্বের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান, (২) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, (৩) শিক্ষা-প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান অথবা শিক্ষা-পদ্ধতির গবেষণা, (৪) বুনিয়াদী শিক্ষাদান-পদ্ধতি, (৫) শিল্প কাজ, (৬) সমাজ জীবন যাপন। নানারূপ ব্যবহারিক কাজও এইখানে করিতে হয়—অভীক্ষা তৈয়ারী ও প্রয়োগ, শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী ইত্যাদি।

বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিত্মালয়সমূহে বেশীর ভাগই সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং সরকারই শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষণান্তে ডিপ্লোমা দিয়া থাকেন। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটি বা রামচন্দ্রন কমিটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিত্মালয় সম্বন্ধে মহাবিত্মালয়ের আওতায় আনিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

বিশেষজ্ঞদের জন্য শিক্ষণ-কেন্দ্র

বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণদানের জন্যও ভারতে শিক্ষণ-ব্যবস্থা আছে। যথা— শারীর শিক্ষা, কান্তিবিত্মা (Aesthetic Education), গৃহ বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি।

শারীর শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর ও প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষণ-ব্যবস্থা আছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ভারতে ১৮টি শারীর শিক্ষণ কলেজ এবং

৪৪টি শারীর শিক্ষণ বিদ্যালয় আছে। ইহাদের শিক্ষণকাল ১ বৎসর এবং শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। এই সকল শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এমন অনেক শিক্ষণকেন্দ্র আছে যেখানে তিন মাস ব্যাপী স্বল্পকালীন শারীর শিক্ষণ দান করা হইয়া থাকে।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গোয়ালিয়রে ১০০ একর জমিতে লক্ষ্মীবাই কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষণকাল ৬ বৎসর এবং শিক্ষণান্তে ডিগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ কলেজ ভারতে মাত্র একটিই। এই কলেজে শারীর শিক্ষার নীতি, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কান্তিবিদ্যা (Aesthetic Education) শিক্ষার ব্যবস্থা এই দেশে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামান্য কয়েকটি শিক্ষণ কেন্দ্রই ভারতে আছে। ঐ সমস্ত শিক্ষণকেন্দ্র হইতেছে—(১) সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার জন্য বিশ্বভারতী, (২) চিত্রকলার জন্য বোম্বাইয়ের জে, জে স্কুল অব আর্টস, (৩) চারুকলার জন্য বরোদার এম, এস বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) নৃত্যের জন্য মাদ্রাজের কলাক্ষেত্র, (৫) মাদ্রাজে সঙ্গীতের জন্য শিক্ষকদের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, (৬) শিল্পকলা শিক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌয়ের গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস, (৭) শিল্প শিক্ষকদের জন্য দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব আর্ট এডুকেশন।

গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষা ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বিশেষ ভাবে প্রচলন হওয়ার ফলে ঐ বিষয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গৃহ বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য কয়েকটি শিক্ষণকেন্দ্র আছে তাহাদের মধ্যে দিল্লীর Lady Irwin College, বোম্বাইয়ের S. N. DT বিশ্ববিদ্যালয় বরোদার বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Home Science, হায়দরাবাদের গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষণ কলেজ, এলাহাবাদের Government College of Home Science for Women, কলিকাতার বিহারীলাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব হোম সায়েন্স উল্লেখযোগ্য।

শিল্পশিক্ষা। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তরে শিল্পশিক্ষা শিক্ষণীয় বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ফলে শিল্প-শিক্ষকের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় ব্যবস্থা অনেক রাজ্যে আছে। এইরূপ শিক্ষণীয় ব্যবস্থা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গেই আছে। বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইল ভূগোল, ইংরাজী, হিন্দী। ইহার শিক্ষণকাল ১ বৎসর।

শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থা

শিক্ষিকাগণ শিক্ষকদের সাথে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য আলাদা শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানও অনেকগুলি আছে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা

শিক্ষাবিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষণদান ও গবেষণার ব্যবস্থা খুবই অল্প দিন হইল ভারতে হইয়াছে। এই শিক্ষণ-ব্যবস্থা দুই ধরণের—যথা (১) M. Ed. B. T. কিংবা B. Ed. ডিগ্রীর পর দুই বৎসর শিক্ষণকাল এবং Ph. D. (M. Ed. এর পর দুই বৎসর শিক্ষাকাল—অধ্যয়ন ও গবেষণা)।

নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে M. Ed. ডিগ্রীর ব্যবস্থা আছে।—আলিগড়, এলাহাবাদ, বারাণসী, বরোদা, বোম্বাই, দিল্লী, গোরক্ষপুর, গুজরাট, কর্ণাটক, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, মহীশূর, নাগপুর, রাজস্থান, পুনা, পাটনা, ওসমানিয়া, পাঞ্জাব, উৎকল, বিক্রম, এস. এন. ডি. টি. ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা ও গৌহাটিতে এডুকেশন এম. এ. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল মাত্র গবেষণার ভিত্তিতে এম. এড. ডিগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে।

এম. এড. ডিগ্রীর পর পর শিক্ষাতত্ত্বের উপর নূতন নূতন গবেষণার ভিত্তিতেই পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষণের ব্যবস্থা আজও বিশেষভাবে হয় নাই, তবে কোন কোন স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এই ধরণের কাজের উদ্যোগ চলিতেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে National Centre for Research in Basic Education নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মারফত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণাদি চলিবে।

১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহ এবং

বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাসম্পর্কিত গবেষণা করিবার জন্ম অর্থ সাহায্য পাইবে।

কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ-শিক্ষা

শিক্ষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষকদের শিক্ষায় দুই রকমের কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন। একরকম হইতেছে শিক্ষকতার জন্ম প্রথম শিক্ষণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা হইতেছে কর্মরত থাকা অবস্থায় শিক্ষা। শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষণ পাইলেই শিক্ষকতা কাজে খুব বেশী পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন না। কিছুকাল শিক্ষকতা করিবার পর যে অভিজ্ঞতা লাভ হইল, তাহার ভিত্তিতে কিছু শিক্ষণ গ্রহণ করিলেই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মত প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশনও এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন, "Intrused efficiency will come through experience critically analysed and through individual and group effect at improvement." অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত পারদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে।

কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্ম কার্যক্রম

বিভিন্ন সময়ে রাজ্য-শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিম্নলিখিত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

(১) ঝালাই পাঠ (Refresher Course), (২) বিশেষ বিষয়ে স্বল্পকালীন আত্যন্তিক শিক্ষাদান (intensive course), (৩) কর্মশালায় ব্যবহারিক কাজের বন্দোবস্ত, (৪) শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্র ও সভা ইত্যাদি। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা খুব ভাল ভাবে বিন্যস্ত হয় নাই।

শিক্ষণ-মহাবিত্থালয় ও সম্প্রসারণ-বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষণ-মহাবিত্থালয়ের সঙ্গে সম্প্রসারণ বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মরত থাকা অবস্থায় শিক্ষণ দান করিয়া থাকে। এই বিভাগ নানা ভাবে এই কাজ করে। প্রতি সপ্তাহের শেষে শিক্ষণের ব্যবস্থা, অল্পকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং দীর্ঘকালীন শিক্ষা ইত্যাদি সম্প্রসারণ-বিভাগ শিক্ষণের জন্ম আয়োজন করে।

এই জাতীয় শিক্ষণ-কর্মশালা, আলোচনা-চক্র, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা, শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী, শিক্ষাক্ষেত্রে পথ নির্দেশনা সম্বন্ধীয় আলোচনা-চক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনা, শ্রাব্যদৃশ্য শিক্ষা-সরঞ্জামের ব্যবহার, পুস্তক প্রকাশন ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষকতার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হইয়া থাকে।

প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা-বিভাগের উপরস্থ কর্মচারীদের জন্য আঞ্চলিক আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থাও শিক্ষা মন্ত্রণালয় করিয়া থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় পনেরটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন। আঞ্চলিক আলোচনা-চক্র ছাড়াও নিখিল ভারত আলোচনা চক্রের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এই সকল আলোচনা চক্রে, পরীক্ষা পরিচালনা, বিজ্ঞান শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ

রাধাকৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণান কমিশনের শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশ।

১। শিক্ষণ-শিক্ষার কার্যক্রম বা কোর্স সম্পূর্ণভাবে রদবদল করিয়া রচনা করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীর পাঠদানের উপরই সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দান করিতে হইবে।

২। পাঠদান কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় বাছিয়া লইতে হইবে।

৩। শিক্ষার্থীদিগকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বর্তমান ধারার সহিত পরিচিত হইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করা হইবে।

৪। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের যেন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে।

৫। শিক্ষণ-শিক্ষার কোর্স অত্যন্ত নমনীয় হইবে এবং স্থানীয় প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উহার রদবদল করিতে হইবে।

৬। যাহারা শিক্ষণ-শিক্ষা শেষ করিয়া অন্ততঃ পক্ষে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেই মাষ্টার্স্ ডিগ্রী অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করা যাইবে।

৭। অধ্যাপকদিগের মূল কাজসমূহ সর্বভারতীয়-ভিত্তিতে রচনা করিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) শুধু দুই রকমের শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

(ক) যাহারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে তাহাদের জন্য শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহাদের জন্য শিক্ষার কার্যকাল হইবে দুই বৎসর।

(খ) গ্রাজুয়েটদের জন্যও শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহাদের জন্য বর্তমান ১ বৎসর কাল কার্যকাল থাকিবে, কিন্তু তাহা পরে সম্প্রসারিত করিয়া দুই বৎসর কাল হইবে।

মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট

(২) গ্রাজুয়েটদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিশ্ববিত্থালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং বিশ্ববিত্থালয় তাহাদিগকে ডিগ্রী প্রদান করিবে। কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক পাশের পর শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি পৃথক বোর্ডের অধীন থাকিবে।

(৩) শিক্ষার্থীরা এক বা একাধিক পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষণ গ্রহণ করিবে।

(৪) শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিত্থালয়গুলি তাহাদের কার্যক্রমের সাধারণ অংশ হিসাবে ঝালাই পাঠের ব্যবস্থা করিবে। বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ে স্বল্পকালীন আত্যন্তিক শিক্ষণ ব্যবস্থা করিবে। কর্মশালার ব্যবস্থা করিবে।

(৫) শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিত্থালয়গুলি শিক্ষাবিষয়ক বহু গবেষণাকার্য পরিচালনা করিবে এবং এই কারণে শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিত্থালয়ের অধীন একটি পরীক্ষামূলক বিত্থালয় থাকিবে।

(৬) শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিলে শিক্ষার্থীদিগকে কোন বেতন দিতে হইবে না। তাহা ছাড়া তাহারা কিছু ভাতা পাইবে। তাহা ছাড়া যাঁহারা শিক্ষকতা করিতে করিতে শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছেন, তাহারা ভাতা ছাড়া বেতনও পাইবেন।

(৭) শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজগুলি যথাসম্ভব আবাসিক হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়।

(৮) যে সমস্ত শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা অন্ততঃ পক্ষে তিন বৎসরকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা শুধু মাষ্টারস্‌ ডিগ্রীতে ভর্তি হইতে পারিবেন।

(৯) শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে সহজ কর্মবিনিময় চলিবে।

(১০) শিক্ষিকার অভাব মিটাইবার জন্য আংশিক সময়ের জন্য মহিলা শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষণ-শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ধারা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক ও মধ্যবিদ্যালয়ের স্তরে জাতীয় শিক্ষার প্যাটার্ণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব দেখা যায়। ফলে পুরাতন শিক্ষণ-বিদ্যালয়গুলি নিম্ন বুনিয়াদী এবং উচ্চ বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হইল। ইহা ছাড়া কতকগুলি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়গুলিতে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের শিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে নূতন দিল্লীতে A National Institute of Basic Education নামে একটি বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা। ইহা ছাড়া এই সংস্থা স্বল্পকালীন শিক্ষণ এবং আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করিতেছিল। এই শিক্ষণ বা আলোচনা-চক্রে সাধারণতঃ যোগদান করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাবর্গ এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রশাসকগণ।

বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং নামে একটি সংস্থা দিল্লীতে স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য উচ্চতর ট্রেনিং এবং

গবেষণার ব্যবস্থা করা। এই উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণ বা গবেষণা করিতে পারেন শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রশাসকগণ, শিক্ষক-শিক্ষকাগণ এবং শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ। এই সংস্থাটি সম্প্রসার কার্যও করিবে। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করিয়া National Council of Educational Research and Training রাখা হইবে।

(1) The Central Institute of Education (1948).
(2) The Central Bureau of Text-Book Research (1954).
(3) The Central Bureau of Educational and Vocational Guidance (1954).
(4) The National Institute of Basic Education (Delhi 1956).
(5) The National Fundamental Education Centre. (Delhi 1956).
(6) The Directorate of Extension Programmes for Secondary, Education (Delhi 1959).
(7) The National Institute of Audio-visual Education (Delhi 1959).

উপরের সাতটি সংস্থা দ্বারা যে সমস্ত কার্য পরিচালিত হইত তাহা এখন National Council পরিচালনা করিবেন। এই National Councilএর তত্ত্বাবধানে আরও চারিটি আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজ পরিচালিত হইবে। এই আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজগুলিতে বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দেওয়া হইবে। চারিটি আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—আজমীর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর ও মহীশূরে। সময়ে এই আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজগুলি Regional Institute of Educationএ পরিণত হইবে।

রাজ্য শিক্ষা-সংস্থা

যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের দেশে কাজ হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার প্রসারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু শিক্ষার গুণগত উৎকৃষ্টতার দিকে এত দিন পর্যন্ত কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে আমাদিগকে শিক্ষার গুণগত

উৎকর্ষতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই জন্য ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার গুণগত উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। প্রথমেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতি সম্পর্কিত কাজ করিবেন। পরে ইহার কার্যক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি পাইবে।

রাজ্য শিক্ষাসংস্থা

এই সংস্থার কার্যক্রম নিম্নরূপ :—

(ক) কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান (In Service Training), (খ) প্রকাশন (Publication), (গ) গবেষণা (Research), (ঘ) সম্প্রসারণ (Expansion)

শিক্ষণ-শিক্ষার সমস্যা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যদিও শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, তবুও বলা যাইতে পারে যে দেশের সমগ্র শিক্ষার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প। উপযুক্ত পারদর্শী শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বল্পতা হেতু বুনিয়াদী শিক্ষার সম্প্রসারণ হইতেছে না এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষারও প্রবর্তন হইতে পারিতেছে না। মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই অল্প, তাহার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীগুলিতে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি বিভিন্ন রাজ্যে হইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য পেশার তুলনায় শিক্ষকতা করিয়া যে বেতন পাওয়া যায় তাহা খুবই অল্প। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার যাঁহারা পার হইয়া যান, তাঁহারা প্রথমে অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে কর্মের সন্ধান করেন। যাঁহারা ভাল ছেলে তাঁহারা অন্যত্র কর্মে নিযুক্ত হইয়া যান। যাঁহারা কোন কিছুর পক্ষে উপযুক্ত নন, তাঁহারা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাবৃত্তির মানও ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছে।

শিক্ষকদের অভাব

তাহা ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য স্তরেও নানা সুযোগ দেখা গিয়াছে। বর্তমানে ভারতের শিক্ষা একটি নূতন আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই আদর্শের খোঁজ পাওয়া যাইবে বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জীবন এবং জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপরেই খুব গুরুত্ব

আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু এই আদর্শ অন্যান্য ধরণের শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজে নাই। তবে B. T., B. ED প্রভৃতি স্তরেও এই আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। B. ED. এর পুরাতন পাঠ্যক্রম বর্জিত হইয়াছে এবং এই নূতন আদর্শকে গুরুত্ব দিয়া B. ED. এর নূতন পাঠ্যক্রম রচিত হইয়াছে।

তৃতীয় নিখিল ভারত শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজসমূহের সভায় আলোচিত হয় যে, দুই প্রকারের শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজ থাকিবার মোটেই প্রয়োজন আছে কিনা। গ্রাজুয়েটের স্তরে একই রকম শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত সমিতি স্থির করেন যে, দুইএর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা যাইতে পারে, যদি (১) পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষা কমান যায় এবং (২) ব্যবহারিক কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া যায়।

কয়েকটি শিক্ষণ-শিক্ষা অবশ্য এই সমস্যা সমাধানের দিকে গুরুত্ব দিয়াছে। বিশ্বভারতীর 'বিনয়-ভবনে' (শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজ) B. T. শিক্ষাসূচীতেই

বিনয়-ভবন ও বিদ্যা-ভবন

কার্যকাল বৃদ্ধি করিয়া সেইখানে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি ও দর্শন প্রবেশ করাইয়াছেন। উদয়পুর শিক্ষণ-শিক্ষা-কলেজ 'বিদ্যাভবনে' বুনিয়াদী শিক্ষণ এবং মামুলি শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য অপসারণের চেষ্টা করা হইতেছে।

সব চেয়ে বেশী অসুবিধা দেখা গিয়াছে শিক্ষকদের বেলায়। তাঁহারা

শিক্ষকগণ যাহা শিখিয়াছেন তাহা প্রয়োগ করিতে নারাজ

শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাহির হন বটে, কিন্তু যে পদ্ধতি তাঁহারা শিক্ষা করেন তাহা তাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে কখনও প্রয়োগ করেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শিক্ষণ-শিক্ষার বিষয় যদি প্রয়োগই না হয় তাহা হইলে শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই লাভ কি ?

তাহা ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষা কালে পাঠদান যে সমস্ত বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়, সেই সব বিদ্যালয় শিক্ষণ-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে খুব ভাল চোখে

Practicising Schoolগুলির মনোভাব

দেখেন না। বিদ্যালয় বলে যে শিক্ষণ-শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে পড়াইবার সময় যতটা পড়ান উচিত তাহা তাহারা পড়ান না, ফলে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ইহার একটা ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। দুই পক্ষের ভুল বোঝাবুঝি কিছুটা

আছে। তাহা অপসারণ করিতে হইবে। রাধাকৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেন কতকগুলি বিদ্যালয় Practicising School হিসাবে স্থির করিয়া রাখিতে হইবে যেগুলি ট্রেনিং কলেজগুলির সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করিবে। রাধাকৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেন, "make it a condition of or even recognition of suitable schools that they shall play their part in the practical training of the recruits whose services they subsquently intend to use."

শিক্ষণ-শিক্ষার আর একটি বড় সমস্যা হইতেছে যে, শিক্ষণ-শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা হইতেছে না। অবশ্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গবেষণার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় অচিরে শিক্ষণ-শিক্ষা বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণা কার্য চলিবে।

গবেষণা

দশম অধ্যায়

নার্সারী-শিক্ষা

শিশু-শিক্ষার পটভূমিকা

একেবারে ছোট শিশুদের জন্য শিক্ষা-প্রচেষ্টা আমাদের দেশের প্রাচীন কালের শিক্ষার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসে শিশুশিক্ষার নজির কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। শিশুকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে **কমেনিয়া** (১৫৯২-১৬৭১) তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক School of Infancy নামক পুস্তকে শিশুর শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। শিশুরা প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা করিবে। ইহার পর **রুশো** (১৭১২-১৭৮৮) তাঁহার Emile নামক পুস্তকে ছোট শিশুর শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। তিনি শিশুকে প্রকৃতির কোলে রাখিয়া শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছেন। পরে **হার্বার্ট** (১৭৭৬-১৮৪১) শৈশবকালের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া শিশু-শিক্ষার কথা অনেক লিখিয়াছেন। ইহার পর **ফ্রোয়েবল** (১৭৮২-১৮৫২) শিশু-শিক্ষার জন্য Kinder Garten (শিশুদের বাগান) নাম দিয়া শিশু-বিদ্যালয় খোলেন। তিনি বলেন যে, শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের বাগান এই নাম হইতেই কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতির কিছুটা স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়। (কিণ্ডার-গার্ডেন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে হইবে।) ফ্রোয়েবেলের পর **ম্যাডাম মন্তেসরী** (১৮৭০-১৯৫২) শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন কথা বলেন এবং তাঁহার পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি মন্তেসরী শিশু-বিদ্যালয় খোলেন। (পরে মন্তেসরী শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দেখুন)।

ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন শিক্ষাবিদ ছোট শিশুদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং তাঁহারা ছোটদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এইরূপ এক জন শিক্ষাবিদ হইতেছেন **ওবারলিন** (J. F. Oberlin) (১৭৪০-১৮২৬)। তিনি ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্ডব্যাক্ (Waldbach) গির্জার ধর্মযাজক হন। ঐ গির্জার

অধীনে ৫টি গ্রাম ও তিনটি ছোট গির্জা ছিল। ওয়াল্ডব্যাকের ধর্মযাজক হইয়া ওবারলিন দেখিতে পান যে, ঐ পাঁচটি গ্রামে মাত্র একটি বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়টি কুঁড়েঘরের মধ্যে অবস্থিত। ওবারলিন কুঁড়েঘরটি একটি বড় বাড়ীতে পরিণত করেন, তাহা ছাড়া অপর চারিটি গ্রামেও বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এই সময়েই ওবারলিনের মনে শিশুবিদ্যালয়ের কথা মনে হয়। Sirus তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Whilst the care of youth thus engaged, even that of infants did not escape the vigilant and benevolent mind of Oberline......He was fearful lest the little children should be exposed to danger, or should contract early habits of idleness or vice, when their parents were engaged in husbandry or at a trade; he was therefore induced to hire rooms, in which the children might amuse themselves, and be instructed, under the control of mild and affectionate women.

জার্মানীর শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে **প্রিন্সেস পলিন**-এর (Princess Pauline of Lippe—১৭৬৯-১৮২০) নাম করা যাইতে পারে। প্রিন্সেস পলিন একটি শিশুদের শিক্ষার কেন্দ্র ১৮০২ খৃষ্টাব্দে খোলেন। পলিন ১৮০২ হইতে ১৮২০ পর্যন্ত তাঁহার শিশুপুত্রের রিজেন্ট ছিলেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি কর্মকেন্দ্র খুলিবার সময় তাঁহার একটি শিশু-যত্নকেন্দ্র (children's care centre) খুলিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি একটি পত্রিকায় মাদাম বোনপার্টি কর্তৃক অনুরূপ একটি শিশুবিদ্যালয় প্যারিসে খোলার সংবাদ পাঠ করেন। উহার পরই Princess Pauline ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ডেটমল্ড-এ একটি শিশু-যত্নকেন্দ্র খোলেন।

ইংলণ্ডে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে **রবার্ট ওয়েন** (১৭৭১—১৮৫৮) স্কটল্যাণ্ডের নিউ-ল্যানার্ক গ্রামে একটি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ওবারলিন কিংবা প্রিন্সেস পলিন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি এই বিদ্যালয় খোলেন নাই। রবার্ট ওয়েন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডাঃ বেল (Dr. Bell) এবং ল্যাঙ্কেষ্টারকে (Lancaster) তাঁহার বিদ্যালয় দেখিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে **জেমস্ বুকাননের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ল্যানার্কে (Lanark) গিয়া ওয়েনের স্কুলে কাজ

গ্রহণ করেন। বুকানন (Buchanan) শিশুদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

"At New Lanark in the beginning, Buchanan made the children march round the room to the strains of the flute. Then he marched through the village, and allowed them to amuse themselves on the banks of the Clyde, and march back again. But this was not the occupation enough, and was apt to be prevented by bad weather, so he he had to invent indoor occupation of amusement for them. He began with simple gymnastic movements, arm execrises, clapping the hands, and counting the movements.

শিশুরা গান গাইত,

March away, march away.
Happy to our classes,
There we will our lessons say,
When we're in our places."

বুকানন ওয়েনের শিশুবিদ্যালয়ে বেশী দিন ছিলেন না, তিনি লণ্ডনে আসিয়া একটি শিশু-বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বুকানন নিউ জীলণ্ডে (New Zeland) শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য মনন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে যান নাই।

শিশুশিক্ষার ইতিহাসে **স্যামুয়েল ওয়াইল্ডারস্পিনের** (Samuel Wilderspin) (১৭৯২—১৮৮৬) অবদানও কম নয়। তিনি বুকাননের **ভিনসেণ্ট স্কোয়ারের** (Vincent Square) শিশু-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বুকাননের নেতৃত্বে তিনি শিক্ষকতা-বৃত্তি শিক্ষা করেন। তিনি **মিঃ উইলসন** (Mr. Wilson) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিশু-বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। বুকানন ওয়াইল্ডারস্পিনকে সাহায্য করেন এবং ওয়েনও তাঁহাকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। ওয়াইল্ডারস্পিন বুকানন ও ওয়েনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লেখেন,—

"Having taken the liberty of mentioning the name of Mr. Owen, I take the opportunity of returning my thanks to that gentleman for having visited the Spitafields infant school three or four times." বুকানন সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "In this neighbourhood, I found Mr. Buchanan; a conversation with him led···to my becoming an Infant teacher."

শিশু শিক্ষার ইতিহাসে **ডেভিড্ স্টো** (Devid Stow)এর অবদানও উল্লেখযোগ্য। তিনি ওয়েনের মতই বলেন যে শিশুদের পরবর্তীকালের শিক্ষার ভিত্তি প্রাক-প্রাথমিক-স্তরেই রচিত হয়, এবং উহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড্ স্টো (David Stow) সম্বন্ধে রাস্ক (Ruske) লিখিয়াছেন, "Stow, while he did not originate the training of infant school teachers, held fast to the view that a mature mind was essential to teaching; he opposed the monitorial or pupil-teachershi psystems, and when the enthusiasm in the infant school movement began to wane, he retained and developed the idea of a trained teaching profession.

বিংশ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষার তাৎপর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয় এবং বিভিন্ন দেশে উহা সাগ্রহে অনুসৃত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে বুয়র যুদ্ধের সময় দেখা যায় সৈন্যগণের শোচনীয় স্বাস্থ্যহীনতা। তাহা দেখিয়াই ঐ দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে অবহিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে **ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয়** ডেপ্টবোর্ড অঞ্চলে প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত করেন। দরিদ্র পিতামাতার শিশু সন্তানেরা অবহেলিত হইয়া না থাকে এই উদ্দেশ্যেই এই শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ছোট শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং ক্রমশঃ প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে বর্তমান সরকার ছোট শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ইহার প্রসার খুব বেশী মাত্রায় হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছোট শিশুদের জন্য বিদ্যালয় অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পরে ইহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এখন নানা উদ্দেশ্যে নানাধরণের নার্সারি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

চীনদেশেও নার্সারি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন খুব বেশীভাবে অনুভূত হইয়াছে এবং ফলে বহু শিক্ষিকা কিণ্ডারগার্টেন এবং মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতে প্রাক্-প্রাথমিক বা নার্সারি স্তরের শিক্ষা

ভারতে পরাধীনতার যুগেও যখনই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইয়াছে, তখনই ৬ বৎসর হইতে বালক-বালিকাদের কথাই চিন্তা করা হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বিদেশে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছিল। সরকারী তরফে যদিও এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যায় নাই কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবিত ধনাঢ্য দেশী সমাজ এবং ভারত প্রবাসী ইউরোপীয় সমাজ তাঁহাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যয়-বহুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইয়াছিলেন। ফলে ভারতের বড় বড় শহরে এবং অনেক পার্বত্য শহরে এই ধরণের বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। সেখানে পড়ানোর ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশী।

পাশ্চাত্যে অবশ্য ক্রমশঃ এই বিষয়টি স্বীকৃত হইতেছিল যে, যদিও ৬ বৎসর হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করা দরকার, তথাপি, শিশুর সুষম বিকাশ সাধনের জন্য তাহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের জন্য আলাদা বিদ্যালয় থাকা দরকার। এই জন্যও বটে, আবার জীবিকার দ্বন্দ্বে নারী সমাজ অংশ গ্রহণ করায়, নারীদের সুবিধার জন্যও দুই হইতে পাঁচ বৎরের বয়সের শিশুদের আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় পালন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বস্তুতঃ এই বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই পাশ্চাত্য দেশসমূহে নার্সারি স্তরের শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ ঘটিতে লাগিল। ভারতে অবশ্য যেটুকু নর্সারী-শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে উভয়বিধ কারণই অনুপস্থিত ছিল। কারণ ইংরাজ সরকার কোন সময়েই সমস্ত জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলার মত সদিচ্ছা পোষণ করিতেন না। ফলে

ইউরোপে যে সব রীতিনীতি নিত্য প্রবর্তিত হইতেছিল, ভারতে তাহা প্রবর্তনের চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে স্তর পর্যন্ত আইনের আওতায় আনা হইয়াছিল, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছিল না। ভারতে যেটুকু নার্সারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে ছিল আধুনিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুকরণ-স্পৃহা ও আভিজাত্য বজায় রাখার প্রয়াস আর ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়ানদের চেষ্টা। যাহাই হউক, ভারতের কতকগুলি বড় বড় সহরে এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও, পল্লীগ্রামে এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীর অভাব এত বেশী ছিল যে, তাহার পূর্ববর্তী বয়সের শিশুদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কি কর্তৃপক্ষ কি অভিভাবক কাহারও চিন্তাই ছিল না।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তখনও তাঁহার চিন্তায় সাত বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষার বিষয়টিই ঘুরিতেছিল। কিন্তু কারামুক্তির পর তিনি ঘোষণা করিলেন যে তিনি বিগত কয়েক বছর ধরিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষা হইবে সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষা। এই প্রথম দেশের সর্ব-প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখ দিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের পূর্ব স্তরেরও শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইল। গান্ধীজীর সহিত এক সময় নার্সারী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তনকারিণী মারিয়া মন্তেসরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বলাই বাহুল্য, গান্ধীজী যে প্রাচ্য সুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেন এবং যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শিক্ষাসমস্যাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে মন্তেস্বরী পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যয়বহুল নার্সারি-শিক্ষা প্রচলনের সমর্থন তিনি করিতে পারেন নাই। ফলে নার্সারী-শিক্ষা ও প্রাক্-বুনিয়াদীস্তরের শিক্ষাচিন্তা খানিকটা পৃথক হইয়া পড়ে।

সার্জেন্ট রিপোর্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। ঐ রিপোর্টেও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র জীবনের জন্য একটি সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা-পরিকল্পনা। অতএব এই শিক্ষা খুব শিশুকাল হইতে সুরু হইবে। সরকারী অর্থে পরিচালিত নার্সারি বিদ্যালয় আমাদের দেশে খুবই নূতন। শিশুরা ৩ বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত নার্সারী বিদ্যালয়ে পড়িবে। যাহাতে তাহারা পরবর্তী স্তরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য তৈয়ারী হইতে পারে। কিন্তু সকল শিশুদের জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। কতকগুলি স্থানে রাষ্ট্রচালিত বিদ্যালয় থাকিবে এবং সেগুলি দেখিয়া বেসরকারী নার্সারী-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এই ছিল সার্জেণ্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যে সমস্ত স্থানে সাধারণ লোকের বাড়ী অত্যন্ত নোংরা ও অপরিসর এবং শিশুর মাতাকেও দিনের বেলায় বাহিরে কাজ করিতে হয়, সেই সমস্ত জায়গায় মাঠ ও বাগান-সম্বলিত বাড়ীতে নাচগান, উপযুক্ত বিশ্রাম এবং ভাল শিক্ষাগার হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মধ্যেই খুব মঙ্গল হইয়া থাকে। এই শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু ইহা বাধ্যতামূলক নয়। ভারতের এই বয়সের শিশু সংস্থার এক-তৃতীয়াংশের জন্যই কমিটি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের যে আন্দোলন সুরু হয়, তাহাতে নার্সারী শিক্ষা সম্বন্ধেও সামান্য অংশ ছিল। আইন প্রবর্তন করিয়া ৬ হইতে ১১ বৎসরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হয়, কিন্তু নার্সারী স্তর বাদ পড়িয়া গেল। শুধু এইটুকু সুলক্ষণ দেখা গেল যে সরকারী ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলেও একটি দুইটি করিয়া নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে সুরু করিল।

বর্তমানে সাধারণতঃ ৪০টি করিয়া বালক-বালিকা লইয়া গ্রামাঞ্চলের প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সংগঠিত হয়। সহরাঞ্চল সম্বন্ধে একথা খাটে না। সহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী ও প্রধানতঃ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে অনগ্রসরতা পৃথিবী-বিদিত। এই অনগ্রসরতা প্রধানতঃ ভারতীয় চরিত্রের জন্যও ঘটিয়াছিল। শিক্ষার উপযোগিতা তীব্র ভাবে অনুভব করা ভারতীয়দের ধাতে ছিল না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানদের পাঠাইবার কোনো গরজই দেখা যাইত না। শিক্ষার ব্যাপারে তাই নিত্য নূতন গবেষণা ও নিত্য নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করার মতনও আবহাওয়া দেশে গড়িয়া উঠে নাই এবং কোন্ স্তরে কি রকম শিক্ষাধারা হওয়া উচিত, এ বিষয়েও কোনরূপ চিন্তার সূত্রপাত হয় নাই। ভারতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। তিনি নিজে যেটুকু পারিয়াছিলেন, তদনুযায়ী শিক্ষার একটা ধারা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু পাশ্চাত্যে বিংশ শতককে আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল 'শিশুদের যুগ' (age of child)। ইহা সর্বতোভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল নানা শিশুকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে। এই কল্যাণ প্রেরণা হইতেই শিশু-মনস্তত্ত্বের সমুন্নতি এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের অগ্রগতির ফলেই, শিশুদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রয়োজন এ মত সর্বত্র স্বীকৃত হইতেছিল। কমেনিয়াস, পেস্তালৎসি, মণ্টেসরি ও ফ্রোয়েবেল এই চারি জন মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় শিশুশিক্ষা এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে নার্সারী স্তরের শিক্ষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ মন্তেসরি ও ফ্রোয়েবেলের অবদান।

শিশু-মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে শিশুবিদ্যালয় সংগঠন এবং পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে যে গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হইতেছিল, তাহার ফলে সমগ্র শিশু-শিক্ষার ধারাই বদলাইয়া গেল। বলাই বাহুল্য, শিশুমানসের কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়াই শিশুশিক্ষা রূপ পরিগ্রহ করিল।

একথা সকলে অনুভব করিয়াছিলেন যে, শুধুমাত্র পড়াশুনা করার জন্য ৬ বছরের কম শিশুদের বিদ্যালয়ে আনিয়া আটক রাখা সম্ভব নয়। বরং তাহাদের প্রকৃতি যাহা চায় তদনুযায়ী বিদ্যালয় গঠন করাই সংগত। ফলে শিশুপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিদ্যালয় গঠন করার প্রয়াস দেখা গেল।

শিশু-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

১। খেলা। ২ হইতে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, তাহারা খুবই খেলিতে চায়। দৈহিক বিকাশের দিক হইতে দেখিতে গেলে, এই সময় তাহাদের পেশীসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং পেশী সঞ্চালনের মধ্য দিয়াই তাহারা আনন্দ লাভ করে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলিতে গেলে "Their muscles cry for exercise." অকারণে লাফাইয়া, দৌড়াইয়া, ঝুলিয়া, দোল খাইয়া, গড়াগড়ি দিয়া, ডিগবাজী দিয়া তাহারা আনন্দ পায়। আবার নানা জাতীয় খেলনা, গাড়ী, জীবজন্তু, পুতুল, ইত্যাদি লইয়া দাপাদাপি করিয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহারা আনন্দ পায়। কাজেই বিদ্যালয় সংগঠন করিবার সময় শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য

রাখিয়া বিদ্যালয় গঠন করা দরকার। শিশুরা কত বিভিন্ন বিষয়েই না আকর্ষণ অনুভব করে। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ে শিশুরা যদি কল্পনার অধিক চর্চ্চার সুযোগ পায় অথবা আপন আপন অভিরুচি মতন কাজের সুযোগ পায় তাহা হইলে খেলা করার যে আত্যন্তিক আগ্রহ তাহা পরিতৃপ্ত হয়। সে জন্য ভাল নার্সারী-স্কুলে, নানা জাতীয় খেলনা ও দৈহিক পেশী সঞ্চালনের নানাবিধ উপকরণ থাকে। অবশ্য মন্তেসরী এবং ফ্রোয়বেল খেলার সামগ্রীর নানা রকম উন্মেষ সাধন করিয়াছিলেন। সেগুলিও স্কুলে ব্যবহৃত হয়।

২। **গান**। এই স্তরের শিশুদের সবে মাত্র কথা ফুটিয়াছে। এই সময় অনুকরণ-স্পৃহা অত্যন্ত তীব্র থাকে বলিয়া, শিশু যাহা শোনে তাহাই শিখিয়া লয়। তাহা ছাড়া ঝঙ্কার-মুখর অর্থহীন ছড়ায় শিশুরা আকৃষ্ট হয়। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী-সমন্বিত ছড়ার গান শিশুর প্রিয় হয়। প্রতিটি ভাল নার্সারীতেই নানা রকম সহজ বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত নৃত্যে নিপুণা শিক্ষিকা থাকেন।

৩। **ছবি**। শিশুরা তাহাদের ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়া সবে মাত্র চক্, পেন্সিল ধরিতে শিখে এবং রং সম্বন্ধে যেমন প্রথম পরিচয় সুরু হয়, তেমনি জীবজন্তুর আকৃতিগত পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। এই রকম অবস্থায়, শিশু তাহার প্রিয় দ্রব্যগুলি আঁকিবার সহজ চেষ্টা করে। এই জন্য প্রতিটি নার্সারীতেই আঁকিবার সরঞ্জাম রাখিতে হয়। সাধারণতঃ মোটা কাগজ, গাঢ় উজ্জ্বল রং ও মোটা তুলির ব্যবহার করিতে শিশুরা ভালবাসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অংকন-উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়।

৪। **ফুল**। একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রতি শিশুই ফুল ভাল ভাসে। কাজেই বিদ্যালয়ে যদি সুন্দর ফুলবাগান থাকে তাহা হইলে এমনিতেই বিদ্যালয় আকর্ষণীয় হয়। তাহার উপর আছে সৃজনেচ্ছা। প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু সৃজন করিয়া তৃপ্ত হইতে চায়। একথা শিশুর বেলাতেও সত্য। কাজেই শিশুদের নিজের হাতের রচনা করা ছোটবাগানে যখন ফুল ফুটিতে থাকে, তখন শিশুদের সৃজনেচ্ছা তৃপ্ত হয়। তাহারা আনন্দ লাভ করে।

৫। **জীবজন্তু প্রভৃতির প্রতি প্রীতি**। এই বয়সের শিশুরা কাকাতুয়া, টিয়াপাখী, খরগোস, গিনিপিগ, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত

আসক্ত হয়। এই সব প্রাণী কাছে দেখিতে পাইলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। সেই জন্য বিদ্যালয়ে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি ছোটখাট চিড়িয়াখানা করা কর্তব্য।

৬। **সংগ্রহশালা।** বাচ্চারা সকল সময়েই কিছু না কিছু সংগ্রহ করিতে ভালবাসে। বয়স্কদের নিকট হয়ত সেই সংগ্রহের কোনো দামই নেই। কিন্তু সংগ্রাহকদের নিকট তাহার মূল্য অসীম। তাই অতি সযত্নে বিদ্যালয়ে একটি সংগ্রহশালা খুলিয়া সংগৃহীত দ্রব্যগুলি রাখা দরকার।

শিশুদের একটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে। সবই সম্ভব হয় সেই দেশে। এখানে বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য একাকার। বিদ্যালয়ে শিশুর কল্পনা জগতের খানিকটা ভাব আসে এমন পরিবেশ রচনা করিতে হইবে। তাহার উপর আছে সহৃদয়া স্নেহশীলা শিক্ষিকা নিয়োগ। এই ভাবে একটি নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে নার্সারী শিক্ষার অধিক প্রয়োজন কেন ?

প্রথমেই এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে, নার্সারী স্কুল লেখাপড়া শেখার জায়গা নয়। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি লেখা পড়া শেখার স্থান না হয় তাহা হইলে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লাভ কি ? লাভ বুঝিতে হইলে, গোড়া হইতে জানা দরকার।

একটি জাতির সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে সুশৃঙ্খল, সদাচার ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিকের উপর। ভারতে নাগরিকের সদ্‌গুণগুলির আরও অভাব।

নার্সারি বিদ্যালয়ে কতকগুলি সুঅভ্যাস গঠনের বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আর, মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করিয়াছেন, এই বয়সে যাহা শিখা যায় তাহা জীবনের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়।

তাহা হইলে নিয়ম শৃঙ্খলা মজ্জাগত করিয়া লইতে ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে বাড়িয়া উঠার জন্য অল্প বয়স হইতেই সুনীতি ও সুঅভ্যাসগুলি আয়ত্ত করা দরকার।

ভারতে আর একটি ত্রুটি হইল, শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে না। বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে এই সমস্যা এখনও প্রবল। বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যথাসময়ে হাজিরা দেওয়ার মতো মন গঠনের জন্যও নার্সারী দরকার।

তাহা ছাড়া প্রতিটি দেশের বয়স্ক ব্যক্তিই চায়, তাহার সন্তান-সন্ততিরা আরও ভাল পরিবেশে, আরও সুন্দর জীবন-যাপন করুক। ভারতে এমনিতেই অধিকাংশ পরিবারেই জীবন-যাত্রার মান অনুন্নত। প্রতিটি পরিবারকে আমরা সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি নাই। তাই ছোট ছোট বিদ্যালয় স্থাপন, সেখানকার সুন্দর পরিবেশে শিশুদের পালন করা কর্তব্য। এইগুলি ছাড়াও নার্সারী স্কুলে শিশুদের অনেক ভালগুণ অভ্যাস করিতে হয়। বাস্তব জীবনে তাহারও মূল্য কম নহে।

ছোট ছোট শিশুরা দল বাঁধিয়া কাজ কর্ম করিতে, খেলিতে, নাচিতে ও গান গাহিতে ভালবাসে। পরস্পর এক সাথে কাজ করার মধ্য দিয়া শিশুদের সামাজিকতার বিকাশ ঘটিতে থাকে। অনেক ঘরকুনো ভীতু ছেলেমেয়ের ভয় ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা সাহসী হইয়া সকলের সাথে মিশিতে পারে অনেক অতি সাহসী ছেলেমেয়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে চাপিয়া সাধারণের মতে চলিতে হয়। অনেকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার ফলে শিশুর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, চেনা জগৎ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে।

তাহা ছাড়া পরিচ্ছন্ন থাকা, জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখা, সকলের সাথে ভাগ করিয়া খাওয়া, দলের নিয়মকানুন মানিয়া চলা ইত্যাদি নানা শৃঙ্খলামূলক অভ্যাস ধীরে ধীরে গঠিত হয়। পরবর্তী জীবনে এইগুলি স্থায়ী হয় এবং সুনাগরিকতার জন্য যে সব গুণের কথা বলা হয় তাহার ভিত্তি রচিত হয় এইখানেই।

নার্সারী বিদ্যালয় শিশুকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলে

মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, মানুষের জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর তাহার ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু বাড়ীতে সাধারণতঃ মা, বাবা, আত্মীয়স্বজনের স্নেহচ্ছায়ায় এক প্রকার পুতুলের মত বাস করে। স্বাধীনভাবে নিজের কাজ নিজে করার বা কল্পনা ও ইচ্ছামত কোনো কাজ করার তাহার উপায় থাকে না। অথচ বিদ্যালয়ে অতখানি স্নেহশাসন থাকে না বলিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অবকাশ থাকে। ইহাতে শিশু ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়। নিজের জুতা পরা, জামা পরা, জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখা, ইত্যাদি কাজে তাহার স্বাবলম্বন আসিতে থাকে।

ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন-পদ্ধতি

(Froebel's Kindergarten Method)

ফ্রোয়েবেল **৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক** শিশুদিগের শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন তাহা "**কিণ্ডারগার্টেন**" (Kindergarten) বা 'শিশুবিদ্যালয়' নামে সুপরিচিত এই 'শিশুর বাগানে' মালীরূপ-শিক্ষকের ভূমিকা হইল সযত্নে চারাগাছ-রূপ শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে বিকশিত হইয়া উঠিতে সহায়তা করা, এই ধরণের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তিনি পদ্ধতি হিসাবে নানা পুস্তকপাঠের পরিবর্তে নানারূপ কাজ, খেলা, নৃত্য গান আর গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি কিছু ক্রমবর্ধমান কাজ ও খেলার কথা বলেন যাহাদের সহায়তায় শিশু আপন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া স্বক্রিয়ভাবে আত্ম-বিকাশের সুযোগ পায়। তাঁহার উল্লিখিত ক্রীড়াদ্রব্যগুলির মধ্যে 'Gifts' নামে পরিচিত গোলা (Sphere), ঘনক্ষেত্র (cube), নলাকৃতি বস্তু (cylinder) এই তিনটি মুখ্য দ্রব্য আছে, গোলা 'শিশুর' গড়াইয়া বা ছুড়িয়া দেওয়ার জন্য, কিউব দিয়া কিছু তৈয়ার করিবার জন্য আর নলাকৃতি বস্তু গড়াইয়া দেওয়া বা দাঁড় করাইয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করার জন্য রাখা হইয়াছিল, ইহা ছাড়া তিনি কাঠি, আংটি, ত্রিকোনাকৃতি বা চতুষ্কোনাকৃতি বস্তু প্রভৃতির কথাও বলিয়াছেন।

ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করেন যে শিশু প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা শিশুর বিকাশ দ্রুততর করা সম্ভব। তাই তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি শিশু প্রকৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছিলেন :—

(১) শিশু সর্বদা কোন না কোন কাজ করিতে ভালবাসে এবং সাধারণতঃ খেলার ভিতর দিয়াই তাহার কর্মপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাই তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই দুইটির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(২) শিশুর নানা বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহের মূলে রহিয়াছে ইন্দ্রিয়গণের সক্রিয়তা, এই জন্য তিনি পর্যবেক্ষণ-মূলক বস্তু পাঠের কথা বলিয়াছেন।

(৩) প্রকৃতির জীবরূপী শিশু-প্রকৃতির মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে। বলিয়া তিনি মুক্ত প্রকৃতি হইতে তাঁহার স্বাধীন শিক্ষালাভের কথা বলিয়াছেন।

(৪) নিজহাতে কিছু পরখ করিতে শিশু অধিক আগ্রহী বলিয়া তিনি শিক্ষাগ্রহণে অনুরূপ সুযোগ শিশুকে দিতে চাহিয়াছেন।

(৫) শিশু ভাঙ্গাগড়া ভালবাসে। তাই তিনি এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে চাহেন।

(৬) অনুকরণ প্রিয় শিশুকে তিনি অনুকরনীয় অবস্থার মধ্য হইতে শিক্ষার কথা বলিয়াছেন।

(৭) চিন্তা ও বিচার শক্তির তুলনায় শিশুর শাব্দিক স্মৃতিশক্তি অধিকতর শক্তিশালী, তাই তিনি এই সুযোগ তাহাদের দিয়াছেন।

(৮) শিশুকে তাহার সমবয়সীদের মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিলে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি অনুরূপ শিক্ষার কথা বলিয়াছেন।

(৯) গল্পের ভিতর দিয়া নানা বিষয় শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

(১০) সঙ্গীতানুরাগী শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন।

(১১) স্বাধীনতা প্রিয় শিশুকে ফ্রয়েবেল যথোপযুক্ত পরিমাণ স্বাধীনতাও কর্তৃত্বের (control) মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন।

(১২) মাতার প্রতি অধিক আসক্ত শিশুদের তিনি অনুরূপ শিক্ষিকার কাছে শিক্ষার্জনের পক্ষপাতী।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

(১) এই শিক্ষায় উপহারস্বরূপ শিশুকে ছোট ছোট বাক্সে রঙ্গীন ফিতা, সূতা আর নানা আকৃতির বস্তু দিয়া রাস্তা, ঘর, তাঁবু ইত্যাদি নির্মাণ করিতে দিয়া রঙ-জ্ঞান ও নানা জিনিষ তৈয়ারীর অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়; ইহা ছাড়া অধিকতর সৃজনীত্মক কর্মসূচক খেলার (যেমন কাদামাটি, কাগজ কাচি ও ছুরির কাজ) ব্যবস্থাও আছে।

(২) ইচ্ছামত অঙ্কন হইতে শুরু করিয়া ধাপে ধাপে তৈয়ারী ও পরিচিত গণ্ডীর জিনিষ আঁকিতে দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) ইহা ছাড়া কাগজ ও মাটির জিনিস তৈয়ারী, সহজ বুনন ও সেলাইয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষদান করা হয়।

(৪) গাছপালা ও পশুপক্ষীর ক্রমবিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের এইগুলির প্রচলন ফ্রয়েবেল প্রথম করেন।

(৫) ছবির সাহায্যে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৬) গল্পের সাহায্যে শিশুমন জয় করিয়া নানা বিষয়ে বিশেষতঃ ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়।

(৭) ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জ্ঞান ও খেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। শিশুর অনুকরণ-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নানা ধরণের অভিনয়-মূলক খেলার (পশুপক্ষী সাজা) ব্যবস্থা আছে। আবার গানের মধ্য দিয়া একাধারে নানান্ কর্ম ও ব্যায়াম করার, নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে গমনের এবং নৃত্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

(৮) ভগবানের বন্দনা, মহত্ত্ব আলোচনা, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য, মহাপুরুষের জীবনী পাঠের মধ্যে দিয়া নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৯) পঠন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বস্তু বা প্রাণীর নামের পরিবর্তে তাহাদের ছবির নিম্নে প্রথম অক্ষর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া বারবার উচ্চারণ করাইয়া প্রথমে শব্দ গঠন ও শেষে বাক্যগঠন করিয়া পাঠ করিতে দেওয়া হয়।

(১০) লিখন-শিক্ষাদানকালে কাঠি বা বীচির সাহায্যে অক্ষর তৈয়ার করিতে দিয়া পরে সাজানো অক্ষর দেখিয়া ও শিক্ষকের লেখা অনুকরণ করিয়া শ্লেটে লিখিতে দেওয়া হয়।

(১১) গল্পে বস্তু ও প্রাণীর সংখ্যা বলিয়া, নানান্ খেলা বীচি ও কাঠি সাজাইতে দিয়া ওপরে তাহা শ্লেটে লিখিতে গিয়া যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যায়।

ফ্রোয়েবেল বলেন, "God creates and works productively in uninterrupted continuity." ভগবান হঠাৎ কোন কিছুই প্রবর্তন করেন না এবং অতি ক্ষুদ্র মৌলিক পদার্থকে বৃদ্ধি করিয়া তোলেন। অতএব ফ্রোয়েবেল মানবজীবনকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থা বলিয়া মনে করেন। এই ধারণা হইতেই ফ্রোয়েবেল তাঁহার শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, Unity (একত্ব), continuity (অবিচ্ছিন্নতা) এবং Development (ক্রমবিকাশ) এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা বিজড়িত।

কিণ্ডারগার্টেনের (kindergarten এর) মূলনীতি নির্ভর করিতেছে শিশু-চরিত্র পর্যবেক্ষণের উপর। ফ্রোয়েবেল অবশ্য মনোবিদ্ ছিলেন না, তবুও তাঁহার নিজস্ব একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল। তাহা এই— (১) শিক্ষা মানব-জীবনের স্বাভাবিক গতি, (২) শিশু সজীব বস্তু এবং সে সৃজনাত্মক স্বয়ংকর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, (৩) শিশু সমাজের সক্রিয় সভ্য।

ফ্রোয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগান্তকারী এবং তাহার জন্যই তিনি শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার—মানুষ সৃজনাত্মক কর্মের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করিবে। মানবজাতির ক্রমবর্দ্ধমান গতির সঙ্গে সজীব মানুষের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়া তাহার নিজের মূল্য যাচাই করিয়া লইতেছে—এই হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা। ফ্রোয়েবেলের মতে শিশু হইতেছে কর্মী এবং শিক্ষার স্থান হইতেছে কর্মের পরে। শিক্ষা হইবে নিশ্চয়ই, তবে কর্মান্তে। রুশো, পেস্তালজি ইন্দ্রিয়ানুভূতি-জনিত শিক্ষাদান সম্পর্কে যে মত পোষণ করিতেন, ফ্রোয়েবেল তাহা পরিহার করেন। তাঁহার মতে সৃজনাত্মক কাজে, স্বয়ংকর্মের মধ্য দিয়াই ইন্দ্রিয়ানুভূতি-জনিত শিক্ষা হইয়া থাকে। ফ্রোয়েবেলের Giftগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হইল। শিশুর বিকাশে Giftগুলি যে ভাবে একটির পর একটি সাহায্য করে, সেই ভাবে Giftগুলি সমান রহিয়াছে। প্রতিটি Gift ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষাপ্রদ। একটি নূতন Giftএর সঙ্গে একটি পুরাতন Gift মেশান হয় এবং তাহাতে শিশুর খেলা সহজ ও বুদ্ধিজনিত হয়। এই Giftগুলির সাহায্যে শিশুর নৈতিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সর্বরকম বিকাশ হয়। Giftগুলির ক্রম ও তাহাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল।

গিফ্‌ট	বস্তু	শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য
১ নং	৬টি কাঠের বল—প্রত্যেকটির রং বিভিন্ন	যখন বলগুলিকে গড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন বলের উপাদান, রং, আকৃতি, গতি, দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান লাভ হয় এবং বল চালনার ফলে শিশুর মাংসপেশীসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

গিফ্‌ট	বস্তু	শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য
২ নং	একটি বল, একটি ঘন-ক্ষেত্র ও একটি নলাকৃতি জিনিষ	গতিসম্পন্ন বল সম্বন্ধে শিশুর জানা আছে অজনা স্থিতিসম্পন্ন ঘনাকৃতি জিনিষ আনার দরুণ শিশুর দুই এর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে। দুইয়ের সমন্বয় হইয়াছে নলাকৃতি জিনিষে, যাহার মধ্যে দুইয়ের বৈশিষ্ট্যই বর্তমান।
৩ নং	একটি বড় কাঠের কিউব, আটটি কিউবে বিভক্ত	অংশের সঙ্গে পূর্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান। এই কিউব-গুলির দ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব। যথা—বাড়ী, সিঁড়ি, দরজা ইত্যাদি।
৪ নং	আটটি লম্বা তিন পলা কাঁচ (prism)	সংখ্যা গণনা, বিভিন্ন আকৃতি, একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক। এই জিনিষগুলির সাহায্যে নানা জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে শিশুদের সুস্পষ্ট ধারণা হয়।
৫ নং	কিউব এবং prism একসঙ্গে	
৬ নং	১ নং হইতে ৫নং পর্যন্ত সমস্ত গিফ্‌ট	
৭ নং হইতে ৯ নং	কাঠের টুকরা কাঠ, আংটি, দড়ি, গুটি	আয়তন, পরিধি, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি পায়।

পূর্বে বর্ণিত Giftগুলি লইয়া শিশুরা খেলিবে। ঠিক কোন্ বয়সে শিশুরা Kinder gartenএ আসিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ফ্রোয়েবেল শিশুদের তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম অবস্থা হইতেছে খুব ছোট শিশুদের জন্য জন্মের পর হইতে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই সময় শিশুরা বাড়ীতে থাকিবে, এবং নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলিবে, সেই খেলার উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক। ফ্রোয়েবেলের মতে শিশুদের দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্যন্ত। এই বয়সে শিশু কিণ্ডারগার্টেনে থাকিবে এবং নানা খেলার মারফতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইবে। ৭ বৎসরের পরের অবস্থাকে ফ্রোয়েবেল বলিয়াছেন বাল্যকাল। এই সময়ে বালককে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিশুকালের শিক্ষা পাওয়া ও

বাল্যকালের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এই যে শিশুকালে শিশু খেলার মারফত স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শিক্ষার প্রয়োজন হইবে, সে শিক্ষাই সে পাইবে ; আর বাল্যকালে শিশুর উপর শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। কিণ্ডারগার্টেনে শেষের দিকের শিশু এবং বাল্যকালের প্রথম দিকের শিশুদের লইয়া ফ্রোয়েবেল সংযোজককারী বিদ্যালয় বা Connecting School খুলিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য ছিল দুই অবস্থার বৈপরীত্যের মধ্যে সহজ সমাধানের বাল্যাবস্থার জন্য তৈয়ারী করিয়া দিবেন।

ফ্রোয়েবেল কিণ্ডারগার্টেনে খেলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন, "Play is the highest achievement of child development of this stage, since it is spontaneous expression, according to the necessity of its own nature of the child's inner being." শিশু খেলার ভিতর দিয়াই জীবন তৈয়ারী করিয়া নেয়, এই হইতেছে ফ্রোয়েবেলের মত। তাঁহার মতে খেলা ও শিক্ষণীয় কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, সমস্তই এক।

মন্তেসরী পদ্ধতি (Montessari Method)

শিক্ষাক্ষেত্রে ডাঃ মেরিয়া মন্তেসরীর পরিকল্পিত পদ্ধতি "মন্তেসরী পদ্ধতি" নামে পরিচিত। পদ্ধতি সম্পর্কে আপন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ৩ হইতে ৭ বৎসরের সাধারণ মেধার শিশুদিগের শিক্ষাদানের জন্য ইহার প্রচলন করেন। ইহাদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি শিশু-নিকেতন (Children House) নামক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা পরিচালনার ভার থাকে এক জন পরিচালিকার উপর (Directress)। এক জন চিকিৎসক ও এক জন যত্নকারী (care-taker) তাহাকে সাহায্য করেন।

মন্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতির সঙ্গে এই শিক্ষাধারার মূলগত ঐক্য থাকিলেও শিক্ষাজগতে ইহা অধিকতর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুর চাহিদাভিত্তিক, বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নহে—স্তরভেদে শিশুর পরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের

কথা এই শিক্ষানীতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষোপকরণগুলি সহজ, সরল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার দরুণ ফ্রোয়েবেলের giftগুলি অপেক্ষা মন্তেসরীর অবলম্বিত ব্যবস্থা শিশু ও ব্যক্তি উভয়কেই অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে। ইহা ছাড়া মন্তেসরী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্থানে ইহার বাস্তব প্রয়োগের পথও দেখাইয়া দিয়াছেন।

মন্তেসরী-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) মন্তেসরী তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে স্বাধীনভাবে আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য-পালনের ভিতর দিয়া সু-অভ্যাস অর্জনের সুযোগ উল্লেখযোগ্য ভাবেই দিয়াছেন।

(২) আপন চেষ্টায় শিক্ষালাভই তাঁহার পদ্ধতির মূলনীতি, পরিচালিকা কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে নির্দেশ দিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্জামের সহায়তায় শিশুকে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের সুযোগ দিবেন।

তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বয়ংশিক্ষা বা Auto-education অর্থাৎ বিভিন্ন উপকরণ দিয়া স্বাধীনভাবে খেলার ভিতর দিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের দ্বারা শিক্ষালাভ করাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। খেলার উপকরণগুলির মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসবিশিষ্ট কাঠের টুকরা এবং বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট কাঠের টুকরা বসাইতে শিশুকে দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) 'কিণ্ডার গার্টেন'-পদ্ধতির মত মন্তেসরী-পদ্ধতিতেও শিশুকে তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির যত বেশী সম্ভব ব্যবহার করিয়া শিক্ষা করিতে দেওয়া হয়। উন্নতির বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যথোপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহারের দ্বারা শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উপর মন্তেসরী সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

(৪) শিশুগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আপন ধারায় শিক্ষার্জন করে। তাই মন্তেসরী শ্রেণীগত অপেক্ষা ব্যক্তিগত শিক্ষাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন।

(৫) তিনি নানা শিক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শিক্ষা লাভের উপর খুব জোর দিয়াছেন।

(৬) সামাজিক জীবনের উপযোগী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে শিশুকে নানান ধরণে বাস্তবধর্মী কাজের সুযোগ দেওয়া হয়।

(৭) শারীরিক বিকাশ মানসিক বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলিয়া বাঁশের বা কাঠের সিড়ি, দোলনা ইত্যাদি তাঁহার বিদ্যালয়ে রাখিয়াছেন। এইগুলির সাহায্যে শিশু স্বতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গসঞ্চালনের স্বযোগ পায়।

(৮) ৫ম বর্ষ হইতে শিশুর লেখাপড়া শুরু করার জন্য তিনি নানাধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন।

(৯) গৃহ-সংলগ্ন বাগানে গাছের পরিচর্যা ও পশুপক্ষী পালনের মধ্য দিয়া শিক্ষা লাভের স্বযোগ তিনি শিশুকে দিয়াছেন।

(১০) আনন্দমূলক কাজে শিশুকে নিযুক্ত রাখিয়া তিনি বিদ্যালয়ের স্বশাসন বহাল রাখিবার কথা বলিয়াছেন।

(১১) তিনি শিশুদের নীরবতার অভ্যাস গঠনের কথাও বলিয়াছেন।

(১২) শিশুর শিক্ষাভার মূলতঃ শিক্ষয়িত্রীর উপরই রাখা হইয়াছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

(১) এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিজ হাতে কাপড় কাচা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার মধ্য দিয়া বাস্তব জীবনের কাজেরও শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) যথোপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সময়মত পরিবেশন, নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং খেলা-ধূলা ও ব্যায়ামের মধ্যে দিয়া শারীরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে যথোপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহারের জন্য নানা কাজের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। ইহাদের সহায়তায় শিশু বস্তুর ওজন, গাঢ়তা, রং সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

(৪) শিক্ষামূলক কাজ মন্তেসরী কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রঙের বিভিন্নতা অনুসারে বস্তুকে সজ্জিত করা, কাপড়ে বোতাম আঁটা, মাটির জিনিষ তৈয়ারী করা, পোড়ান ইট ইত্যাদি দিয়া ঘর তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৫) শিশুকে প্রথম পেন্সিল দিয়া ইচ্ছামত আঁকিতে দিয়া, পরে জিনিষের রেখাচিত্রে রঙ করিতে ও শেষে তুলি ব্যবহারে স্বযোগ দেওয়া হয়।

(৬) বৃক্ষপরিচর্যা ও পশুপক্ষী প্রতিপালনের ভিতর দিয়া শিশুদিগকে উদ্ভিদ-জীবন ও পশু-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে দেওয়া হয়।

(৭) তিনি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহার দ্বারা ৪।৫ বৎসরের শিশু এক বা দেড় মাসের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে পারে, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারে ও কাঠের ও ধাতুর বস্তুর সহায়তায় প্রথমে অঙ্কন ও পরবর্তী কালে ঐগুলির উপর হাত বুলাইয়া শিক্ষককে অনুকরণ করিয়া অক্ষর উচ্চারণ করিতে শিখে, অক্ষর জ্ঞান হইতে সহজেই অক্ষর লিখাও শিখিতে পারে।

(৮) মন্তেসরী প্রথম বইতে মুদ্রার সাহায্যে শিশুকে গণনা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। শিশুরা টাকা আধুলি দুয়ানী ইত্যাদির সাহায্যে আনন্দের সঙ্গে গণনা শিক্ষালাভ করে। তাহার পর ১ হইতে ১০ ইঞ্চি দাগ দেওয়া কাঠি সাজাইয়া এবং সর্বশেষে সংখ্যা স্পর্শ করিয়া ও নূতন নূতন কাঠি যোগ করিয়া, এমন কি লিখিতভাবে যোগ, বিয়োগ, পুরণ, ভাগ পর্যন্ত করিতে পারে।

(৯) শিক্ষয়িত্রী প্রথমে বস্তু দেখাইয়া ও তাহাদের গুণ বুঝাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামগুলি উচ্চারণ করিতে দেন, পরে তাহাদের বস্তু ও তাহার কাজ দেখিয়া উহাদের নাম বলিতে ও দেখাইতে বলেন, এই নামগুলি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিয়া শিশুরা তাহাদের শব্দভাণ্ডার ও ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করিতে পারে।

ডাঃ মন্তেসরীর শিক্ষানীতিতে ফ্রোয়েবেলের প্রভাব

ফ্রোয়েবেল দ্বারা ডাঃ মন্তেসরী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ফ্রোয়েবেলই প্রথম শিশুরা যে বয়সে বিদ্যালয়ে আসে, সেই বয়সের চেয়ে নীচু বয়সের শিশুদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাঃ মন্তেসরীও ঐ বয়সে শিশুদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রোয়েবেলই শিশুকে একটি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করিয়া শিশুর মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। ডাঃ মন্তেসরীও ঐরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে ডাঃ মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের কাছে ঋণী। তৃতীয়তঃ, ফ্রোয়েবেলের ন্যায়

ডাঃ মন্তেসরীও শিশুর আত্মবিকশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে ফ্রোয়েবেলের খেলনাগুলির অন্তর্নিহিত রূপক এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুর্বোধ্য ইঙ্গিতগুলি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ খেলনাগুলি ডাঃ মন্তেসরীর খেলনা বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিবে।

কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী স্কুলের মধ্যে শিক্ষাদানের পার্থক্য

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল	মন্তেসরী স্কুল
১। কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষিকা সমগ্র শ্রেণীকে পরিচালনা করেন।	১। মন্তেসরী স্কুলের পরিচালিকা শ্রেণী-কক্ষের একাংশে দাঁড়াইয়া শিশুদের কাজকে লক্ষ্য করেন।
২। শ্রেণীর শিশুরা দলগতভাবে নির্দেশিত কার্যে নিযুক্ত থাকে।	২। শিশুরা খেলনা সহযোগে ব্যক্তিগত ভাবে খেলে।
৩। শিক্ষিকা কোন কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলে একটি দলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন।	৩। পরিচালিকা একটি বা দুইটি শিশুর সঙ্গে একবারে কথা বলেন।
৪। শ্রেণীবিন্যাস-দলগত কার্যের জন্য টেবিল থাকে।	৪। ব্যক্তিগত কার্যের জন্য টেবিল।
৫। শিক্ষিকা ঠিক করিয়াছেন, কোন্ কোন্ Gift লইয়া শিশু খেলা করিবে এবং কি occupation-এ নিযুক্ত থাকিবে।	৫। শিশু নিজেই তাহার খেলনা বাছিয়া লয়, এবং সে যদি খেলনা দ্বারা খেলিতে আগ্রহ বোধ না করে, তবে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে বা অন্য কিছু কাজ করিতে পারে।
৬। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ বা খেলা চলে।	৬। শিশু যতক্ষণ ইচ্ছা কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

পরিশিষ্ট

(১) প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে ইংরাজী শিক্ষা

কিছু দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে শিশুদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না। এক্ষণে তাঁহারা পূর্ব নির্দেশ সংশোধন করিয়া তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা হইতেছে, সরকারের পূর্ব নির্দেশ অমান্য করিয়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই ইংরাজী শিক্ষাদান চলিত। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এই সরকারী নির্দেশনার দ্বারা অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। তবুও প্রশ্ন জাগে, সরকার কোন্ যুক্তিতে প্রথম নির্দেশনা দিয়াছিলেন এবং কোন্ অভিজ্ঞতা হইতে উহা খণ্ডন করিয়া নূতন নির্দেশনা দিলেন। মনে হইতে পারে যে, নিছক জনমতের চাপে গণতান্ত্রিক সরকার তাহার পূর্ব-নির্দেশনা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যাপারে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের চাপে শিক্ষা-বিজ্ঞান-বিরোধী ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া গণতন্ত্রের একটি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থারূপে পরিগণিত হয় না। অপর পক্ষে শিক্ষা-বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা মনে করার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি দেখা যায় না। তাহা হইলে কি সরকার অবৈজ্ঞানিক ভাবেই প্রথম নির্দেশ দিয়াছিলেন? এই প্রশ্নগুলি নিশ্চয় খুব স্বাভাবিক।

প্রকৃত ঘটনা হইতেছে, ইংরাজী শিক্ষা লইয়াই শিক্ষিত মহলে মতভেদ বেশ তীব্র। ইহার মধ্যে দুইটি চরম মতবাদী রহিয়াছেন। এক দল ইংরেজী-শিক্ষাকে এত অধিক মূল্য দেন যে ইহাকেই শিক্ষার প্রধান দিক বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তি, ইংরাজী হইতেছে আন্তর্জাতিক চিন্তার বাহন। ইহার মধ্য দিয়াই সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উচ্চ-জ্ঞান সম্ভব, তাই ইহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। তাঁহারা এই বিষয়ে এত বেশী গুরুত্ব দেন যে, শিক্ষার এই মাধ্যমকে আয়ত্ত করিতেই যদি শিশুশিক্ষার্থীর শিক্ষার সবটুকু প্রচেষ্টা ব্যয় করিতে হয়, তাহাতেও তাহারা

পিছপা নন। অপর চরমপন্থিগণ ইংরজী শিক্ষাকে দাস-মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। এরাই ইংরাজী হটাও আন্দোলনের পৃষ্ঠ-পোষক। অহিন্দীভাষীগণ হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া তাহারা যেন বেশী পরিমাণে ইংরাজীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন—যদি ইহার সাহায্যে হিন্দীভাষীর আক্রমণ ঠেকানো যায়। কারণ তাহারা মনে করেন যে, হিন্দীসর্বভারতীয় ভাষারূপে পূর্ণ স্বীকৃতি পাইলে তাহারা হিন্দীভাষীদের তুলনায় অসুবিধায় পড়িবেন। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দী শিক্ষা অপেক্ষা সহজ নহে, বরং কঠিন। তবু তাঁহাদের সান্ত্বনা যে তাঁহারাই শুধু ঐ বেশী অসুবিধা ভোগ করিবেন না—হিন্দীভাষীরাও সমান অসুবিধা অনুভব করিবেন। বলা বাহুল্য, অসূয়াপ্রসূত এই মনোভাবটিকে সুস্থ বলা যায় না। সম্ভবতঃ ইংরাজীর প্রতি অতি অনুরাগীদের এই বাড়াবাড়ি হইতেই ইংরেজী হটাও দলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই দলের মতও অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নহে। ইংরাজী ভাষা পৃথিবীর একটি মহান্ ভাষা—ইহার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয়ন সহজ। তাই আমাদের দেশে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক উচ্চ ইংরাজী জ্ঞান-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে এবং সেই জন্য শিক্ষাক্রমে অন্ততঃ ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে চিরকালই ইংরাজী এবং আরো উন্নত বিদেশী ভাষা রাখিতে হইবে। যাহা হউক বর্তমানে এমন কি রাজ-কার্যে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবেও যে ইংরাজী ভাষা থাকিবে তাহা রাষ্ট্র-পরিচালকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং এখন পাঠ্যক্রমে ইংরাজী শিক্ষা রাখার প্রশ্নের অবতারণার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, উহা কোন্ স্তরে আবশ্যিক গণ্য করা হইবে ও তাহার মান কিরূপ হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন মনে করিয়াছেন, নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ইহাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ইহার দুইটি বিভাগ রাখিয়া একটিকে আবশ্যিক ও অপর উন্নত পর্যায়ের বিভাগটিকে আবশ্যিক না করিয়া ঐচ্ছিক রাখা হইবে। মনে হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার কমিশনের এই শিক্ষাই গ্রহণযোগ্য। কারণ সকলেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাইবে না এবং তাহাদের পক্ষে নিম্নতর শিক্ষা-পর্যায়ে ইংরাজী শিখিবার অনর্থক প্রচেষ্টায় স্বল্পস্থায়ী শিক্ষা-কালকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করা এবং অন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ নষ্ট করার অর্থ হয় না—ইহা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অপচয়।

যদিও ইহা সত্য যে, কে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইবে—কে পাইবে না তাহা শিশুর মেধাদ্বারা বর্তমানে স্থির হয় না, তাই সকলের পক্ষেই নিম্নতর শিক্ষাস্তরে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত—সুতরাং নিম্নতর শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রম একই হওয়া ভাল। তাই যদি নিম্নস্তরে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন না করিলে উচ্চতর স্তরে ইংরাজী শিক্ষার মারাত্মক বাধা না ঘটে, এই পর্যায়ে ইংরাজী শিক্ষা বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভাষা-শিক্ষাবিদগণ মনে করেন প্রাথমিক স্তরে একাধিক ভাষা শিক্ষার প্রচেষ্টা শিশুর জ্ঞান-স্পৃহার পক্ষে ক্ষতিকর এবং মাতৃভাষা ভালভাবে আয়ত্ত হইবার পূর্বে বিদেশী ভাষা শেখানোর চেষ্টা না করাই বিধেয়। অনেক সভ্য দেশে এই মতটি গৃহীত হইয়া ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছে। সুতরাং এই দিক হইতে সরকারের পূর্বঘোষিত নীতিকেই সমর্থন করিতে হয়। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনকে যদি সাহিত্য শিক্ষার পর্যায় হইতে ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ ও কথাবার্তা বলার (দৈনন্দিন প্রয়োজন) ক্ষমতার বিকাশ-সাধন পর্যায়ে আনা হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী না শিখাইলেও মাধ্যমিক স্তরে তাহা সম্ভব হইবে। পূর্বে ৭ম শ্রেণীতেই সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত ও ইহাতে শিক্ষার্থী ৪ বৎসরে বেশ কিছু ব্যুৎপত্তি অর্জন করিত। সুতরাং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ঠিক মত পদ্ধতিতে ইংরাজী শিখিলেও শিক্ষার্থী ৫ বৎসর বা ৬ বৎসরে বেশ কাজ-চলা ইংরাজী শিখিতে পারিবে। যদি তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী শেখানো নীতি হিসাবে রাখাই হয়, তবে তাহার পাঠ্যক্রম খুবই হাল্কা হওয়া উচিত। প্রথম দুই বৎসরে তাহা অক্ষর পরিচয় এবং কিছু নিত্য-ব্যবহৃত সহজ শব্দের ব্যবহার শিক্ষা ও সহজ বাক্য গঠন শিক্ষা, এইটুকুই রাখিতে হইবে—যেন তাহা মাতৃভাষা শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার উপর ভারস্বরূপ গণ্য না হয়। উহার শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও যত দূর সম্ভব মনোজ্ঞ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই শিক্ষাটুকু অকেজোই থাকিয়া যাইবে—সুতরাং ইহার প্রচেষ্টার জন্য যেন সাধারণ শিক্ষাক্রম ব্যাহত না হয়। সুখের বিষয়, শিশুকে সহজ পদ্ধতিতে ইংরাজী কথাবার্তার সহিত পরিচিত করার ভাল পদ্ধতি বাহির হইয়াছে। উহাতে শিক্ষকদিগকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে

আরো বাস্তবাশ্রিত ও সহজ করা প্রয়োজন। এখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে যে পরিমাণ শিক্ষার আশা করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে—ইহা আয়ত্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে যে সময় ও প্রচেষ্টা ব্যয় করিতে হইবে, তাহা তাহাদের সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও মাতৃভাষা শিক্ষার উপর খুব বাধা সৃষ্টি করিবে। উহা কমাইয়া ফেলা প্রয়োজন। ইংরাজীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারকে গৌণ না করিয়াও বলা যায় যে, উহা যত প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন মাতৃভাষা শিক্ষা ও অন্যান্য সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা উহা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। তাহার ক্ষতি না করিয়া যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা এই স্তরে সম্ভব, তাহাই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই ভাবে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত মধ্যপন্থা গ্রহণকেই আমি ঐ প্রশ্নের শ্রেষ্ঠ সমাধান বলিয়া মনে করি।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের দিক হইতেও খুব অসুবিধা দেখা যায়। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থীদের যেরূপ ভাবে ইংরাজী ভাষা মনোজ্ঞ করিয়া শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেখানে শুধু অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাই সেইরূপ ভাবে পাঠদান করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইংরাজী জ্ঞান কতটুকু? ইংরাজী সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান খুবই স্বল্প। তাহা ছাড়া এখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিক্ষা হিসাবে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুলে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিক্ষা করাও ঐচ্ছিক ব্যাপার। অতএব ইংরাজী যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর Structural Method অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া, যাঁহারা পদ্ধতি বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ নন তাঁহাদের পক্ষে খুবই মুশকিল। অতএব শিশুদের ইংরাজী শিক্ষা ব্যাপারে অসুবিধার অন্ত নাই। অচিরে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলিতে আবশ্যিক করা একান্তই প্রয়োজন। যত দিন পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক শিক্ষণলাভ না করিবেন, তত দিন পর্যন্ত সরকারকর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকের সহিত শিক্ষাদানের সহযোগী একটি পুস্তক শিক্ষকদিগকে দিতে হইবে, যাহা পড়িয়া শিক্ষকগণ প্রতিটি পাঠ শুদ্ধরূপে এবং সুন্দররূপে ছাত্রছাত্রীদিগকে

শিক্ষা দিতে পারেন। তাহা ছাড়া ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধেও পুস্তক শিক্ষকদিগকে পাঠ করিতে দিতে হইবে। কর্মরত থাকা-কালীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষণ দান করিলে ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনা-চক্র, পাঠচক্র, প্রদর্শনী পাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট লাভবান হইবেন।

(২) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হওয়ার সময় পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষার যে ব্যবস্থা বর্তমানে আছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। দেখা যায় যে, ৬—১১ বৎসর বয়সের শিশুদের মাত্র ৪০ শতাংশ, ১১—১৭ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের মাত্র ১০ শতাংশ, ১৭ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের যুবকযুবতীদের ·০৯ শতাংশ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায়। অবশিষ্টরা পায় না। অথচ সংবিধানে উল্লিখিত আছে, সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন বর্তমান শিক্ষার আরও কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। যেমন, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মাথাভারী। অতিমাত্রায় কলা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয় উপেক্ষিত। সহর ও গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার বৈষম্য কম নয়। নারী-শিক্ষার প্রতিও উদাসীন মনোভাব লক্ষিত হইত।

দেশের সহিত সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা থাকিলেও তাহা বিক্ষিপ্ত, সর্বাত্মক ছিল না। কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন ও ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মধ্য দিয়া জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি সাধিত হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন সামগ্রিক উন্নতি বিধানের দিকেই প্রথম হইতে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করিয়া ও নূতন নূতন ব্যবস্থার সূচনা করিয়া আধুনিক ভারতের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিয়া তোলাই তাহার লক্ষ্য ছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা বেশ বাড়িয়া যায়। পরপৃষ্ঠার ছকে তাহা লিখিত হইল।

	প্রস্তাবিত খরচ	প্রকৃত খরচ
প্রাঃ শিক্ষা	৮০ কোটি	৯৩ কোটি
মাঃ শিক্ষা	২০ ,,	২২ ,,
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৫ ,,	১৫ ,,
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২২ ,,	২৩ ,,
সামাজিক শিক্ষা	৪ ,,	৫ ,,
পরিচালনার ব্যয়	১০ ,,	১১ ,,
	১৫১ ,,	১৬৯ ,,

পরিকল্পনার প্রাক্কালে শিক্ষা উন্নয়ন-সংক্রান্ত উপসমিতি এরূপ আনুমানিক হিসাব করেন যে, ৬ হইতে ১৪ বৎসরের দেশের সমস্ত বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা দরকার। তাহা ছাড়া শিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় আলাদা। এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে শিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ২০০ কোটি টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ খাতে আরও ২৭২ কোটি টাকা প্রয়োজন।

কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সঙ্কুলানের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই পাঁচ বৎসরে লক্ষ্য এত না বাড়াইয়া ধীরে ধীরে কাজ করার নীতি গৃহীত হয় ও মূল তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়।

(১) ৬ হইতে ১১ বছরের বালক-বালিকাদের শতকরা ৬০ ভাগের শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য গৃহীত হয়। এইরূপ স্থির হয় যে, ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনা আরও বাড়াইয়া তোলা হইবে এবং ১৯৫০-৫১ সালে যাহা ছিল শতকরা ২৩ সেই সংখ্যা ৪০এ উঠাইয়া আনার লক্ষ্য থাকিবে।

(২) মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫ ভাগ বালক-বালিকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করা হইবে। বালিকাদের ক্ষেত্রেও যাহাতে শতকরা ১০ জনকেও বিদ্যালয়ে আনা যায় এমন আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে।

(৩) সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রেও এরূপ লক্ষ্য নির্ধারিত হয় যে, বয়স্ক পুরুষদের শতকরা ২০ ভাগ এবং বয়স্কা নারীদের শতকরা ১০ ভাগ যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে সুযোগ পায়, এমন আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে। অবশ্য বয়স্ক অর্থে ১৪—৪০ বৎসর যাহাদের বয়স, তাহাদের ধরা হইয়াছিল।

শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল। পূর্ব হইতেই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাদেশিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কাজে কাজেই প্রতি প্রদেশই আপন আপন ধারা অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া হইয়াছিল। এখন, সারা ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা ও সর্বভারতীয় মান তৈয়ারী করার প্রচেষ্টা দেখা যাইতে লাগিল। তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নানা পরিকল্পনা, অর্থসাহায্য ইত্যাদি প্রদেশে প্রদেশে আসিয়া পৌছাইতে লাগিল, তাহাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

প্রাথমিক শিক্ষা। স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য অধিক পরিমাণে পাইবার প্রত্যাশায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বিকেন্দ্রিত করা হইল। তাহা ছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষা (Basic National Education) হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার উন্নয়নের চেষ্টা সুরু হইল। সর্বপ্রথম এই শিক্ষা উন্নয়নের, এবং যাঁহারা এই শিক্ষাদান করিবেন সেই স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষকদের পেশাগত নৈপুণ্য বাড়াইয়া তুলিবার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইল। আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজও চলিতে লাগিল।

শিক্ষকদের দ্রুত ট্রেনিং দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষকই শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি শিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হইতে লাগিল। প্রথম পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল যে ৬—১১ বছর বয়সের শতকরা ৪২ জন এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের শতকরা ১২.৮ জন যাহাতে বিদ্যালয়ে পড়িতে পায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করা হইবে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষণ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই ঐ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া স্থির হইয়াছিল।

পরিকল্পনা কালে আর একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দান করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে অতি অল্প সংখ্যায় ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়া এক গুরুতর সমস্যা। সে জন্য নূতন নূতন বিদ্যালয় ক্রমাগত না বাড়াইয়া প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি যাহাতে উন্নত হইতে পারে, এবং ক্রমশঃ বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত হইতে পারে তাহারই অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ে শিল্প চালু করারও পরিকল্পনা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-সংস্কারে সর্বাপেক্ষা বাধা ছিল শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। তাহা ছাড়া

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত করিতে হইলে শিল্পকাজ-জানা শিক্ষকও দরকার। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৫৯% শিক্ষক ছিলেন শিক্ষণপ্রাপ্ত। পরিকল্পনাশেষে উহা দাঁড়ায় ৬৪ শতাংশে।

মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রায় সমকালেই মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশসমূহ যথাসম্ভব কার্যকরী করার চেষ্টা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ইহার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যথা:—উচ্চ-বিদ্যালয়গুলির গুণগত উৎকর্ষতা-বিধান, শিল্পবাণিজ্য-শিক্ষালয় অধিক সংখ্যায় স্থাপন, ইত্যাদি। কারণ ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছিল, শিক্ষকতার মান নানা কারণে অধোমুখী হওয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান দ্রুত নামিয়া যাইতেছিল—তাহার ফলে সমগ্র দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা জাতীয় জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষতার মান আশা করা যাইতেছিল, তাহা সম্ভব হইতেছিল না। সেজন্য মাধ্যমিক স্তরের গুণগত উৎকর্ষতা-বিধান প্রধান লক্ষ্য ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশন গঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে যে নীতি গৃহীত হয় তাহা হইল অধিক সাহায্য-দান নীতি। কারণ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর্থিক অনটনে শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছিল। কলেজসমূহে ভীড় হ্রাসের জন্যও নানা পন্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। কারণ কলেজসমূহে অত্যধিক ভীড় হওয়ার ফলে শিক্ষার মান দ্রুত নামিয়া গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও মান নামাইয়া ফেলিতেছিল। তাহা ছাড়া আরও একটি বিষয় চিন্তা করা হইতেছিল। কলেজসমূহে অত্যধিক ভীড় হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পরিকল্পনা-কমিশন মনে করিয়াছিলেন যে, সরকারী বা যে কোন চাকুরীতে ডিগ্রী বা পাশ সার্টিফিকেটের দাম অত্যধিক। যে কোনো চাকুরী সংগ্রহ করিতেই কোনো পাশ না থাকিলে চলে না। সেজন্যও কলেজ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ভীড়। তাহার বদলে যদি এরূপ ব্যবস্থা করা যায় যে, প্রতিটি নিয়োগের সময়েই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেই চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না, তাহা হইলে স্কুলে কলেজে ভীড় হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা-কমিশনের এই চিন্তা কার্যে রূপায়িত

হইতে পারে নাই। পরিকল্পনা-কমিশন পরিকল্পনার সময়েই গ্রামাঞ্চলেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন । দেশে অন্ততঃ একটি এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরিকল্পনা-কালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ ৩৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৮ কোটি টাকা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রধানতঃ বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ২.৯২ কোটি টাকা উচ্চ-শিক্ষার জন্য, ১১ কোটি টাকা বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার জন্য, ১ কোটি টাকা যুব-শিক্ষা ও যুব-কল্যাণ এবং ৪ কোটি টাকা সমাজ-কল্যাণের জন্য বরাদ্দ ছিল। এই সময় প্রাদেশিক সরকারসমূহের বরাদ্দ ছিল ১১৭ কোটি টাকা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ১৭ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীসংখ্যাও শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সাফল্য ছিল আরও অধিক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ২২টি ও ছাত্র-সংখ্যা শতকরা ৮৯ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারও আশাপ্রদ। নিম্নের তথ্যে তাহা বুঝা যাইতেছে।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৩৫০টি	১,৬৫০টি
মিড্ল স্কুল	১৩,৮৫০টি	১৯,৩০০টি
উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,৩০০টি	১০,৬০০টি
বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়	৩০টি	৪৩০টি
কারিগরী বিদ্যালয়	১৩০টি	৪৮০টি

উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাতেও আশানুরূপ অগ্রগতি দেখা যায়। অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায় এবং আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু কলেজী শিক্ষার মানও দ্রুত নামিয়া যায়। শিক্ষকের অপ্রতুলতা, কলেজ-পরিবেশ শিক্ষার উপযুক্ত না হওয়া, নিম্নমানের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্থনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে এই রকম অবস্থা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষার মান নামিয়া যাওয়ার অর্থই হইল জাতীয় শিক্ষার মানের অবনতি হওয়া অর্থাৎ পৃথিবীতে জাতির মর্যাদা কমিয়া যাওয়া। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার মানোন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থা

(১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিশেষ করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানোন্নয়ন, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, সমাজশিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক কর্মের উন্নয়ন —প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল রাজ্য-সরকারসমূহের ১২৫ কোটি টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৪ কোটি টাকা, মোট ১৬৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইল—কেন্দ্রীয় সরকারের ৯৫ কোটি টাকা ও রাজ্য-সরকারসমূহের ২১২ কোটি, মোট ৩০৭ কোটি টাকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দের তালিকা

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা	৯৩ কোটি	৮৯ কোটি
মাধ্যমিক শিক্ষা	২২ ,,	৫১ ,,
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা	১৫ ,,	৫৭ ,,
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২৩ ,,	৪৮ ,,
সমাজশিক্ষা	৫ ,,	৫ ,,
প্রশাসন ইত্যাদি খাতে	১১ ,,	৫৭ ,,
	১৬৯ কোটি	৩০৭ কোটি

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার কি অগ্রগতি ঘটিয়াছিল এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কি লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নের তালিকায় বুঝা যাইবে।

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
৯-১১ বছরের শিশুদের শিক্ষা	৫১%	৬২·৭%
১১-১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ	১৯%	২২%
১৪-১৭ বছরের কিশোরদের শিক্ষা	৯·৪%	১১·৭%

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়া যায়।

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	২,৭৪,০৩৮	৩,২৮,৮০০
নিম্ন বুনিয়াদী	৮,৩৬০	৩৩,৮০০
উচ্চ বুনিয়াদী	১,৬৪৪	৪,৪৭১
হাই/হায়ার সেকেণ্ডারী	১০,৬০০	১২,১২৫
বহুমুখী বিদ্যালয়	২৫০	১,১৮৭
বিশ্ববিদ্যালয়	৩১	৩৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার যে সমস্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তাহা নিম্নরূপ :—(১) যে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা ক্রমশঃ বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত করা এবং শিক্ষার সুযোগ বাড়াইয়া তোলা, (২) সংবিধানে যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছিল সেই লক্ষ্যে পৌছানো। উপরোক্ত তথ্যে এইটুকু লক্ষ্য করা যাইবে যে, প্রাথমিক স্তরে শতকরা ১১ ভাগ উন্নতি ঘটিয়াছে, কিন্তু ১১-১৪ বছরের বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৩ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা যায়। কাজেই সংবিধানে যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা এখনও সুদূর-পরাহত। (৩) আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বিপুল শিক্ষার অপচয় ঘটে তাহা নিবারণ করা। (৪) বালিকাদের শিক্ষার উপরেও খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও প্রথম পরিকল্পনায় যেরূপ সামগ্রিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহা বজায় রাখা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা-বিধান এবং দ্রুত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রসারের যেমন চেষ্টা করা হয়, তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক সংস্কারের চেষ্টা হয়। দেখা যাইতেছিল মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় শতকরা ৫০ জন অকৃতকার্য হয় আর শতকরা ৫ বা ৭ জন উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃহৎ অংশেরই অপচয়। এই অপচয় রোধ করার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেখা গিয়াছিল। এইরূপ মনে করা হইয়াছিল যে, অধিক সংখ্যায় বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে

পারিলে এই অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হইবে। সেজন্য কারিগরী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই মনোভাব লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ, দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির পরিমাণ বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে সরকারী বৃত্তিতে পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তাই কারিগরী শিক্ষার উপরও জোর পড়ে। সাধারণতঃ চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দক্ষ কারিগরের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়। বড় বড় আকারে ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ টেক্‌নোলজী স্থাপন করিয়া, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বাড়াইয়া, পলিটেকনিক স্থাপন করিয়া, জুনিয়ার টেকনিক্যাল বা ট্রেড-স্কুল স্থাপন করিয়া দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির চেষ্টা হয়। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রেও দ্রুত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা বাড়াইয়া তোলার চেষ্টা করা হইতে থাকে।

(৪) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-খাতের ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়ানো হয়। এই পরিমাণ ছিল ৪০৮ কোটি টাকা।

তাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-খাতে ২০৯ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষা-খাতে ৮৮ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা-খাতে ৮২ কোটি এবং অন্যান্য খাতে ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

সংবিধানের ৪৫ ধারায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্পূর্ণ করা যাইবে। তাহা সম্ভব না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর **বাধ্যতামূলক শিক্ষার** ব্যবস্থা করা দরকার।

আর একটি বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ সুরু করা হয়। তাহা হইল, শিক্ষা সম্বন্ধে এক ব্যাপক সমীক্ষার ব্যবস্থা। এই সমীক্ষার ফলে দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সমস্যাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং কি ধরণের স্কুল কোথায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা হয়।

এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল, আরও কয়েক লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন হইবে এবং এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষণবিহীন শিক্ষকের শিক্ষণদান করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহা নিম্নরূপ। হিসাব করিয়া ইহা স্থির হইয়াছিল—৩৮০১৩টি এক-শিক্ষক-বিশিষ্ট নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ২৮ লক্ষ অতিরিক্ত শিশুর শিক্ষাদানের সুযোগ বাড়ানো যাইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ হিসাব করা হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনা-কালের মধ্যে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ বালক-বালিকার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে এবং ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য অনেক নূতন নূতন জিনিষ সংযোজিত হয়। যেমন, সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্স ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। তাহা ছাড়া দিল্লীতে শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা ও সহায়তার জন্য যে সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলি যাহাতে পূর্ণভাবে শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হয়—

৬-১১ বৎসরের শতকরা ৬৩ জন অতিরিক্ত শিক্ষালাভ করিবে
১১-১৪ " " ২২ জন " " "
১৪-১৮ " " ৮ জন " " "

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তাহার সহিত গ্রামাঞ্চলে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রসারিত করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা হইল সমগ্র ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(৫) ইংলণ্ডের শিক্ষণ-শিক্ষা কমিটি (McNair Committee)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনে বলা হয়, ইংলণ্ডের সকল স্তরের জন্য শিক্ষা সফল করিতে হইলে ৯০ হাজার হইতে সোয়া লক্ষ নূতন শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন। কিন্তু এত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিবে কোথা হইতে? এই জন্য বোর্ড দুই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করেন—স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে জরুরি শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজ (Emergency Training College) খোলা হইল। এদিকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার জন্য এক কাজ করা হইল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে লিভারপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের (Vice-Chancellor) নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হইল। তৎকালীন লিভারপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ছিলেন স্যার আর্নল্ড ম্যাকনেয়ার (Sir Arnold McNair)। এই শিক্ষণ-শিক্ষা কমিটির নাম হইল Recruitment and Training of Teachers and Youth Readers Committee.

ম্যাকনেয়ার কমিটির মন্তব্যগুলি হইতেছে নিম্নরূপ।

(১) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্য-কুশলতা ও তাঁহাদের সামাজিকতা-বোধ বৃদ্ধি করা। স্নাতক ছাড়া অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য দুই বৎসরের পরিবর্তে তিন বৎসরের ট্রেনিং দান এবং প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তিন মাসের জন্য কোনও বিদ্যালয়ে ঐখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকার মত পাঠদান করিতে হইবে। এই সুপারিশটি বিশেষ কার্যকরী এবং সফল হইয়াছে।

(২) ম্যাকনেয়ার কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশটি হইতেছে যে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজের সাধারণ বিষয় ছাড়া কতকগুলি সামাজিক ও কৃষ্টিগত বিষয় শিক্ষা করিবেন; যথা—সমাজবিজ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্য, চারুশিল্প, চারুকলা, সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা, যুব-শক্তি চালনা, শারীরিক ও মানসিক বিকলাঙ্গ ও অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা ইত্যাদি। কমিটির মতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ব্যাপক ট্রেনিং থাকা প্রয়োজন।

(৩) কমিটির তৃতীয় সুপারিশ হইল শিক্ষাদানে ব্যাপৃত পুরাতন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য 'রিফ্রেশার কোর্স' বা ঝালাই পাঠের ব্যবস্থা করা।

(৪) ম্যাকনেয়ার কমিটির চতুর্থ সুপারিশ এলিমেণ্টারী স্কুল ও গ্রামের (Rural) স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির। এলিমেণ্টারী ও গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায়

অনেক কম ছিল। উপরের শ্রেণীতে যাঁহারা পড়াইতেন, তাঁহারা সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকদের মতই কাজ করিতেন। কমিটি সকল শিক্ষকের বেতন এমন একটা স্কেল করিয়া দেন যাহাতে এলিমেণ্টারী ও গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর কোন অসুবিধা না হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ ভাল বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে বহু যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষাদানে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের সত্তর ভাগ শিক্ষিকা, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহাদের বেতন শিক্ষকদের তুলনায় কম রহিয়া যায়। পূর্বে ইংলণ্ডের বিবাহিতা শিক্ষিকাকে শিক্ষকতার কাজে নেওয়া হইত না এবং শিক্ষকতা করিতে করিতে কেহ বিবাহ করিলে তাঁহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইত। কিন্তু ম্যাকনেয়ার কমিটির সুপারিশে এইরূপ নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হয়। মাতৃত্বের জন্য শিক্ষিকাদের বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৫) ম্যাকনেয়ার কমিটির আর একটি বিশেষ সুপারিশ হইল, বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক যোগাড় করা। যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের অনুমোদিত যোগ্যতা যদি না থাকে, যদি তাঁহারা অন্যান্য গুণের অধিকারী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষকতা-কার্যে অর্থাৎ ট্রেনিং কলেজে ঢুকিবার কোন বাধা থাকিবে না। ম্যাকনেয়ার কমিটির এই প্রস্তাব ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দুই দেশেই প্রবর্তন করা হইয়াছে। কমিটি আরও বলিয়াছেন, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যখন বৃত্তি মনোনয়ন করিবে, তখন তাহাদিগকে শিক্ষকতা-কাজের মহত্ব বুঝাইতে হইবে। যে সব ছেলেমেয়েরা এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাহিবে, তাহাদের স্কুলে আঠার বৎসর পর্যন্ত পড়িবার জন্য ভাতা ইত্যাদি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। যাঁহারা পরিণত বয়সে শিক্ষকতা-কার্যে আসিবেন, তাঁহাদিগকে অধিক বেতন দেওয়া হইবে। কমিটি বলেন যে, ট্রেনিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুব বেশী যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ট্রেনিং কাউন্সিল স্থাপন প্রয়োজন। কমিটি এই মত পোষণ করেন যে, এতদিন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করা হইত এবং তাঁহারা ট্রেনিং কলেজে পুস্তকাশ্রয়ী-বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এখন দেশের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে ট্রেনিংকে সর্বদোষ হইতে বিমুক্ত করিতে।

(৬) বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন গৃহীত হয়। ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তৎপূর্বে উহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্তৃক, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্তৃক, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আদেশে কিছু পরিবর্তিত করা হইয়াছে এবং তাহার পরও উহার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারেই জেলা স্কুল-বোর্ডসমূহ গঠিত হইয়াছে।

এই আইন অনুসারে রাজ্য-সরকারের স্তরে একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা-কমিটি স্থাপিত হইবে ও ঐ কমিটিতে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে থাকিবেন রাজ্য-সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা, দুইটি ডিভিসন হইতে স্কুল-বোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত চারি জন সদস্য ও সরকার-মনোনীত সাত জন সদস্য। যদি স্কুল-বোর্ডের সভ্যগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম না হন, তবে উহারাও সরকার-মনোনীত হইবেন। সরকার-মনোনীত সাত জন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন রাজ্য-সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করার জন্য এই কমিটির শরণাপন্ন হইতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা স্কুল-বোর্ড গঠিত হইবে।

উহার সভ্য হইবেন—

(১) সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে জেলা-শাসক।
(২) ঐ জেলার অন্তর্গত মহকুমার-শাসকগণ
(৩) ঐ জেলা-স্কুল-পরিদর্শক
(৪) সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান
(৫) ,, ,, ,, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান

(৬) প্রতি সাব-ডিভিশন হইতে জেলা-বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত এক জন করিয়া প্রতিনিধি

(৭) প্রতি সাব-ডিভিসন হইতে ইউনিয়ন-বোর্ড সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত এক জন করিয়া প্রতিনিধি

(৮) প্রতি সাব-ডিভিশন হইতে এক জন করিয়া সরকার-মনোনীত প্রতিনিধি

(৯) দুই জন সরকার-মনোনীত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি

(১০) এক জন শিক্ষক প্রতিনিধি।

জেলা-স্কুল পরিদর্শক জেলা স্কুল-বোর্ডের সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত সেক্রেটারী হইবেন। প্রথম দুইটি কার্যকালের জন্য জেলা-শাসক ইহার সভাপতি হইবেন—তৎপরে সকল সভ্যের ভোটে অধিকতর আস্থাভাজন ব্যক্তি সভাপতি নিযুক্ত হইবেন। প্রয়োজন হইলে ঐভাবেই আর এক জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন। বোর্ড কর্তৃক ভার-প্রাপ্ত হইলে তিনি সভাপতির কিছু কিছু দায়িত্ব লইতে পারিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি বোর্ডের সভা পরিচালন করিবেন এবং কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে তিনি নূতন সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। প্রতি চারি বৎসর পরে নূতন নির্বাচন দ্বারা বোর্ড গঠিত হইবে এবং উহা আইনসিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন বোর্ড কাজ করিবেন। সরকার অযোগ্য বিবেচনা করিলে সভাপতি, সভ্য অথবা সমগ্র বোর্ডকে অপসারিত করিয়া শূন্য স্থানে নূতন নির্বাচন ঘোষণা করিতে পারিবেন। এই বোর্ড তাহার অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা প্রস্তুত করিবেন ও প্রয়োজন মত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, শিক্ষক নিয়োগ বদলী করিবেন, তাহাদের বেতনাদি প্রদান করিবেন, বোর্ড পরিচালনের জন্য অন্য কর্মচারী নিয়োগ করিবেন, চাকুরীর সর্ত মান্য করিয়া তাহাদের উপর শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন। বোর্ড পরিচালন সংক্রান্ত ব্যাপারে মিটিংএর স্থান নির্ধারণ, কর্তব্যাদি বণ্টন, বিশেষ কমিটি নিয়োগ, অর্থাদির আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের বিধিবিধান রচনা করিতে পারিবেন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। তাহারা কোনও দায় ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে অক্ষমতা দেখাইলে সরকার বোর্ডকে আদেশ করিতে পারিবেন। ইহারা প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত

তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থভুক্ত করিবেন, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, প্রয়োজন ও সুবিধামত কোনও অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রাণ্ট ইন্ এইড্ মঞ্জুর করিবেন, প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে শিক্ষা-অধিকর্তার সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করিবেন ও তথ্যাদি প্রদান করিবেন, শিক্ষকদিগকে বেতন, ভাতা, পেন্সন প্রভৃতি (বিধিনিয়ম অনুসারে) প্রদান করিবেন। বোর্ড প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে তাঁহাদের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বাজেট তৈয়ারী করিবেন ও কাজের হিসাব রাখিবেন। ঐ হিসাব অডিট বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইবে ও তাঁহার নির্দেশনা ইহারা মানিতে বাধ্য থাকিবেন। অবশ্য তাঁহার কোনও রায় বিষয়ে বোর্ড শিক্ষা-অধিকর্তার নিকট পুনর্বিচার চাহিতে পারেন। কিন্তু অধিকর্তা কর্তৃক অডিটর-প্রদত্ত রায় গৃহীত হইলে তাহারা তাহাদের দায় মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। বোর্ড যদি কোনও জমি গৃহ প্রভৃতি দখলের প্রয়োজন জ্ঞাপন করেন, তবে সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া জমি দখল আইনের সাহায্যে বোর্ডকে তাহা প্রদান করিবেন। বোর্ডএর অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বোর্ডের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা তহবিল

সরকার প্রদত্ত অর্থ, জেলায় আদায়ীকৃত শিক্ষাকর, জেলা স্কুল-বোর্ডের সম্পত্তির আয়, ছাত্রদত্ত বেতন ও অন্য ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থদ্বারা এই তহবিল গঠিত হইবে। এই তহবিল বোর্ডের অধীনে থাকিবে। বোর্ড ইহা হইতে তাহাদের সম্পত্তি-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব, সেস আদায়ের জন্য কমিশন বাবদ ব্যয়, অডিট ফি, শিক্ষকের বেতন ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ নির্বাহ করিতে পারিবেন।

বোর্ড প্রতি বৎসর ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে তাহাদের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের পরিকল্পিত হিসাব রাজ্য শিক্ষা-অধিকর্তা মারফৎ সরকারের মঞ্জুরীর জন্য প্রদান করিবেন। সরকার প্রয়োজনমত উহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন। মঞ্জুরীকৃত বাজেট অনুযায়ী বোর্ড তাহার কর্মচারী ও প্রতিনিধিগণ মারফৎ তাহা খরচ করিবেন, কিন্তু তাহাদের আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষণ জন্য অডিটরকর্তৃক অডিট হইবে ও বোর্ড উক্ত অডিট রিপোর্ট

অনুযায়ী আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। বোর্ডের সরকারী প্রতিনিধিগণ যদি অডিট রিপোর্ট অনুসারে আর্থিক দায়িত্বে পড়েন, তবে ঐ অর্থ তাহাদের মাহিনা হইতে কাটিয়া লইয়া পুনরুদ্ধার করা হইবে। অন্য নির্বাচিত সভ্যের ক্ষেত্রে তাহা সরকারী তহবিল তছরুফ পুনরুদ্ধার বিধি অনুসারে আদায় করা ও পুনরুদ্ধার করা হইবে। অবশ্য অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত বিচ্যুতি সম্বন্ধে পুনর্বিচার জন্য তাঁহারা রাজ্য-শিক্ষা-অধিকর্তাকে অনুরোধ করিতে পারেন ও তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ঐ অর্থ আদায় স্থগিত থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি

Progress of Pry. & Basic Education in West Bengal since 1947-1948

বৎসর Year	প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা Number of Primary & Junior Basic Schools	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা Number of Scholars (Institution wise)		শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা Number of Teachers		মোট Total
		বালক Boys	বালিকা Girls	শিক্ষণপ্রাপ্ত Trained	শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন Un-trained	
১	২	৩	৪	৫	৬	৫
১৯৪৭—১৯৪৮	১৩,৯৫০	৮,৯০,০৬৭	১,৫৪,০৪৪	১৩,৭৭১	২১,৬৫৯	৩৫,৪৩০
১৯৪৮—১৯৪৯	১৪,১৬৬	৯,৮০,৪৩৯	১,৭৬,৫৭২	১৪,৭০২	২৩,৫৯৫	৩৮,২৯৭
১৯৪৯—১৯৫০	১৫,০০১	৯,৮১,০৮০	২,৯৬,১১৭	১৭,১৫৩	২৪,২২৮	৪১,৩৮১
১৯৫০—১৯৫১	১৪,৭৮৩	১০,৬১,৭৪৮	৩,৫৪,৭৭৮	১৭,৭০২	২৫,৪৯০	৪৩,১৯২
১৯৫১—১৯৫২	১৫,১৬৪	১০,৯৭,৩৮৭	৩,৯২,৯২৬	১৮,৪৩৯	২৫,৪৯১	৪৩,৯৩০
১৯৫২—১৯৫৩	১৫,৩৫৩	১১.৪২,২১৩	৪.৩০,৫৪৩	১৮,৮৭০	২৬,২২৪	৪৫০৯৪
১৯৫৩—১৯৫৪	১৬,৯৬৪	১২,১২,২৬০	৪,৯২,৯৩১	২০,৮৪৩	৩১,৩৩১	৫২,১৭৪
১৯৫৪—১৯৫৫	২০,৬৯৫	১৩,৪২,৭৩৮	৫.৭১,১৯৪	২২,৫৮১	৪০,২০৯	৬২.৭৯০
১৯৫৫—১৯৫৬	২৩,০৩১	১৪,৭৪ ৪৩৪	৭.০৪,৬০৩	২৩,৯০৭	৪৫,২৬৭	৬৯,১৭৪
১৯৫৬—১৯৫৭	২৫,২৪১	১৫,৩০,৫০৩	৭ ৯০,৮৯৩	২৬,২৫৫	৪৭,৮৪৩	৭৪ ০৯৮
১৯৫৭—১৯৫৮	২৫,৪৩৬	১৫,৬৩,৮৩৭	৮.০১,৮০২	২৭,২৫৪	৪৭,৩৩২	৭৪ ৫৮৬
১৯৫৮—১৯৫৯	২৬ ২৯০	১৬ ১১,৭০৬	৮.৫৩.৭৩৯	২৮,৫৫৬	৪৮,৫৪৬	৭৭,১০২
১৯৫৯—১৯৬০	২৭,২০৯	১৬,৫০,০৫৬	৯.০০,০০৭	৩০,৩৩১	৫১,১২৩	৮১,৪৫৪
১৯৬০—১৯৬১	২৭,৯৭২	১৬,৮৮,৬০০	৯ ৪৬,৩৮৯	৩১,৮৯০	৫১,৮৪২	৮৩,৭৩২
১৯৬১—১৯৬২	৩০,৩৩৫	১৮,২৩,৩৩৭	১১.১৯,৯৬৫	৩৩,৫২০	৫৬,২৪৯	৮৯,৭৬৯
১৯৬২—১৯৬৩	৩২ ০৯২	১৯,৮৩,০৭১	১১ ১৭,৯৪৬	৩৫৬৪৭	৫৯,৯৪৩	৯৫,৫৯০

UNIVERSITY QUESTIONS

B. T. Examination,—1954

History of Education

Full marks—100

The questions are of equal value. Answar Five questions, Three from section A and Two from section B.

Section—A

1. Compare the Brahmanic system of education with the Buddhistic system in regard to the aim and organisation.

Or

Write notes on any two of the following :—

(a) Akbar's educational theory and organisation.

(b) Teaching of handwriting in the old days.

(c) The method of instruction in a chatuspathi of old.

(d) Admission examination of Nalanda University.

2. What are the major recommendations of the Secondary Education Commission regarding the curriculum at the high school stage and the examination at the end of that stage ?

3. Discuss the problem of languages in schools in free India.

4. Write notes on any two of the following :—

(a) Iswar chandra Vidyasagar's contribution to education in Bengal.

(b) William Adam.

(c) G. K. Gokhle and Primary education.

(d) Rabindranath's ideal of education.

5. Write a critique on recent University reforms in India with particular reference to Bengal.

Section—B

6. Discusss the general principles underlying the guidance movement.

Or

Comment on the 'Comprehensive school' idea

1955—History of Education

Full marks—100

The questions are of equal value. Answer Five questions, Two from section A and three from section B.

Section—A

1, Give a critical estimate of the contribution of Froebal to modern educational thought, making reference to his important writings.

2. Show how a beginning of national system of education in England can be traced in Education Act of 1902.

Section—B

3. Give an account of the ancient University at Nalanda with special reference to the courses of studies followed there.

4. The Government of India put a stop to the Orientalist versus Occidentalist controversy in education by issuing a resolution in 1835. What important decisions were embodied in that resolution ?

5. The Despatch of 1854 emphasized the introduction of system of grants-in-aid. Show how the grants-in-aid system helped in promoting education through the medium of English in secondary schools in India during the past years.

6. Discuss the provisions of the Bengal (Rural) Primary Education Act 1930, and show why a separate Act was necessary for non-municipal areas.

7. The Basic education scheme is considered as the most important national educational experiment throughout India.

Discuss its merits and show how it can be linked up with an improved type of education recommended by the Mudaliar commission.

1956—History of Education

Section—A

1. John Dewey says—"The principle that development of experience comes through interaction means that education is essentialy a social process. This quality is realized in the degree in which individuals form a community group." Amplify the idea of Dewey and show how it is shaping the educational policy of State Governments in India.

Section—B

2. Give an account of what the Muslim rulers did for promotion of learning in India.

3. The East India Act of 1813, was the first legislative admission of the right of education to participate in the public revenues of India. Lord Moira (Governor General of India) in 1815 emphasized the foremost claims of the village school masters in the reorganisation of education in India. But nothing was done for them for many years, why ? Give reasons for your answer.

4. The three universities at Calcutta, Madras and Bombay will celebrate their centenaries in 1957. Narrate how they came into existence in 1857, and what powers they possessed in the beginning.

5. Lord William Bentinck's resolution of 1835 gave a new direction to education in India. On account of passing of the new Government of India Act, the year 1935 was considered as the threshold of a new era of provvincial autonomy. What suggestions were made by the Government of Bengal in their resolution of 1935 for improvement of primary education in the province ?

6. Trace the growth of national educational movement through the instrumentality of the First Five Year Plan of the Government of India. What were the new directions which the plan envisaged in the field of education ?

1957
History of Education
Full marks—100

Answer Five questions, selecting at least two from each Section.

Section—A

1. Trace the historical development of Froebel's theories as they were expanded and corrected by application to practical teaching, and came to their culmination in the kindergarten.

Section—B

2. Examine critically the Brahmanic System of education and give reasons for its decline at the advent of Buddhism in ancient India.

7. Give a brief account of the educational activities of the Christian missionaries and the East India Company in the former presidencies of Bengal and Madras prior to 1814.

3. Write notes on any two of the following :—
(i) Wood's Despatch of 1854.
(ii) The Hunter Commission of 1882.
(iii) The Abbot-Wood Report.

4. Discuss the main recommendations of the Calcutta University Commission of 1917 in the light of subsequent expansion of education in the country.

5. Describe a Multi-purpose School as it is expected to function under favourable circumstances in the country. How have the Government of India differed from the recommendations of the Secondary Education Commission in respect of the reorganisation of Secondary Education ?

1958—History of Education

Answer Five questions, selecting two from Group A and three from Group B.

Group—A

1. Give a critical estimate of the contributions of either Montessari or Pestalozzi on education.

2. Discuss the main educational ideas of John Dewey and indicate whether similar ideas have been expressed by any of the Indian Educators.

Group—B

3. Discuss critically the general characteristics of the Hindu system of education in ancient India.

4. Give a critical estimate of the aims and organisation of either Buddhistic or Islamic Education in India.

5. Give a brief account of the beginnings of Western Education in India, mentioning the main agencies responsible for the same.

6. Write notes on any two of the following :—

(a) Macaulay's Minute.

(b) Adam's report.

(c) Curzon's educational policy.

7. What are the main clauses of the Bengal (Rural) Primary Education in West Bengal and examine critically the measures that are being adopted by the state for its improvement.

1959—History of Education

Group—A

1. Estimate Froebel's contributions to modern education.

Group—B

2. Give an account of the aims and activities of the ancient universities in India with special reference to the courses of studies followed in any one of the universities you mention.

3. Trace the origin and growth of Ismalic Education in Mediaeval India.

4. Give a critical account of the Orientalist-Occidentalist controversy in the field of Indian education during the 19th century. What was its outcome ?

5. Trace the development of Calcutta University with special reference to its organisation, administration and problems since 1857.

6. Discuss the development of Secondery Education in India since Independence.

B. A. Education. 1962

1. Discuss the Educational activities of the Christian missionaries during the days of East India Company.

2. State the important recommendations of the Indian Education Commission of 1882.

Why was it thought necessary to provide Secondary Education on the grant-in-aid basis ?

3. Trace the development of Primary Education in India from 1882 to 1913.

4. What were the main provisions of Bengal (Rural) Primary Education Act of 1930 ?

5. Trace the development of Secondary Education in West Bengal since independence.

6. State the salient features of the Wardha scheme of Education and examine them.

7. "The results of women's education under the existing conditions have not been entirely satisfactory." Discuss the statement.

8. Write short notes on any two of the following :—

(a) Adam's report on vernacular education.

(b) Filtration theory.

(c) Bengal Government Resolution of 1937 on Education.

(d) Control of Education by local bodies.

B. A, Part II—1963

Third Paper

Group A

1. Trace the growth of the idea of introducing compulsory primary education in pre-independant and independant India. What are your suggestions for the introduction of free and compulsory primary education in India at an early date ?

2. "The concept of secondary education in India is fast changing."

Critically examine the statement with reference to the recognised pattern of secondary education in your state.

3. Give an account of the recent developments in the field of Basic education in India. What difficulties do you find in its aim and practices?

4. What, according to you, should be the ideals of University education? Set forth in this connection your views about the creation of new Universities in India.

5. The present system of external examination has been characterised as one of the worst features of Indian education. How far do you agree with the statement? What changes would you suggest for improving the system?

Group B

6. 'Nursery and Kindergarten schools in some Western Countries are called play schools where children learn the 3R's only incidentally without the help of any books.' What are your views about such schools? Discuss the significance of the term 'play' here.

7. Set forth your views about an ideal curriculum for primary education.

8. Write short notes on any two of the following :—

(a) Wastage and stagnation in primary education.

(b) Sargent Scheme.

(c) Qualification of an ideal primary school teacher.

(d) Montessori method.

Group C

9. Offer your own suggestion for the recruitment of competent teaching personnel for Higher Secondary (multipurpose) schools in West Bengal under present conditions.

10. Write a critique on the present curriculum for higher secondary education in your state.

11. Write short notes on any two of the following :—
   (a) Control of secondary education.
   (b) Need for guidance in secondary education.
   (c) In-service training of teachers.
   (d) Hadow Report.

Group D

12. Critically discuss the progress of technical education in India through the instrumentality of the last two Five-years plans.

13. What should be the relation of technical education with general education ? How far that objective is realised in the present system of technical education in the country ?

14. Write short notes on any two of the following :—
   (a) General education movement.
   (b) Education and employment.
   (c) Pre-medical course.
   (d) Place of Art and craft in education

B. A. Part II—1964

Third Paper

Group A

1. Give an account of the new pattern of secondary schools in India as outlined by the Secondary Education Commission, 1952-53. Do you think that the multi-purpose schools will be able to improve secondary education in our Country ? Give reasons for your answer.

2. Offer your own views regarding the position of English in the primary curriculum.

3. What is your idea about the immediate conversion of all the traditional primary schools into Basic patterns ?

4. Trace the origin and development of local administration of education in India. How far has it been effective in promoting primary education in India ?

5. Discuss the problems connected with the recruitment, selection, and training of the teaching personnel for your secondary school.

Group—B
(Pre-School Education)

6. The Pre-School stage is educationally more important in the life of a child than any other period of life. Discuss.

7. "The wastage and stagnation in the field of primary education are still appalling." Elucidate. How would you solve the problem ?

8. In recent years, there has been a mushroom growth of the so-called kindergarten and nursery schools without any specialists or trained teachers on the staff. Critically examine the statement. Can you justify their existence ? Give reasons for your answer.

Group—C
(Secondary Education)

9. What, according to you, should be the aims of secondary education ? How far these aims are being realised in our system of Secondary education ?

10. Write an essay on 'Guidance in Secondary education.'

11. Set forth your own views regarding the control and administration of Secondary education in India.

Group—D
Technical Education including Art & Craft.

12. What according to you is the aim of technical education ? Fully discuss the question.

13. The requirements of India after independence demand that there should be a larger number of engineering

institutes spread all over the country to train our youths. Do you agree ? Give reasons for your answer.

14. Greater attention must be paid to the teaching of art and craft in schools for cultivating an artistic and aesthetic sense in our young pupils, if not for anything else. Elucidate the statement.

Group—E

(Education of handicapped children)

15. What are the different types of handicapped children ? Discuss the psychological and educational problems relating to one such type.

16. "The education of handicapped children is a state responsibility."—Discuss.

What has your State done in this respect ?

17. "Many of us are blind about the blind."

What is the significance of this statement ? What arrangements exist at present in our country for the education of the visually handicapped ?

Bibliography

1. Education in India by K. S. Vakil.
2. History of Education in India and Pakistan by F. E. Keay.
3. The Students' History of Education in India by Nurullah & Nayek
4. ভারতের শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ by Kalyani Karlekar
5. Education in India Today and Tomorrow by S. N. Mukherjee
6. History of Education in India by S. N. Mukherjee
7. The Development of Modern Indian Education by Bhagwan Dayal Srivastava (Old Edition)
8. The Development of Modern Indian Education by Bhagwan Dayal Srivastava (New Edition)
9. Ancient Indian Education by R. K. Mukherjee
10. The Report of the Secondary Education Commission—India Govt.
11. Educational Reconstitution by Hindusthani Talimi Sangha
12. Higher Education in relation to Rural India by H. T. Sangha
13. Gandhian Outlook and Technique —Unesco.
14. The Report of the Assessment Committee on Basic Education—Govt. of India Publication
15. The Report of the University Education Commission —India Govt.
16. Causes and Treatment of Backwardness by Brest.

17. Rehabilitation of the Physically handicapped by Kessler.
18. Education of the Handicapped by Powell.
19. Backwardness in Basic Subjects by Schonell.
20. সমাজ ও শিশুশিক্ষা by Pratima Gupta.
21. Nursery Years by Susan Isaacs.
21. Hindusthan Year Book 1963.
22. India : a reference annual, 1960,-61-62-63.
23. Compulsory Primary Education in India—Unesco.
24. Five Year Plans—Govt. of India First, Second and Third—(Draft Plan.)
25. আমাদের শিক্ষা—ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ।
26. Teachers and Youth Readers.
27. Report of the Kher Committee—Mc Nair Committee Report.
28. Report of the Central Advisory Board of Education. (Sarjent's Report.)
29. Education in India by A. N. Basu.
30. সরল ভারতীয় শিক্ষার বর্তমান সমস্যা by শ্রীঅসীম বর্ধন।
31. History of Infant Education by Rusk.